অহল্যাভূমি পুরুলিয়া

অহল্যাভূমি পুরুলিয়া

তৃতীয় পর্ব

সম্পাদনা

দেবপ্রসাদ জানা



দীপ প্রকাশন
২০৯এ, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০০০৬

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০৪

প্রচ্ছদশিল্পী : ধ্রুব দাস
সহঃ সম্পাদনা : নিলয় মুখার্জ্জী

প্রকাশক : শংকর মণ্ডল
২০৯এ বিধান সরণি, কলকাতা-৬

মুদ্রণ :
জগদ্ধাত্রী প্রিণ্টার্স
৩৭/১/২ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড
কলকাতা-৬৪

বর্ণ সংস্থাপনঃ
আই. ই. আর. ই.
২০৯এ বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৬

অখণ্ড পুরুলিয়ার সেই সব মানুষের উদ্দেশে
যারা আচরণে বিনীত
আকাঙ্ক্ষায় নির্লোভ
যারা হৃদয়ের নিকটে আজও
চেয়েছে শুধু হৃদয়

যে ভূমি ধূসর হয়ে যায়নি
যে অরণ্য গগনপ্রয়াসী
যে নদী প্রবাহের লাগি
অস্থির চঞ্চল অতি

ভূমিকা

ব্যবহারজীবী হিসেবে পুরুলিয়া বিচারপ্রার্থী জনসাধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আমার পবিচিতি হয়েছে গত শতাব্দীর ষাট দশকের শুরু থেকেই। অভিজাত পঞ্চকোট পরিবারকেও যেমন চিনেছি জেনেছি, তেমনি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এবং আদিবাসী ভূমিজ অনুন্নত সম্প্রদায়ের মানুষকেও খুব কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে আমার পঁচিশ বছরের ব্যবহারজীবী জীবনে। বিচারক হিসাবেও উপলব্ধি করতে পেরেছি এদের সহজ সরল অথচ আবেগপ্রবণ মানসিকতা। আচরণে নম্র, সাধারণভাবে নির্লোভ এখানকার মানুষ। শহরে অভিজাতদের কাছে যারা ব্রাত্য, তাদের মর্যাদাবোধ দেখেছি নিরঙ্কার লোক সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে।

রাজ্যের জেলাগুলির মধ্যে এই সীমান্তবর্তী জেলাটি পশ্চাৎপদ হলেও, প্রাকৃতিক খনিজ সম্পদে ভরপুর, যদিও যথাযথ ব্যবহারের তেমন কোন বলিষ্ঠ শিল্প গড়ে ওঠেনি। বনজ সম্পদেও অগ্রণী। বিজ্ঞানমনস্কতা যেমন বিকশিত হয়নি সাধারণ মানুষের মধ্যে, শিক্ষা বিস্তারেও প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠেনি আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা। অন্ধ কুসংস্কারের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হয়নি সহজ সরল মানুষ। অথচ রয়েছে লোক সংস্কৃতির ঐশ্বর্যসম্ভার লোক সাহিত্য ও সঙ্গীতের অভিব্যক্তি ও মূর্ছনায় এবং মানবসম্পদের দ্যোতনায়।

বঙ্গভাষী মূলস্রোতের সঙ্গে সহ অবস্থান রয়েছে কোল, ভীল, সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও, হো, ভূমিজ, অসুর, বিড়হর, ডোম, কালিন্দী, বাউরি, রাজোয়াড়, কামার , কুমার, কুর্মি, মাহালি, কুইরি, শবর খেড়িয়া, ও মারোয়াড়ীদের। তাদের নিজের ইতিকথা নিয়েও গড়ে উঠেছে এক সমন্বয়ী লোকসংস্কৃতি, যা এক স্বতন্ত্ররূপ পরিগ্রহ করেছে বাচনভঙ্গির বৈশিষ্ট্যে। মধ্যযুগীয় বাংলাভাষাব সঙ্গে মিশ্রণের ফলে উদ্ভব হয়েছে নবকলেবরে সীমান্তভূমির কথ্য উপভাষা। ভাষা থেকেই নানা বিকিরণে বিচ্ছুরিত হয়েছে তার নিজস্ব ভঙ্গিমায় লোকগাথা, সাহিত্য, কবিগান, বাউল ঘরানায় সঙ্গীত, টুসু গান, নাচনী, ঝুমুর ইত্যাদি। আবার কালীপুরের মার্গ সঙ্গীত এবং নানা আঙ্গিকের ভাদুগান।

"অহল্যাভূমি পুরুলিয়া"-র তিন খণ্ডে প্রকাশিত মানভূম ও পুরুলিয়ার ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব ও পুরাকীর্তি, ভাষা, সাহিত্য, লোক-সংস্কৃতি ও সমাজজীবনের এই আকর গ্রন্থের যথার্থ প্রয়োজন ছিল। জেলাশাসক ও সমাহর্তা শ্রী দেবপ্রসাদ জানা অনবদ্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন পুরুলিয়াপ্রেমী লেখক গোষ্ঠী এবং গবেষকদের সমন্নয়সাধন করে এই প্রচেষ্টার মধ্যে। জেলাশাসকের এই ভূমিকা মনে করিয়ে দেয় হান্টার, ও' ম্যালি, পার্জিটার ও ডালটন প্রমুখ সিভিলিয়ানদের—যাঁরা প্রশাসনে যোগ্যভূমিকা পালন করেও আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার অনবদ্য সাক্ষর রেখে গেছেন। সম্পাদক বিশেষত ধন্যবাদার্হ কারণ আজকের প্রশাসনিক পটভূমি ঊনবিংশ কিংবা পরের শতকের তুলনায় অনেক বেশি সমস্যাসংকুল। বর্তমানের অন্যান্য জেলা প্রশাসকরা এ ধরনের প্রয়াস নিলে সারা রাজ্যের মানুষ উপকৃত হবেন।

প্রত্যেকটি প্রবন্ধ বা প্রতিবেদনই সুলিখিত। তার মধ্যে কয়েকটি গবেষণাধর্মীও বটে। আমি সামান্য আলোকপাত করেছি মাত্র কয়েকটি রচনাসম্ভারের উৎকর্ষ সম্বন্ধে।

অবহেলিত মানুষের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের এবং সমাজসংস্কারের ভূমিকা এবং জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াসে বিপ্লবী অন্নদাপ্রসাদের আন্দোলন, যা তাঁকে পরবর্তীকালে কর্মযোগী অসীমানন্দ রূপে চিহ্নিত করেছিল, সে সম্বন্ধে ড. ব্রজদুলাল চক্রবর্তী লিখিত "পুরুলিয়ার মানুষ অসীমানন্দ : শতবর্ষের আলোকে" অনেক অজানা তথ্য উদ্ভাসিত করে। মানভূমের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে শ্রী বারিদবরণ মিশ্র লিখিত পুরুলিয়া জিলা স্কুলের সার্ধশতবর্ষে অবস্থান, মানভূম ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশনের সমান্তরাল এবং স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য (শ্রী অনিলকুমার চৌধুরীর প্রতিবেদনের মাধ্যমে), স্বাধীনতার পরবর্তী অধ্যায়ে চরিত্রগঠন ও

শৃঙ্খলাবোধের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত "সৈনিক স্কুল ও পুরুলিয়া" (মিহিরকুমার ভট্টাচার্য লিখিত প্রবন্ধ) শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য ভূমিকার কথা মনে করিয়া দেয়। শ্রী নিলয় মুখার্জীর লেখা "পুরুলিয়ার হরিপদ সাহিত্য মন্দির" অনুসন্ধিৎসু পাঠককে সন্ধান দেয় গ্রন্থাগার এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশের, বিজ্ঞানমনস্কতার উন্মেষ সম্বন্ধে তুষার সেনগুপ্ত লিখিত জেলা বিজ্ঞান কেন্দ্র, পুরুলিয়া তথ্যসমৃদ্ধ অভিজ্ঞান বিতরণ করে, তেমনই এক আকরের সন্ধান দেয় মৃণালকান্তি মণ্ডলের লেখা পুরুলিয়া জেলা বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জি। "পুরুলিয়ার নারীশিক্ষা" বিষয়ক ইন্দ্রাণী দেবের লেখাটি লিঙ্গ বৈষম্য ও নারীশিক্ষার প্রগতি সম্বন্ধে অনেক ইতিবাচক ভাবনাচিন্তা উত্থাপিত করে জনমানসে। সর্বোপরি অজয়মোহন গাঙ্গুলী লিখিত "পুরুলিয়া জেলার শিক্ষাব্যবস্থার বিবর্তন" আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে দারিদ্র্য এবং অভিজাতশ্রেণীর অনীহা সত্ত্বেও শিক্ষা প্রসারে কিছু তথ্যভিত্তিক পরিসংখ্যান দিয়ে সারণির মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থার একটি সামগ্রিক চিত্র পরিস্ফুট করেছে। শ্রী সুশান্ত হাজরার লেখা "পুরুলিয়ার গ্রন্থাগার আন্দোলন" শিক্ষাবিস্তারে গ্রন্থাগারের বিশিষ্ট অবদান এবং সরকারি প্রয়াসের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অবহিত করেছেন। অপূর্ববকুমার সান্যাল যেমন "মানভূম—উপভাষা প্রসঙ্গে" ভাষায় জড়তা এবং সারল্য নিয়ে কথ্যভাষার সমধিক গুরুত্বের কথা বলেছেন. শিক্ষা : ভাষা-সমস্যা উপভাষার ভূতভবিষ্যৎ" সম্বন্ধে ছন্দম দেব তাঁর রচনায় মান্য-ভাষা ও উপভাষার তাৎপর্য বিশ্লেষণে সাধারণ জনগোষ্ঠীর কাছে তাদের কথ্যভাষা সম্পর্কে ব্রাত্য মানসিকতার কথা স্মরণ করিয়ে, চেয়েছেন উপভাষাকে লালন করা বা শ্রদ্ধা প্রদর্শনের অর্থ মান্যভাষাকে অস্বীকার করা নয়, প্রয়োজনে বিজ্ঞানসম্মত ভাষানীতি এবং শিক্ষানীতি, যাতে শিক্ষাচর্চা ও জ্ঞানচর্চা অবহেলিত না হয়। লেখ্যভাষাচর্চার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপের অনস্বীকার্যতা। সেজন্য শুধু তথ্য নয়, চাই প্রযুক্তিও। প্রযুক্তির পত্রপুষ্প যেন ঝরে পড়ে মানভূমের শ্যামল মানসিকতায় সীমান্তরাঢ়ী ও ঝাড়খণ্ডী বাঙলার গ্রামীণ শব্দকোষে, যাতে শিক্ষাবিস্তারে কোন প্রতিবন্ধকতা বা বিঘ্ন না আসে।

"পুরুলিয়া জেলার পত্র-পত্রিকা, একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনে" জগন্নাথ দত্ত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার ইতিবৃত্ত ও প্রসার সম্বন্ধে একটি তথ্যভিত্তিক বিন্যাস করেছেন, ক্ষণজীবী ক্ষুদ্রপত্রিকা ছাড়াও সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকার প্রকাশে বহুলাংশ বৃদ্ধির কথা বলেছেন পশ্চিমবঙ্গ অন্তর্ভুক্তির উত্তর কালে। পুরুলিয়ার হিন্দি সাহিত্যের চর্চা-চিত্র উন্মোচিত করেছেন রাওয়েল পুষ্প। "অভিব্যক্তি" নামে সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থার মাধ্যমে হিন্দি, বাংলা ও উর্দু এই ত্রিভাষায় এক কবিগোষ্ঠীর সূচনা ও মহিলাদের মধ্যে সাহিত্যচর্চার অগ্রগতি সম্বন্ধেও আলোকপাত রয়েছে এই প্রতিবেদনে। তেমনি শিবেন্দ্রকুমার পাণ্ডের বিজ্ঞানবিষয়ক সাহিত্য রচনার সম্ভার, যা পর্যাবরণ চেতনা, বিজ্ঞান প্রগতি ও যোজনা বিষয়ে জ্ঞানপিপাসু পাঠক মাত্রকেই নতুন অভিজ্ঞানের সন্ধান দিয়েছে।

মানভূমি উপভাষা, কাঁসাই সভ্যতা ইত্যাকার তত্ত্বগত আলোচনার কোন ছায়াপাতই ঘটেনি গম্ভীর সিং মুড়া বা সিন্ধুবালা দেবীর নৃত্যকর্মে। পুঁথিগত শিক্ষার অপেক্ষা না করেই লোকসংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তার নিজস্ব দ্যোতনা বা অভিব্যক্তিতে। সৃষ্টির পিছনে সক্রিয় যে মাতৃশক্তি তারই আভাস দিয়েছেন সুবোধ বসুরায় "লোকসংস্কৃতির উৎস সন্ধানে" নিবন্ধে। দক্ষিণ রাঢ়ে মানুষের বেশভূষা অবিন্যস্ত, আচরণ রুক্ষ, ভাষা রূঢ়, রড়া বা রক স্টোন দিয়ে তৈরি বাড়ির ভিত্তি, কিন্তু কঠিন সংকল্পবদ্ধ মন দিয়ে এদের লোকসংস্কৃতি গড়ে উঠেছে।

শ্রুতিস্মৃতিতেই রয়েছে লোকসংস্কৃতির উৎস। তেমনি জেলার অর্থনীতি আর লোকজীবনে ছাপ পড়েছে নানা ক্ষুদ্রশিল্পের সম্ভার এমনকি অনপনেয় কয়লার। কোল, ভীল, সাঁওতাল, মুণ্ডা, ভূমিজ, অসুর, বিরহড়, ডোম, কালিন্দী, বাউরি, রাজোয়াড়, কামার, কুমার, কুর্মি, মাহালি, কুইরি, ওঁরাও, হো, শবর খেড়িয়া, মারোয়াড়দের ইতিকথা নিয়েও অনেক লোকসংস্কৃতির উৎস রয়েছে। মূলত অব-আর্য মানুষের বিশেষ উচ্চারণ ও বাকভঙ্গিগত বৈশিষ্ট্যের তাপে ও চাপে আদি মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষার যে স্বতন্ত্র রূপ ও অবয়ব গড়ে উঠেছে তাই হল সীমান্তভূমিব উপভাষার নিজস্ব পরিচয়। আর ভাষা থেকেই সাহিত্য। লোকসাহিত্য, গদ্য, পদ্য, নাটক সব মুখে মুখে। উচ্চারণ আর বাচনভঙ্গিব কলাকৌশল

বাদ দিলে অর্ধেক রস মাটি। এমনিতে রুক্ষ নীরস শুকনো টাঁড়ের মতো এখানের মানুষের কথাবার্তা, কিন্তু গল্প বা আখ্যান পরিবেশনের মধ্যেই নরম মিহি গলা, টেনে টেনে সুরের অভিব্যক্তি, গানে বা মিষ্ট ভাষণে। কে উপলব্ধি করবে যে তখন তারা কল্পলোকে। ইতিকথা, অতিকথা, পুরাণকথা, রাতকথা, জানকথা—কথার যে শেষ নেই। কোত্থেকে আসে, উৎস কী— সেটা উপলব্ধির বিষয়। এই প্রতিবেদনে লেখক তাঁর গবেষণার মানসিকতায় বলতে চেয়েছেন লোকসংস্কৃতির উৎস রয়ে গেছে দৃষ্টির বাইরে, সম্ভবত আর্কিয়ান যুগে। প্রকৃতির বুকে যারা সারাজীবন কাটিয়েছে তারা না জেনেই ভালোবেসেছে। যা শিখেছে, যা জেনেছে তা ভালোবাসারই কল্যাণে। ঘাসের মতোই যা অমর। পাথরকেও সবুজ করেছে ভালোবাসা।

"পুরুলিয়ার কবিদের কবিচর্চা প্রসঙ্গে" লিখেছেন মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। কবিতা ও গানের দেশ পুরুলিয়া, রেলশহর আদরায় কবিতা আন্দোলনের ঢেউ, পুরুলিয়া শহরে কবিদের কবিতার কুচকাওয়াজ ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যায়ে ভালো করে তিনি তাঁর নিবন্ধে ব্যক্ত করেছেন এক প্রতিপাদ্য সত্য, জগৎ ও জীবনকে বাদ দিয়ে কোন সার্থক কবিতা রচিত হতে পারে না। যতই পরীক্ষা-নিরীক্ষা হোক না কেন, সত্যিকার সার্থক কবিতা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে মনের মণিকোঠায়, আর যা অন্তঃসারশূন্য তা মহাকালের বিচারে বিবর্জিত হবেই। তিনি আশা করেছেন নতুন শতাব্দীর সোনালি আলোকে রক্তপদ-চিহ্ন রেখে এগিয়ে যাবে নতুন দিগন্তের সন্ধানে।

'অযোধ্যা পাহাড়ে সাঁওতালদের শিকার মেলা'র মাধ্যমে সিরাজুল হক বৈশাখী পূর্ণিমার যৌবন মেলা বা পৌরুষের মাদকতার চিরাচরিত প্রথা-নির্ভর উৎসবের আখ্যান বর্ণনা করেছেন। প্রত্যেক পুরুষকেই কমপক্ষে একবার এই শিকার উৎসবে অংশগ্রহণে করতে হবেই। তাদের প্রত্যেকের ঘরে মা-বোন-স্ত্রীরা দিন গুনতে থাকে শুভ প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায়, না ফিরে আসা পর্যন্ত প্রথামতো তারা কাপড় কাচে না, মাথায় চিরুনি দেয় না এবং সিঁদুরও পরে না এবং নিয়মের নিগড়ের মধ্যে থাকে। শহুরে কৃত্রিমতার প্রাচীর টপকে আমাদেরও প্রত্যাশা করা উচিত কী অনাবিল আনন্দের স্রোতে বয়ে যায় এই উৎসবে।

কিরীটি মাহাতোর লেখা "পুরুলিয়ার ঝুমুর গান ও ঝুমুর কবি" প্রসঙ্গে ঝুমুরের সংজ্ঞা ও তার পরিচয়, উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, তার শ্রেণীবিভাগ, ভৌগোলিক পরিসীমা, তার সুর, তাল, গায়কী, তার সঙ্গীত ও সাহিত্য, অনুপ্রাস ও অলংকার, কবি ও শিল্পী-সমাজ এবং বিভিন্ন ভঙ্গিমা ও তার বহিঃপ্রকাশ— যেমন ভবপ্রীতানন্দ ওঝা, রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলী, জগৎ কবিরাজ, বরজুরাম দাস, অখু কর্মকার, নরোত্তম সিংমানকী, সৃষ্টিধর সিংদেও কাটিয়ার, সলাবত মাহাত, কৃত্তিবাস কর্মকার ইত্যাদি বিভিন্ন ভাবধারা এবং গায়কী এবং ঝুমুর শিল্পীদের বিবরণ-সমন্বিত এই প্রতিবেদন যেন একটি তথ্য-নির্ভর গবেষণার ফলশ্রুতি। তেমনি অনুপ মুখোপাধ্যায় লিখিত ' পুরুলিয়ার নাট্যচর্চার ইতিবৃত্ত"। বিভিন্ন শিল্পী এবং শিল্পী-গোষ্ঠীর অবদান সম্বলিত প্রবন্ধ। ড. শান্তি সিংহের "প্রসঙ্গ বাউল-সাধনা ও পুরুলিয়ার বাউল গান" একটি তথ্যনির্ভর দর্শনতত্ত্ব সম্বলিত গবেষণাপ্রসূত প্রবন্ধ। কায়াসাধনায় নারী সহায়িকা, বৈষ্ণব যৌনাচারী রহস্যবাদী উপধর্মের লোকায়ত মতবাদের সঙ্গে তন্ত্র, বৌদ্ধ শূন্যবাদ, সাংখ্যযোগ ও বৈষ্ণব সহজিয়া মতেব এবং সুফিবাদী, ধ্যানধারণার সংমিশ্রণের কোথায় যোগসূত্র ও কোথায় পার্থক্য তা বিশ্লেষণ করেই লেখক বলতে চেয়েছেন বাউল-সাধনায় নারীদেহ কামনা ও ভোগের উপাদান নয়, দেহসাধনের জন্যই নারীপুরুষের মিলন, যেখানে প্রেমই লক্ষ্য, দেহসঙ্গমে থাকবে কামহীনতা। বাউল-সাধনার গুহ্য আচার পদ্ধতি কামকে ছাড়িয়ে প্রেমতীর্থে উত্তরণের পথে অনেকেই পথভ্রষ্ট, তবুও সেই অতীন্দ্রিয়বাদী উত্তীর্ণ সাধনধারাকে কীভাবে রবীন্দ্রনাথও তাঁর শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন তার বাঙ্ময় রূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন ড. সিংহ তাঁর প্রতিবেদনে। পুরুলিয়া জেলা সম্পর্কে আনন্দ পুরস্কার প্রাপ্ত গবেষক ড. সুধীর চক্রবর্তীর 'বাউল-ফকির-কথা' গ্রন্থে প্রকাশিত মতামত খণ্ডন করে ড. সিংহ বলতে চেয়েছেন পুরুলিয়ার লোকসঙ্গীত টুসু-ঝুমুর-করম-ভাদু প্রভৃতির মতনই বাউলগান এ জেলারই প্রাণের সম্পদ—যা অন্য জেলা থেকে আমদানি করা নয়, এ মাটিরই সংস্কৃতির ফসল। সেবাধর্মের সাধন মনোহর ক্ষ্যাপা, ঝালদার

হেটজার্গো গ্রামের সৃষ্টিধর কাটিয়ার, সিজাডি গ্রামের যজ্ঞেশ্বর মাহাত, মানবাজারের মালিয়ানের রামকানাই মাহাত, মালিয়ান গ্রামের দিল্লেশ্বর মাহাত, সাঁওতালডিহির প্রেমসিড্ডি হেমদাস আনন্দাশ্রমের স্বামী উত্তমানন্দ, যাঁর পূর্বাশ্রমের নাম রামেশ্বর সিংহ— এঁদের বাউলগানের উদ্ধৃতি দিয়ে লেখক তাঁর তথ্য সপ্রমাণ করেছেন। তাঁরা বৈষ্ণবপন্থী বাউল ভাবুক, তাঁদের মধ্যে তথাকথিত নারীকেন্দ্রিক গুহ্য যৌনাচার বা তার বিকৃতি অবিদ্যমান। পুরুলিয়ার বাউল অধ্যাত্মপ্রিয়, সংসার বিরাগী ভাবুক হয়েও সমাজের প্রিয়জন।

স্বপন দাসের লেখা "মানভূমের ভাদুগান" প্রতিবেদনটি তার স্বীয় ভাস্বরতায় প্রোজ্জ্বল। করম উৎসব মূলত কৃষি উৎসব বা শস্য উৎসব। তাঁর মতে বিভিন্ন কিংবদন্তী প্রামাণ্যতার অভাবে বা যুক্তির অভাবে গ্রহণীয় নয়। রাজকন্যা ভদ্রেশ্বরী বা ভাদু কিনা সে সম্বন্ধে বিতর্ক থাকলেও পুরুলিয়া গেজেটিয়ারে তার স্বীকৃতি রয়েছে। শুধু বাউরি বা বাগদি সমাজের মধ্যেই এই পূজার প্রচলন এটাও যুক্তিগ্রাহ্য নয়। পুরুলিয়া বা মানভূমে কোন সম্প্রদায়গত সীমারেখার মধ্যে এই পূজা আবদ্ধ নয়। প্রধানত এইটি মেয়েদের পূজা। ভাদুগানের বৈশিষ্ট্য কাশীপুর রাজমহলের ঘরোয়ানায়। মার্গ সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতায় এর ব্যাপ্তি।

কাশীপুর ঘরোয়ানার আঙ্গিকের বাইরেও রামায়ণ প্রসঙ্গে, সামাজিক প্রসঙ্গে ও নানা ভাদুগান প্রচলিত ও তার ব্যাপ্তিও হয়েছিল। ছড়া জাতীয় গানও তৈরি হয়েছে বিভিন্ন বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে। এছাড়াও আছে দলবদ্ধ গান। রঙ্গ-রসিকতার মাধ্যমে একদল অন্য প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করে, প্রতিপক্ষও সদুত্তর দেন যোগ্য শ্লেষে। এইভাবে উত্তর-প্রত্যুত্তরের মধ্যে ভাদুগান জমে ওঠে। মাঝে মাঝে একই গান ভাদু ও টুসুর মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়, কারণ এই গানগুলির লিখিত রূপ নেই। লেখক উপসংহার টেনেছেন এই কথা বলে যে ভাদুগান বর্ষাসঙ্গীত নয়। শস্যকেন্দ্রিক বা কৃষি উৎসবের অঙ্গও নয়। ভাদু কোন দেবকন্যা নয়, প্রকৃত মানবী, এক চঞ্চলা বালিকার মূর্ত প্রতিচ্ছবি। রাঢ় বাংলার মাটির সঙ্গে তার নিবিড় যোগসূত্র. তাই মাটিতে লালিত মেয়েদের কাছে তাদের এত প্রিয়, এত কাছের। ভাদু তাদের এতটাই আপনজন তাকে ছেড়ে প্রাণ বাঁচা দায়।

সৈকত রক্ষিতের লেখা "প্রেম ডুরিয়া শাড়ি"—হাট-বাজারের সজীবতা, ক্রেতা-বিক্রেতার পরিপূর্ণতায়। ভিড়ই হল হাটের প্রাণ। পণ্য-সম্ভারের ভারে জর্জর, পরব-বিহারে প্রাণোচ্ছল, নাচ, বাদ্য, বাজনার আকর্ষণ তো আছেই। আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর জন্য মন-প্রাণ আকুল হয়ে থাকে, যার প্রাপ্তি হয় হাটে-বাজারেই; সেখানেই মেলে প্রেম-ডুরিয়া শাড়ি, যা এনে দেবে তার ভালোবাসাব মানুষটি। প্রেমিকের কাছে তার ভালোবাসার মানুষটিকে কেনার ধাতব-মুদ্রা হল তার প্রগাঢ় প্রেম।

বাস্তবমুখী জীবনযাত্রার সঙ্গে মিশ্রিত ওতপ্রোত হয়ে আছে অন্ধ কুসংস্কার আর তামসিকতা। শ্যামল কুমার মণ্ডলের লেখা "পুরুলিয়াব গ্রামসমাজে ডাইনি" এবং মহাবীর নন্দীব "মানভূম সংস্কার বিচিত্রা" যা হাঁচি টিকটিকি বাধার সংস্কারের মধ্যে, মানসিক দুর্বলতার মধ্যে যার বাসা বাঁধা। অনেক সংস্কারই তার রীতি-বৈচিত্র্যে প্রমাণ করে যে মানভূমের মাটিতেই তার জন্ম।

এক বৈচিত্র্যের মধ্যে এবং সমন্বয় লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্যের মধ্যে মানভূম তার স্বীয় স্বাতন্ত্র্যে প্রোজ্জ্বল। তবে মানভূমের মানুষের প্রকৃত সংগ্রাম তার যথাযথ মানবিক মর্যাদার দাবিতে। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের মধ্যেও তার সাংস্কৃতিক উত্তরণ এসেছে। স্বকীয়তায় ভরপুর তার মর্যাদা-সম্পন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, তার লোকসংস্কৃতি। সামাজিক উন্নয়নের মধ্যেই তার আশাআকাঙ্ক্ষার সম্যক প্রাপ্তি ও স্বীকৃতি ঘটবে। সে ব্যাপারে শুধু সরকারি উদ্যোগ নয়, সামাজিক সংহতির একান্ত প্রয়োজন আছে। সে কারণেই এই প্রবন্ধ সংকলনের যথার্থ মূল্যায়ন হবে প্রকৃত মানসিকতার উন্মেষের মধ্যে।

অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কাছে এই সংকলনের যথার্থ সমাদর হবে এই আশা দৃঢ়ভাবে পোষণ করি।

প্রাক্‌কথন

সুদীর্ঘকাল মানভূমে-থাকা পুরুলিয়া ছিল 'মানহারা মানবী'। বিচিত্র স্বার্থান্বেষীর সুচতুর চক্রান্তের জাল পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তির কাল অবধি ছিল প্রকট। তারপর, প্রায় দু'দশক, অনেকের কাছে এই প্রান্তিক জেলা খরা-অজন্মা-দারিদ্র্য-অপুষ্টি কুষ্ঠের দেশ।

অতঃপর ব্যতিক্রমী বাঁক। প্রশ্ন উঠে আসে, কবি শংখ ঘোষের কবিতার ভাষায়—

'বৃষ্টিহীন দুই হাত উঠে এসেছিল খরা বুকে
এখন সমাজ
কার নাম বলে আর? কাকে দিতে চায় সব ভার?'

দিগন্তবিস্তারী নীলাভ শৈলশ্রেণী, আরণ্যক স্নিগ্ধ শ্যামলিমা, রুক্ষ-বন্ধুর লাল মাটি নিয়ে বিপরীত ললিতে কঠোরে পুরুলিয়া বিগত সত্তর দশকের শেষ থেকে, আত্মমর্যাদায় তুলেছে মাথা! অহল্যাভূমি পুরুলিয়া আলোভরা প্রাণের স্বপ্নে পেরিয়ে এসেছে অন্তহীন পথ। একথা যেন একদা কবি জীবনানন্দ তাঁর কবিতায় নিজস্ব কাব্যপ্রকরণে অভিনব প্রকাশরীতিতে বলেছেন—

'মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব
থেকে যায় ; অতীতের থেকে উঠে আজকের মানুষের কাছে
প্রথমত চেতনার পরিমাপ নিতে আসে।'

কবিকথিত 'চেতনার পরিমাপ' ফুটে ওঠে ইতিহাসবোধের উজ্জ্বল দিকচিহ্নে, আর্থসামাজিক ভাবনার সুসংবদ্ধ রূপায়ণে, মানবিকবোধের প্রত্যাশিত অগ্রগমনে। তার প্রতিচ্ছবি সাহিত্য সংস্কৃতি ইতিহাস বিজ্ঞানের প্রমীতির মাঝে উদ্ভাসিত।

মানভূম থেকে পুরুলিয়ার ক্রান্তিকালে স্বাদেশিক চেতনার বিশ্বস্ত ছবি শিক্ষাবিস্তারে তথা নারীশিক্ষার গুরুত্বে যেমন রূপায়িত, তেমনই প্রাতিস্বিক চেতনার হীরকদ্যুতি বিচ্ছুরিত প্রান্তিক বাংলায় থেকেও আধুনিক মন-মননে সমুজ্জ্বল আধুনিক কবিকুলের নানাস্বাদের কবিতামালায়। লাল মাটি নীল অরণ্যের মায়াঘেরা এই প্রান্তিক বাংলার প্রতি বিশ্বস্তহৃদয়ে পুরুলিয়াদরদী কবি শান্তি সিংহ বলেন—

'এই প্রান্তিক বাঙ্‌লায় মৃত্যুর পরেও তোমাকে আসতে হবে।
দুঃসহ খরার দিনে, শালডাল-ভেঙে-হাতে ঢ্যাঙা শরীর নিয়ে হেঁটে যাবে...
ন্যাড়া-মাঠ, বিবর্ণ প্রান্তরে উড়বে লাল ধুলো, শামখোল খুঁজবে জলা,
আগুনের ফিনকিতে রক্ত খয়ের হবে, তবু মানুষ হাঁটবে.........
রাগী আর জেদি মানুষ লাল-কাঁকুরে মাটিতে দেবে গাঁইতির ঘা,
তার কোটরগত চোখে ভাসবে অঘ্রাণের ধান আর টুসুগানের ছবি।'

এ জেলার কবিতাচর্চায় স্থানিক গণ্ডি, আঞ্চলিক ভাষায় অনুশীলনের মাঝে আধুনিক চেতনার গাণ্ডেয়

বাতাস, যা প্রধানত মহানগরী কলকাতা অভিমুখী পরিশীলিত চেতনার ফসল তা প্রবলভাবে প্রতিভাত হয় বিগত শতাব্দীর সত্তর দশকে। উৎপল হোমরায় এবং শান্তি সিংহের উদ্যোগে মহতী কবি সম্মেলনে এসেছিলেন কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মণীন্দ্র রায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় পূর্ণেন্দু পত্রী প্রমুখ বিশিষ্ট কবি। এ জেলার কবিদের পাশে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান প্রভৃতি জেলার কবিরাও।

সাম্প্রতিক কবিতাচর্চার পাশাপাশি এ জেলার নাট্যভাবনা ছোটগল্প-উপন্যাস লেখার আনুপূর্বিক ইতিহাসও সমান জরুরি। বাংলা সহিত্যচর্চার পাশে হিন্দি সাহিত্যচর্চার একটি উজ্জ্বল দিক এ জেলায় পরিদৃশ্যমান। ফলত, এ জেলার পত্রপত্রিকা বিচিত্র সাহিত্যসম্ভারে আশাভরা ভাষা তৈরি করে চলেছে। এ জেলার গ্রন্থাগার আর তার সদর্থক আন্দোলন ইতিহাসের পাতায় চিহ্নিত। আলোচ্য তৃতীয় পর্বের প্রথম অংশে আছে এসব নিয়ে তথ্যঋদ্ধ বিস্তারিত আলোচনা।

পুরুলিয়া তার প্রাণের সম্পদ লোকসংস্কৃতির বিশালব্যাপ্ত ঐশ্বর্যে ভুলে যায় খরার দুঃসহ যন্ত্রণা। এখানকার ঝুমুর, ভাদু, টুসু, বাউলগান, আদিবাসী সমাজের সংস্কার বিচিত্রা, অযোধ্যা পাহাড়ের শিকার মেলা, সর্বোপরি ছৌ এবং নাচনী নাচ রসিক নরনারীর চিত্তকে করে পরিতৃপ্ত। এসবের বিশ্বস্ত আলোচনা এই পর্বের দ্বিতীয় অংশে বিধৃত। সঙ্গে আছে গ্রামজীবনে প্রচলিত অন্ধ কুসংস্কার ডাইনি প্রথার বিজ্ঞানধর্মী সমীক্ষা।

মানুভূম আজ মনোভূমে, তবু তার উজ্জ্বল স্মৃতির অভিজ্ঞান—মানভূম ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন—এ জেলার শিক্ষা তথা স্বাদেশিক চেতনার ধুনি জ্বেলেছে, তার ধারা আজো অব্যাহত। শিক্ষাবিস্তারে ঐতিহ্যঋদ্ধ পুরুলিয়া জেলা স্কুল, সৈনিক স্কুল প্রভৃতি কয়েকটি প্রথম সারির বিদ্যায়তন এবং জেলা বিজ্ঞান কেন্দ্র বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ জেলার সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র হরিপদ সাহিত্য মন্দির। এখানেই একদা শ্রদ্ধা সম্বর্ধনা জানানো হয়েছে বিজ্ঞানাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়কে। এর বার্ষিক অনুষ্ঠানে একদা পৌরোহিত্য করেছেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। নানা অনুষ্ঠানে এসেছেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, নীহাররঞ্জন রায়, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নির্মল কুমার বসু, হুমায়ুন কবীর, প্রমথনাথ বিশী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিদগ্ধ বিদ্বজ্জন।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের তীব্র মুহূর্তে দেশবরেণ্য গান্ধিজি, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, নেতাজি সুভাষচন্দ্রের আগমনে নতুন গতিবেগ অনুভব করেছিলেন এ জেলার মানুষ। এ জেলারই আর-এক স্মরণীয় স্বাদেশিক ব্যক্তিত্ব—যিনি বহু সাধকের বহু সাধনার সম্মিলিতরূপ, এবং নেতাজির প্রীতি সখ্যে ভাস্বর—তিনি এই পুরুলিয়ার মানুষ অসীমানন্দ। মানবসেবাব্রতী সেই মহান ব্যক্তিত্বের জীবনালেখ্য ও সংগঠন-পরিচিতি এই পর্বের তৃতীয় অংশে যুক্ত—যে অংশের অন্তর্গত ভারত সেবাশ্রম সংঘের সেবাযজ্ঞের ইতিহাস এবং জেলার উন্নয়নে 'কল্যাণ'-সংস্থার কল্যাণী ভূমিকা।

সমাপ্তি পর্বের পরিশিষ্ট তথা শেষ অংশে সংযুক্ত হয়েছে পুরুলিয়া জেলা বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জি এবং জেলার তথ্য ও পরিসংখ্যান—যা অনুসন্ধিৎসু পাঠক কুলের তৃষ্ণা মেটাতে সাহায্য করবে।

"অহল্যাভূমি পুরুলিয়া"র শেষ পর্বের সম্পাদকীয় লিখতে গিয়ে কৃতজ্ঞ-স্বীকৃতি জানাই লেখক-গবেষকবৃন্দকে—যাঁদের সানন্দ সহায়তায় সম্ভব হল এই সমাপ্তি পর্বের গ্রন্থনা। সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই মাননীয় বিচারপতি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মুকুলগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে, যিনি এক ব্যস্ততম ব্যক্তিত্ব কিন্তু বিমুখ করেন না শুভ উদ্যোগের কোনও প্রয়াসীকে। দীপ প্রকাশনের জনপ্রিয় কর্ণধার শ্রী শংকর মণ্ডল ও পুরুলিয়া হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের সম্পাদক ও আমার সম্পাদনা সহযোগী স্নেহভাজন শ্রী নিলয় মুখার্জীর আন্তরিক সহায়তা "অহল্যাভূমি পুরুলিয়া" প্রকাশের বিশেষ অনুঘটক—কোনো কৃতজ্ঞতার ভাষাই যথেষ্ট নয় স্বীকৃতি জানাতে।

কর্মজীবনের যে সৃজনশীল খণ্ডাংশে এই দীর্ঘ গ্রন্থের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন সেই সময়ে যাঁর অচঞ্চল ও হার্দিক প্রেরণা আমাকে সরকারি কাজের পাশাপাশি এই গ্রন্থটিকে দিনের আলো দেখার

নিশ্চয়তা দিয়েছে, তিনি একটি বৃহৎ বিদ্যায়তনের প্রধান, শিক্ষা-সংস্কৃতি-সংশ্লিষ্ট বহু প্রতিষ্ঠান ও কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত এবং একটি কিশোরী কন্যার জননীর সব দায়িত্ব ছাড়াও বহু শাখা-প্রশাখাযুক্ত না-ছোটো-একটি পরিবার চালান আমার সাহায্য ব্যতিরেকে সাবলীল দক্ষতায়—তিনি সম্পাদক-জায়া শ্রীমতি বর্ণালী জানা (বসু)। ঘটনাবহুল ও সমস্যাঋদ্ধ প্রশাসনিক কাজের ফাঁকের সময়টুকু তাই নিয়োগ করতে পেরেছি এই সারস্বত কর্তব্যে।

পুরুলিয়ার প্রিয় অধিবাসীদের উদ্দেশে নিবেদিত তিন পর্বে বিধৃত "অহল্যাভূমি পুরুলিয়া" অংশত অনালোকিত ভূখণ্ডটিকে যদি নিয়ে যেতে পারে মরমী পাঠকের হৃদয়ের কাছে তাহলে সার্থক হবে আমাদের সকলের প্রয়াস—যারা ভালোবাসি এই বর্ণময় ভূখণ্ডটিকে, তার অনাবিল ভূমিপুত্রদের, তার ইতিহাস ও সংস্কৃতিঋদ্ধ অতীত ও বর্তমানকে, যার ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধ-সম্ভাবনায় প্রোজ্জ্বল।

মহানগরীসংলগ্ন কোলাহলমুখর একটি উন্নত অথচ সমস্যাকীর্ণ জেলা থেকে প্রাক্‌বসন্তের পলাশরাঙা এই পশ্চিম প্রান্তিক ভূখণ্ডে আসার পরে আরও দুটি বসন্ত কাটিয়ে বর্ষাস্নিগ্ধ সবুজ পলাশে পরিপূর্ণ পুরুলিয়া থেকে মহানগরীতে ফেরার প্রাক্কালে স্মৃতির অর্গল খুলে দেখি, প্রকৃতির উদার দাক্ষিণ্য—যা সকলের জন্য শুধু নয়, পেয়েছি অগণন মানুষের উষ্ণ সাহচর্য ও অকৃপণ ভালোবাসা যা আজীবন সঞ্চিত থাকবে আমার একান্ত গভীর অনুভবে। বিনিময়ে দেবার সামর্থ্য কিছু নেই। "অহল্যাভূমি পুরুলিয়া" রইল সেই অন্তহীন সম্পর্কের সেতু হয়ে।

পুরুলিয়া
১লা আষাঢ়, ১৪১০
১৬ জুন ২০০৩

বিনীত
দেবপ্রসাদ জানা

বিষয় সূচি

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ সংগঠন ঃ স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব — ১৮৭-২৪০

তথ্য ঃ পরিসংখ্যান — ২৪১-২৬৮

শিক্ষা : ভাষা-উপভাষা : সাহিত্য

পুরুলিয়ার শিক্ষাব্যবস্থার বিবর্তন

অজয় মোহন গাঙ্গুলী

পটভূমিকা : ১৯৫৬ সালে ১লা নভেম্বর ভারতবর্ষের মানচিত্র থেকে লুপ্ত বিপুল বনজ ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ 'মানভূম' জেলার বাংলা ভাষাভাষী অধ্যুষিত কিছু অংশ নিয়ে জেলা হিসাবে পুরুলিয়া পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হয়। দীর্ঘ আন্দোলনের ফলশ্রুতি পুরুলিয়া জেলার বঙ্গভুক্তি। শিক্ষার দিক থেকে পুরুলিয়া জেলা চিরদিনই অনগ্রসর।

এই অনগ্রসরতার জন্য কয়েকটি কারণের উল্লেখ করা যেতে পারে।

১. জেলার জমিদার শ্রেণী ছিল শিক্ষাপ্রসারে অনাগ্রহী।

২. জনসাধারণ ছিল অত্যন্ত দরিদ্র এবং শিক্ষা ছিল তাদের সামর্থ বহির্ভূত।

৩. সরকার শিক্ষা প্রসারে বিশেষ আগ্রহী ছিল না।

প্রশাসন ও রাজস্ব আদায়কে কেন্দ্র করে এক শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটেছিল। রেল ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে আদ্রায় গড়ে উঠে এক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বসতি। তাদের চাহিদা ও উদ্যোগে জেলাতে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সূচনা ঘটেছিল। কিন্তু তারা ছিলেন মূলত বহিরাগত, ইংরেজদের ঔপনিবেশিক শোষণের বাহক এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন ফলে শিক্ষার আলো বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে স্পর্শ করেনি।

বঙ্গভুক্তির সময় জেলার শিক্ষাব্যবস্থার চিত্র পাওয়া যাবে নিম্নলিখিত সারণিগুলি থেকে—

সারণি - ১ সাক্ষরতার হার (১৯৬১)

মোট	পুরুষ	মহিলা
১৭.৭৯%	৩১.০৬%	৫.০৪%

সারণি - ২ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা (১৯৬১)

প্রাথমিক বিদ্যালয়	জুনিয়র বেসিক স্কুল	মোট
১৩৯৩	১৩৪	১৫২৭

সারণি - ৩ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা (১৯৬১)

নিম্ন মাধ্যমিক	উচ্চ বিদ্যালয়	একাদশ শ্রেণীর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মোট
৭৩	২৫	১২	১১০

সারণি - ৪ মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা (১৯৬১)

পুরুষ	মহিলা	মোট
২	১	৩

শিক্ষার প্রসার—

বঙ্গভুক্তির পর পুরুলিয়া জেলার সর্বস্তরে শিক্ষার চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষা প্রসারের কর্মসূচি রূপায়িত হতে থাকে। নিম্নলিখিত সারণিগুলি থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত জেলার শিক্ষাব্যবস্থার একটি রূপরেখা পাওয়া যাবে।

সারণি - ১ সাক্ষরতার হার (১৯৭১)

মোট	পুরুষ	মহিলা
২১.৫০%	৩৪.২৭%	৮.২৫%

৬১-৭১ দশকে সাক্ষরতা হারের বৃদ্ধির একটি লক্ষণীয় দিক হল জেলায় পুরুষ ও মহিলা উভয় ক্ষেত্রে সাক্ষরতার হার ৩.২৯% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি - ২ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা (১৯৭৫)

প্রাথমিক বিদ্যালয়	জুনিয়ার	বেসিক স্কুল মোট
১৩৮৩	১৪১	২৫২৪

এই সময়কালে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল ১৯৬৬ সালে জেলা বিদ্যালয় পর্ষদ-এর প্রতিষ্ঠা। এরপর জেলাব গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার দায়িত্ব জেলা বিদ্যালয় পর্ষদকে দেওয়া হয়।

সারণি - ৩ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা (১৯৭৫)

বিদ্যালয়	বালক	বালিকা	মোট
নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়	৯১	০৭	৯৮
উচ্চ বিদ্যালয়	৫৮	০৭	৬৫
একাদশ শ্রেণীর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩৩	০৪	৩৭
	১৮২	১৮	২০০

এই সময় মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ করা যেতে পারে :

(১) নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির শ্রেণীবিভাগ—

নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—দুই শ্রেণী যুক্ত - তিন শ্রেণী যুক্ত - চার শ্রেণী যুক্ত।

(২) অনুদান বিধি—সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির অনুদানবিধি একধরনের ছিল না। কোনটি ছিল সাহায্যবিহীন। কোনটি সরকার থেকে কেবল মহার্ঘভাতা পেত। কোনটি বেতন ঘাটতি ভিত্তিক প্রকল্পাধীন ছিল, আবার কোনো কোনো বিদ্যালয় বেতনের একটি অংশও মহার্ঘভাতা পেত।

(৩) উদ্যোক্তা—বিদ্যালয়গুলি মূলত বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

(৪) সিনিয়ার বেসিক স্কুলগুলির ধীরে ধীরে অবলুপ্তি ঘটতে থাকে, ১৯৭১ সালের পর জেলাতে এরূপ ২টি বিদ্যালয় ছিল। আজও ওই দুটি স্কুল সিনিয়ার বেসিক শিক্ষার প্রতীক হিসাবে টিকে রয়েছে।

(৫) শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা—১৯৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হল সরকার পরিপোষিত শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়। প্রথমে মহাবিদ্যালয়টি মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ছিল, পরবর্তীকালে এটি সহশিক্ষা মূলক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়।

(৬) সৈনিক স্কুলের প্রতিষ্ঠা—কেন্দ্রিয় ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে ১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় সৈনিক স্কুল। এর উদ্দেশ্য ছিল National Defence Academy-এর জন্য ছাত্রদের তৈরি করা। প্রথমে বিদ্যালয়টি The Council of Indian School Certificate Examination-এর অনুমোদন লাভ করে। ১৯৬৯ সালে বিদ্যালয়টি C.B.S.E-এর অনুমোদন প্রাপ্ত হয়।

(৭) মহাবিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থা—বঙ্গভুক্তির সময় পুরুলিয়া জেলায় ১টি মহাবিদ্যালয় ছিল—জগন্নাথ কিশোর কলেজ। এই মহাবিদ্যালয়ে কেবলমাত্র B.A. পড়ানো হত, B.Sc. বা Hons. পড়ার সুযোগ জেলাতে ছিল না, ১৯৬১ সালে B.Sc. ও ১৯৬৯ সালে B.Com. পড়ানোর অনুমোদন মহাবিদ্যালয়কে দেওয়া হয়। ১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় নিস্তারিণী মহাবিদ্যালয়। এটি বর্তমানে পুরুলিয়া জেলার একমাত্র মহিলা মহাবিদ্যালয়। ১৯৬১ সালে রঘুনাথপুর কলেজ, ১৯৬৪ সালে সরকার পরিপোষিত শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, ১৯৬৬ সালে আনন্দমার্গ মহাবিদ্যালয়, ১৯৭১ সালে রামানন্দ সেন্টিনারী কলেজ এবং ১৯৭৫ সালে অচ্ছুরাম স্মৃতি মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৫ সালে মোট মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭টি।

পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ও শিক্ষার প্রসার

১৯৭৮ সালে চালু হয় ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা। এ সময় থেকে শিক্ষা বিস্তার নীতির মৌলিক পরিবর্তন হয়। জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে শুরু হয় সুপরিকল্পিতভাবে শিক্ষা বিস্তার।

এই পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল—

(১) জেলা থেকে নিরক্ষরতা দূর করা।

(২) শিক্ষার অঙ্গনে ১৪ বৎসর পর্যন্ত সকল ছেলেমেয়েকে নিয়ে আসা।

(৩) শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে শিক্ষার হারের পার্থক্য কমিয়ে আনা।

(৪) নারীশিক্ষা প্রসারে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(৫) উচ্চশিক্ষার দ্বার স্থানীয়ভাবে জেলার ছেলেমেয়েদের জন্য উন্মুক্ত করা।

(৬) পেশাগত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

(৭) ভাষাগত সংখ্যালঘুদের জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা।

(৮) প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

(৯) প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটানো।

গৃহীত কর্মসূচি ও তার বাস্তবায়ন

শিক্ষার লক্ষ্য পূরণে বিভিন্ন কর্মসূচিগ্রহণ করা হয় এবং সেগুলি আন্তরিকতার সঙ্গে বাস্তবায়িত হতে থাকে।

(১) সার্বিক সাক্ষরতা প্রসার কর্মসূচি—সার্বিক সাক্ষরতা প্রসার কর্মসূচিকে একটি গণ-আন্দোলনের রূপ দেওয়া হয় যার মূল উদ্দেশ্য ছিল জেলাকে নিরক্ষরতা মুক্ত করা।

(২) সাক্ষরোত্তর কর্মসূচি—এই কর্মসূচির মাধ্যমে নব্যসাক্ষরদের সাক্ষরতার মান বজায় রাখার প্রচেষ্টা করা হয়।

উল্লিখিত অভিযানের মাধ্যমে জনশিক্ষাব স্বপক্ষে একটি অনুকূল আবহাওয়া গড়ে ওঠে।

(৩) প্রবহমান শিক্ষা—

সদ্য ও স্বল্প সাক্ষরদের দিকে লক্ষ্য রেখে এই প্রকল্পের ঘোষিত লক্ষ্য হল—

(ক) অর্জিত সাক্ষরতাকে শিক্ষার কাজে ব্যবহার।

(খ) যুক্তিশীল চিন্তা-চেতনার বিকাশ।

(গ) জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে অর্জিত শিক্ষাকে ব্যবহার।

(৪) জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম—

২০০০-২০০১ সাল থেকে শুরু হয় জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম। এই কার্যক্রমে মূলত চারটি লক্ষ্যকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এইগুলি হল—

(১) সকলের কাছে শিক্ষার সুযোগ পৌঁছে দেওয়া।

(২) ৫+ থেকে ৮+ বছর বয়সি সকল ছেলেমেয়েকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা।

(৩) মাঝপথে যাতে বিদ্যালয় ছেড়ে না যায় তার ব্যবস্থা করা।

(৪) পঠন-পাঠনের মানোন্নয়ন ঘটানো।

(৫) সর্বশিক্ষা অভিযান—

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের সম্প্রসারিত রূপ হল সর্বশিক্ষা অভিযান। এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পর্যায়ক্রমিক কর্মসূচিগৃহীত হয়েছে।

২০০২—সারাদেশের অন্যান্য জেলার সাথে এই জেলাতেও প্রকল্পের কাজ শুরু করা।

২০০৩—বিদ্যালয় বহির্ভূত ও বিদ্যালয় ছুট ৫+ থেকে ১৩+ বয়সি সব ছেলেমেয়েকে শিশু শিক্ষা কেন্দ্র, বিদ্যালয় প্রত্যাবর্তন শিবির ও পাঠক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার অঙ্গনে নিয়ে আসা।

২০০৬—৫+ থেকে ৮+ বছর বয়সি সকল ছেলেমেয়ের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করা।

২০১০—ঐ বয়সের সকল শিশুর অষ্টম শ্রেণী অবধি প্রারম্ভিক শিক্ষা সুনিশ্চিত করা।

উপরিউক্ত প্রকল্পগুলির মাধ্যমে বেড়েছে সাক্ষরতার হার। নিম্নলিখিত সারণি থেকে এর একটি চিত্র পাওয়া যাবে।

সাক্ষরতার হার—

সাল	মোট	পুরুষ	মহিলা
১৯৬১	১৭.৭৯%	৩১.০৬%	৫.০৪%
১৯৭১	২১.৫০%	৩৪.২৭%	৮.২৫%
১৯৮১	২৯.৬৯%	৪৫.৪১%	১৩.২৫%
১৯৯১	৪৩.২৯%	৬২.১৭%	২৩.২৪%
২০০১	৫৬.১৪%	৭৪.১৮%	৩৭.১০%

উপরিউক্ত সারণি থেকে এই তথ্য পাওয়া যায় যে ৮১ - ৯১ দশকে সাক্ষরতার হার সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সমগ্র রাজ্যের সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির তুলনায় এই জেলার সাফল্য কম। যেখানে সমগ্র রাজ্যে ৮১-৯১ দশকে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে ১৬.৭৬%, সেক্ষেত্রে পুরুলিয়া জেলায় এই হার বৃদ্ধি পেয়েছে ১৩.৬০%, মেয়েদের ক্ষেত্রে সাক্ষরতার হার শোচনীয়। ১৯৯১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী সমগ্র রাজ্যে মেয়েদের সাক্ষরতার গড় হার ৪৬.৫৬ শতাংশ কিন্তু পুরুলিয়া জেলাতে এই হার ২৩.২৪% ।

প্রাথমিক শিক্ষা

উপরিউক্ত কর্মসূচিগুলি রূপায়ণ-এর মাধ্যমে তৈরি হয়েছে জনশিক্ষার এক অনুকূল পরিমণ্ডল, জোর পড়েছে প্রাথমিক শিক্ষার উপর। প্রাথমিক শিক্ষাকে সমাজের দরিদ্রতম অংশের কাছে গ্রহণীয় করে তোলার জন্য কয়েকটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে—

(১) শিক্ষাকে অবৈতনিক বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

(২) পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত সকল ছাত্রছাত্রীকে বিনামূল্যে পুস্তক দেবার ব্যবস্থা হয়েছে।

(৩) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের খাদ্য দেবার ব্যবস্থা হয়েছে।

(৪) বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা হয়েছে।

(৫) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

(৬) পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা সুনিশ্চিত করার জন্য প্রাথমিক স্তর থেকে পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়া হয়েছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা

জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে সুপরিকল্পিতভাবে শুরু হয় মাধ্যমিক শিক্ষা প্রসারের কর্মসূচি। এর লক্ষ্য ছিল—

(১) মাধ্যমিক শিক্ষার অঙ্গনে বেশিসংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে আসা।

(২) শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে শিক্ষার হারের পার্থক্য কমিয়ে আনা।

(৩) বিদ্যালয়বিহীন অঞ্চল ও তপশীলি জাতি ও উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে বিদ্যালয় স্থাপন করা।

গৃহীত কর্মসূচি—

(১) প্রতিটি গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় কমপক্ষে একটি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা।

(২) প্রতিটি পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় ন্যূনতম একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা।

(৩) প্রতিটি পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় ন্যূনতম একটি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা।

(৪) সকল দু -শ্রেণীযুক্ত ও তিন শ্রেণীযুক্ত বিদ্যালয়গুলিকে চার শ্রেণীযুক্ত বিদ্যালয়ে উন্নীত করা।

(৫) চলতি বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে অধিক সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর ভর্তির ব্যবস্থা করা।

কর্মসূচি রূপায়ণ

(১) সকল দুই শ্রেণীযুক্ত ও তিন শ্রেণীযুক্ত বিদ্যালয়কে চার শ্রেণীযুক্ত বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়। ২০০৩ সালে সারা জেলাতে ১টি দু-শ্রেণীযুক্ত ও ১টি তিন শ্রেণীযুক্ত বিদ্যালয় রয়েছে।

(২) প্রতিটি গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় ন্যূনতম একটি নিঃ মাঃ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। ২০০৩ সালে কেবলমাত্র নিম্নলিখিত চারটি গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় কোন মাধ্যমিক বিদ্যালয় নেই।

(ক) বাঘমুণ্ডী পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় সিন্দরী গ্রামপঞ্চায়েত

(খ) রঘুনাথপুর পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় আড়রা গ্রামপঞ্চায়েত

(গ) ঝালদা ১নং পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় ঝালদা দরদা গ্রামপঞ্চায়েত।

(ঘ) ঝালদা ২নং পঞ্চায়েত সমিতি এলাকা রিগিড় গ্রামপঞ্চায়েত।

এই চারটি গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় ১টি করে নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল কিন্তু স্থানীয় গোলযোগহেতু বিদ্যালয় শুরু করা যায়নি। প্রতিটি পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় ন্যূনতম ২টি করে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।

(৪) প্রতিটি পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় ন্যূনতম ১টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।

উচ্চশিক্ষা—১৯৭৫ সালের পর পুরুলিয়া জেলায় নিম্নলিখিত ছয়টি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

ক্রমিক সংখ্যা	কলেজের নাম	পঞ্চায়েত
(১)	বলরামপুর কলেজ	বলরামপুর
(২)	নেতাজী সুভাষ আশ্রম মহাবিদ্যালয়	বাঘমুন্ডী
(৩)	মহাত্মা গান্ধী কলেজ	হুড়া
(৪)	মানভূম মহাবিদ্যালয়	মানবাজার
(৫)	মাইকেল মধুসূদন মহাবিদ্যালয়	কাশীপুর
(৬)	পঞ্চকোটরাজ মহাবিদ্যালয়	নেতুরিয়া

সুপরিকল্পিতভাবে মহাবিদ্যালয়গুলিকে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ফলে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও উচ্চশিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত হয়।

পুরুলিয়া হোমিওপ্যাথি কলেজকে ডিগ্রি কলেজে উন্নিত করা হয়। কলেজটি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডিগ্রি কলেজ হিসাবে স্বীকৃত লাভ করে। তাছাড়া বেসরকারি উদ্যোগ ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় The Bengal Institute of Science and Technology। এই কলেজটি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডিগ্রি কলেজ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এখানে B.C.A. ও B.B.A পড়ানো হয়।

নিম্নলিখিত সারণি থেকে ২০০৩ সালে পুরুলিয়া জেলার শিক্ষাব্যবস্থার একটি সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যাবে।

রণি

পুরুলিয়া জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ২০০৩

ক্রমিক সংখ্যা	মিউনিসিপ্যালিটি/ পঞ্চায়েত	প্রাথমিক বিদ্যালয়		মাধ্যমিক বিদ্যালয়				মহা বিদ্যালয়	শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	অন্যান্য মহাবিদ্যালয়
		প্রাঃ বি	জুঃ বেসিক স্কুল	সিঃ বেসিক স্কুল	নিঃ মাঃ বিদ্যালয়	উচ্চ বিদ্যালয়	উচ্চ মাঃ বিঃ				
১	আড়ষা	১৮২	৬		৪	৬	২				
২	বান্দোয়ান	১২৭	৫		৬	৬	২				
৩	বরাবাজার	১৯২	৮		৮	৭	৪				
৪	বলরামপুর	১১৮	৭		১	৫	৪	১			
৫	বাঘমুণ্ডী	১৩৮	১১		৩	৬	২	১	১		
৬	ঝালদা ১নং	১২৯	১৫		৫	৬	৩			১	
৭	ঝালদা ২নং	১১১	৪		৪	৫	২				
৮	জয়পুর	১১২	৪		২	৪	৩				
৯	পুরুলিয়া ২নং	১৩৮	১০		৫	১২	৫			১	
১০	পুরুলিয়া ১নং	১২৯	৯		৬	৮	৪				
১১	হুড়া	১৭৮	১৪	১	৯	১৪	৪	১			
১২	পুঞ্চা	১৫২	১০		৬	১০	৬	১			
১৩	মানবাজার ১নং	১৮৮	৬		৬	৬	৬	১	১		
১৪	মানবাজার ২নং	১১২	৫		৯	৪	৪				
১৫	পুরুলিয়া (মি)	৭৮	২		৩	৩	১১	২	১		২
১৬	ঝালদা (মি)	২০				৩		১			
		২০৪২	১৬	১	৭৭	১০৫	৬২	৮	৩	২	২

পুরুলিয়া জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ২০০৩

ক্রমিক সংখ্যা	মিউনিসিপ্যালিটি /পঞ্চায়েত	প্রাথমিক বিদ্যালয়		মাধ্যমিক বিদ্যালয়				মহা বিদ্যালয়	শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	অন্যান্য মহাবিদ্যালয়
		প্রাঃ বি	জুঃ বেসিক স্কুল	সিঃ বেসিক স্কুল	নিঃ মাঃ বিদ্যালয়	উচ্চ বিদ্যালয়	উচ্চ মাঃ বিঃ				
১৭	রঘুনাথপুর ১নং	৯৮	৬	১	৪	৩	৪		১		X
১৮	রঘুনাথপুর ২নং	১৬৩	৪		৩	৪	৪				X
১৯	পাড়া	৮৩	২		৬	৭	৮				X
২০	সাঁতুড়ী	১০৩	৫		২	৭	২				X
২১	নেতুড়িয়া	২১৮	২		৩	৬	৫	১			X
২২	কাশীপুর	২৯	৯		৫	৯	১১	১			X
২৩	রঘুনাথপুর(মি)					২	৩	১		১	X
		৭৭৮	২৮	১	২৪	৩৮	৩৭	৩	১	১	X
	পুরুলিয়া জেলা	২৮২০	১৪৪	২	১০১	১৪৩	৯৯	১১	৪	৩	২

অবাংলা ভাষাভাষীদের শিক্ষাব্যবস্থা

উর্দুভাষার মাধ্যমে শিক্ষা এবং মাদ্রাসা শিক্ষাঃ

১৮৮৭-৮৮ সালে পুরুলিয়া শহরে পুরুলিয়া মাদ্রাসা নামে একটি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। বিদ্যালয়টি পুরুলিয়া পৌরসভার আর্থিক অনুদানে পরিচালিত হত। পরবর্তীকালে বিদ্যালয়টি ২ শ্রেণীযুক্ত নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি লাভ করে। পঃ বঃ সরকারের গৃহীত নীতি অনুযায়ী বিদ্যালয়টি ৪ শ্রেণীযুক্ত নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। বলরামপুর গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় বালকদের একটি ও বালিকাদের ১টি, বড়উরমা গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় ১টি, গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় ১টি, রোপো গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় ১টি, ভাগুরপুয়ারা-চিপিদা গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় ১টি, চিপিদা গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় ১টি, মানবাজার গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় ১টি, কাশীপুর গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় ১টি, সাতুড়ী গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় ১টি, মুরাডী গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় ১টি, দিঘা গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় ১টি, শালতোড়া গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় ১টি, শাঁকা গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় ১টি, ঝাপড়া জবররা গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় ১টি, দেওলী গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় ১টি, পারা গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় ১টি, রড়রা গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় ১টি উর্দু প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। দীর্ঘদিন পুরুলিয়া জেলাতে উর্দুমাধ্যমের কোন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল না। আদ্রা দঃপূঃ রেলওয়ে বালকদের উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রথম ভাষা হিসাবে উর্দু পড়ানো হয়। এই অসুবিধা দূর করার জন্য কয়েকজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় আয়েসা কাচ্ছী উর্দু বিদ্যালয়। বিদ্যালয়টি ১৯৭৮ সালে নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৯৫ সালে বিদ্যালয়টি উচ্চ বিদ্যালয় উন্নীত হয়। একই সময়ে বাঘরায় প্রতিষ্ঠিত হয় সিনিয়ার মাদ্রাসা ইসলাহুল মোমিন। তাছাড়া রঘুনাথপুর ২নং ব্লক এলাকায় নতুনডি ও দিঘিতে দুটি জুনিয়ার মাদ্রাসা স্থাপন করা হয়েছে।

হিন্দি—পুরুলিয়া জেলাতে হিন্দি মাধ্যমের ৩টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে—দুটি বালকদের ও একটি বালিকাদের। তাছাড়া ৪টি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ও ১টি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বাংলা ও হিন্দি দুটি মাধ্যমে পড়ানো হয়। দুটি হিন্দি মাধ্যমের দশ শ্রেণীযুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে।

ইংরেজি—সাম্প্রতিককালে জেলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের চাহিদা বাড়ছে। অধিকাংশ ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় C.B.S.E. অনুমোদিত এবং বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত। পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনার ব্যবস্থা আছে। এটি পশ্চিমবঙ্গে মধ্যশিক্ষা পর্যদ কর্তৃক অনুমোদিত। সাঁওতালডির—সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যদ কর্তৃক অনুমোদিত একটি দশমশ্রেণী যুক্ত ইংরেজি মাধ্যমের মাধ্যমিক বিদ্যালয়। রঘুনাথপুর মিশন নিঃ মাঃ বালিকা বিদ্যালয়ে বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হয়। বিদ্যালয়টি পঃ বঃ মধ্যশিক্ষা পর্যদ কর্তৃক অনুমোদিত। পুরুলিয়া শহরে রয়েছে এ্যাসেম্বলী অব গড চার্চ, সেণ্ট জেভিয়ার্স ও দুটি ডি.এ.ভি. স্কুল—সব কটি ইংরেজী মাধ্যমের।

কমপিউটার শিক্ষাব্যবস্থা ঃ

জেলার সর্বত্র কমপিউটার শিক্ষার প্রতি চাহিদা বাড়ছে। বেসরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন কমপিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে উঠছে। সরকারি উদ্যোগে বিদ্যালয় ও কলেজ স্তরে কমপিউটার শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। ২০০০ সালে জেলাতে সর্বপ্রথম পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যাল ম্যানেজার উচ্চবিদ্যালয়ে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে অন্যতম পাঠ্যবিষয় হিসাবে কমপিউটার বিজ্ঞান চালু হয়। পরবর্তীকালে পুরুলিয়া জেলা স্কুল, বরাকর উচ্চ বিদ্যালয়, বলরামপুর ভজনাশ্রম উচ্চ বিদ্যালয় ও বলরামপুর ফুলচাঁদ উচ্চ বিদ্যালয়ে কমপিউটার বিজ্ঞান পড়ানো হয়। পুরুলিয়া জগন্নাথ কিশোর

কলেজ, মানবাজার মানভূম মহাবিদ্যালয় ও লৌলাড়া রামানন্দ সেন্টিনারী কলেজে কমপিউটার বিজ্ঞান পড়ানোর অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে কম্পিউটার বিজ্ঞান চালু করা যায়নি। ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় The Bengal Institute of Science and Technology। এখানে B.C.A পড়ানোর ব্যবস্থা রয়েছে।

২০০১ সাল থেকে জেলাতে শুরু হয়েছে Computer Literacy Programme প্রথমে NIIT–WEBEL -এর সহযোগিতায় চারটি বিদ্যালয়ে এই কর্মসূচি শুরু হয় ঃ—

(১) পুরুলিয়া জেলা স্কুল।

(২) রাষ্ট্রীয় বালিকা বিদ্যালয়।

(৩) বরাবাজার উচ্চ বিদ্যালয়।

(৪) রঘুনাথপুর জি. ডিল্যাং ইনস্টিটিউটশন।

পরবর্তীকালে আরও দশটি বিদ্যালয়ে I.B.M. WEBEL-এর সহযোগিতায় এই কর্মসূচি শুরু হয়।

কারিগরি শিক্ষা ঃ পুরুলিয়াতে কারিগরি শিক্ষার তিনটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে ।

(১) পুরুলিয়া পলিটেকনিক ।

(২) সরযু প্রসাদ জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্‌টিটিউট।

এটি ১৯৬১ সালে ঝালদার নিকট ডুরগীতে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিন বৎসরের জুনিয়র ডিপ্লোমা কোর্স পড়ানো হয়।

(৩) ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্‌টিটিউট ।

এটি রঘুনাথপুরে প্রতিষ্ঠিত। এই প্রতিষ্ঠানে ১ বৎসরের বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রেড পড়ানো হয়।

শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান—১৯৫৭ সালে পুরুলিয়াতে প্রাথমিক ও জুনিয়র বেসিক স্কুলে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য জুনিয়র বেসিক ট্রেনিং ইনস্‌টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ১টি সহশিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান। ২০০৩ সালে মাঝিমিড়া ও বাঘমুন্ডীতে ২টি জুনিয়র বেসিক ট্রেনিং ইনস্‌টিটিউট স্থাপিত হয়।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য ১৯৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় সরকার পরিপোষিত শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠানটি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডিগ্রি কলেজ হিসাবে স্বীকৃত এবং এখানে Bachelor of Education পড়ানো হয়। মহাবিদ্যালয়টি সহশিক্ষামূলক।

প্রতিবন্ধীদের শিক্ষাব্যবস্থা ঃ

পুরুলিয়া Deaf and Dumb School ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৫ সালে বিদ্যালয়টির নিজস্ব ভবন নির্মিত হয়। ১৯৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় Blind School।

উপরিউক্ত তথ্যের আলোকে একাবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে যার মূল লক্ষ্যই হল সমগ্র জেলাকে নিরক্ষরতা মুক্ত করা এবং অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সকল ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদান সুনিশ্চিত করা।

Source :

(1) West Bengal District Gazetteers, Purulia.

(2) Office of the District Inspector of School (P.E.), Purulia.

(3) Office of the District Inspector of Schools (S.E.), Purulia.

(4) Govt. of W. Bengal – District Census Hand Book–1961, 1971, 1981, 1991.

শিক্ষা : ভাষা-সমস্যা : উপভাষার ভূত-ভবিষ্যৎ

ছন্দম দেব

১.

গৌরচন্দ্রিকায় একথা স্বীকার করে নেওয়া আবশ্যক, যে ভাষাতত্ত্বের মতো জটিল ও দুরূহ বিষয়ের অবতারণা করার পরিসর এখানে নেই। তবুও যে এমন একটি বিষয়ের আলোচনায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েছি, তার মূলত দুটি কারণ আছে। প্রথমত, সমষ্টির সংস্কৃতি ও ব্যক্তির ভাবের জগতের একটি প্রধান মুখপত্র এই 'ভাষা'—যার সম্পর্কে আমার অপার আগ্রহ। দ্বিতীয়ত, দেড় দশক ধরে পুরুলিয়ার মতো প্রান্তিক একটি জেলায় অধ্যাপনা করতে গিয়ে দেখেছি, যে এখানকার উপভাষা বা লোকভাষার ব্যবহারকারী ছাত্রছাত্রীরা বিধিবদ্ধ শিক্ষার, বিশেষত উচ্চশিক্ষার, প্রাঙ্গণে এসে ধোপদুরস্ত, বাবুগন্ধী, পরিমার্জিত, মান্য বাংলা ভাষার সামনে পড়ে কীরকম সংকুচিত হয়ে পড়ে। শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণের মধ্যেকার সেতু যে ভাষা, তা যখন সংকটের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তখন যে শিক্ষা ব্যাপাবটি সবিশেষ আনন্দের বিষয় থাকে না, একথা বলাই বাহুল্য। তাছাড়া, কখনো কখনো, বিষয়জ্ঞান ভালো হওয়া সত্ত্বেও কোনও কোনও শিক্ষার্থী মান্যভাষার যথার্থ জ্ঞান না থাকায় খারাপ ফলাফলের শিকার হয়—এও দেখেছি। বিধিবদ্ধ শিক্ষা, ব্যক্তিগত চর্চা এবং শিক্ষকতা মিলিয়ে প্রায় তিন দশকের মতো সময় ধরে সাহিত্যের অঙ্গনে বিচরণের সুবাদে ভাষার চাল-চলন-হাল-হকিকত-মেজাজ-মর্জির কিঞ্চিৎ খবরও আমাকে রাখতেই হয়েছে। এসব মিলিয়েই, এবং ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের জলহাওয়ায় এতগুলো বছর কাটানোর ফলে এখানকার লোকভাষার ঐশ্বর্য ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটা উৎসাহ তৈরি হওয়ার ফলেই হয়তো আমার এহেন অবতারণা।

২.

এবার মূলে যাওয়ার পালা। তবু জানি, আমরা গল্প ভালোবাসি। তাই দুটো গল্প। আসলে ঘটনা।

> গল্প ১. আমার শ্রদ্ধাভাজন অগ্রজপ্রতিম একজন ইতিহাসের অধ্যাপকের কাছে শুনেছিলাম---স্থানীয় কোনো ছাত্র বা ছাত্রী ইতিহাস পরীক্ষার খাতায় কোনো একজন ক্ষমতাচ্যুত ও জনরোষতাড়িত শাসক (নাম স্মরণে নেই) সম্পর্কে লিখেছিল— "তখন উয়ারা রাজাকে রাস্তা দিয়েঁ লেতড়াইঁ (বা লেতড়াইয়েঁ) লিয়ে গে(ই)লছিল।" এহেন প্রকাশভঙ্গি সেই অধ্যাপক তথা পরীক্ষককে যে মহা সংকটে ফেলেছিল তাতে সন্দেহ

নেই, কেননা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে ছাত্রের বিষয়টি/ঘটনাটি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা আছে, যদিও মান্য ভাষার যথাযথ দখল না থাকায় সে কেতাবি ভাষায় ভাবটি প্রকাশ করতে পারেনি। বেশ মনে পড়ে, তাঁর মুখে কৌতুক ও দুশ্চিন্তার সহাবস্থান দেখেছিলাম। যদিও তিনি কী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তা আর জানা হয়নি।

(টীকা:—ছাত্র/ছাত্রীটির বক্তব্য ছিল, যে ক্ষিপ্ত জনগণ ওই শাসককে রাস্তার ওপর দিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। "লেতড়াই" শব্দটি উপরিউক্ত অর্থেই স্থানীয় উপভাষায় ব্যবহৃত হয়।)

গল্প ২. আমার অন্য একজন অগ্রজপ্রতিম অধ্যাপক, এবং লোকসংস্কৃতির উৎসাহী গবেষক, ভদ্রলোকের কাছে আরেকটি গল্প শুনেছিলাম। তিনি মাঝে মাঝেই নিছক উৎসাহে কিংবা লোক গবেষণার কাজে গ্রামে গ্রামে, মেলা-পার্বণে ঘুরতেন। এমনই কোনো এক গ্রামে তিনি একবার গিয়েছিলেন গ্রামেরই কোনো একজনের সঙ্গে দেখা করতে। ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত শহুরে, মার্জিত চেহারার এই ভদ্রলোককে দেখে গ্রামের ওই ভূমিজ সন্তান প্রশ্ন করেছিলেন—"মহাশয়ের আগমন-ট?" বিস্মিত অধ্যাপক মহাশয় কী উত্তর দিয়েছিলেন সেটা এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু পরে তিনি আমাকে বলেছিলেন, যে তাঁর কাছে ওই গ্রামীণ লোকটির মুখ থেকে তার নিজের ভাষায় "কিসকে আইসেছেন আইজ্ঞা?" গোছের প্রশ্নই প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু যখন সে মার্জিত ভাষায় প্রশ্ন করে বসল, এবং তা বিশুদ্ধ দুটি বাংলা শব্দ ব্যবহার করে, তখন শহুরে অধ্যাপক মশাই যারপরনাই অবাক হয়েছিলেন। যদিও তিনি লক্ষ করেননি, যে একজোড়া বিশুদ্ধ মান্য বাংলা শব্দের শেষে প্রতিপদের চাঁদের মতো ঝুলছে মানভূমী উপভাষার 'ট' টি।

৩.

আপাতত 'মান্য ভাষা' ও 'উপভাষা' সম্পর্কে দু-একটি প্রাথমিক কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। প্রথমে মান্য ভাষা সম্পর্কেই বলা যাক।

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই সরকারি কাজকর্ম, সাহিত্যচর্চা এবং শিক্ষাদানের জন্য একটি মডেল ভাষা দাঁড় করানো হয়েছে। একে অনেকে শিষ্টভাষা, শহুরে ভদ্রলোকের ভাষা, বাবু ভাষা, চালু ভাষা ইত্যাদি নানা ডাকনামে অভিহিত করেছেন, যদিও আমার 'মান্যভাষা' শব্দটিই যৌক্তিক বলে মনে হয়েছে। একেই আমরা ইংরেজিতে বলি 'Standard Language'–যা আয়ত্ত করতে না পারলে সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক স্তরগুলোতে বিচরণ করা দুরূহ হয়ে ওঠে। এর কারণ সবসময় নিশ্চয়ই এই নয় যে, মান্যভাষা ঐশ্বর্যের দিক থেকে সবার ওপরে। বরং অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে-কোনো একটি ভাষা মান্যতার স্বীকৃতি পাওয়ার পিছনে মূলত দুটি কারণ কাজ করে : (১) এই ভাষা সমাজের ওপরতলার তথা সম্ভ্রান্ত অংশের ভাষা হওয়ায় এর মান্যতা বেশি, (২) শিক্ষাদানের মাধ্যম ও লেখ্য রূপের একটি সাধারণ চেহারা দেওয়ার জন্য সর্বজনগ্রাহ্য একটি ভাষার প্রয়োজন থেকে এর সৃষ্টি। যদিও সামাজিক সম্ভ্রমজনিত মান্যতার বিষয়টিকেই এখন ভাষাতাত্ত্বিকরা সমধিক গুরুত্ব দিচ্ছেন। ড. পবিত্র সরকার এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

"স্ট্যান্ডার্ড ভাষার সম্ভ্রম সমস্ত নন-স্ট্যান্ডার্ড ভাষার চেয়ে বেশি। ভাষাবিজ্ঞানী ও সমাজমনোবিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে-কোনো ভাষার যে 'prestige standard form', তার সেই

ভাষার অন্যান্য নন-স্ট্যান্ডার্ড উপভাষার তুলনায় কোনো 'inherent aesthetic or linguistic advantage' নেই। বরং স্ট্যান্ডার্ডের এই সম্ভ্রমের মূলে আছে নানারকম ভাষাতিরিক্ত সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক কারণ।"[১]

আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি 'acrolect'-এর কথাও বলেছেন—

"কিন্তু একটিমাত্র ভাষার পরিসরে স্ট্যান্ডার্ড ভাষাই অন্যান্য নন-স্ট্যান্ডার্ড ভাষার তুলনায় সম্ভ্রমের সিঁড়িতে সকলের উপরে থাকে। আধুনিক গবেষক এই জন্য তার নতুন নামকরণ করেছেন acrolect–উচ্চতম ভাষা।"[২]

এ যুগের বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ ডেভিড ক্রিস্ট্যাল বলেন—

"The view maintains that everyone speaks a dialect--whether urban or rural, standard or non-standard, upper class or lower class. And no dialect is thought of as 'superior' to any other, in terms of linguistic structure–though several are considered prestigious from a social point of view."[৩]

যে কথাটা এই আলোচনা প্রসঙ্গে স্মরণে রাখা আবশ্যক, তা হল—কোনো মান্য ভাষাই আকাশ থেকে ভূপতিত হয় না। এবং তা কোনো ঐশ্বরিক মাহাত্ম্যে মণ্ডিত নয়। ভাষার ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায় যে, সব মান্য ভাষাই উৎসমূলে ছিল আসলে একটি উপভাষা, যা একটি বিশেষ অঞ্চল বা জনগোষ্ঠীর মানুষ ব্যবহার করত। এহেন একটি উপভাষা মান্য ভাষার রূপ পরিগ্রহ করার দুটি কারণ আছে—তা আগেই বলেছি। প্রথমটি অবশ্যই সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রাধান্যের প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। সভ্যতার অগ্রগতির গতিমুখ যেহেতু নগরকেন্দ্রিকতা ও শাসনক্ষমতার কেন্দ্রমুখীনতার দিকেই ধাবিত, ফলত সেই শাসনকেন্দ্রই ক্রমে হয়ে ওঠে সংস্কৃতিকেন্দ্র তথা ভাষাকেন্দ্র, এবং সেই বিশেষ কেন্দ্র ও সন্নিহিত অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর ভাষাই তখন হয়ে ওঠে মান্য ভাষা। অবশ্য একথাও অনস্বীকার্য যে, এটি একটি সামাজিক প্রক্রিয়া হলেও মান্য ভাষার সঞ্জননে এটিই একমাত্র দিক নয়। অন্য দিকটি হল—জ্ঞানচর্চা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি, প্রাতিষ্ঠানিক তথা বিধিবদ্ধ শিক্ষা, সরকারি কার্যপ্রণালী এবং লেখ্য ভাষার এক সর্বজনীন (সেই ভাষার ব্যবহারকারীদের সাপেক্ষে), মান্য রূপ সামাজিক কারণেই প্রয়োজন হয়ে পড়ে। প্রক্রিয়াটি দ্বান্দ্বিক—সামাজিক কারণেই উপভাষা যেমন মান্যতার দিকে এগোয়, বা সমাজ একটি মান্য ভাষা তৈরি করে নেয়, তেমনই আবার অপরপক্ষে এও সত্য যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো একটি উপভাষা সৃষ্টিশীল ও প্রভাবশীল লেখকের বা জ্ঞানীজনের হাত ধরে মান্যতার দিকে এগোয়। অনেক ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী মানুষের নেতৃত্বে আন্দোলন সংগঠিত হতেও দেখা গেছে।

উপরিউক্ত ধারণার সমর্থনে অনেক তথ্যই দেওয়া যায়—আপাতত দুটিই যথেষ্ট। প্রথমত, ইংরেজি ভাষার ক্ষেত্রে যাকে আমরা 'Standard English' বলি, তা উৎসগতভাবে ছিল East Midland Dialect–যা মূলত লন্ডন ও তার সন্নিহিত অঞ্চলে ব্যবহৃত হত, এবং যা Chaucer-এর হাত ধরেই ক্রমশ standard language-এ পরিণত হয়। Chaucer-এর নিজের ভাষা East Midland Dialect-ই তাঁর সাহিত্যের ভাষামাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং পরবর্তীকালে তা মান্যতার দিকে এগিয়েছে—একথা যেমন সত্য, তেমন লন্ডন ইংল্যান্ডের শাসনক্ষমতার তথা রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ক্ষমতার কেন্দ্র ছিল বলেই East Midland Dialect দ্রুত মান্য ভাষার স্বীকৃতি পেয়েছিল—এও তেমনই সত্য। দ্বিতীয়ত, বাংলা মান্য ভাষার ইতিহাসও অনেকটা এরকম কথাই বলে। বাংলায় লেখ্য গদ্যের প্রথম সপ্রমাণ উদাহরণ সম্ভবত ১৫৫৬ সালে আসামের রাজাকে

লেখা কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণ দেবের চিঠি। যদিও এই ভাষা নিতান্তই বৈষয়িক আদানপ্রদানের ভাষা—যা মূলত সরকারি চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ এবং নথির ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হত, তবু তা সেই সময়ের একটি প্রামাণ্য লেখ্য রূপ—একথা অস্বীকার করা যাবে না। এরকম উদাহরণ ইংরেজি ভাষার ক্ষেত্রেও আছে—সাহিত্য মাধ্যমে গদ্যরূপ আত্মপ্রকাশ করার বহু পূর্বেও ইংলন্ডে গদ্যের নমুনা পাওয়া গেছে—যা মূলত সরকারি নথি, ধর্মীয় উপদেশ এবং ইতিহাসের ঘটনাবলির নিবন্ধীকরণের কাজে ব্যবহৃত হয়েছিল—এবং এ প্রসঙ্গে Alfred, Aelfric, Wulfstan প্রভৃতি নামের কথা ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের পাঠকমাত্রেই স্মরণ করতে পারবেন।

সাধু বাংলা ভাষার লেখ্য রূপ সদর্থেই প্রথম একটি স্থিতিশীল মান্যতা পায় সম্ভবত বিদ্যাসাগরের লেখনীকে ভর করেই। এরপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে শুরু করে স্বাধীনতার সময় পর্যন্ত 'সবুজপত্র' পত্রিকার প্রকাশ এবং প্রমথ চৌধুরীর নেতৃত্বে এবং রবীন্দ্রনাথের সমর্থনে মান্য চলিত ভাষাকে মান্য লেখ্য রূপ দেবার আন্দোলন একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষে চলিত ভাষাকে সংবাদপত্রের ভাষা হিসেবে মেনে নেওয়ার পর থেকেই চলিত ভাষা পাকাপাকিভাবে মান্যতা পায়। কিন্তু লক্ষ করলেই দেখা যাবে, যে রবীন্দ্রনাথ যে ভাষাকে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির মাধ্যমে মান্যতা দিয়ে গেছেন, তাও আসলে কলকাতা-২৪ পরগনা এবং প্রধানত কৃষ্ণনগর অঞ্চলের গঙ্গাপারের ভাষা, যাকে 'পূর্ব রাঢ়ী' বলে চিহ্নিত করা হয়, এবং যা একসময় গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর উপভাষাই ছিল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবশ্য একটা স্বকীয়তা ও স্বাধীনতার দিক আছে—সাহিত্যিক এক্ষেত্রে স্ব-রাট, ভাষা নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্বাধীন। কেননা সাহিত্য মান্য ভাষা কিংবা কোনো বিশেষ উপভাষায়, অথবা দুয়ের সমন্বয়েও রচিত হতে পারে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' কিংবা দেবেশ রায়ের 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' দুটি জনপ্রিয় উদাহরণ—এরকম অসংখ্য উদাহরণ আছে। কিন্তু মান্য ভাষা সংক্রান্ত আলোচনায় আর একটি জরুরি কথা বলা প্রয়োজন। আমরা আগেই বলেছি, যে মান্য ভাষা মানেই তা যে উন্নততর ভাষা—এমন কোনো অর্থ নেই, এবং আধুনিক ভাষাতত্ত্ববিদেরা তা মনেও করেন না। উপরন্তু, মান্য ভাষা পূর্ববর্তী কোনো উপভাষারই পরিবর্তিত রূপ একথাও আমরা মেনে নিয়েছি। কিন্তু তার পরও এটা মনে রাখা প্রয়োজন, যে মান্য ভাষা দীর্ঘদিন শিক্ষাদান প্রক্রিয়া এবং জ্ঞানচর্চায় ব্যবহৃত হবার ফলে নিত্যনতুন শব্দ ও পরিভাষা আহরণ এবং উদ্ভাবন করে, যার ফলে এই ভাষা ক্রমশই সমৃদ্ধতর এক ভাষা-ভাণ্ডার বা 'linguistic repertoire' গড়ে তোলে—স্বাভাবিক নিয়মেই এর প্রকাশক্ষমতার পরিধি বিস্তৃত হয়।

৪.

উপভাষা সম্পর্কে কিছু বলার ক্ষেত্রে সমস্যা এই যে, এ ব্যাপারে নানা মুনির নানা মত। অনেকের মতে, মান্য ভাষা আসলে একটা সামাজিক স্বীকৃতির মার্কা, আভিজাত্যের ছাড়পত্র, কেননা মান্য ভাষাও বিশেষ ধরনের একটি উপভাষা ছাড়া কিছুই নয়। এ কারণেই সম্ভবত উপভাষা বা dialect-এর ধারণা বদলে গিয়ে ক্রমশ 'সমাজ-ভাষা' বা 'sociolect'-এর ধারণা জন্ম নিয়েছে। অর্থাৎ, সমস্ত ভাষাই, তা সে কথ্য বা লেখ্য যাই হোক না কেন, আদতে একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন ও অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত, এবং অভ্যাস ও প্রতিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এ প্রসঙ্গে ভাষাতত্ত্ববিদ ডেভিড ক্রিস্ট্যালের উক্তি আগেই আমরা দেখেছি। Dialect সম্পর্কে আলোচনায় তিনি আরও বলেছেন—

"It is sometimes thought that only a few people speak regional dialects. Many restrict the term to rural forms of speech–as when they say that 'dialects are dying out these days'. They have noticed that country dialects are not as widespread as they once were, but they have failed to notice that urban dialects are now on the increase. Another view is to see dialects as sub-standard varieties of a language, spoken only by low-status grou, s–implicit in such comments as 'He speaks correct English, without a trace of dialect'. Comments of this kind fail to recognise that standard English is as much a dialect as any other variety–though a dialect of a rather special kind."[8]

যাই হোক, একথা অনস্বীকার্য যে, যে-কোনো উপভাষাই তার নিজস্ব সম্পদ ও সমৃদ্ধিতে উজ্জ্বল, তা সে মান্য হোক বা না হোক। আবার একথাও সত্য যে, একটি মূল ভাষা ভৌগোলিক ও সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে, তাই উপভাষা নামে চিহ্নিত হয়। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান মনে করে যে, যে-কোনো উপভাষার ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতার জগৎকে প্রকাশ করতে তার উপভাষা যথেষ্ট সক্ষম। কিন্তু মনে রাখা দরকার— ওই মানুষ যখন বৃহত্তর অভিজ্ঞতার জগতে প্রবেশ করে, জ্ঞান ও শিক্ষার চর্চায় যুক্ত হয়, তখন ওই উপভাষা তাকে সম্পূর্ণ সাহায্য করতে পারে না—তাকে মান্য ভাষা, এমনকি প্রয়োজনে বিদেশি ভাষার দ্বারস্থ হতে হয়।

৫.

পুরুলিয়া জেলার প্রচলিত লোকভাষা—যা সাধারণভাবে 'মানভূমি' উপভাষা বলে পরিচিত— আসলে পূর্বতন মানভূম (যার মধ্যে ধলভূম, সিংভূম, তথা বর্তমান বিহার ও ঝাড়খণ্ড রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ছিল) জেলা ও তৎসন্নিহিত মালভূমি অঞ্চলের ভাষাগুচ্ছের অন্তর্গত। একেই ড. সুধীর করণ 'সীমান্ত রাঢ়ী' ভাষাগুচ্ছ বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে,

"প্রকৃতপক্ষে সীমান্ত রাঢ়ের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত লোকভাষার তেমন কোনো নামই ছিল না, যদিও লোকনিরুক্তিতে তা কোথাও মানভুঁইয়া, কোথাও ধলভুঁইয়া, কোথাও বাঁকড়ি ইত্যাদি নামে চিহ্নিত হত। কিন্তু এসব আঞ্চলিক ভাষাই একত্রভাবে 'সীমান্তরাঢ়ী' ভাষাগুচ্ছেরই অন্তর্গত, ঝাড়খণ্ডীও এই পর্যায়ভুক্ত। "সীমান্তরাঢ়ী" মুখ্যত মানভূম কেন্দ্রিক, বিভিন্ন অঞ্চলে ধ্বনিগত কিছু কিছু পার্থক্য অবশ্যই বর্তমান"[৫]

এমনকি পুরুলিয়া জেলারই অঞ্চল ও ব্লকভেদে এই উপভাষার ভিন্নতর রূপ ও রং লক্ষ করা যায়। সামগ্রিকভাবে এই বিস্তীর্ণ মালভূমি অঞ্চলে বহু ভাষার অস্তিত্ব এবং ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করা গেছে এবং এই ভাষাগুলির মধ্যে অধিকাংশই সীমান্ত বাংলার এই জেলাতেও বর্তমান, যদিও এর মধ্যে অনেকগুলি ভাষার ব্যবহারকারী ক্রমশ কমে আসছে। ১৯৬১ সালের জনগণনার সমীক্ষা অনুযায়ী তৎকালীন পুরুলিয়া জেলায় মুখ্যত যে ভাষাগুলি বর্তমান ছিল তার ব্যবহারকারী-ভিত্তিক পরিচয়টি এইরকম:

জনসংখ্যা	ভাষা	ব্যবহারকারী	শতকরা হিসেব
১৩,৬০,০১৬	বাংলা	১১,৩২,৩৭৬	৮৩.২৬%
	সাঁওতালি	১,৩৬,০০৩	১০%
	মুন্ডারি	১,০৭৭	মুন্ডা জনসংখ্যার ৮.৪৭%

জনসংখ্যা	ভাষা	ব্যবহারকারী	শতকরা হিসেব
১৩,৬০,০১৬	কুর্মালি	১২,৫৩৩	১%
	ওরাওঁ (কুরুখ-ওরাওঁ)	২৩৭	ওরাওঁ জনসংখ্যার ৪.৩৬%
	হিন্দি	২৫,০৭৬	২.৪৩%
	উর্দু	১৯,৮১৭	১.৪৫%

এছাড়াও, 'আদিভাষা-মুন্ডা' এবং 'আদিভাষা-কুরুখ-ওরাওঁ' ও 'আদিভাষা' নামে তি৹ ভাষার উল্লেখ পাওয়া যায়, মাতৃভাষা হিসেবে যেগুলির দাবিদার ছিল যথাক্রমে ১২,২২৫ জন, ৮৮৯ জন এবং ১,০৮১ জন। যদিও ভাষাতত্ত্বগতভাবে এই ভাষাগুলি কোনো শ্রেণীভুক্ত নয়।[৬]

ভাষাগুলির মধ্যে সাঁওতালি ও মুন্ডারি অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর (Mundari sub-family) এবং ওরাওঁ ও কুরুখ-ওরাওঁ দ্রাবিড়ীয় গোষ্ঠীর ভাষা—এটা স্বীকৃত, এবং সম্ভবত এ কারণেই অনেক ভাষা ও লোকগবেষক এখানকার উপভাষায় অস্ট্রিক এবং দ্রাবিড়ীয় ভাষাগুচ্ছের প্রভাব প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু সে বিতর্কে না গিয়েও বলা যায় যে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ তথা সমতলের মান্য ভাষার থেকে এই উপভাষা অনেকাংশেই পৃথক, এবং ধ্বনিগত, শব্দগত এবং অর্থগত— তিন দিক দিয়েই এর প্রভূত স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য আছে।

এরকম কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের কথা সংক্ষেপে বলা যেতে পারে। প্রথমত, ক্রিয়াপদের মধ্যস্থিত হ্রস্ব-ই, যা প্রচলিত বা মান্য বাংলায় অপিনিহিতির ফলে 'এ'-ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে, তা মানভূমের উপভাষায় ক্ষীণ রূপ ধারণ করেছে। ফলে যে উচ্চারণগত অবস্থার উদ্ভব হয়েছে, তাকে অনেকে 'হ্রস্ব অপিনিহিতি' বলেছেন:

"প্রচলিত বাংলায় অপিনিহিতির -ই- লুপ্ত হয়ে -এ- হয়েছে কিন্তু মানভূমী উপভাষায় অপিনিহিতির -ই-ধ্বনি ক্ষীণ হয়ে অভিশ্রুত এ্যা-কে আশ্রয় করেছে।"[৭] একেই নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় 'হ্রস্ব অপিনিহিতি' বলেছেন। কিন্তু এটি সম্ভবত অপিনিহিতির দৃষ্টান্ত নয়, বরং ড. সুধীর করণের মত এক্ষেত্রে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য—"দুটি স্বরধ্বনির মধ্যে যে হ্রস্ব 'ই' ধ্বনি শ্রুত হয় তা আসলে বিপর্যস্ত হ্রস্ব-ই ধ্বনি।"[৮] এতে ক্রিয়াপদগুলির একটি বিশিষ্ট চেহারা ও ধ্বনি তৈরি হয়েছে:

সাধু বাংলা	মান্য চলিত বাংলা	মানভূমী বাংলা
করিয়া	করে	ক(ই)রে
দেখিয়া	দেখে	দে(ই)খে
দেখিয়াছিল	দেখেছিল	দে(ই)খেছিল
যাইয়াছিল	গেছিল	গে(ই)লছিল
করিবে	করবে	ক(ই)রবেক
চলিতে	চলতে	চ(ই)লতে

উল্লেখ্য, যে, এই উপভাষার উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্য বাংলা হরফে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

এরকম অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে আবার 'গে(ই)লছিল' এবং 'ক(ই)রবেক'-এ যথাক্রমে মধ্য ও প্রান্তিক স্থানে 'ল' ও 'ক' ব্যঞ্জনধ্বনির আগম একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয়ত, এই উপভাষায় মহাপ্রাণ ধ্বনির ছড়াছড়ি। "মানভূমকেন্দ্রিক সীমান্তরাঢ়ীতে মহাপ্রাণ ধ্বনির প্রাচুর্য একটি উল্লেখযোগ্য ভাষাতাত্ত্বিক বিষয়। যেমন—উদাহরণস্বরূপ বুড়া > বুড়হা ; বুড়ি > বুড়হি ; গাড়া (গর্ত) > গাঢ়া ইত্যাদি।"[৯]

তৃতীয়ত, এই উপভাষায় নাসিক্যভবনের প্রবণতা, যেমন—খেয়েছিল > খাইয়েঁছিল / খা(ই) এঁছিল, গিয়েছিল > যা(ই)য়েঁছিল, আখ > আঁখ, কুয়া > কুঁয়াঁ ইত্যাদি।

এছাড়াও অসংখ্য বৈশিষ্ট্য আছে, যার পূর্ণাঙ্গ আলোচনার পরিসর এটা নয়, তবু কয়েকটি বিশিষ্টতা উল্লেখের মাধ্যমে উপভাষাটির ধ্বনিগত চরিত্রের একটা আভাস পাওয়া যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে আরও কিছু কথা পরে অবশ্যই বলব।

৬.

কিন্তু যে উদ্দেশ্যে এত আলোচনা, তা হল—পশ্চিমবঙ্গের এই প্রান্তিক জেলার উপভাষার ভৌগোলিক-সামাজিক এবং ভাষাগত অবস্থান সম্পর্কে দু-একটি কথা বলা। শাসন ও ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে যেমন পুরুলিয়ার ওপর 'পিছিয়ে পড়া জেলা' ছাপটি পাকাপাকিভাবে পড়ে গেছে, তেমনই এই উপভাষাও (হয়তো আরও অনেক উপভাষাই) 'পশ্চাদপর', 'দুর্বল', 'গ্রাম্য' 'আদিবাসী ভাষা' (অবশ্যই নেতিবাচক অর্থে) ইত্যাদি শহুরে অভিধার ভূষণে ভূষিত হয়েছে। ফলত সমাজ-সংস্কৃতি-ভাষার এই প্রান্তবর্তী চরিত্র ক্রমশই প্রান্তিকায়নে (marginalisation) পরিণত হয়েছে। 'উত্তর-ঔপনিবেশিকতা' (postcolonialism) ও 'দলিত' (Subaltern) তত্ত্ব আওড়াতে গিয়ে আমরাই কখন তার শিকার হয়ে গেছি। পুরুলিয়ার গ্রাম্য যুবক-যুবতী তাই উচ্চশিক্ষার প্রাঙ্গণে পিছনের সারির বাসিন্দা (back-benchers) ; তাদের প্রাণের ভাষা ক্রমশই 'ভাঁড়ের ভাষা'য় (funny language) পরিণত, মহানগরীর শহুরে নাগরিক তাদের এ রাজ্যের বাসিন্দা মনে নাও করতে পারে। সমস্যাটা অবশ্যই, আগেই বলেছি, উচ্চশিক্ষা এবং জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রেই বেশি প্রকট। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের এ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় যে, ভাষা কোন পথে এগোবে—মান্যতা না আঞ্চলিকতা? যদি আঞ্চলিকতার পথে এগোয়, তবে মান্য ভাষা সর্বজনীনতা, গ্রাহীতা, ও জ্ঞানচর্চার পথে তার কাঠামোগত বিশ্বাসযোগ্যতা হারাবে। যদি মান্যতার পথে এগোয়—যা পৃথিবীর ভাষা-ইতিহাসে প্রায় সর্বত্রই দেখা গেছে—তাহলে আঞ্চলিক ভাষা—যা একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর দ্বারা ব্যবহৃত ভাষা—তার ঐশ্বর্য ও অভিব্যক্তির স্বকীয়তা হারাবে। শিক্ষা, বিশেষত উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে, উপভাষার আঞ্চলিকতা প্রতিবন্ধকতা হয়ে উঠতে পারে—প্রায়শই হয়ে থাকে—এবং এ কারণেই, মেধা ও বিষয়ের আত্মীকরণ সত্ত্বেও বহু ছাত্র-ছাত্রী শুধুমাত্র মান্য ভাষায় সঠিক অভিব্যক্তির অভাবে যথার্থ সাফল্য থেকে বঞ্চিত হয়। এক্ষেত্রে আমরা পূর্বকথিত প্রথম গল্পটি স্মরণ করতে পারি। যে পরীক্ষার্থী 'লেতড়াই লিয়ে গে(ই)লছিল' লিখেছিল, তার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত পরিবেশ অনুযায়ী ওই অভিব্যক্তির মান্যতা থাকলেও শিক্ষাপদ্ধতির কাঠামোয় ওই উপভাষা কখনোই মান্য ভাষার স্থান নিতে পারে না। ফলে বিষয়জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও মান্য ভাষায় যথার্থ প্রকাশের অভাবে তার শিক্ষাগত মান নীচে বলেই ধরে নেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে ড. পবিত্র সরকার মার্কিনদেশের একটি সমচরিত্রের ঘটনার (phenomenon) কথা উল্লেখ করেছেন:

"একথা ঠিক যে, মার্কিনদেশের কালো ছেলেমেয়েদের (কিম্বা স্প্যানিশভাষী মেক্সিকান বা পুয়ের্তোরিকান ছেলেমেয়েদের) তাদের ভাষার জন্য স্কুলে নানারকম অবিচার ও উন্নাসিকতার শিকার হতে হয়েছে। মধ্যবিত্ত শ্বেতকায় শিক্ষক-শিক্ষিকারা অনেকেই নিশ্চয় কৃষ্ণকায় ছেলেমেয়েদের

পারঙ্গমতা সম্বন্ধে মনে মনে অবৈজ্ঞানিক সংশয় পোষণ করতেন (সকলেই বর্ণবিদ্বেষী ছিলেন এমন কথা বলছি না)। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা এমন ধারণার কথা প্রায়ই প্রকাশ্যে বলতেন যে, কালো ছেলেমেয়েরা 'Intellectual bunglers'–তাদের মুখের ভাষা কোনো ভাষাই নয়, সে ভাষায় যুক্তি দিয়ে কিছু প্রকাশ করা যায় না ইত্যাদি। ফলে ক্লাসে যে কালো ইংরেজি (Black English Vernacular) বলত সে প্রকাশ্যে শাস্তি না পেলেও শিক্ষকদের অনুদারতার বলি হত, এবং তার নিজের কাছেও এই জিনিসটাই বারবার তুলে ধরা হত যে, তার ভাষাটা একটা হাস্যকর ও লজ্জাকর ভাষা, সেটা বললে সে ভদ্রসমাজে ঠাঁই পাবে না, এবং সে ভাষা না ছাড়লে তার উদ্ধারের কোনো আশা নেই। এর ফলে কালো বা ওই ধরনের গরিব ছেলেমেয়েরা ক্লাসে মুখই খুলতে চাইত না, পরীক্ষার খাতায়ও শুদ্ধ-অশুদ্ধের দ্বন্দ্বে পড়ে তেমন ভালো লিখতে পারত না, এবং সেটাই তাদের 'বুদ্ধিহীনতা' ও 'লেখার সামর্থ্যের অভাব' এর অকাট্য নির্ভুল প্রমাণ হিসাবে গৃহীত হত। শিক্ষকেরা এটা জানতেন না যে, ভাষাজ্ঞান আর বিষয়জ্ঞান হুবহু সমার্থক নয়, ভাষার ব্যবহারে দুর্বলতা থাকলেও বিষয়ের বোধে দুর্বলতার অনুমান তা থেকে করা যায় না।"[১০]

কিন্তু এর বাইরেও একটা বিষয় আছে। কথ্য ভাষার ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য, লেখ্য ভাষা বা জ্ঞানচর্চার ভাষার ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নাও হতে পারে। সত্যি কথা বলতে, শিক্ষা বিশেষত উচ্চশিক্ষায় মান্য ভাষা ছাড়া নান্য পন্থা। শিক্ষাদান একটি সার্বিক ও সামগ্রিক বিষয়—এক্ষেত্রে বিশেষ ভাষা, দেশ ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্যই আমাদের একটি মডেল ভাষার দ্বারস্থ হতে হবে, তাকে মান্য, আদর্শ, শিষ্ট, লেখ্য, প্রামাণ্য, প্রমিত, স্ট্যান্ডার্ড—যে নামেই ডাকি না কেন। কিন্তু শিক্ষাচর্চার ক্ষেত্রে মান্য ভাষাকে মেনে নেওয়ার ও তার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে নেওয়ার অর্থ কখনোই উপভাষাকে ছোট বা নিকৃষ্ট বলে ভাবা নয়। উপভাষার পরিধি সীমিত হতে পারে, তার ব্যবহারকারীর সংখ্যাও আপেক্ষিকভাবে কম হতে পারে, কিন্তু তা যেন সাংস্কৃতিক প্রান্তিকায়ন (cultural marginalisation)-এর শিকার না হয়, এটা লক্ষ রাখাও শিক্ষিত শিষ্টজনের কর্তব্য বলেই আমার মনে হয়। এ বিষয়ে আরও কিছু বলার আগে অন্য একটি ভাষাতাত্ত্বিক ঘটনা সম্পর্কে দু-এক কথা বলা দরকার।

৭.

ভাষাবিচারের ক্ষেত্রে বিগত কয়েক দশক ধরে Verbal Deficit বা Language Deficit নামে একটি তত্ত্ব আলোচিত, এবং পরবর্তীকালে তীব্রভাবে সমালোচিতও হয়েছে। তত্ত্বটির মুখ্য প্রচারক হলেন বেজিল বার্নস্টাইন, যিনি তাঁর Class, Codes and Control (Vol. 1, Routledge & Kegan Paul, London, 1971) বইটিতে 'সবল' ও 'দুর্বল' ভাষার ধারণা নিয়ে আলোচনা করেছেন। বার্নস্টাইন প্রথম দিকে এ দুই ভাষার নামকরণ করেছিলেন 'formal speech' এবং 'public speech'–পরবর্তীকালে নাম পালটে এদের বলেন 'elaborated code' এবং 'restricted code'– যার মাধ্যমে তিনি যথাক্রমে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ভাষা এবং অনুন্নত ও দরিদ্র শ্রেণীর ভাষাকেই নির্দেশ করেছেন। বার্নস্টাইন ভাষা দুটির চরিত্র নির্ধারণে যথাক্রমে less predictable বা universalistic (প্রসঙ্গ নিরপেক্ষ) এবং highly predictable বা particularistic (প্রসঙ্গ নির্ভর)—এই শব্দবন্ধ ব্যবহার করেছেন। বার্নস্টাইনের ভাষার এই শ্রেণীবিভাগের বাংলা নামকরণ করেছেন ড. পবিত্র সরকার—যথাক্রমে 'বড়লোক ভাষা' আর 'গরিব ভাষা'। কিন্তু বড়লোক বা গরিব বলতে এখানে ভাষার সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যের মাত্রাভেদ বোঝাচ্ছে, নাকি ব্যবহারকারীর সামাজিক

অর্থনৈতিক অবস্থানকে বোঝাচ্ছে—সেটা স্পষ্ট নয়। যদিও বার্নস্টাইনের তত্ত্বের লক্ষ্যটি পরিষ্কার—তিনি একটি ভাষাকে সমৃদ্ধতর ও উন্নততর, এবং অপরটিকে নিকৃষ্ট ও দুর্বল বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। বার্নস্টাইনের তত্ত্বের মধ্যে, প্রকৃতপক্ষে তাঁর সমাজচিন্তার মধ্যেই, প্রতিক্রিয়ার গন্ধ আছে।

বার্নস্টাইনের তত্ত্বের মূল ধারণার সপক্ষে আর একটি তত্ত্বের কথা বলেন Benjamin Lee Whorf, তাঁর 'Language, Mind and Reality', প্রবন্ধে। তত্ত্বটির দাবি এইরকম যে, মানুষের ভাষাজ্ঞান ও শব্দভাণ্ডারই তার অভিজ্ঞতার পরিধিকে নির্দিষ্ট করে ও তার বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে। এই তত্ত্বকে পুষ্ট করেছিল Edward Sapir নামে একজন নৃতত্ত্ববিদের সমাজ-ধারণা। পরবর্তীকালে যুগ্মভাবে এই তত্ত্বটি Sapir Whorf hypothesis হিসেবে পরিচিত হয়। কিন্তু অভিজ্ঞতা ও ভাষাতত্ত্বের গবেষণামূলক বিচারে দেখা গেছে যে, এর উল্টোটাই সত্যি—মানুষের পরিবেশ, অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজনের জগৎই তার ভাষাকে নিয়ন্ত্রণ করে, এবং তার ভাষা-ভাণ্ডার (linguistic repertoire) বা শব্দ-ভাণ্ডার (vocabulary) গড়ে তোলে।

বার্নস্টাইনের তত্ত্বের সমালোচন' প্রসঙ্গে ড. পবিত্র সরকার বলেন—

"সত্যই কি ভাষার উঁচু-নীচু গরিব-বড়োলোক বলে কিছু আছে? আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের স্পষ্ট উত্তর হল, না, কোনো ভাষাই অন্য ভাষার চেয়ে উঁচু বা নীচু নয়, সবল বা দুর্বল নয়। প্রত্যেক ভাষাই সেই ভাষাগোষ্ঠীর ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক বা মননগত প্রয়োজন মেটানোর পক্ষে যথেষ্ট সমৃদ্ধ।"[১১]

ভাষা বিচারের ক্ষেত্রে বার্নস্টাইনের উঁচু-নীচু শ্রেণীবিভাগের মধ্যেই যে গলদ আছে, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু একথাও তো সত্যি যে, যে-কোনো ভাষাই "সেই ভাষাগোষ্ঠীর ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক বা মননগত প্রয়োজন" হয়তো মেটাতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটি বিশেষ অ-মান্য (non-standard) উপভাষার ব্যবহারকারীরা তাদের ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে অনেকাংশে সীমাবদ্ধ বলে, এবং বিশ্ব প্রতিবেশ অর্থাৎ এই Brave New World-এর অভিজ্ঞতা তাদের তেমন করে স্পর্শ করেনি বলেই (তার পিছনে অবশ্যই প্রধান কারণটি আর্থসামাজিক) সেই উপভাষায় এই বিরাট বিশ্বের ধারণাকে আত্মস্থ করা সম্ভব নয়, আর তাই আমাদের আশ্রয় নিতে হয় মান্য বা স্ট্যান্ডার্ড ভাষার কোলে। আগেই বলেছি, স্বীকৃতি পাওয়ার কারণটি যাই হোক, স্বীকৃত ভাষা হিসেবে দীর্ঘদিন ব্যবহৃত হবার ফলে মান্য ভাষাও উন্নত ও বিস্তৃত হয়, তার ভাষাভাণ্ডার আরও সমৃদ্ধ হয়।

এক্ষেত্রে আর একটি বিষয়ের দিকেও লক্ষ রাখা প্রয়োজন। যে উপভাষাকে স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে গণ্য করা হয় না, তাকে আমরা 'non-standard' বলতে পারি, কিন্তু তা কখনোই 'sub-standard' নয়। আসলে, মান্য ভাষা ছাড়া সমস্ত উপভাষাই নন-স্ট্যান্ডার্ডের গোত্রভুক্ত। সমস্যা হল, যে উপভাষা স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে গৃহীত নয়, তার ব্যবহারকারীরা যদি সামাজিক ও ভাষাগত চাপে ক্রমাগত বিধ্বস্ত হতে থাকে, তাহলে তাদের অবস্থাটা কী দাঁড়াবে? ড. পবিত্র সরকার একে "লজ্জিত ভাষা" বলেছেন। আমার মনে হয়, শুধু 'লজ্জিত' কেন, অন্তত পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষিতে পুরুলিয়ার লোকভাষা অনেকাংশে 'লাঞ্ছিত'-ও বটে। শুধু তাই নয়, বিষয়টি শুধু ভাষার পরিধিতে সীমাবদ্ধ নয়। ভাষা যেহেতু সংস্কৃতির প্রধান একটা অঙ্গ, ফলত সামগ্রিকভাবে সংস্কৃতির সঙ্গেও বিষয়টা জড়িয়ে আছে। গণ-সাক্ষরতা, বয়স্ক-সাক্ষরতা, সাংস্কৃতিক মুক্তি প্রভৃতি প্রসঙ্গে পাওলো ফ্রেইরে তাঁর **Cultural Action for Freedom** গ্রন্থে যে "culture of silence" বা "নীরবতার সংস্কৃতি"-

র কথা বলেছেন, তার সঙ্গে ভাষা-দ্বন্দ্বে উদ্ভূত এই পরিস্থিতির অনেক মিল আছে। অ-মান্য (non-standard) ভাষাগোষ্ঠীর এই পড়ুয়ারা নীরবতাকেই সারকথা বলে মেনে নেয়—মেনে নেয় যে, মান্য ভাষা আয়ত্ত করতে পারুক বা না পারুক, মান্য ভাষার আধিপত্য মেনে নেওয়াটা তাদের কর্তব্য। আমি মান্য ভাষা শেখার বিরুদ্ধে ওকালতি করছি না, আর প্রতিটি উপভাষায় আলাদা-আলাদা শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠক্রম চালু করা আমাদের মতো গরিব দেশে অর্থনৈতিক এবং পরিকাঠামোগত কারণে সম্ভব নয়—একথাও জানি এবং মানি। বলতে চাইছি ঠিক উল্টোটাই। মান্য ভাষাটা তাদের শিখতেই হবে, কারণ তারা উচ্চশিক্ষার জগতে এসেছে, কিন্তু উপভাষাগোষ্ঠীর পড়ুয়াদের মান্য ভাষাটা আলাদা যত্ন নিয়ে শিখিয়ে দেওয়ার যে প্রয়োজনীয়তা আছে বা সেটার যে ব্যবস্থা হওয়া দরকার, তা আমরা, শিক্ষাবিদ ও নীতি প্রবর্তকেরা, ভুলেই যাই। পড়ুয়াগোষ্ঠীর দিক থেকেও কোনো দাবি ওঠে না, কারণ তারা ওই 'নীরবতার সংস্কৃতি'র শিকার।

৮.

আবার প্রসঙ্গ পুরুলিয়া জেলা। পুরুলিয়া জেলার সর্বত্র একেবারে ঠিক একই উপভাষা ব্যবহৃত হয় না, একথা উল্লেখ করেছি। কিন্তু ধ্বনিগত ও শব্দভাণ্ডারগত বিভিন্ন পার্থক্য ও বিশিষ্টতা সত্ত্বেও এই ভাষাগুচ্ছের একটা সাধারণ চেহারা আছে। তবুও এটা সত্য যে, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে, এমনকি মধ্যশিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই ভাষা-সংকট স্থান বা অঞ্চলভেদে কিছুটা পৃথক, এবং প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসা পড়ুয়াদের এই সমস্যা যত তীব্র, শহরাঞ্চলের আশেপাশের এলাকা থেকে আসা পড়ুয়াদের সমস্যা তার চেয়ে কিছুটা কম। শহরাঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের সমস্যা অবশ্যই অনেকটা কম, তবে সমস্যা যে নেই এমন কথা বলা যাবে না। ব্যক্তি-বিচার নয়, সমষ্টি-বিচারেই এ কথা বলছি।

সমস্যাটা যে হঠাৎ উদ্ভূত এমন নয়, কিন্তু আগে এতটা চোখে পড়ত না, কারণ উচ্চশিক্ষার প্রসার এতটা ছিল না। বিগত তিন দশকের ওপর সময় ধরে এ রাজ্যে শিক্ষার সর্বস্তরে প্রভূত বিস্তার ঘটেছে, এটা অতি বড় সমালোচকও জানেন। প্রাথমিক শিক্ষাকে তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত করা, মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকে প্রসারিত করা, এবং উচ্চশিক্ষার দ্বারকে যথাসম্ভব প্রত্যন্ত অঞ্চলেও পড়ুয়াদের জন্য খুলে দেওয়া—এই ত্রি-স্তরীয় শিক্ষাবিস্তারের জোয়ারে হয়তো সংখ্যাতত্ত্ব একটু বেশিই গুরুত্ব পেয়েছে, যতটা পরিমাণগত, ততটা গুণগত পরিবর্তন (কাঙ্ক্ষিত হলেও) হয়তো আসেনি, কিন্তু মুদ্রার অপর পিঠটাও দেখতে হবে। জনগণনা সমীক্ষার বছর হিসেবে ১৯৭০কে ভিত্তিবর্ষ ধরে নিয়ে দেখা যাবে, যে ১৯৭০ সালে এ জেলায় কলেজ ছিল ৪টি (১টি শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়সহ), বর্তমানে যে সংখ্যাটা দাঁড়িয়েছে ১২তে। এর ফলে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের পড়ুয়ারা, যারা জন্মসূত্রে সীমান্ত রাঢ়ী উপভাষাগুচ্ছের ব্যবহারকারী, উচ্চশিক্ষার প্রাঙ্গণে আসার সুযোগ পেয়েছে। এর মধ্যে একটা অংশ একেবারেই উচ্চশিক্ষার ময়দানে প্রথম প্রজন্ম (first-generation learners)–যাদের অনেকের পরিবারেই মাধ্যমিক স্তর এমনকি প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত পড়াশুনোর প্রেক্ষাপটও নেই। সেই প্রত্যন্ত সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ভাষাগোষ্ঠীর ছাত্রছাত্রীরা যখন মহাবিদ্যালয়ের নতুন প্রতিবেশে কিছুটা সংকুচিত হয়ে ক্লাসের এক কোণে বসে মান্য বাংলাভাষা বা ইংরেজি ভাষায় আমাদের জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা শুনে গলদঘর্ম হয়, আপ্রাণ চেষ্টা করে তার ভাষার এবং জ্ঞানের জগতের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে, তখন অনেক সময়ই, আশা-নিরাশা, আনন্দ-যন্ত্রণার বিপরীতমুখী স্রোতের সংঘর্ষে বাকরুদ্ধ হয়ে গেছি আমি। প্রান্তীয় এই জেলায়, বিশেষত

গ্রামীণ স্কুল-কলেজে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা না থাকলে, মহানগরীতে বসে এ কথা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

অতএব, শিক্ষা বা জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে এখানকার উপভাষা বারবার মুখোমুখি হচ্ছে মান্য ভাষার—অসম লড়াইয়ে হার মানতে বাধ্য হচ্ছে—সবসময় এ কারণে নয় যে উপভাষার প্রকাশক্ষমতা কম, অনেক সময়েই এ কারণে যে এ ভাষার মান্যতা নেই। অথচ মান্য ভাষাও উপভাষার প্রভাব ও ব্যবহারগত অনিবার্যতাকে অস্বীকার করতে পারছে না—ফলে শিক্ষাদান-শিক্ষাগ্রহণ প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে। কলকাতার ভাষা, যা মান্য ভাষা হিসেবে স্বীকৃত, এবং পুরুলিয়ার লোকভাষা, যাকে 'মানভূমি' (চালু অর্থে) বা 'সীমান্ত রাঢ়ী' (বৃহত্তর অর্থে) নামে অভিহিত করা যায়, দুটিই বাংলা ভাষা, একথা সত্য। তবু এ দুটি ভাষার দূরত্ব এতটাই যে, আলাদাভাবে মান্য ভাষার চর্চা না করলে প্রায়োগিক সংকট অনিবার্য। আরও সংকট এই যে, উপভাষায় অভ্যস্ত শিক্ষার্থীর কথ্য ভাষার শব্দ ও উচ্চারণভঙ্গি মান্য ভাষার লেখ্য রূপের মধ্যে ঢুকে পড়ছে—একেও এক ধরনের 'linguistic interference' বলা যায়। প্রথম গল্পের উদাহরণ ছাড়াও 'হয়'-কে 'হই', 'যায়'-কে 'যাই' লেখার নমুনা এ অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার উত্তরপত্রে যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে। শিক্ষার্থী মান্য ভাষার প্রায়োগিক দক্ষতাও অর্জন করছে না, অথচ নিজস্ব উপভাষার সম্পদ থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। ফলত তৈরি হচ্ছে ভাষা-বিভ্রাট (language disaster), সংযোগের সংকট (communication crisis)। তৈরি হচ্ছে প্রান্তিকীকরণ (marginalisation)। পুরুলিয়া পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তিক জেলা, ফলে ভৌগোলিক দূরত্বের বিষয়টা বাধ্যতামূলক, এমনকি কেন্দ্র-রাজধানী-মহানগরী কলকাতা থেকে রাজনৈতিক-সামাজিক দূরত্ব এখনও ঘোচেনি, বরং বলা যায় অনেকটাই বাকি। কিন্তু তার চেয়েও বড় সংকট সাংস্কৃতিক দূরত্ব—যা কখনো কখনো পরিণত হয়েছে গূঢ় অভিমানবোধে। এমনকি মানভূমি উপভাষায় সাহিত্যচর্চা—যার একটা দীর্ঘ ইতিহাস আছে এই অঞ্চলে—হয়তো সেই অভিমানেরই একটা স্বতন্ত্র প্রকাশ। উপভাষায় সাহিত্যচর্চা কোন নতুন ঘটনা নয় (আগেই বলেছি), কিন্তু মূল মান্য ভাষা ও সাহিত্যের স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন এই সমান্তরাল সাহিত্যচর্চা মাঝে মাঝে মনে এই প্রশ্ন তোলে, যে এটা সত্ত্বাসংকট (identity crisis)-এর বহিঃপ্রকাশ নয় তো? নাকি এও সেই অভিমানের linguistic-cultural reflection?

উপভাষার (যা স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে বিবেচিত নয়) এই সংকট নিয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন ভাষাতত্ত্ববিদ ডেভিড ক্রিস্ট্যাল, তাঁর **Language Death** (Cambridge University Press, 2000) নামক গ্রন্থে। তিনি পৃথিবীতে বহু ভাষার মৃত্যু এবং ভবিষ্যতে আরও বহু ভাষার মৃত্যুর স্বরূপ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ভাষা-বিলুপ্তিকে মূলত তিন ভাগে ভাগ করেছেন—মৃত্যু, ধ্বংস ও আত্মহনন। ঐতিহাসিক কারণে ভাষার স্বাভাবিক মৃত্যু, অন্য ভাষা ও সংস্কৃতির আধিপত্যে একটি ভাষার ধ্বংস হয়ে যাওয়া, এবং অধিকতর ক্ষমতাশালী ও প্রভাবশালী ভাষার সামনে প্রান্তিকায়িত ভাষার আত্মহননের পথে এগিয়ে যাওয়া—সমগ্র প্রক্রিয়াটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, ভাষা একটি জীবন্ত সত্তা, তারও একটা নিজস্ব আচরণ আছে। এছাড়া, এক বা একাধিক উপভাষার ওপর একটি মান্য তথা রাজভাষা (সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের প্রেক্ষিতে এটি সবচেয়ে শক্তিশালী ও প্রভাবশালী) যখন আধিপত্য ও প্রভুত্ব বিস্তার করে, তখন যে অবস্থার উদ্ভব হয়, তাকে 'ভাষাগত বা ভাষাতাত্ত্বিক সাম্রাজ্যবাদ' বলে অভিহিত করেছেন Robert Phillipson তাঁর **Linguistic Imperialism** (Oxford University Press) গ্রন্থে। এহেন ভাষা-সংকটের সামনে দাঁড়িয়ে যদি ভাষাকে অকালমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে হয়, তাহলে 'দ্বিভাষিকতা' ছাড়া যে অন্য

পথ নেই, সে কথা জানিয়েছেন Charlotte Hoffmann তাঁর **An Introduction to Bilingualism** (London) বইয়ে। যদিও দ্বিভাষিকতার ধারণা একেবারে নতুন নয়, তবে এ মুহূর্তে যে সমস্যা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি, সেক্ষেত্রে প্রয়োজন আন্তর্ভাষা দ্বিভাষিকতা (intra-language bilingualism), অর্থাৎ শিক্ষার্থী যেন মূলগতভাবে একই ভাষার (এক্ষেত্রে বাংলা ভাষার) মান্য রূপ ও জন্মসূত্রে প্রাপ্ত উপভাষাকে সমান দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করতে পারে।

৯.

আলোচনা শেষ করার আগে পুরুলিয়ার প্রচলিত উপভাষা সম্পর্কে দু-একটি জরুরি কথা আবার বলছি। বলছি, কেননা আমার মনে হয়েছে এগুলি এই উপভাষার ঐশ্বর্য ও সম্পদের দিক।

প্রথমত, এই উপভাষার বিপর্যস্ত 'ই'-ধ্বনি (আগেই আলোচিত) ভাষাটিকে এক ধ্বনিগত স্বকীয়তা দান করেছে। এতে ভাষার ধ্বনিগত চলনে এক দোলা সঞ্চারিত হয়, যা এই ভাষার একান্ত নিজস্ব সম্পদ। মান্য ভাষার 'টলে যায়'-এব থেকে এই উপভাষার 'ট(ই)লে যায়' একটা অতিরিক্ত ধ্বনিগত দোলা লাগায়।

দ্বিতীয়ত, নাসিক্যীভবনের প্রবণতা— যেমন 'খা(ই)য়েঁ, যা(ই)য়েঁ, হ(ই)য়েঁছে' ইত্যাদি শব্দে—ভাষাটি এক গ্রামীণ সাংগীতিকতায় মুখর।

তৃতীয়ত, "নামধাতুর এত অনায়াস প্রয়োগ বাঙলা ভাষার কোন উপভাষাতেই পরিলক্ষিত হয় না।"[১২]

উদাহরণস্বরূপ, ভকভক > ভকভকাইঁ ; কাঠ > কাঠাইঁ ; কালো > কালহাইঁ ; পাথর > পাথরাইঁ / পাথরাইন (পাথরাইঁ দিব = পাথর ছুঁড়ে মেরে দেব) ইত্যাদি। মনে হয়, এই ঘটনাটি ভাষাটিকে ব্যাকরণগতভাবে সরলীকৃত করলেও ব্যবহারের দিক থেকে অনেক 'কাছের ভাষা' করে তুলেছে।

চতুর্থত, এই ভাষা অসাধারণ সাবলীলতার সঙ্গে শরীর-ভাষাকে ব্যবহার করে থাকে। প্রথম গল্পের 'লেতড়াইঁ' শব্দটির কথা মনে করলেই বোঝা যায় যে, শব্দটি তাড়িত ব্যক্তির ধূলিধূসরিত পথে বস্ত্রবিলুণ্ঠিত অবস্থায় টালমাটাল পায়ে দৌড়নোর এক শারীরভাষাগত চিত্র তুলে ধরছে।

পঞ্চমত, ভাবকে ধ্বনির মাধ্যমে চিত্রায়িত করার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে ভাষাটির। পূর্বের উদাহরণটিই যথেষ্ট, তবু আরো দু'টি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন, অকবকাইন্যা (ক্রি)। (ছটফট করিস না / ধড়ফড় করিস না) ; লড়-খচ (অ) (উল্টোপাল্টা / এলোমেলো) ইত্যাদি।

ষষ্ঠত, শরীরের ভাষাকে মানসিক প্রক্ষোভের ভাষা দিয়ে প্রকাশ করার ক্ষমতা। যেমন, পেটটা দমে দুখাছে (পেটে খুব যন্ত্রণা হচ্ছে)। শরীর-মনের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের কথা আমরা সকলেই জানি, কিন্তু তাকে ভাষার অচ্ছেদ্য বন্ধনে বেঁধে ফেলা—এ এক অভিনব ঘটনা। সব মিলিয়ে, ভাষাটির বিচরণক্ষেত্র ছোট হলেও তার অভিব্যক্তি বা প্রকাশক্ষমতা খুবই বেশি বলে মনে হয়েছে আমার। সেটিই অন্যান্য বহু ভাষার মতো ভাষাটিকে বাঁচিয়ে রাখার অন্যতম কারণ বলে বিবেচিত হতে পারে।

১০.

উপসংহার অতএব এই যে, সাংস্কৃতিক কারণেই এই উপভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার একটা দায়

আমাদের আছে—অন্তত থাকা উচিত। মান্য ভাষার যে ধ্বনি ও শব্দ শোষণক্ষমতা, তাকে ব্যবহার করে এই উপভাষার শব্দভাণ্ডার ও ধ্বনিভাণ্ডারের সম্পদকে রক্ষা করার বিষয়টি ভাষাতাত্ত্বিক ও ভাষাচর্চাকারীরা মাথায় রাখতে পারেন। যদিও জানি, ভাষাতাত্ত্বিকরা ভাষাকে ব্যাখ্যা করেন, নিয়ন্ত্রণ করেন না, এবং ভাষা তার নিজস্ব গতিতেই গ্রহণ-বর্জন করে এগিয়ে চলে, তবু এই চেতনা আখেরে লাভ দিতে পারে বলে আমার ধারণা। আমাদের আরও যত্নবান হওয়া উচিত দ্বিভাষিকতার দিকে এগোনোর সার্থক সম্ভাবনার ব্যাপারে।

কিন্তু আমরা যখন "শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ" বলে রবীন্দ্র-শরণ নিই, তখন প্রায়ই বিস্মৃত হই যে, পশ্চিমবঙ্গেই এমন বহু ভাষাগোষ্ঠী আছে, যাদের কাছে মান্য বাংলা বিদেশি ভাষার মতো না হলেও যথেষ্ট দুর্গম। ফলে মান্য বাংলাকে সব জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা বলে চালিয়ে দেওয়ার ঢালাওতন্ত্র বোধ হয় খুব বিবেচনার কাজ নয়। ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় যা স্বীকার করি, ভাষা-নীতি প্রণয়নের সময় তা বিস্মৃত হব কেন? ভাষা-শিক্ষার ব্যাপারে তাই মান্য ভাষা শিক্ষার জন্য, বিশেষত যারা এই ভাষার ব্যবহারকারী নয় তাদের জন্য, অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। তাতে শিক্ষা ও সংস্কৃতি—উভয় ক্ষেত্রেই আমরা উপকৃত হব। বাংলা ও ইংরেজি—দুটি পৃথক ভাষার সমান্তরাল চর্চা যদি সম্ভব হয়, তবে একই ভাষার দুটি রূপের সমান্তরাল চর্চা কেন সম্ভব হবে না? উপভাষাকে লালন বা শ্রদ্ধা করার অর্থ নিশ্চয়ই মান্য ভাষাকে অস্বীকার করা নয়—এটা সবারই স্মরণে রাখা প্রয়োজন, বিশেষত যাঁরা এই উপভাষার জন্য অশ্রুপাত করে থাকেন, তাঁদের তো বটেই। অশ্রু দিয়ে এর ক্ষয় ও ধ্বংস ঠেকানো যাবে না, চাই বিজ্ঞানসম্মত ভাষা-নীতি ও শিক্ষানীতি। অন্যদিকে, উপভাষার প্রতি অহেতুক দুর্বলতা যেন মান্য ভাষার প্রতি অবহেলার জন্ম না দেয়। সেক্ষেত্রে অবহেলিত হবে আমাদের শিক্ষাচর্চা ও জ্ঞানচর্চা—যা কাম্য নয়। সাধারণভাবেই তথ্য-প্রযুক্তি কবলিত সভ্যতায় ভাষাচর্চার ও ভাষাশিক্ষার দিকটি অবহেলিত। সেজন্যই প্রয়োজন ভাষাচর্চা, বিশেষত লেখ্য ভাষাচর্চার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে, বিশেষত উচ্চশিক্ষার স্তরে, ভাষা ও সাহিত্যচর্চা এখন নিতান্তই বাহুল্যে পর্যবসিত। শুধু বিজ্ঞান বা বাণিজ্য নয়, কলা বিভাগের ক্ষেত্রেও এখন এটা নিষ্ঠুর সত্যে পরিণত। তথ্য চাই, চাই প্রযুক্তি। কিন্তু তাই বলে ভাষাশিক্ষার প্রতি এমন বিমাতৃসুলভ আচরণ—একে আত্মহনন ছাড়া কী-ই বা বলা যায়? প্রযুক্তির পত্রপুষ্প ঝরে পড়ুক আমাদের ভাষার শ্যামল অঞ্চলে—আমরা সেই দিকে তাকিয়ে আছি।

<u>প্রসঙ্গ নির্দেশ:</u>

১. পবিত্র সরকার—**ভাষা, দেশ, কাল,** জি এ ই পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃঃ ১৬৮।

২. পবিত্র সরকার—পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৬৮।

৩. Crystal, David – **The Cambridge Encyclopedia of Language,** 2nd edition, Cambridge University Press, 2000, p.24.

৪. Crystal, David—পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৪।

৫. সুধীর করণ—**সীমান্তরাঢ়ী ও ঝাড়খণ্ডী বাঙলার গ্রামীণ শব্দকোষ** ; দি এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, ২০০২, ভূমিকা।

৬. **West Bengal District Gazetteers**, Purulia, Govt. of West Bengal, 1985.

৭. নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়—মানভূমী বাংলা উপভাষা তত্ত্বের ভূমিকা, মুক্ত প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃঃ ৬।

৮. সুধীর করণ—পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ভূমিকা।

৯. সুধীর করণ—পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ভূমিকা।

১০. পবিত্র সরকার—পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৫৭-১৫৮।

১১. পবিত্র সরকার—পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৫৮।

১২. সুধীর করণ—পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ভূমিকা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

১। অধ্যাপক সুবোধ কুমার বসুরায়, প্রাক্তন প্রধান, ইংরেজি বিভাগ, জে. কে. কলেজ, পুরুলিয়া।

২। ড. শ্যামাপ্রসাদ বসু, প্রাক্তন প্রধান, ইতিহাস বিভাগ, নিস্তারিণী কলেজ, পুরুলিয়া।

৩। অধ্যাপক অমিয় কুমার বসু, ইংরেজি বিতাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

৪। ড. দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রধান, বাংলা বিভাগ, জে. কে. কলেজ, পুরুলিয়া।

৫। অধ্যাপিকা ইন্দ্রাণী দেব, প্রধান, ইংবেজি বিভাগ, নিস্তারিণী কলেজ, পুরুলিয়া।

মানভূম-উপভাষা প্রসঙ্গে

অপূর্ব কুমার সান্যাল

১৯০৪ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ আয়োজিত এক সভায় রবীন্দ্রনাথ বঙ্গীয় উপভাষার আলোচনা চেয়েছিলেন প্রধানত বাংলার প্রকৃত ব্যাকরণ প্রণয়নের জন্য :

"বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে যতগুলি উপভাষা প্রচলিত আছে, তাহারই তুলনাগত ব্যাকরণই যথার্থ বাংলা বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ"। শুধু ব্যাকরণ নয়, উপভাষা-চর্চার মধ্য দিয়ে সেই অঞ্চলের ধর্ম, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস থাকে লোকযান (Way of Life) বলে সেটাকেই জানা যায়। সমগ্র ভারতবর্ষের ভাষা-উপভাষা-বিভাষা চর্চার বিহনখণ্ডে সম্পূর্ণ মহাসাগরতুল্য সংকলন গ্রন্থাকার গ্রীয়ারসন সাহেব 'Linguistic Survey of India'-র vol.-V-এ বঙ্গ উপভাষা সম্বন্ধে একটি অনুমানের আশ্রয় নিয়েছেন। কলকাতার সামান্য পূর্ব দিক থেকে উত্তর-দক্ষিণে তিনি একটি মানসিক লম্ব রেখা অঙ্কন করে এই রেখার বামপার্শ্বের ভাষাগুলিকে পশ্চিমী ও ডান পার্শ্বের ভাষাগুলিকে পূর্বী নামে অভিহিত করেন। সেই হিসাবে কলকাতা—হুগলি, মেদিনীপুর, পূর্নিয়া, রংপুর, সাঁওতাল পরগনা ও মানভূম সবটাই পশ্চিমী ও ঢাকা, যশোহর-খুলনা, শ্রীহট্ট, কাছাড় এইগুলি পূর্বী শাখার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (যাঁকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 'ভাষাচার্য' আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন) বাংলায় চারটি উপভাষার শ্রেণী নির্দেশ করেছেন। 'রাঢ়', 'বরেন্দ্র', 'কামরূপী' ও 'বঙ্গ'। 'রাঢ়' উপভাষার পশ্চিমী শাখায় প্রত্যন্ত বাংলা, সাঁওতাল পরগনা, পশ্চিম বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, মানভূম ও সিংভূম অন্তগত হয়েছে। এ ছাড়াও ভাষাচার্য সাতটি কথ্যভাষার দিক্ নির্দেশ করেছেন—(১) কলকাতা, (২) মানভূমি, (৩) রাজবংশী, (৪) ঢাকা-মানিকগঞ্জ, (৫) বরিশাল, (৬) শ্রীহট্ট, (৭) চট্টগ্রাম।

ডক্টর সুকুমার সেন বাংলার পাঁচটি উপভাষার শ্রেণীবিন্যাস করেছেন—(১) রাঢ়ী, (২) বরেন্দ্রী, (৩) বঙ্গালী, (৪) কামরূপী, (৫) ঝাড়খণ্ডী (দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গ)।

রাঢ়ী উপভাষার বিভাষা (Sub-dialect) রূপে মানভূম অংশের কথ্য ভাষার আলোচনা চলতে পারে না। এইজন্যই একে স্বতন্ত্র ঝাড়খণ্ডী রূপে স্থান দিতে হয়েছে।

রাঢ়ী উপভাষার সঙ্গে মানভূমী উপভাষার গুরুতর অমিল। অপিনিহিত ও বিপর্যস্ত 'ই' যেমন 'মইধ' 'সাঁইঝ' বা স্বরবিপর্যস্ত 'পায়খ'—মানভূমি এই বিন্যাসগুলি রাঢ়ীতে একেবারেই নেই। বরং পূর্বী উপভাষা 'বঙ্গালী'র সঙ্গে এর মিল আছে। ডঃ সুধীর করণও বলেছেন 'অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আর্যভাষী মানুষ এইসব ভূমিতেই প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটিয়েছিল, আজও যে যোগাযোগের পালা শেষ হয়নি।' ('সীমান্ত বাংলার লোকযান)।

ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ সাহাও এই উপভাষাকে 'ঝাড়খণ্ডী' বলেই অভিহিত করেছেন ও বলেছেন, "অন-আর্য মানুষের বিশেষ উচ্চারণ ও বাগভঙ্গীগত বৈশিষ্ট্যের তাপে ও চাপে আদি মধ্যযুগীয় বাংলাভাষার যে একটি স্বতন্ত্র অবয়ব গড়ে উঠেছে তাই হল এই (ঝাড়খণ্ডী) সীমান্তভূমির উপভাষার নিজস্ব পরিচয়।"

ছোটনাগপুরের প্রতিটি গ্রাম-উপান্তে একখণ্ড 'জাহের-ভূমি' থাকে ; দেবপীঠসূচক অস্ট্রিক শব্দ এই 'জাহের' ও 'থান' থেকেই ঝাড়খণ্ডের উদ্ভব হয়েছে বলেই তাঁর ধারণা। ষোড়শ শতকে 'চৈতন্য-চরিতামৃত' ঝাড়খণ্ডের উল্লেখ রয়েছে।

'মথুরা যাইবার কালে আসেন ঝারি খণ্ড,
ভিল্ল প্রায় লোক তাঁহা পরম পাষণ্ড।'

এই সংস্কৃত শ্লোকে দেখা যাচ্ছে যে, "লৌহপাত্রে জলপান, শালপাতায় ভোজন ও খর্জুরপত্র বা খেজুরপাতায় যারা শয়ন করে তাদের ভূমিকেই 'ঝাড়খণ্ড' বলা যায়।"

'অয়ঃপত্রে পয়ঃপাজম্ শালপত্রে চ ভোজনম্।
শয়নম্ খর্জুরীপত্রে ঝাড়খণ্ডো বিধীয়তে।।'

অষ্টাদশ শতকের রামকান্ত রায়ের ধর্মমঙ্গলেও ঝাড়খণ্ডী বাদ্যযন্ত্রের বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ আছে।

অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ সাহা ঝাড়খণ্ডী ভাষার বিস্তৃত সীমা নির্দেশ করেছেন—সাঁওতাল পরগনার নিম্নাংশ, ময়ূরভঞ্জের উত্তরাংশ, রাঁচি জেলার বুণ্ড ও তামাড়, পুরুলিয়ার সমগ্র অংশ, মেদিনীপুরের পশ্চিম সীমা, ঝাড়গ্রাম, গিধনি-বেলপাহাড়ি, উত্তর-পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম বাঁকুড়া এবং ইচাডি-চাণ্ডিল থেকে ঘাটশিলা বহড়াগোড়া পর্যন্ত সুবর্ণরেখার অববাহিকা অঞ্চল। উত্তর-পশ্চিমে 'নাগপুরিযার' (ছোটনাগপুরিয়া অর্থে) যেখানে শেষ সেখান থেকেই ঝাড়খণ্ডীর সুরু-দক্ষিণপূর্ব সীমানায় ওড়িয়ার সঙ্গে এই উপভাষা লীন হয়ে গেছে; ও' ম্যালি সাহেব 'Santal Parganas District Gazetteer'-এ (1910) বলেছেন ওই সময়ে ওই জেলায় শতকরা ১৩.৫ ভাগ বাংলা ভাষাভাষী ছিল, যারা কিছু 'রাঢ়ী চোলি' বা দক্ষিণবঙ্গের শুদ্ধভাষা ও কিছু 'মালপাহাড়ী' ভাষায় কথা বলে। (পৃঃ ৮০)

এই ঝাড়খণ্ডের উপভাষা ও তিনটি বি-ভাষা (Sub-dialect)–(১) মধ্যা ঝাড়খণ্ডী যার অপর নাম ধলভুঁইয়া, (২) দক্ষিণা ঝাড়খণ্ডী বা মানভুঁইয়া—এর মধ্যে সাঁওতাল পরগনারও কিছুটা অংশ আছে (ও ম্যালি দ্রষ্টব্য), (৩) উত্তরা ঝাড়খণ্ডী বা বহড়াগোড়িয়া। এই তিনটি বিভাজন ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ সাহার মতানুযায়ী নির্দিষ্ট করা যায়। 'কুর্মালি ভাষাতত্ত্বে' ক্ষুদিরাম মাহাতো মহাশয় ঝাড়খণ্ডীর মধ্যে 'ফোল' ও 'কুর্মালি' এই দুটি মাত্র বিভাষার শ্রেণী নির্দেশ করেছেন। (পৃঃ ৬) Linguistic Survey-এর শেষখণ্ড ১৯২৮ এ প্রকাশিত। এই ৭৫ বৎসরে (২০০৩) কাঁসাই-কুমারী দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে বিভাষা-উপভাষার নতুন নতুন পদ্ধতি ও যন্ত্র-সাজসরঞ্জাম হাতের কাছে উপস্থিত হয়েছে। ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় বিভাষা চর্চা এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। H. Orton ও W. Halliday-র প্রামাণ্য বই Survey of English Dialects, (Leeds, 1963) H. Kurath-এর Linguistic Atlas of New England (1943) এবং সর্বোপরি "Dialectology—J. K. Chambers ও Peter Trudgill (Cambridge, 1994) নব নব পন্থা ও সূত্র উদ্ভাবন করেছেন।

সংগ্রাহক বা কে ভাষা-বিভাষার তথ্যদান করছেন সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। গ্রীয়াবসন সাহেবের এই ব্যাপারে কিছু ঘাটতি ছিল এবং সর্বভারতীয় ব্যাপারে এ ছাড়া কোনো উপায়ও ছিল না, বিশেষ ওই পূর্ব যুগে।

সংগ্রাহক-সূত্রে Kurath সাহেব তিনটি শ্রেণী নির্দেশ করেছেন।

(১) সামান্য শিক্ষা ও সামান্য পাঠক্ষমতা।

(২) একটু বেশি শিক্ষণ এবং প্রায় হাই স্কুল পর্যন্ত পাঠ।

(৩) উচ্চশিক্ষিত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী।

একে আরও প্রাগ্রসর করে Chambers ও Trudgill সাহেব NORM পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন যথা (Non-motrile)—অচলনশীল বা স্থানু), Older (বয়স্ক-৭০ বা তদূর্ধ্ব) Rural (গ্রামীণ-শহর থেকে অনন্ত তিনমাইল দূর) এবং Male (পুরুষ)। সংগ্রাহকের এই চারটি গুণ থাকা আবশ্যিক। এ বিষয়ে নারীবাদীরা হয়তো একটু রুষ্ট হতে পারেন কিন্তু বৈজ্ঞানিক সমীক্ষায় দেখা গেছে (অন্ততঃ ওদেশে) যে নারীদের ভাষা পুরুষের থেকে আত্ম-সচেতন ও শ্রেণী-সচেতন। (In the Western nations women's speech tends to be more self-concious and class-conscious than men's) B. Thorne & N. Henley : 'Language and Sex' (London, 1975)

গ্রীয়ারসন সাহেবের ভাষা-বিভাষা সমীক্ষার প্রায় ষাট বৎসর পরে (১৯৮৯) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. লিট উপাধিপ্রাপ্ত (১৯৮৪) ডঃ নিখিলেশ পুরকাইত মহাশয়ের 'বাংলা অসমীয়া ও ওড়িয়ার উপভাষার ভৌগোলিক জরিপ প্রাসঙ্গিকতা' গ্রন্থে ভাষা-সমীক্ষক ও সংগ্রাহকের নাম ও সামাজিক অবস্থান চিহ্নিত না থাকায় সমস্যা দেখা দেয়। অথচ এই গবেষণা ড. সুকুমার সেন, পণ্ডিত ওড়িয়া মুখ্যমন্ত্রী ড. হরেকৃষ্ণ মহতাবও অসমীয়া বিভাগের প্রধান ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা পবীক্ষা করে প্রশংসা করেন। "বিশ বছরের অধিক" ধরে এই ক্ষেত্র সমীক্ষা চলে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ। এটি একটি প্রামাণ্য গ্রন্থও বটে।

দুর্ভাগ্যের বিষয় গ্রীয়ারসন সাহেবের St. Luke XV-এর "A certain man had two sons...." এর ভাষান্তরটি যদি গৃহীত হত তো এই ৬০ বছরে কথ্যভাষা কি পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে তার একটা মোটামুটি রূপরেখা পাওয়া যেত। কিন্তু ড. পুরকাইত তাঁর নিজস্ব তিনটি পংক্তিই যথা "ভারতের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের সময় আমি প্রিজাইডিং অফিসার ছিলাম...." (২) লোকসংগীত সংগ্রহের জন্য এক ছাত্রবন্ধুকে নিয়ে বেরিয়েছি পাড়াগাঁয়ে...." ও (৩) "তুমি কোথায় যাচ্ছ? আমি কলকাতায় যাচ্ছি" (পৃঃ ২-৩, তদেব) সেই মানদণ্ড স্বরূপ গ্রহণ করেছেন।

পুরুলিয়ার মানভূমী বিভাষায় এর রূপ....

(১) ভারতের বড় ভোটের সময় হামি 'প্রিসাইডিং অফিসার ছিলাম'

(২) গান জোগাড়ের জন্যে একটা ছাত্রকে লিয়ে বেরহাঁইছি ডেহাতে।

(৩) 'তুমি কোথায় যাছ ?' 'আমি কলকাতায় যাছি'—ইত্যাদি রূপান্তর সম্বন্ধে অধুনা-প্রয়াত "মানভূমী বাংলা উপভাষা তত্ত্বের ভূমিকা" (কলিকাতা, ১৯৯৬) প্রণেতা নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় এর উচ্চারণ বিষয়ে একটু ভিন্নমত পোষণ করতেন। এই গ্রন্থ-ভূমিকায় ড. পবিত্র সরকার এই গ্রন্থের প্রশংসা করে বলেন "অজস্র তথ্য ও প্রচুর রূপ (morph) উদাহরণ" যেগুলিকে তিনি মনে করেন "এগুলি ভাষা বিজ্ঞানীর কাছে অমূল্য উপাদান।"

আমার মনে হয় যে সংগ্রাহকের নাম ডঃ পুরকাইত দিয়েছেন—"মোহন নিয়োগী—গ্রাম বলরামপুর- পোঃ বাগুাডি, পুরুলিয়া) তার বয়স ও সামাজিক অবস্থানের জন্যই এই বিভিন্নতার প্রতীয়মান হচ্ছে, (সেটি এখানে দেওয়া নেই) NORM পদ্ধতির এখানেই প্রাসঙ্গিকতা।

গ্রীয়ারসন সাহেব তাঁর মহাসাগর তুল্য ভাষা-পর্যালোচনা গ্রন্থ-কুড়ি খণ্ডে প্রকাশিত

'Linguistic Survey of India'-য় ১৭৯টি ভাষা ও ৫৪৪টি ভারতীয় উপভাষার। আলোচনা করেছেন। ১৯২৮ সালে এই গ্রন্থের শেষ সংস্করণ হয়েছে। তখন Tape-recorder ইত্যাদি যন্ত্রের ও নানান বৈজ্ঞানিক পন্থা-পদ্ধতির উদ্ভব হয়নি। তথাপি তিনি যে সংগ্রহের নিদর্শন রেখেছেন কিছু কিছু ভ্রমপ্রসাদ সত্ত্বেও তা তুলনারহিত। এই পঞ্চম খণ্ডের প্রথম ভাগে বাংলা ভাষার বিস্তৃত আলোচনা আছে। এই বাংলা বিভাষার মধ্যে তিনি মানভূম, ধলভূম, খড়িয়া-থর, লোহার ডাগার শরাকী, কুর্মালি, পাহাড়িয়া-থর পূর্বীসমাগধী, হাজারিবাগী বাংলা, পাঁচ পরগনিয়া বিশেষত টামাড়িয়া বাংলার নিদর্শন রেখেছেন। (ধীরেন্দ্র সাহা বুন্ডুকেও এর অন্তর্গত করেছেন, তবুও বাকি থাকে শিলি, বরাগুা ও রাহে) এইজন্যই এর নাম 'পাঁচ পরগণিয়া'।

সমগ্র ভাষা-আলোচনার ক্ষেত্রে Phonetic উচ্চারণগুলি নির্ণয় করার বিষয়ে একটি পদ্ধতি তিনি নির্ণায়িকারূপে গ্রহণ করেছেন। এই উক্তিটি Bible-এর New Testament, St. Luke XV-পর্যায়ের Parable of the Prodigal Son-এর বিখ্যাত উক্তি "A certain man had two sons ; and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unton them his living!" কথ্য মান্য চলিত-বাংলায় এই বাক্যগুলির রূপ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে (Languages and Literatures of Modern India, Calcutta, 1964, p.-73)–"একজন লোকের দুটি ছেলে ছিল। তাদের মধ্যে ছোটটি বাপকে বল্লে 'বাবা, আপনার বিষয়ের মধ্যে যে ভাগ আমি পাব, তা আমাকে দিন। তাতে তার বাপ-এর বিষয়-আশয় তাদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন।"

এই Standard বা মান্য উচ্চারণ থেকে গ্রীয়ারসন সাহেব প্রদত্ত মানভূম ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কথ্যভাষার উচ্চারণগুলির এই প্রকার বিভেদ হয়ে যাচ্ছে। (ইংরাজি থেকে 'বাংলা' লিপ্যন্তরে হয়ত কিছু ত্রুটি থাকতে পারে। এজন্য ক্ষমাপ্রার্থী)

(১) মানভূমী—এক লকের দুটা বেটা ছিল, তাদের মাঝে ছটু বেটা তার বাপ্‌কে বল্লেক, 'বাপ্ হে, আমাদের দৈলতের যা হিস্যা আমি পাব তা আমাকে দাও। এতে তার বাপ আপন দৈলেত বখরা করে তার হিস্যা তাকে দিলেক।' (পৃঃ ৭২)

(২) ধলভুঁইয়া—এক লকের দুটা ছা ছিল। তাদের ভিত্রে সব ছোট ছাটা তার বাপকে বল্ল 'অ বাপ্, ধনের যে হিস্ব (his va) আমি পাব ; সে ট আমাকে দে, তাতে সে তাকের মধ্যে ধন হিস্যা করি দিল। (পৃঃ ৭৮)

(৩) খড়িয়া থর—য়্যাহক্ নকের দুইটা ছাওগা রহিলা। তাহারদের মাঝে ছটকা বাব্বাকে কহিলাক 'বাব্বা দৈলতটার যে মহর বাঁটা হিচা, তাই মহরকে দিন। আর সে তাহর দিকে দৈলতটা বাঁটি কুরি দিম্।' (পৃঃ ৯৪)

(৪) লোহার ডাগার শরাকী বাংলা—এক (ek) লোকের দু বেটা রহে। উহার মাঝে ছোটা বেটা বাপ্‌কে কইলেক এ বাপ্, দৌলতের যে ভাগ পাম মুই, সেই ভাগ মোকে দে। সে উহার মাঝে দৌল্য বাটা করি দিলেক।

(৫) মালপাহাড়ী—(গ্রীয়ারসন পাদ্রি সাহেব স্ক্রেফস্রাডের সাহায্যেই মাত্র এ ভাষা পর্যালোচনা করতে পেরেছিলেন। দাশ ও রায় পরবর্তীকালে নতুনভাবে আলোচনা করে দেখেন যে এর ভাষভাষী মাত্র ৪৬২ জন।)

এ জঁড়ঁর দুইটা বেটা আছলেক্। উঁ হিয়ার মধ্যে ছটা বেটা আপড়াঁর বোবাক, বল্লঁ 'ও বোবা, ধনের জাহায় বাখবা ম্যুই ভেঁটবো, মোখে দে। তাতে উঁই ঘরকরণা উঁহিথাক বাখরা কেরিঁ দিলঁ।'

(৬) কুর্মালী—এক লকের দুটা বেটা ছালিয়া রেহেক। তাদের মইধে ছুটু বেটাটায় অকর্ বাপকে কেহলাক্ বাপহে হামরাকর দৌলতকর যেমঁয় হিঁসা পায়ম্ সে মকে দে। তখন তাকর বাপ্ আপন দৌলত বাঁটিকে অকঁর হিঁসা দেঁই দিলাক।

(৭) হাজারিবাগী বাংলা—এক লোকের দু বেটা ছিল। তকর মে ছোট বেটা আপন বাপ্‌সে কলই, 'এ বাপ্ চিজকে যে বখরা হাম্ পায়ের সে হামরা দেই দে। তকর মে সে চিজ ভাগ করে দেলেন।' (পৃঃ ১৬৩)

(৮) পাঁচপরগণিয়া (গ্রীয়ারসন সাহেব শুধু টামাড় অঞ্চলের বিভাষা যাকে ইনি 'টামাড়িয়া' বলেছেন তারই মাত্র উদ্ধৃতি দিয়েছেন)

কোনো এক আদ্‌মিকের দুইটা ছুয়া রোহে। তেকার মাহানে (ma h ʼne) ছোট ছুয়াটা আপন বাপকে কোহলাক্ 'বাপ্ ময় ধনকের যে হিসা পামু সে মোকে দেউ। তেকাই মাহানে ও কার বাপ সে ধন হিসা কয়ের দেলাক্। (পৃঃ ১৭০)

(৯) ছোটনাগপুরিয়া—কোন্ আদ্‌মিকের দুজন বেটা রহই। উমান মইঠে ছোটা বাপ্‌কে কহল্ 'এবাপ্ খরজই মধে যে হাম্ অর বাঁটাওয়ারা হেই, সো হাম কে দে।

দেখা যাচ্ছে ODBL এ আচার্য সুনীতি কুমার বাংলাভাষার প্রধানতম লক্ষণ বলে যে প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির কথা বলেছিলেন যেমন সম্বন্ধপদে 'আর, র, কার', অতীতে 'ইল', ভবিষ্যতে 'ইব' ইত্যাদি সাধারণ লক্ষণগুলি এই বিভাষাগুলিতে অনেকক্ষেত্রেই রক্ষিত হচ্ছে। যেখানে সেগুলি রক্ষিত হচ্ছে না, সেখানেই মাত্র ত্রি বিষয়ে পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন আছে।

এইজন্যই শেষোক্ত (১০নং) এই বিভাষাটিকে 'কুর্মালি ভাষাতত্ত্বে' (পৃঃ ৪৮) 'বিহারী সেদানী' বলে উল্লেখ করলেও, সে দাবি মনে হয় গ্রহণযোগ্য হবে না।

এই বিভাষাগুলির ধন্যাত্মক প্রকৃতি বিচার করলে মোটামুটিভাবে সাধারণ যে লক্ষণগুলি দেখা বা শোনা যায়, তা হ'ল :

(১) 'ও' কারের 'অ' প্রবণতা-লক-লোক।

(২) অপিনিহিতির সুস্পষ্ট উপস্থিতি-মইধী-মধ্য-সাঁইঝ-সাঁঝ।

(৩) অভিশ্রুতির অনস্তিত্ব বা বিলুপ্তি- আঁইটা-এঁটো (সং-আমৃষ্ট) হয় না। তেমনই বাইগন-বেগুন, মাইয়া-মেয়ে।

(৪) স্বরসঙ্গতির প্রভাব প্রায় নেই। ঠুঁটা-ঠুঁটো, শিয়াল-'শেয়াল-শ্যাল' হয় না।

তেমনিই মিছা, মিঠা, রূপা-ঠিক এই রূপেই থাকে মিছে, মিঠে বা রূপো হয় না।

(৫) স্বানুশসিক ধ্বনির (guttural) আধিক্য (সুধীরকরণ ও ধীরেন্দ্র সাহা-এর জন্য অস্ট্রিক জনগোষ্ঠীর প্রভাব বলেই মনে করেছেন) যেমন—, ড়, ড়ঁ ছাঁইর, কঁইতি, গুঁড়ুর, কুঁড়াচি ইত্যাদি।

(৬) 'ল ও ন' এবং 'ব ও ম' এর প্রতিস্থাপনা বা exchange লাল-নাল, লাচনী,-নাচনী, বদলাম-বদনাম,যবুনা-যমুনা।

(৭) বিভক্তিহীন ষষ্ঠী ও সপ্তমী 'বনভিতর গুঁড়ুর কাঁদে', বনের ভিতর নয়, 'রাইত ছিলি ঘাটশিলা' রাতে ছিলি ঘাটশিলা নয়।

(৮) নামধাতুর বাহুল প্রয়োগ: মেঘ বিজলায়, মাথাট ভুলকাঁই দিব গরুগুলা ডহরাঁই দে (ডহর = পথ) (ছেঁদা করে দেব) পথে বার করে দে।

এর মধ্যে ধলভুঁইয়া ও বহড়াগোড়িয়া বিভাষায় ওড়িয়া প্রভাবে কিছু নতুন প্রত্যয় ও বিভক্তি যুক্ত হয়েছে বলে ধীরেন্দ্রনাথ সাহা মনে করেন—যেমন পঞ্চমী অর্থে 'নু' প্রয়োগ—বাঁশের নু কঁইচি দড়। তুচ্ছার্থক 'উ'-তুই ভাবছু কি ফুলমণি। পঞ্চমী অর্থে আবার বহড়াগড়িয়াতে

'রু', 'ঠুন', 'ঠুরু' প্রয়োগ—'ঘর রু আসেটে।' এখানে উল্লেখ রাখা ভাল প্রথম পুরুষের কালরচনায় বচনভেদও আছে যেমন আসেটে (একবচন) আসেটেন, আসেনটেন (বহুবচন) (গলা (এক) গেলাজ (বহুবচন) 'স্থা' ধাতু দিয়ে ঘটমান্ বর্তমান যেমন 'কবেটে', অতীতে ওড়িয়া 'থিলা'—সে খাইথিলা, হীই থিলা (হয়েছিল) ; এও যেমন আছে আবার সংযোজক অব্যয়ে হিন্দির 'ভি' প্রয়োগও দেখা যায় 'সে ভি যাবে!' (also)

এই ওড়িয়া জনগোষ্ঠীর প্রভাব বা ওড়িয়া ভাষার প্রভাব থেকে আগত প্রত্যয়গুলি নিয়ে অবশ্য পণ্ডিতদের মধ্যে বেশ বিভেদ-বিতর্ক আছে। গ্রীয়ারসন সাহেব ও তাঁর মতানুযায়ী ধীরেন্দ্র সাহাও মনে করেন যে দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের ভাষাগুলি 'Mixed Oriya and Bengali' এবং 'Mixed Oriya and Santali' কিন্তু আচার্য সুনীতিকুমার ও তদীয় শিষ্য সুধীরকুমার করণ মনে করেন যে রাঢ় থেকেই এই বিভাষা 'উড্র' (Oriya) জনজাতির মধ্যে প্রবেশ করে ও সেখান থেকে উড়িষ্যায় ব্যবহৃত হতে থাকে। "From Rarha the languages spread among the Odra tribes of South West Bengal and from there it was taken to what is now Orissa." (O.D.B.L.)

ডক্টর সুধীর করণ অনুমান করেন যে বগুড়া, পাবনা, রাজশাহী ইত্যাদি পূর্ববঙ্গের উত্তরাঞ্চলের ভাষা রাঢ় ভাষায় সংক্রামিত হয়েছে ; বোধহয় কৈবর্ত জনসম্প্রদায় উত্তরবঙ্গের এই বিভাষা নিয়েই দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে আসে। (Karan : South-Western Bengali, 1992, p. 10) এই বিভাষাগুলির ঘটমান বর্তমান (Present Progressive Tense) বিশ্লেষণ করে দেখা যায়: মুই করত (একবচন) আমরা করিটি (বহু), আপনি করেনটেন (এক) আপনারা করেনটেন (বহু)। [এগুলির বহুল প্রয়োগ গোপীবল্লভপুর ও বহড়াগড়িয়ায় দেখা যায়। ড. করণ মনে করেন যে করত, করঁট হচ্ছে আসলে কর + বট থেকে এসেছে। এই 'বট' শব্দটি 'সংস্কৃত বর্ততে > বট্ট ই > বটে যেটি একাধারে ক্রিয়া ও সংযোজক অব্যয় রূপেও ব্যবহৃত হয়। (কে বট ঘরণী অন্নদামঙ্গল) সুনীতি কুমারও মনে করেন "West Rarha dialects use বটে as the equivalent of আছে and হয়: It is still preserved in Manbhum e.g. তোমার হাতে ঘটিতে কি বটে ? জল বটে" (O.D.B.L. p. 1042) এই 'বট' প্রয়োগ ও মেদিনীপুর ও মানভূমে এর ব্যাপক ব্যবহারই প্রমাণ করে যে এই বিভাষাগুলির উৎপত্তি বঙ্গভাষা থেকেই, ওড়িয়া ভাষা থেকে কখনোই নয়। "Anyway what may be the historical development of the district of Midnapur, it is evident that South-Western Bengali did not originate from Oriya" (Karan : South-Western Bengali, p.-11)

অতএব দেখা যাচ্ছে যে বিহারী, ওড়িয়া, আর্য, অনার্য, দ্রাবিড়, কোল-মুন্দারি ইত্যাদি অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষার ঘাত-প্রতিঘাত নিয়ে মূল বঙ্গভাষার সঙ্গে সংঘর্ষে ও সমন্বয়ে এই সব উপভাষা বা বিভাষাগুলি গড়ে উঠেছে ; কিন্তু এর মূল কাঠামো সর্বদাই বঙ্গভাষার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে এসেছে ; ওড়িয়া, বিহারী বা অসমীয়া ভাষার মূল রূপের সঙ্গে এর বিস্তর প্রভেদ।

কিন্তু এ বিষয়ে বৈয়াকরণিক পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারের প্রয়োজন এখনও অনেকখানিই রয়ে গেছে। যে-কোনো জীবিত বা সজীব ভাষার ব্যাকরণগত যে চারটি উপাঙ্গ-ধ্বনিপ্রকরণ (Phonology), রূপপ্রকরণ (Morphology), বাক্যবিন্যাস প্রকরণ (Syntax) ও বাগার্থ বা অর্থপরিবর্তন প্রকরণ (Semantics)—এই চতুরঙ্গের সবদিকে লক্ষ্য রেখেই এই উপভাষা-বিভাষাগুলির পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন রয়ে গেছে। এই বিস্তীর্ণ গবেষণায় এখনও কেউ হাত দেননি বলেই মনে হয়।

তুলনামূলক ইতিহাসভিত্তিক আলোচনার (Historical Linguistics) গণ্ডী ছাড়িয়ে বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞানের (Description) দিক থেকে এই উপভাষা-বিভাষা অনেক জরুরি হয়ে পড়েছে, কেননা এখানে কথ্যভাষার গুরুত্বই সমধিক। ভাষাতাত্ত্বিক আবদুল হাই যে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলেছিলেন, "অতীতের থেকে ভাষাটি কেমন করে আজ এখানে উপস্থিত হল তার থেকে বর্তমানের উচ্চারণ, সমাজজীবনে এর ব্যবহারে রূপ ও রঙের সমন্বয়ে তার রহস্যময় প্রয়োগ। (ভাষাতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ, ভাষা—পৃঃ ৪৯) চমস্কি প্রবর্তিত সঞ্জননী-প্রক্রিয়ায় বা (Syntactic Structure) বিভাষাগুলির আলোচনা আজও অপেক্ষিত রয়ে গেছে। এই সব আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনা মূল ভাষায় কিছু কিছু দেখা গেলেও, উপভাষায়—বিশেষ বিভাষার ক্ষেত্রে একেবারে সূত্রপাতই হয়নি। খুবই আশ্চর্যের বিষয় এ ব্যাপারে অনেক ভাষাতাত্ত্বিকের থেকেও রবীন্দ্রনাথই পথিকৃৎ হয়ে আছেন। (আব্দুল হাই.....তাদের)

বোধহয় সবথেকে বড় উপকার হবে বাংলাভাষায় একটি প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ রচনার উপকরণ সংগ্রহের কাজে। শতবর্ষ পূর্বে (১৯০৪) রবীন্দ্রনাথ যে আশাব্যক্ত করেছিলেন (প্রবন্ধের প্রথমেই যেটি উদ্ধৃত হয়েছে। তারই পুনরাবৃত্তি) "বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে যতগুলি উপভাষা প্রচলিত আছে, তাহার তুলনাগত ব্যাকরণই যথার্থ বাংলার বৈজ্ঞানিক ব্যাকবণ।"

ঠিক শতবর্ষ পূর্বে (১৩০৮) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে এ বিষয়ে যে বিরাট বিতর্কের সূত্রপাত হয় যার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর, হীরেন্দ্রনাথ ও এমনকি ভাষাচার্য সুনীতিকুমারও পরবর্তীকালে বিজড়িত হয়ে পড়েন। এখানে প্রায় একবাক্যে সকলেই স্বীকার করেন যে তৎকালে প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণ আসলে বাংলাভাষায় প্রকৃতি-বহির্ভূত এক সংস্কৃতানুগ ব্যাকরণমাত্র। তাঁদের উক্তি ও বাদানুদের মধ্যে শুধু জ্ঞান ও তত্ত্বকথা নয়, অনেক পরিহাস-প্রবণ লঘু হাস্যরসেরও অবতারণা আছে। দু একটি উদ্ধৃতি দিই ঃ "এখন যাহাকে বাঙলা ব্যাকরণ বলা হয় উহা বাঙলা ব্যাকরণ নহে। বাঙলাভাষা সংস্কৃতের নিকট যারা পাইয়াছে এ সেই অংশের ব্যাকরণ—উহা সংস্কৃত ব্যাকরণ। পানিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন, আমরা যদি তাহা শিখিতে চাই, তাঁহার পুঁথি পড়িলেই চলিবে। (রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা,, ১৩০৮, পৃঃ ২১৮)। "বাংলা ভাষার ব্যাকরণ যাঁহারা গড়িতে যাইবেন, তাঁহাদের মনে রাখা উচিত যে, তাঁহারা ভাষায় যাহা আছে তাহারই প্রয়োগ, প্রকৃতি, গঠনপ্রণালীর নিয়মাদি কিরূপ তদেব ব্যাখ্যা করিবেন মাত্র, কেই কিছু নূতন গড়িবেন না।" (হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, তাদের, ১/৯-১/২), দেখা যাচ্ছে diachromic পদ্ধতি পরিত্যাগ করে Synchronic পদ্ধতির দিকে তাঁরা তখনই পদক্ষেপ নিতে চাইছেন। রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলেন (ভাষার ইঙ্গিত) "আমরা যেমন বিদ্যালয়ে ভারতবর্ষের ইতিহাস নাম দিয়া মহম্মদ ঘোরী, বাবর, হুমায়ুনের ইতিহাস পড়ি, তেমনি আমরা বাংলা ব্যাকরণ নাম দিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়িয়া থাকি, তাহাতে অতি অল্প পরিমাণে বাংলার গন্ধ থাকে মাত্র।" (রচনাবলী, বিশ্বভারতী, ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৩৯৭) শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী পরিহাস করে বলেছিলেন "গরিবকে পয়সা দাও" যদি সম্প্রদান কারক হয়, তবে "ছেলেকে মারিলাম" 'সন্তান' কারক না হইবে কেন ? সুনীতিকুমার সংক্ষিপ্তাকারে বক্তব্য রাখেন "বাংলার কতকগুলি নিজস্ব জিনিস আছে; সংস্কৃতে তার নামগন্ধও নেই যেমন অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, স্বরসঙ্গতি, প্রতিধ্বনি শব্দ, সহায়ক ক্রিয়া—এ বাংলা ভাষার নিজস্ব প্রকৃতি একেবারেই সংস্কৃতের প্রকৃতি, নহে।"

"মানভূম ভাষা প্রসঙ্গ" আলোচনাতেও এই উক্তিগুলি স্মর্তব্য। শুধু মানভূমি কেন, যে-কোনো উপভাষা-বিভাষার উপাদান সংগ্রহ বাংলা ভাষায় "প্রকৃতি বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ"

নির্মাণের কাজে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মানভূমী উপভাষা বা বিভাষা যে নামেই আমরা ডাকি না কেন (এর যথার্থ প্রকৃতিনির্ণয় এখনও উপেক্ষিত, অন্তত তর্কাতীত নয়) তার আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে। 'ছত্রাক' পত্রিকা প্রায় ত্রিশ বৎসর যাবৎ সুবোধ বসু রায় মহাশয়ের নেতৃত্বে ভাষা ও বাগভঙ্গি সংগ্রহ করে চলেছে। ধীরেন্দ্রনাথ সাহা, সুধীর কুমার করণ তাঁদের বিশাল গবেষণার বেশকিছু অংশ এই উপভাষা-বিভাষার আলোচনায় নিয়োগ করেছেন। ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় এবং নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় "মানভূমী বাংলা উপভাষা পুরুলিয়া জেলার গ্রাম্য-ভাষাতত্ত্ব পুস্তিকায় তত্ত্বের ভূমিকা" গ্রন্থে এর রূপরেখার প্রথম একক প্রচেষ্টায় এর ব্যাকরণ রচনা করে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এই গবেষণা ও সংগ্রহ কার্য অতীব দীর্ঘস্থায়ী ও দুঃসাধ্য আরও অনেক কিছু জানার পর, অতীত তথ্যগুলির বিশ্লেষণ-বিভাজন করে একটি ভাষা-পরিষদ আলোচনার পর একটি স্থির অনুমানে পৌঁছান হয়তো সম্ভব হবে। প্রথমে তৃণমূল স্তরে থানা-ভিত্তিক আলোচনার সূত্রপাত করা যেতে পারে। এই সূত্রে Indian Linguistic Society কর্তৃক প্রদত্ত প্রায় পাঁচশো মূল কৃৎ ও তদ্ধিত (Verb & Noun) শব্দের তালিকা ধরে তার উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যেতে পারে। ড. আবদুল হাই মনে করেন ভাষা সংগ্রহের প্রাথমিক কার্য ক্রিয়া ও সর্বনাম পদ সংগ্রহ করা" বস্তুত করার তো অনেক কিছুই আছে। রবীন্দ্রনাথই প্রথমে বলেছিলেন (ওই বক্তৃতায়-১৯০৪) সন্ধান ও সংগ্রহ করিবার বিষয় এমন কত আছে তাহার সীমা নাই।"

কিন্তু সেই আদিম প্রশ্নটি থেকে যাচ্ছে 'করবে কে?' Who is to bell the cat? এর অতি সহজ উত্তর হচ্ছে—আমরাই করব, আমাদেরই করতে হবে। পরাধীন ভারতে আমাদের হয়ে গ্রীয়ারসন সাহেব অনেকটাই তো করে গেছেন, শুধু বঙ্গীয় নয়, সমগ্র ভারতীয় ভাষাচর্চার ক্ষেত্রেও বটে। এখন বঙ্গভাষার জন্য বঙ্গবাসীকেই হাল ধরতে হবে। সামান্য সূত্রপাতেই রবীন্দ্রনাথ আশান্বিত হয়ে উঠেছিলেন, ওই বক্তৃতায় বলেছিলেন, "জননী, সময় নিকটবর্তী হইয়াছে, ইস্কুলের সন্তানদের পদধ্বনি শোনা যাইতেছে...... তোমার প্রসারিত শীতলপাটির উপরে আমাদের ছোটবড় সকল ভাইয়ের মিলনকে তোমার অশ্রু গদগদ আশীর্বচনের দ্বারা সার্থক করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকো।" (ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ, ১৯০৪) শতবর্ষ পরেও সে কথা সমান প্রযোজ্য, (শুধু মানভূমের জন্য নয় তো বটেই), সমগ্র বঙ্গদেশের (বাংলাদেশে ও পশ্চিমবঙ্গ যুক্ত অর্থে) পক্ষেও।

পুরুলিয়ায় নারীশিক্ষা

ইন্দ্রাণী দেব

আজ সকালে সংবাদপত্র খুলেই পুরুলিয়ার এক মর্মান্তিক খবর চোখে পড়ল। আমাদের আলোচনাব বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই ঘটনাটি. অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঃ

আনন্দবাজার পত্রিকা, ৪ঠা জুলাই ২০০৩—

গঞ্জনার জ্বালায় চার মেয়েকে মেরে মা আত্মঘাতী

কেন্দা (পুরুলিয়া) ঃ অভাবের সংসারে পর-পর চারটি কন্যা-সন্তানের জন্ম দেওয়ার গঞ্জনা সইতে না পেরে চার মেয়েকেই বিষ খাইয়ে মেরে আত্মঘাতী হয়েছেন এক মহিলা। তাঁর নাম মালতী মাহাতো (৩৫)। বৃহস্পতিবার কেন্দা থানা এলাকায় রাজারবাখ ঝাউ জঙ্গলে একটি পাকুড় গাছের নীচে ওই পাঁচজনের মৃতদেহ পুলিশ উদ্ধার করে।... পুলিশেব অনুমান, তীব্র অভাবের সংসারে ওই মহিলা একের পর এক কন্যা-সন্তানের জন্ম দেওয়ায় তাঁকে অশেষ গঞ্জনা সহ্য করতে হত। তাঁদের পরিবারে এই নিয়ে অশান্তি লেগেই ছিল। পুলিশের বক্তব্য সমর্থন করেছেন স্থানীয় কয়েকজন গ্রামবাসীও। দীর্ঘদিনের মানসিক অত্যাচারের পরিণতিতেই মালতীদেবী আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছেন বলে পুলিশ ও গ্রামবাসীর ধারণা।

স্বাধীনতার ৫৬ বছর পরেও এই ধরনের ঘটনা নিয়মিত ভাবে ঘটে চলেছে, এটাই দুঃখজনক। নারীশিক্ষার প্রশ্ন আজও এই কারণে এত গুরুত্বপূর্ণ থেকে যাচ্ছে।

শিক্ষা প্রগতির সহায়ক, এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক অগ্রগতির পথপ্রদর্শক। অথচ, যথেষ্ট চেতনার অভাবেই বেশিরভাগ নিম্নবিত্ত নারীরা শিক্ষালাভের প্রতি বিমুখ থেকে যান। এর ফলে আমরা একটি বিভ্রান্তিকর আবর্তের সম্মুখীন হচ্ছি, এবং সেই পুরনো প্রশ্নে ফিরে যাচ্ছি—ডিম আগে, না পাখি আগে? শিক্ষা ছাড়া যেমন উন্নতি প্রায় অসম্ভব, তেমন মানসিক জড়তার কারণে শিক্ষার বিস্তারও কষ্টসাধ্য। সাংবিধানিক সমানাধিকার ও সুযোগ-সুবিধার কথা বলাটা অবান্তর, যদি না এ২ আইন বা বিধি আমরা কার্যকরী করতে পারি, ও পিছিয়ে-পড়া নারীজাতির কাছে পৌঁছে দিতে পারি। বহু অঞ্চলে সাংস্কৃতিক-সামাজিক-পরিকাঠামোগত বাধা কাজ করছে, যার মূল সুদূরপ্রসারী ও অনেকাংশে স্থায়ী। এই ধরনের বাধা অতিক্রম করা যেমন দুষ্কর, তেমন এও সত্য যে বিধিবদ্ধ শিক্ষাও অনেক সময় সামাজিক সাম্য-সাধনের স্বার্থে আঞ্চলিক ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক পরিকাঠামো ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়—যা কখনোই কাম্য নয়। সার্বিক বিচারে

অবশ্য, বিধিবদ্ধ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য, এবং সেই কারণেই, পুরুলিয়ার মতো একটি প্রত্যন্ত, ক্ষরাপ্রবণ, উপজাতিপ্রধান, পিছিয়ে-পড়া জেলাতেও নারীশিক্ষার প্রশ্নটি এখন ক্রমেই অগ্রাধিকার পাচ্ছে।

নারীশিক্ষার পেছনে সাধারণত তিনটি উদ্দেশ্য থাকে। প্রথমত, এটি নারীর সামাজিক স্বীকৃতি ও কোন উচ্চ সামাজিক স্থান অর্জনের ক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য ধাপ। দ্বিতীয়ত, শিক্ষা নারীর সমাজ-আরোপিত সীমাবদ্ধতা ও দ্বিধাগুলি অতিক্রম করতে শেখায়, এবং নতুন আত্মসম্মানবোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করে, যার ফলে পুরুষশাসিত সমাজে সে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে, এবং তার জৈবিক, মানসিক ও সামাজিক ক্ষমতার সম্বন্ধে অবহিত হতে পারে। তৃতীয়ত, একজন নারীকে শিক্ষার দ্বার খুলে দেওয়ার অর্থ একটা গোটা পরিবারকে শিক্ষিত করার সূত্র ধরিয়ে দেওয়া। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় সাক্ষরতা অভিযানের সেই বীজমন্ত্রটি—"সাক্ষর মায়ের সন্তান কখনো নিরক্ষর হয় না।" এ ছাড়া, পরীক্ষা ও পরিসংখ্যান প্রমাণ করে দিয়েছে, যে শিশুমৃত্যুর হার সরাসরি নারীশিক্ষার সঙ্গে জড়িত। শিক্ষিত নারীর শিশুকে বাঁচানো অনেক সহজ, সেই শিশুদের অপুষ্টিজনিত রোগে অনেক কম ভুগতে হয়, এবং তার বুদ্ধির বিকাশ এর ফলে অনেক তাড়াতাড়ি ঘটে। লন্ডনে প্রকাশিত ৪২টি দেশের ওপর নেওয়া এক সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে যে মায়ের শিক্ষাগত অবস্থানের ওপর অনেকাংশে নির্ভর করে শিশুর শিক্ষার গুণগত মান। *The Statesman* সংবাদপত্রের ৪ঠা জুলাই ২০০৩ সংখ্যায় প্রকাশিত এই রিপোর্টটির একটি অংশ এখানে উদ্ধৃত হল—

"According to the study, the education of the parents, particularly the mother's, is important. Students whose mothers completed upper secondary education, got higher scores in reading, maths, and scientific literacy."

অতএব, এই দিক দিয়েও নারী-শিক্ষার সামাজিক প্রয়োজন অপরিসীম।

পুরুলিয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষার এই সুবিধেগুলো আরও বেশি করে উল্লিখিত হচ্ছে। কারণ এই জেলাটি একটি "পিছিয়ে-পড়া" জেলা হিসেবে সর্বজনবিদিত, এবং এখানকার উপজাতি-গোষ্ঠীগুলির মহিলাদের বাকি রাজ্যের তুলনায় অনুন্নত ধরে নিয়ে শিক্ষা-বিস্তারের কাজে পদার্পণ করা হয়। অতএব, সর্বপ্রথম প্রশ্ন হল, এখানকার মহিলারা কতটা অনুন্নত, বা কোন্ দিক দিয়ে অনুন্নত। যে-যে কারণে আমরা তাদের সম্বন্ধে এমন মনোভাব পোষণ করে থাকি, তার মূল কিছু-কিছু যুক্তি নীচে দেওয়া হল—

১। তারা প্রতিষ্ঠিত বাংলা ভাষায় কথা বলে না।

২। শহরে মানুষের সম্মুখীন হলে তাদের নিজেদের মধ্যে গুটিয়ে যাবার প্রবণতা থাকে।

৩। নিজেদের এলাকার বাইরে বহির্জগতের সমস্যা বা বিষয়বস্তুর সম্বন্ধে ভাবনা-চিন্তায় অনভ্যস্ত থাকায়, বিধিবদ্ধ লেখাপড়ায় ব্যবহৃত পুস্তকগুলির অর্থ উদ্ধার করতে তাদের বেশ বেগ পেতে হয়।

৪। বাল্যবিবাহের আধিক্য। প্রজনন ও শিশু-খাদ্য সংক্রান্ত একটি সরকারি সমীক্ষা অনুযায়ী ১৮ বছরের কম বয়সে বিয়ে হওয়া মেয়েদের % হারের দিক দিয়ে পুরুলিয়ার স্থান দ্বিতীয় উচ্চতম, যা মুর্শিদাবাদের পরেই।

দেখা যাচ্ছে যে, পুরুলিয়ার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বিকাশের মাত্রা যাচাই করতে গিয়ে আমরা কলকাতা ও তার পরিপার্শ্বের কৃষ্টি ও জীবনধারাকে মান হিসেবে ব্যবহার করছি—যা একদিকে অবশ্যম্ভাবী হলেও, অন্য দিকে অযৌক্তিক। অযৌক্তিক এই কারণে, যে এই মাপকাঠি অনুযায়ী

তাদের বুদ্ধি বা বুদ্ধিহীনতার বিশ্লেষণ আমরা করে থাকি—যা একেবারেই সঠিক নয়। প্রচলিত শিক্ষাধারার একটা বড় অসুবিধে হল যে তা আঞ্চলিক ভাষা বা জীবনধারার বৈশিষ্ট্যগুলোকে সাধারণত বিবেচনা করে না, বা করা তার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। এখানকার নারীদের যুগ-যুগ ধরে গড়ে ওঠা সংস্কার, কু-সংস্কার ও সামাজিক সত্তাকে কাটিয়ে উঠে বিধিবদ্ধ শিক্ষার রীতি-নীতি আয়ত্ত করতে যে মানসিক পরিবর্তন প্রয়োজন, তা নিঃসন্দেহে তৈরি হচ্ছে, কিন্তু পুরোপুরি তৈরি করতে আরও সময় লাগবে। এই কারণে, সেই প্রথম প্রশ্নটিতে বারে বারে ফিরে যেতে হয়—শিক্ষা আগে, না সামাজিক উন্নতি আগে! এখানে এখনও কন্যা-সন্তানকে বোঝা জ্ঞানে শিশু-বয়স থেকে বঞ্চিত করা হয়। এখনও পারিবারিক খরচের সিংহভাগ পুত্রের উপর ঢেলে কন্যার জন্য বরাদ্দ অর্থের অঙ্ক হ্রাস করা হয়। শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও অধিকার নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই আছে। তা অধিকাংশ মানুষের-ই এখনও উপলব্ধির বাইরে। "গণশক্তি" পত্রিকায় প্রকাশিত ১লা জুলাই ২০০৩-এর "স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা" নামক বিশেষ সংখ্যায় উল্লিখিত এক সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে যে একজোড়া বলদ হেক্টরপ্রতি জমিতে প্রতি বছর ১০৭৪ ঘণ্টা কাজ করে; একজন পুরুষ করে ১২১২ ঘণ্টা, ও একজন নারী করে ৩৪৮৫ ঘণ্টা। উল্টোদিকে সেই পুরুষের আহার হল ঘরের উৎকৃষ্টতম খাদ্য, এবং সেই নারীর খাদ্য সীমাবদ্ধ থাকে পরিবারের অবশিষ্ট আহারাদিতে। কন্যা-সন্তানের প্রতি এই তাচ্ছিল্যের মনোভাব আমাদের সমাজে কত গভীরে প্রবেশ করেছে, তা স্পষ্ট করার জন্য একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। আমার পরিচিত জনৈক ভদ্রলোক, **যিনি একটি কলেজে অধ্যাপনা করেন,** তাঁর সহকর্মীদের প্রশ্নের উত্তরে জানালেন, যে তাঁর মেয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষায় মোট ৬৮ শতাংশ নম্বর অর্জন করেছে। তিনি এই কথাও স্বীকার করলেন, যে মেয়েটির পড়াশুনো তিনি চিরকাল অবহেলার চোখেই দেখেছেন, এবং যেহেতু মাধ্যমিকের পর কন্যার বিবাহের কথাই এতদিন তাঁর পরিকল্পনায় ছিল, এই কন্যার উচ্চশিক্ষার প্রতি আকর্ষণ দেখে তিনি এখন সমস্যায় পড়ে গেছেন। উচ্চশিক্ষিত সমাজেও যেখানে এই ধরনের মনোভাব আমরা এখনও উৎপাটিত করতে পারিনি, সেখানে সাধারণ, নিরক্ষর মানুষের কথা তো বলাই বাহুল্য। অমর্ত্য সেন তাঁর গবেষণায় প্রমাণ করেছেন যে মেয়েদের স্বল্প-শিক্ষা, এমনকি উচ্চ-শিক্ষা দিলেও, তাদের তুলনামূলক উন্নতির অভাবের কারণ তাদের শৈশবের বঞ্চনা। অতএব, জেলার সামগ্রিক উন্নতি, ও পরিবার-পিছু আয় এবং ক্রয়ক্ষমতাব বৃদ্ধি ঘটাতে না পারলে নারী-শিক্ষার গুরুত্ব খুব বেশি বাড়ানো সম্ভবপর হবে না।

১। পুরুলিয়া জেলায় নারীর শিক্ষাগত অবস্থান

তবু, ক্যাপল্যান্ডের সঙ্কলিত ১৯১১ সালের "মানভূম জেলার গেজেটিয়ার"-এ যে চিত্রটা তুলে ধরা হয়েছিল, তার থেকে আমরা অনেকটা পথ অতিক্রম করে এসেছি। ১৮৭১-৭২ সালে তৎকালীন মানভূম জেলায় ৮৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল, যার মধ্যে একটি ছিল মেয়েদের জন্য। চল্লিশ বছর পর ক্যাপল্যান্ড় লিখছেন—

"মানভূম জেলায় ছেলেদের জন্য প্রাথমিক স্তরের বিদ্যালয় আছে ৬৭৬, যার মধ্যে উচ্চ-প্রাথমিক ৭৩টি ও নিম্ন-প্রাথমিক ৬০৩টি...

সকল স্তরের বিদ্যালয়ে পড়ুয়ার সংখ্যা ২২,৫৮৫, যার মধ্যে ছেলের সংখ্যা ২১,৪৩৫ ও মেয়ের সংখ্যা ১১৫০।"

১৯৩৯ সালে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে ১১২৫-এ দাঁড়ালেও, প্রাথমিক শিক্ষা

আবশ্যিক করে দেওয়া হয় শুধু ছেলেদের জন্য।

স্বাধীনতার পর, সরকারি উদ্যোগে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার ঘটল। ১৯৫০-৫১ সালে প্রাথমিক স্তরে নারীশিক্ষার অবস্থা নীচের এই তালিকাটির থেকে পরিষ্কার হয়ে যাবে (এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এই সময় মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শুধু ছেলেদের জন্য কোন স্কুল ছিল না— সহ-শিক্ষার (co-education) ব্যবস্থা ছিল প্রত্যেকটিতেই)—

১৯৫৫-৫৬ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়

বিদ্যালয়	সহশিক্ষা বিদ্যালয়*	বালিকা বিদ্যালয়
নিম্ন প্রাথমিক	১৬৮১	৯৬
উচ্চ প্রাথমিক	৩১৭	১৪
মোট	১৯৯৮	১১০

* রিপোর্টে জানা যায় যে সহশিক্ষা বিদ্যালয় হলেও এই স্কুলগুলি মূলত ছাত্র-অধ্যুষিত ছিল— ছাত্রীর সংখ্যা ছিল নগণ্য।

১৯৭১ সালে দেখা যাচ্ছে, যে ২২০২টি বিদ্যালয়ে ১,৬৬,৪৭৯টি পড়ুয়াদের মধ্যে মাত্র ৪০,৮৭০টি ছিল মেয়ে।

বিংশ শতাব্দীর শেষেও মূল চিত্রের খুব বেশি পরিবর্তন আমরা পাই না। ১৯৯৬ সালে, UNICEF-এর সহযোগিতায়, পুরুলিয়ার জেলাশাসক এখানকার সাক্ষরতা বিষয়ক একটি সমীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করেন। এই সমীক্ষা অনুযায়ী, পুরুলিয়া জেলার মোট সাক্ষর মানুষের সংখ্যা ৭,৮৩,৯২৫, যার মধ্যে ৫,৭৯,৮২৯ জনই ছিল পুরুষ, ও ২,০৪,০৯৬ জন নারী। এই ব্যাপারে সবচেয়ে উন্নত ব্লক নির্ধারিত হয়েছিল রঘুনাথপুর ১নং ব্লক। সেখানেও মোট ৫৪,৪৮৯ জন সাক্ষরের মধ্যে নারীর সংখ্যা ১৮,১২৭। সমগ্র জেলায় নারী-সাক্ষরতার হার ৩৬% এবং ঝালদা ২নং ব্লকে এই নারী-সাক্ষরতা মাত্র ১৫%। ১৯৯১ সালের জনগণনায় পুরুলিয়ায় মোট সাক্ষরতার হার দেখানো হয়েছে ৪৩.২৯%। এর মধ্যে পুরুষ আছে ৬২.১৭%, ও মহিলা ২৩.২৪%। দশ বছর পর, ২০০১ সালের গণনায়, এই হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়ে, মোট ৫৬.১৪%-এ দাঁড়িয়েছে। পুরুষ সাক্ষরতার হার হয়ে গেছে ৭৪.১৭%, ও নারী ৩৭.১৫%। তবু, জাতীয় সাক্ষরতার হার যেখানে ৬৫%, পুরুলিযাকে এখনও অনেকটা পথ অতিক্রম করতে হবে।

পুরুলিয়ায় আর একটা বড় বাধা হয়ে গেছে ছাত্রীদের স্কুল-ছুটের (drop-out) প্রবণতা। ২০০৩ সালের ৩১শে মার্চের হিসেবে, মেয়েদের বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ৬৩.৩৩%, এবং সার্বিক ভর্তির হার ৬৮.৮১%। অথচ সমীক্ষায় প্রকাশ যে, পুরুলিয়ায় স্ত্রী-সাক্ষরতার হার ৩৭.১৫%। অন্তত অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েরা যাতে স্কুলে পড়ে, তার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। সরকার এই ব্যাপারে কিছু উদ্যোগ নিয়েছে—যেমন স্কুলে খাদ্য বিতরণ করা, প্রাথমিক স্তরে পাশ-ফেল তুলে দেওয়া, ইত্যাদি—কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে সামাজিক বাধা কাটিয়ে ওঠার পক্ষে এগুলো যথেষ্ট নয়। এই মুহূর্তে পুরুলিয়ায় নারীর শিক্ষাগত অবস্থান পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় নিম্নতম, যা মুর্শিদাবাদের পরেই। এটাও লক্ষণীয় যে সংখ্যাগত উন্নতি ঘটলেও, নারী-পুরুষের শিক্ষার অনুপাতিক হার প্রায় স্থিতিশীল—এবং এটাই এখন সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয়।

প্রাথমিক পেরিয়ে, মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার ছবি প্রায় একই রকম। ১৯৬৫-৬৬ সালে ৪৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৯৪৭৪ ছেলে ও ১৩১৭ মেয়ে পড়ত। ১৯৭০-৭১ সালে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ৬৫, যার ৫৮টি ছিল প্রধান ছেলেদের ও ৭টি মেয়েদের জন্য, যেখানে ১৩,৬২৯ ছাত্রের তুলনায় পড়ত মাত্র ৩৪৬৫ ছাত্রী। ১৯৫৬ সালে একাদশ শ্রেণী ও উচ্চ-মাধ্যমিক চালু হয়। ১৯৫৭-৫৮ সালের পাঁচটি উচ্চ-মাধ্যমিক প্রতিষ্ঠান বেড়ে ১২টি হল ১৯৬০ সালে। ১৯৭০-এ ৩৭টি মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ১৮,১৭৮ ছাত্র ও ৪,৩৬০ ছাত্রী পড়ত।

২০০৩ সালে এসে (প্রাথমিক স্তর বাদে) তিনটি স্তরের স্কুল দেখা যায়—জুনিয়ার হাই (অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত)। মাধ্যমিক (দশম শ্রেণী পর্যন্ত), ও উচ্চ-মাধ্যমিক (দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত)। সর্বস্তরের স্কুল জেলায় আছে মোট ৩৩৩টি। ৯৫টি উচ্চ-মাধ্যমিক স্কুলের মধ্যে ১২টি নির্ধারিত শুধু মেয়েদের জন্য, ১১টি শুধু ছেলেদের জন্য, এবং সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে বাকি স্কুলগুলোতে। মাধ্যমিক ও জুনিয়ার হাই স্কুল স্তরে কোন স্কুল শুধু ছেলেদের জন্য নেই। মাধ্যমিক স্তরে মেয়েদের স্কুল আছে ১৩টি, ও সহ-শিক্ষা ভিত্তিক স্কুল ১২৬টি। একইভাবে, মেয়েদের জন্য জুনিয়ার হাই স্কুল রয়েছে ১২টি, এবং সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা আছে ৮৫টিতে। অতএব, এই তথ্যগুলির থেকে এটা পরিষ্কার যে সরকারি শিক্ষা-ব্যবস্থায় মেয়েদের ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি রাখা হয়নি। তবু, সংখ্যাগতভাবে মেয়েরা অনেক পিছিয়ে আছে প্রধানত সামাজিক ও পারিবারিক প্রভেদের কারণে। ২০০২ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, পঞ্চম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত, পুরুলিয়ার এই স্কুলগুলিতে ১,০৬,৮৭২ ছাত্র, ও ৫৭,৫৭১ ছাত্রী পাঠরত ছিল। তিরিশ বছরে শিক্ষিত মেয়ের সংখ্যা বহুগুণ বেড়েছে। কিন্তু আনুপাতিক ব্যবধান রয়েই গেছে।

উচ্চ-মাধ্যমিক পাশ করে মেয়েদের জন্য এখন উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক বেশি সুযোগ গড়ে উঠেছে। ১৯৪৮ সালে স্থাপন হয় পুরুলিয়ার প্রথম মহাবিদ্যালয়—জগন্নাথ কিশোর কলেজ—কেবল ছেলেদের জন্য। মেয়েদের উচ্চশিক্ষায় পদার্পণ করার কোন ব্যবস্থা ছিল না এই সময়। এই সমস্যাটা অনুভব করেন এই কলেজের তৎকালীন পরিচালন সমিতির সচিব, শ্রী জওহরলাল বসু, এবং মূলত তাঁরই উদ্যোগে ১৯৫১ সালে এখানে সহ-শিক্ষা (co-education) প্রবর্তন করা হয়। সহ-শিক্ষা ব্যবস্থায় এই বছর প্রথম দুটি ছাত্রী ভর্তি হয়—সাবিত্রী সেন ও তপতী নন্দী।

১৯৫৭ সাল পর্যন্ত মেয়েদের উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন মেটবার জন্য রইল শুধু এই জে. কে কলেজ। এই বছরে স্থাপিত হল জেলার একমাত্র মহিলা মহাবিদ্যালয়—নিস্তারিণী কলেজ (যা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হবে এর পরের অনুচ্ছেদে)। মেয়েদের উচ্চস্তরে পড়ার সমস্যা অনেকাংশেই এবার মিটলো। শহর এলাকার বাইরে, মফঃস্বলগুলোর চাহিদা মেটাতে, এর পর নিয়মিতভাবে কলেজ খোলা হতে লাগল।

নীচে দেওয়া হল এই কলেজগুলির একটি তালিকা—

১৯৬১ — রঘুনাথপুর কলেজ

১৯৬৪ --- শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, পুরুলিয়া

১৯৭১ — রামানন্দ সেন্টেনারী কলেজ, লৌলাড়া

১৯৭৫ — অচ্ছুরাম মেমোরিয়াল কলেজ, ঝালদা

১৯৮১ — মহাত্মা গান্ধী কলেজ, লালপুর

১৯৮৫ — বলরামপুর কলেজ

১৯৮৫ — নেতাজী সুভাষ আশ্রম মহাবিদ্যালয়, সুইসা

১৯৮৬ — মানভূম মহাবিদ্যালয়, মানবাজার

২০০০ — মাইকেল মধুসূদন মহাবিদ্যালয়, কাশীপুর

২০০০ — পঞ্চকোট মহাবিদ্যালয়, শর্বরী, নেতুড়িয়া

একবিংশ শতাব্দীর চৌকাঠে এসে, পুরুলিয়ায় মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা এখন ১২। সমগ্রভাবে, এটাই উল্লেখযোগ্য যে, এদের মধ্যে একটিও কলেজ শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য নয়—প্রত্যেকটিতে সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। অতএব, নিস্তারিনী কলেজ ছাড়াও, মেয়েদের পড়ার সুযোগ রয়েছে বাকি কলেজগুলোতেও।

২। নারী-শিক্ষায় নিযুক্ত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান

(ক) শান্তময়ী বালিকা বিদ্যালয়—

ক্যাপল্যান্ডের ১৯১১ সালের গেজেটিয়ারে পুরুলিয়া পৌরসভার সাহায্যপ্রাপ্ত দুটি স্কুলের কথা বলা হয়েছিল—প্রথমটি ছেলেদের একটি ভার্নাক্যুলার স্কুল, যা পরে মানভূম ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশন নামে পরিচিত হল; এবং দ্বিতীয়টি একটি বালিকা বিদ্যালয়, যা হয়ে উঠল পুরুলিয়ার সর্বপ্রথম গার্লস হাই স্কুল। প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় হিসেবে যখন এটি ১৮৮৭ সালে স্থাপিত হল, তখন এটি চলত প্রতাপ নাট্যমন্দিরের সামনে, রায়বাহাদুর অম্বুজাক্ষ রোডের পাশে। পরবর্তীকালে, স্কুলটি "শান্তময়ী বালিকা বিদ্যালয়" নামে পরিচিতি লাভ করল। হরিপদ দাঁ নামক এক প্রখ্যাত ব্যবসায়ী ও দানবীর, ওল্ড মানবাজার রোডের ওপর জমি কিনে স্কুলবাড়ি তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন, এবং তাঁর মাতার নামে স্কুলটির নামকরণ করেছিলেন। ১৯৫৩ সালে হাইস্কুলের মর্যাদা অর্জন করার পর আর ৫০ বছর পেরিয়ে গেছে। বর্তমানে ছাত্রীরা এখানে ভর্তি হয় পঞ্চম শ্রেণী থেকে, এবং ছাত্রীসংখ্যা এখন প্রায় ১৫০০। ছাত্রীদের শারীরিক-মানসিক-আত্মিক— সর্বস্তরের বিকাশের লক্ষ্যে সচেষ্ট এই স্কুলের শিক্ষিকারা। রাজ্য-স্তরে মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় ধারাবাহিকভাবে ভালো ফল করে. এখানকার ছাত্রীরা নারীশিক্ষার সাফল্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

(খ) রাষ্ট্রীয় উচ্চ-মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়—

পুরুলিয়ার একমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ত মেয়েদের স্কুল এটি। ১৯৫৬ সালে পুরুলিয়া জেলা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আগে এই স্কুলটি ছিল বিহার সরকারের অধীনে। তারপর এটি এই রাজ্যের তত্ত্বাবধানে, এবং পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নিয়ন্ত্রণে আসে। উচ্চমাধ্যমিক স্তরে এখানে বিজ্ঞান ও কলাবিভাগে পাঠদান করা হয়। পর্ষদের পাঠক্রম ছাড়াও এখানে শারীর শিক্ষা, সাংস্কৃতিক শিক্ষা ও কম্পিউটর শিক্ষার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রীদের শিক্ষামূলক ভ্রমণে নিয়ে যাওয়া হয়। পঠন-পাঠনের মান রক্ষার্থে বহিরাগত শিক্ষিকা নিয়োগ করা হয়, এবং তাঁদের সুবিধার্থে একটি আবাসস্থলও নির্মিত হয়েছে। বর্তমানে ছাত্রীসংখ্যা ৮০০ ছাড়িয়ে গেছে।

(গ) নিস্তারিণী মহিলা মহাবিদ্যালয়—

নিস্তারিণী কলেজের বর্তমান অফিস-বাড়িটি প্রারম্ভিকভাবে ছিল আমেরি সাহেবের বাংলো। ১৯০২ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এই বাড়িটি কিনে নেন, এবং তাঁর পিতা শ্রী ভুবনমোহন দাশ ও তাঁর মাতা নিস্তারিণী দেবী এখানেই বাস করতে থাকেন। এঁরা দুজনেই তাঁদের জীবন নিয়োগ করেছিলেন সমাজসেবা ও নারীশিক্ষায়। নিস্তারিণী দেবী ও তাঁর কন্যা অমলা দেবী প্রথমে শুরু করেন "নিস্তারিণী বিদ্যালয়" নামে একটি প্রাথমিক শিক্ষাদানকেন্দ্র, যার সম্পূর্ণ খরচ বহন করতেন দেশবন্ধু নিজে। বয়স্ক মেয়েদের জন্যও একটি পাঠশালা খুলেছিলেন, যেখানে লেখাপড়া, গান, ও সেলাই শেখানো হত, এবং মান বজায় রাখার জন্য রাঁচী থেকেও শিক্ষিকা আনা হত। নিস্তারিণী দেবীর তত্ত্বাবধানে একটি অনাথাশ্রম ও একটি বৃদ্ধাশ্রমও চালানো হয়েছিল ওই বাংলোতেই। তবে, অত্যন্ত অল্প সময়ের ব্যবধানে ভুবনমোহন দাশ, নিস্তারিণী দেবী ও অমলা দেবীর মৃত্যুর ফলে কিছুদিনের জন্য তাঁদের শিক্ষামূলক কাজে ছেদ পড়েছিল। হরিজন শিশুদের শিক্ষাদানের কাজ দিয়ে আবার তাঁদের ঐতিহ্যকে জাগৃত করলেন শ্রীমতি বাসন্তী দেবী ও তাঁর পুত্র, শ্রী চিররঞ্জন দাশ। শ্রী চিররঞ্জন দাশ যখন অসুস্থ হলেন, তাঁর চিকিৎসা করতে এসে ড. বিধান চন্দ্র রায় মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের কাজ দেখে। তাঁর ইচ্ছায়, এবং তাঁর সাথে শ্রী জীমূতবাহন সেনের মতো সমাজসেবীদের অনুরোধ ও চেষ্টায়, এই বাড়িটিকে মহিলাদের জন্য একটি জাতীয় উচ্চশিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। ১৯৫৮ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি, ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদের হাতে গোড়াপত্তন হল নিস্তারিণী কলেজের নতুন পাঠভবনের।

জন্মলগ্ন থেকেই নিস্তারিণী কলেজ তার অগ্রগতির ধারা বজায় রেখেছে। পুরুলিয়ার মতো একটি অনগ্রসর জেলায় এটি নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে স্তম্ভাকারে দাঁড়িয়ে আছে। প্রতি বছর ২০০-২৫০ ছাত্রী এখানে উচ্চমাধ্যমিক পড়ার সুযোগ পেয়ে এসেছে। বর্তমানে স্নাতক স্তরে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগে ৯টি বিষয়ে অনার্স চালু আছে, এবং সংগীতসহ ১৫টি বিষয়ে সাধারণ স্নাতক পাঠ্যক্রম পড়ানো হয়। প্রত্যেকটি বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে মেয়েরা কলেজের তথা জেলার মুখোজ্জ্বল করেছে। সমস্ত বিভাগ মিলিয়ে এখানে ছাত্রীসংখ্যা এখন প্রায় ১৭০০। বিধিবদ্ধ শিক্ষা ছাড়াও, জেলা-রাজ্য-রাষ্ট্র ভিত্তিক বহু প্রতিযোগিতায় এখানকার মেয়েরা সফল হয়েছে। ২০০১ সাল থেকে "কল্যাণ" সংস্থার সহযোগে কলেজে বৃত্তিমূলক ও ব্যবহারিক শিক্ষাও চালু করা হয়েছে গরিব মেয়েদের স্বনির্ভরতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে। জাতীয় সেবা প্রকল্পের (N.S.S) মাধ্যমে ছাত্রীরা নিয়মিত সেবামূলক কাজেও অংশগ্রহণ করে থাকে।

(ঘ) স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন—

খাঁটি শিক্ষা কখনো একটি বিধিবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। সরকারি বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতি-নির্ধারিত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য, কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে বিশেষ করে, মুক্ত বা অ-বিধিবদ্ধ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। অনুন্নত, উপজাতিপ্রধান, বা অভাববেষ্টিত এলাকাগুলিতে সাক্ষরতার ভিত্তিস্থাপন করার পর প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় মহিলাদের স্বনির্ভর হতে শেখানো। এই কারণে, সেলাই, বোনা, সাধারণ নার্সিং, খাদ্য সংরক্ষণ ও বণ্টন, ফিজিওথেরাপি ইত্যাদি বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রকল্প অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে। এর সাথে প্রয়োজন স্বাস্থ্য, পরিবেশ, শিশুপালন ও কুসংস্কারমুক্তি বিষয়ক শিক্ষা। সাধারণ বিধিবদ্ধ শিক্ষার মধ্যে দিয়ে যারা অন্তত উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পৌঁছবার সুযোগ পেয়েছে, এই ধরনের জ্ঞান

তারা স্বাভাবিকভাবে রপ্ত করে নিচ্ছে। কিন্তু যাদের এই সুযোগ নেই বা আগ্রহ নেই, তাদের জন্য অন্য শিক্ষাপন্থার প্রয়োজন, যার মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাদের দ্বারে দ্বারে, পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে এই ধরনের জ্ঞান বণ্টন করতে পারবেন। মূলত এই সেবামূলক কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে পুরুলিয়ার বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী ব্যক্তি ও সংগঠন।

এই কাজের উল্লেখ করতে গিয়ে প্রথম যাঁর কথা স্বাভাবিকভাবে চলে আসে, তিনি হলেন কমলা দেবী রাঠী। ১২ বছর বয়সে পুরুলিয়ার এক সম্ভ্রান্ত মারওয়াড়ী পরিবারে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁর শাশুড়ী-মাতার প্রেরণায় তিনিই প্রথম তাঁদের এখানকার রক্ষণশীল সমাজে পর্দামুক্ত হলেন। ১৯ বছর বয়সে, বিনোবা ভাবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি নারী উন্নয়ন কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। ১৯৫৩ সালে গঠন করলেন "মহিলা বিকাশ মণ্ডল", যেটি "মহিলা বিকাশ ট্রাস্ট" নামক একটি পরিচালন সমিতির হাতে তুলে দিলেন ১৯৬০ সালে। নিজের বাড়িতে দুঃস্থ শিশুদের পড়তে-লিখতে শেখানো দিয়ে শুরু করে, ১৯৫৮ সালে তিনি নিস্তারিণী কলেজের কাছে "বাল-ভারতী" স্কুল খুললেন সহ-শিক্ষা ব্যবস্থায়, যেখানে হিন্দী-বাংলা দুই মাধ্যমেই পাঠদান করা হয়। এই স্কুলে বহুদিন প্রধান শিক্ষিকারূপে দায়িত্ব পালন করেছেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা শ্রীমতি ইরা দেবনাথ। পরে, মানসিকভাবে অসমর্থ শিশুদের শিক্ষাদানের ও সাধারণ জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য কমলা দেবী খুললেন, "মনোবিকাশ কেন্দ্র।" পুরুলিয়ায় এটাই একমাত্র কেন্দ্র যা এই কাজে নিযুক্ত। মহিলা বিকাশ মণ্ডলের মূলকেন্দ্র, কর্ণী ধর্মশালায়, নিয়মিতভাবে মেয়েদের বিভিন্ন রকমের বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদান করা হয় বিনামূল্যে। ব্যবহারিক শিক্ষার দিকেও এঁদের সর্বদাই নজর আছে—যেমন, পিছিয়ে পড়া গরিব শিশুদের জন্য কোচিং ক্লাসের ব্যবস্থা করা, বা Spoken English ক্লাস চালানো। ১৯৮৯ সালে শুরু হল তাদের আর একটি শাখা, "প্রেরণা"—যা কাজ করে প্রধানত প্রাপ্তবয়স্কা মহিলাদের বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার্থে।

আর একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, "কল্যাণ", পুরুলিয়ায় কাজ শুরু করে রামকৃষ্ণ আশ্রম, নরেন্দ্রপুরের লোকশিক্ষা পরিষদের একটি শাখা হিসেবে, ১৯৭৯ সালে। পুরুলিয়ার এই চরম পশ্চাদপর অবস্থাকে কাটিয়ে উঠে সামগ্রিক উন্নয়নের পথে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে এই সংস্থা ব্রতী। তাদের বহুবিধ গ্রামোন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যে দুটি বিশেষ প্রকল্প নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজ করে চলেছে—নারী ও শিশুবিকাশ কর্মসূচি, এবং কারিগরি শিক্ষা ও স্বনির্ভরতার কর্মসূচি। প্রথমটিতে শিশু-বিকাশের সাথে সাথে মায়েদের সাধারণ শুচিতা, স্বাস্থ্য ও মাতৃদায়িত্ব সম্পর্কে শিক্ষাপ্রদান করা হয়। এই কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হল মায়েদের পুত্র-কন্যার মধ্যে ব্যবহারিক প্রভেদ না করার শিক্ষা দেওয়া।

বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রকল্পে জোর দেওয়া হয় স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরি করার দিকে। ২০০৩ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন ব্লকে এই ধরনের গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে ২৫৩টি, যাতে প্রায় ৪০০০ মহিলা যুক্ত হয়ে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য সফল করে চলেছেন—

১। সাক্ষরতা কর্মসূচি।

২। কুসংস্কার বিরোধী সচেতনতা তৈরি।

৩। উপযুক্ত বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া।

৪। নারী-নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হওয়া।

৫। ছেলে ও মেয়েকে সমানচোখে দেখা।

৬। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা।

৭। গোষ্ঠীর মাধ্যমে টাকা জমাতে শেখানো।

৮। কারিগরি শিক্ষা প্রদান করা।

আরও একটি সংস্থার উল্লেখ না করলে এই আলোচনা অসমাপ্ত থেকে যাবে। নীলকুঠি-ডাঙ্গার "সারদাশ্রয়"-কে কেন্দ্র করে সারদা সংঘ দুস্থ মহিলাদের মধ্যে নীরবে কাজ করে চলেছে। সেলাই-বোনা খাদ্য সংরক্ষণের মতো স্বনির্ভরতাভিত্তিক শিক্ষাদান ছাড়াও এই সংস্থার কর্মীরা একটা ছোট গ্রন্থাগার গড়ে তুলেছেন গরিব ছাত্রীদের জন্য। এই ধরনের ছাত্রীদের সাহায্যার্থে একটা কোচিং ক্লাসও চলে এবং তাদের বই কিনে দেওয়া ও স্কুল-কলেজে ভর্তি হওয়ার টাকা সংগ্রহ করে দেওয়া হয়। সারদা সংঘ সম্প্রতি একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় খুলেছে পুনুড়া গ্রামে।

বহুবিধ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছে পুরুলিয়া জেলায়। তাদের এই প্রচেষ্টার ফলে ধীরগতিতে হলেও উন্নতির আভাস পাওয়া যাচ্ছে। বহু খ্রিস্টান সংস্থা ১০০ বছর যাবৎ এখানকার উপজাতিদের মধ্যে সেবামূলক কাজে রত। তাদের মধ্যে লেপ্রোসি মিশনের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সংস্থা কুষ্ঠমোচনে যেমন সচেষ্ট, তেমন কুষ্ঠ-আক্রান্ত মা ও শিশুদের পুনর্বাসনের দিকেও তারা নজর দিয়েছে। দি এ্যাসেম্ব্লি অফ গড চার্চ ও হোলি চাইল্ড মিশনগুলিও পুরুলিয়ার শহর ও শহরতলী অঞ্চলে নানারকম শিক্ষা ও সেবামূলক কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

৩। নারী—পুরুষ—কিছু ভাবনা

নারীশিক্ষা ও নারীকল্যাণকার্য সূত্রে পুরুলিয়ায় যে পরিবর্তন এসেছে, তা অস্বীকার করা যাবে না। তবু, বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে অযৌক্তিক গোঁড়ামি; নারীজাতিব প্রতি সামাজিক অশ্রদ্ধা , ডাইনি-প্রথার জোরালো অস্তিত্ব ; ও মেয়ে-শিশুদের প্রতি অবজ্ঞা এখনও যথেষ্ট বিদ্যমান। শিক্ষা ও সামাজিক উন্নতিব পারস্পরিক সম্পর্ক আগেই আলোচিত হয়েছে, এবং যাঁরা মানুষের অগ্রগতির এই দুটি দিকের প্রতি দৃষ্টিপাত করছেন—তাঁবা সরকাবি কমী হোক, বা বেসরকারি—তাঁদের অবদানের স্বীকৃতি দেওয়া আমার এই প্রতিবেদনের একটি অন্যতম লক্ষ্য। তবে, সমগ্রভাবে আরও কিছু সমস্যার কথা মনে রাখা দরকার। কিছু নারীকে উচ্চমাধ্যমিকেব গণ্ডি পার করিয়ে দিলেই তাদের জীবনে একটা বিশাল পরিবর্তন আসবে, এটা ভাবা বোধহয় মূর্খতার নিদর্শন। নারীকে শিক্ষা দেওয়া, তাকে স্বনির্ভরতার পথে নিয়ে যাওয়া, তাকে ঘরের গণ্ডির বাইরে কিছু কিছু সামাজিক কাজে নিযুক্ত করা, তার নজর প্রসারিত করতে শেখানো যেমন আবশ্যিক, তেমন সাথে সাথে প্রয়োজন পুরুষকেও নারীর সামাজিক গুরুত্ব ও ভূমিকা সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া, ও সামাজিক শিক্ষার এক পরিকল্পিত কর্মসূচি রূপায়ণ করা। নারীকে সামাজিক কর্তব্যের ব্যাপারে অবহিত করাটা যেমন শিক্ষার একটি অঙ্গ, তেমন পুরুষকে গৃহ ও পারিবারিক কর্তব্যের ব্যাপারে শিক্ষা দেওয়াও প্রয়োজন। আধুনিক সমাজে শ্রম-বিভাজন সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে, এটা যেমন সত্য, তেমন এও সত্য যে পুরোনো নারী-পুরুষের শ্রম-বিভাজনের ক্ষেত্র পরিবর্তিত হচ্ছে। এখন নারী বহু কাজই করছে, যা পূর্বে পুরুষের নিয়ন্ত্রণে ছিল। শিক্ষার মাধ্যমে নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক

তৈরি হবে এক সুষ্ঠু আদান-প্রদানের ভিত্তিতে—এটাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। নতুবা, বহু শিক্ষিত মেয়েদের মতো গোটা নারী-সমাজকে নিপীড়িত, নির্যাতিত থেকেই যেতে হবে।

বহু যুগ ধরে চলে আসছে নারীর এই নির্যাতনের ইতিহাস। বৈদিক যুগের নারী-স্বাধীনতার কথা আমরা এই পরিপ্রেক্ষিতে সর্বদাই আলোচনা করে থাকি। স্মরণ করি মৈত্রেয়ী, গার্গী, অপালার মতো মন্ত্রদর্শিতাদের, যাঁদের পাণ্ডিত্য বেদব্যাস-যাজ্ঞবল্কের মতো মহর্ষিরাও স্বীকার করে গেছেন। ঋগ্বেদের সমানাধিকারের বাচন তো কারোর-ই অজানা নয়। তবু, ওই স্বর্ণযুগেও তো নারী ছিল সেই ভোগ্যবস্তু! সুন্দরী অপ্সরাদের জীবনযাপন কি আমরা সহজে ভুলতে পারব? তাও আবার সোনার ইন্দ্রপুরীতে! আর তা ছাড়া, ক'জন মৈত্রেয়ী-ই বা আমাদের নজর কেড়েছে? মনুসংহিতাই বোধহয় বাস্তব স্বীকার করেছিল, তাই বার-বার লেখক মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, "যে পরিবারে স্ত্রীলোকগণ সদাই দুঃখিত থাকেন, সে কুল আশু বিনাশপ্রাপ্ত হয়।" স্ত্রীলোকগণ যে দুঃখে থাকেন, তার-ই পরোক্ষ স্বীকার রয়েছে এই কথাটিতে। তাছাড়া, তিনি যে বলেছিলেন—"স্ত্রীলোক বাল্যাবস্থায় পিতার বশে, যৌবনে স্বামীর বশে, স্বামী মারা গেলে পুত্রের বশে থাকবে"—এই উক্তিটি আমাদের কাছে আপত্তিজনক হলেও, আমরা তো সেটাকে এখনও অসত্য প্রমাণ করতে পারিনি। ব্যতিক্রমী নারী সব যুগেই ঘুরে-ফিরে আসে, তখনও এসেছিল।

আজ একবিংশ শতাব্দীর আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে আমরা কি সেই যুগের আভাস পাচ্ছি না, যেখানে উচ্চশিক্ষিতা, সচেতন, কুসংস্কারমুক্ত নারী আর ব্যতিক্রমী বলে বিবেচিত হবে না? পুরুষের সাথে একযোগে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে? পুরুলিয়ার নারীদের জন্যও সেই যুগ অপেক্ষা করছে ; শুধু একটু হাত ধরে পথনির্দেশ করার অপেক্ষা। সেটুকু কাজ আমরা সকলে মিলে সম্পাদন করতে পারব—এ আশা নিশ্চয় অসঙ্গত নয়।

<u>কৃতজ্ঞতা স্বীকার</u> :

বিভিন্ন তথ্য ও মূল্যবান পরামর্শের জন্য আমি যাঁদের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ :

১। শ্রী শ্যামাপ্রসাদ বসু—প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ্, ও প্রাক্তন প্রধান, ইতিহাস বিভাগ, নিস্তারিণী কলেজ, পুরুলিয়া।

২। শ্রী সুবোধকুমার বসুরায়—লোকসংস্কৃতি ও লোকভাষার গবেষক, এবং প্রাক্তন প্রধান, ইংরেজি বিভাগ, জে. কে. কলেজ, পুরুলিয়া।

৩। শ্রীমতি নীলিমা সিন্‌হা—অধ্যক্ষা, নিস্তারিণী কলেজ, পুরুলিয়া।

৪। শ্রীমতি কমলা দেবী বাঠী—সভাপতি, মহিলা বিকাশ ট্রাস্ট।

৫। শ্রী অনাথ ব্যানার্জী—সম্পাদক, নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি, পুরুলিয়া জেলা কমিটি।

৬। শ্রী ছন্দম দেব—সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, পুরুলিয়া জেলা কমিটি।

৭। "কল্যাণ" সংস্থার কর্মীবৃন্দ।

৮। শ্রী নিরঞ্জন পুরোহিত—বিভাগীয় প্রধান, সংস্কৃত বিভাগ, নিস্তারিণী কলেজ, পুরুলিয়া।

<u>যে সমস্ত বইয়ের সাহায্য নিয়েছি</u>—

১। *West Bengal District Gazetteers, Purulia* (Govt. of West Bengal, 1985)

২। *Professional Competency in Higher Education*—ed. --N.K. Uberoi (U.G.C., Delhi, 1995)

৩। পুরুলিয়া—তরুণদেব ভট্টাচার্য (ফার্মা কে এল এম প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা ১৯৮৬)।

৪। জিজ্ঞাসা—একবিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, সম্পাদক ঃ শিবনারায়ণ রায়।

পুরুলিয়ার সাম্প্রতিক গল্প ও উপন্যাস

দেবাশিস সরখেল

গল্পকার সিরাজুল হক হয়তো লিখতেন, পেটের ভিতর গুড় কইরছ্যে ভুড়-ভুড়!

কবি বলেন, আপনার কথা বলিতে ব্যাকুল।

এই ব্যাকুলতাই মানুষকে সৃজনশীলতার দিকে নিয়ে যায়। ঝুমুরিয়া গান বাঁধে, ঝুমুরের ছন্দে লাচনি নাচে ললিত-বিভঙ্গে। মনুষ্যদেহ ময়ূরনৃত্য, ধূর্ত শেয়ালির চলন ইত্যাদি সৃজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। গম্ভীর সিং নতুনতর ছৌ-সৃজনে তৃপ্তি পান। সেইভাবেই গপ্পো, কবিতা, উপন্যাস।

এর মধ্যে ছোটগল্পের বিভাগটি অধিকতর সমৃদ্ধ। বাঙালির জীবনবৈচিত্র্যের ছাপ ছোটগল্পে। বিশ্বসাহিত্যের দরবারে তার সুনির্দিষ্ট স্থান রয়েছে। বাংলা গল্পের ট্র্যাডিশন মেনেই এই ভূ-খণ্ডেও গল্প-উপন্যাস অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে নির্মিত হচ্ছে। পুরুলিয়া তথা মানভূম যেহেতু সাজের সাম্রাজ্য, নাচের নন্দনভূমি, জীবন এখানে সততই জতুগৃহ থেকে নিষ্ক্রমণের পথ খুঁজছে, তাই গল্প-উপন্যাসে সংকটের ছবি এখানে অতীব তীব্রতর। তবে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের রচনাকে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা কঠিন। কারণ সৃজনের সীমা ও ভূগোলের সীমা কখনও এক নয়। যে মানুষজন প্রত্যহ সকালের লোকালে বর্ধমান, ভজুডি, আসানসোল, ঝরিয়া ইত্যাদি জায়গায় জন খাটতে যায়, তারাও নিত্যদিন বহু গল্প বয়ে আনে। ঘনায়মান সংকটের ভেতর যে খনিশ্রমিক পুরুলিয়ার প্রান্তদেশে ভূ-গর্ভের অন্ধকারে কয়লা কাটে, তার গল্পও বড় মর্মস্পর্শী। সীমার মাঝে জীবনের এই অসীম সুরের ভেতর রুখা-শুখা মানুষ ঝংকৃত হয়ে ওঠেন। একদল সৎ লেখক সেই জীবনেরই অনুসন্ধানে নিয়ত নিমগ্ন। গল্পসৃজনের কালে তারা লেখকের সামনে এসে ভিড় জমায়। আমাদের এই প্রিয় জন্মভূমি, একাধারে বধ্যভূমিও। লেখক সৈকত রক্ষিতের একটি গল্পগ্রন্থের নাম 'জন্মভূমি বধ্যভূমি'। শ্রমে ও সৃজনে সেই মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণেরই প্রকাশ।

অমলেন্দু কিংবা অজিত রায়—জন্মসূত্রে কিংবা কর্মসূত্রে এ অঞ্চলের না হলেও, আকাঁড়া চালের মতো যে ভাষায় তাঁরা গদ্য রচনা করেন তা ভীষণভাবে এই জীবনেরই কাব্য। তাঁদের 'শহর' পত্রিকা 'শৈলী' পত্রিকা গল্পে, গদ্যে অনুপম।

এই ভূখণ্ডে জীবনের গল্প চলার প্রতি পদক্ষেপ। গল্পের জীবন এখানে অনন্ত সম্ভাবনায় থরোথরো। তবু কি এমন কোনো উপহার আমরা লাভ করতে পেরেছি, যা আঞ্চলিক ঘ্রাণ নিয়েও বিশ্বমানবের। আমরা কি একজন তারাশঙ্কর কিংবা সৈয়দ মোস্তাফা সিরাজ পেয়েছি? তেমন উপন্যাস? কালিন্দী কিংবা তৃণভূমি? পদ্মানদীর মাঝি কিংবা ঢোঁড়াই চরিতমানস? নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে? তিস্তাপারের বৃত্তান্ত? সত্যি বলতে কি এর কোনো সদুত্তর নেই। উত্তর দেবে ভাবীকাল।

একজন লেখকের কথা খুব মনে পড়ে যায়। তিনি প্রকাশিত লেখক নন। প্রায় কুড়িখানা উপন্যাস তিনি লিখেছেন। লেখাগুলির প্রথম ও শেষ পাঠক তিনি নিজে। দ্বিতীয় একজন পাঠক

অনুসন্ধান করছিলেন। অবশেষে ছন্দাদেবী ও আমি। খানচারেক উপন্যাস হাতে এসেছিল। উপন্যাসের চরিত্রগুলি নিয়ে দু'চার কথা বলতেই তাঁর মুখমণ্ডল আলোয় উদ্ভাসিত। বললেন, আমি সার্থক ও তৃপ্ত। পাঠকসংখ্যা দুই ছাড়িয়ে তিনে পৌঁছে গেল। আত্মপ্রচারবিমুখ মানুষটির প্রকাশের বাসনা যে ছিল না তা নয়, যৌবনের দীর্ঘসময় তিনি ব্যয় করেছেন উপন্যাস রচনায়। কিন্তু প্রকাশক পাওয়া যায়নি। সেই ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ও সহমর্মী অনাদিপ্রসাদ মাজী আজ আর বেঁচে নেই। তার রচনাগুলি হয়তো কোনো গোপন অলিন্দে রয়ে গেছে। বস্তুতপক্ষে এ গান তো একা গাইবার নয়। লেখক, সম্পাদক, প্রকাশকের মেলবন্ধন না ঘটলে লেখক কোথায় দাঁড়াবেন? যন্ত্রজগতের অভাবনীয় উন্নতির ফলে এই ভুবনীকরণের যুগে লেখক আর এক নবতর সংকটের মুখোমুখি। —তা হল বাণিজ্য। ছোটগল্পে তো বাণিজ্য হয় না। মানভূমের লেখকের বই ঠেলে-ঠুলে বেচতে হলে সেই পুরুলিয়া বইমেলা। কিন্তু পেটের ভিতর সেই গুড নামক অদ্ভুত বস্তুর ভুড়ভুড়ানি তাতে বিন্দুমাত্র কমে না। বই প্রকাশ পায়, বিলি-বণ্টন হয়। লেখক ও সম্পাদকের যোগসূত্র স্থাপিত হয়। প্রকাশের অভিলাষে লেখক কখনও-সখনও সম্পাদক।

এখানে শুধু গল্পের জন্য গল্পের কাগজ, তাও প্রকাশ পেয়েছে। 'চৌমাথায় সরীসৃপ জাতীয়।' 'ডহর' ও 'ছত্রাক' দীর্ঘদিন যাবৎ ছোটগল্প ও গদ্যপ্রকাশের ব্যাপারে আগ্রহী ছিল। 'আমরা সত্তরের যীশু' গদ্যপ্রকাশে ভূমিকা নিয়েছে। চেলিয়ামা 'অনূজ' পত্রিকা দুখানা গল্পসংখ্যা প্রকাশ করেছে। অহনা, রক্তলিপি, শিখরভূমি, আলোড়ন, ছাতিমতলা, জিরাফ, জনবিকাশ, অরণি, লুব্ধক, বিষণ্ণ-সময়, শঙ্খচিলের ভাষা, রাঢ়ভূমি, শাল-পলাশ, মৈত্রেয়ী মাঝে-মধ্যে গল্প-উপন্যাস প্রকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

অন্যদিকে গল্প-পল্লবিত হওয়ার গল্প নানাপ্রকার। বাংলা সাহিত্যে মহাগদ্যও কবিতার হাত ধরে দিব্যি এগোয়। রীতিমতো আলোড়নসৃষ্টিকারী উপন্যাসের নাম 'দিবারাত্রির কাব্য।' জল-জঙ্গলের কাব্য। 'কপালকুণ্ডলা'-কে বহু পণ্ডিত কাব্যের সমতুল মনে করে। কবিতাও এ ভূখণ্ডে অসংকোচে গল্পের হাত ধরে। কবি মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মাড়-ভাতের লড়াই'-এর ভেতর আশ্চর্য জীবনযুদ্ধের গল্প বিদ্যমান। কবি নির্মল হালদারের 'মৃত্যুঞ্জয়, লালকমল-নীলকমল, নিঃসঙ্গ স্বপ্নেরা' কবিতা হয়েও না বলা গল্পের এক আশ্চর্য দলিল।

কবি মুকুল চট্টোপাধ্যায়ের 'একুশ বসন্তের শেষে' পড়ে চমকে উঠতে হয়। মুকুল চট্টোপাধায়ের গদ্যভাষা স্বতন্ত্র। সম্পাদনা, গদ্যরচনা ও রস-রসিকতায় মুকুল চাটুজ্যের জুড়ি নেই। 'জাগরণ' গদ্যের একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। গোপাল কুম্ভকারের ছড়ার ভেতর বহু অনুগল্প লুকিয়ে থাকে। কবি কানাইলাল খানের অনুগল্পগুলি মুক্তোসদৃশ।

একটু পিছিয়ে গেলে দেখা যায় মূলত 'ছত্রাক' ও 'ডহর'কে ঘিরে ষাটের দশকে দু'টি লেখকগোষ্ঠী তৈরি হয়। এঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন শক্তিমান গল্পকার ও গদ্যকার রয়েছেন। যেমন—সুবোধ বসুরায়, তারকেশ চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ গঙ্গোপাধ্যায়, সিরাজুল হক, বগড়ীলাল দে, যুধিষ্ঠির মাজী, অনাথ মোহান্ত, বিজয়কুমার পাণ্ডা, জীব গোপলন, রণজিত মুখোপাধ্যায়, অরূপ সিংহ, কমল চট্টোপাধ্যায়, জগদীশ সরখেল, বিশাখা মাজী প্রমুখ। এঁদের মধ্যে সিরাজুল হক একজন মরমী ও মগ্ন লেখক। তাঁর কলমে অনায়াস শব্দজাদু তৈরি হয়। কখনো-সখনো তাঁর শব্দচয়ন শব্দভেদি বানের মতো, কখনও চাবুকের মতো। 'নামালিয়া' উপন্যাসের একটিমাত্র শব্দ 'ফটক ডুম' দিয়েই কেল্লাফতে করে দিতে পারেন। সব হারানো মানুষজনের চাপা ফিসফাস গপ্পো। তিনি কান পাতেন। তারপরই পুরুলিয়া স্টেশন থেকে আদ্রা। ভূতগ্রস্তের মতো লিখে

ফেলেন জলডুবির মাঠ ও তিতিরের গপ্পো। তাঁর অবশ্য সংগ্রহযোগ্য গল্পগ্রন্থটির নাম 'জলডুবির মাঠ'। তার গল্পে কখনও খণ্ড-বিচ্ছিন্ন ছিন্নমস্তা দেশ, কখনও ডিভিসির আগ্রাসন, ভুখা শ্রমিক, কাদাপায়ে বাগাল ছেলে স্বচ্ছন্দে স্থান পেয়ে যায়। গল্পের দুনিয়ায় তিনি মানভূমের মেলাদৃশ্য, মুরগি-লড়াই ইত্যাদি স্বচ্ছন্দে নিয়ে আসেন। গল্পের অর্থে গল্প নয়, সৃষ্ট বহুচরিত্রই ঘাড়ের কাছে নিশ্বাস ফেলে।

সৈকত রক্ষিত একজন আদ্যন্ত লেখক। দারুণ সৃষ্টিশীল। লেখাকে উপজীব্য করেই জীবন-যাপন। একজন পুরোদস্তুর ভাষাশ্রমিক। লেখক হবেন বলেই কলকাতায় পাড়ি জমানো। তাঁর মনোভূমি পুরুলিয়া, সৃজনভূমি ও প্রকাশভূমি কলকাতা। তিনি যেন চরিত্র খোঁজেন না, খোঁজেন বিসর্পিল জীবনযাত্রা। তার কলমে হাড়িক, আরাম চেয়ার, মাড়াইকন, জন্মভূমি-বধ্যভূমি, সিরকাবাদ, আনন্দচরিত, ধূলাউড়ানী'র মতো অনবদ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে। আজ থেকে পঞ্চাশবছর পর সাহিত্যের ইতিহাস ছাড়াও যদি কোনো গবেষক অর্থনীতি, সমাজ, ইতিহাস ইত্যাদি নিয়ে ভাবেন তাঁকে অতি অবশ্য সৈকত রক্ষিতের গ্রন্থসম্ভার সংগ্রহে রাখতে হবে। বলা বাহুল্য, পণ্যের দুনিয়ায় বাস করেও লেখাকে পণ্য করে তোলার কোনোরূপ প্রয়াস তাঁর নেই। জনপ্রিয় কথাকারের চটুল শিরোপা বহন না করে এই প্রকৃত ভাষাশিল্পী তাঁর মৌলিক খনন অব্যাহত রেখেছেন।

অধ্যাপক দিলীপ গঙ্গোপাধ্যায় 'অযান্ত্রিক' পত্রিকার মধ্য দিয়ে গল্প-নির্মাণের নতুন ধারা বিকাশের কাজে প্রয়াসী হন। অনাথ মোহান্ত 'মণি মাসিমা', 'মহুয়া-মাতাল' ইত্যাদি বহু অবিস্মরণীয় গল্পের স্রষ্টা।

যুধিষ্ঠিব মাজী মূলত লোকজীবনের ভাষ্যকার। পাশাপাশি গল্প ও উপন্যাস রচনাও চলেছে। কখনও গ্রাম-জীবন, কখনও বা রেল-কলোনির জীবন। 'কোলফিল্ড টাইমস'সহ বহু বাণিজ্যিক কাগজে তিনি উপন্যাস লিখেছেন।

অমলেন্দু চক্রবর্তীর 'অফ্‌স্টেজ-অহল্যা' এবং 'অশ্বত্থামা' উত্তর-আধুনিক উপন্যাস। ভাষা ও বিষয় দুদিক থেকেই অভিনব। এদিকে সময় এগিয়ে যায়, ঐতিহ্যের পথ বেয়ে এগিয়ে এলেন আরও একঝাঁক তরুণ। সত্তর ও আশির দশকে পুরুলিয়ার অনেকেই গল্প ও উপন্যাস রচনার কাজে নিয়োজিত হলেন। বন্ধুবর শংকর সূত্রধরের 'কাচের-দেওয়াল' উপন্যাসটির কথা ভোলা যায় না। চিরদ, চন্দ্রশেখর সরকার, সঞ্জয় চক্রবর্তী, ছন্দা মৈত্র, জ্যোৎস্না কর্মকার, অমিয়কুমার সেনগুপ্ত, দিলীপ বন্দোপাধ্যায়, শ্রমিক সেন, স্বপন দাস, মদনমোহন গোপ, সুভাষ রায়, তপন ঘোষ, নির্মল পট্টনায়েক, শ্যামল গোস্বামী, শরৎ বাউরী সকলেই অল্পবিস্তর স্বাক্ষর রেখেছেন।

শ্রমিক সেন তার প্রাত্যহিক জীবনকেই গল্পের মহিমাদানে সক্ষম। নিজস্ব দিনলিপি ও তাঁর জীবন-যাপনের আশপাশ থেকেই আশ্চর্য সব গল্প তুলে আনতে সক্ষম। আট শ্রমিকের গল্প কিংবা ছিদামের ভাষা তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি। রেল-কলোনির ভিখিরিও তার গল্পে রাজাসনে উপবিষ্ট।

এই সময়ের আর এক শক্তিমান গল্পকার সঞ্জয় চক্রবর্তী। 'গল্পগুচ্ছ' পত্রিকায় তাঁর একাধিক গল্প প্রশংসিত। অন্ত্যজ মানুষের জীবন তাঁর গল্পে ঝলমল করে ওঠে। চিরদ-এর মেলো-ড্রামাটিক গল্পগুলি একসময় রসিক মহলে আলোড়ন তুলেছিল। স্বপন দাসের 'ভূপালের গ্যাস-দুর্ঘটনা' এক নয়া-সৃষ্টি, নয়া-মোড়। ছটফটে তরুণী নয়নতারা তন্তুবায় 'কিছুক্ষণ ট্রেনে', কিংবা 'হিতে-বিপরীত', লিখে আমাদের চমকে দিয়েছেন। এই ধারাটি যেহেতু নিয়ত প্রবহমান, তাই যে-কোনো ইতিবৃত্তই অসম্পূর্ণ থাকতে বাধ্য। প্রত্যাশা রাখি, ভবিষ্যতে প্রকৃতই কোনো শক্তিধর মানুষ আরও নিবিড়ভাবে পুরুলিয়া জেলার গল্প লেখার গল্প রচনা করবেন।

পুরুলিয়ার কবিদের কবিতাচর্চা প্রসঙ্গে

মোহিনী মোহন গঙ্গোপাধ্যায়

❑ কবিতা ও গানের দেশ পুরুলিয়া

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত পুরুলিয়াকে 'পাষাণময় দেশ' বলে তাঁর কবিতায় উল্লেখ করেছেন। সত্যিই উষর ধূসর রুক্ষ কাঁকুরে মাটিতে ভরা পুরুলিয়া যেখানে প্রতি পাঁচ বছরে তিন বছর খরা এসে হানা দেয়। এখানের অহল্যাভূমিতে রুক্ষতা ছাড়া আর কীই বা আছে! তবু মানুষ জ্বরা ক্ষরা দুর্ভিক্ষকে পরোয়া না করে বেঁচে আছে। শুধু বেঁচে আছে বললে ভুল হবে দাঁতে দাঁতে চেপে যন্ত্রণাকে হজম করে নিজস্ব সংস্কৃতিকে রক্ষা করে চলেছে। বারো মাসের তেরো পার্বণে পুরুলিয়ার এই অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম এক নজিরবিহীন ইতিহাস।

কবিতা ও গানের দেশ পুরুলিয়া যেখানে টুসু-ভাদু, করম, অহিরা, ঝুমুর প্রভৃতি লোকসংগীতে মুখরিত হয়ে ওঠে আকাশ বাতাস প্রান্তর এবং অরণ্যভূমি। নাটুয়া ছৌনৃত্যের তালে তালে বেজে ওঠে ধামসা-মাদলও আড়-বাঁশির সুর। পুরুলিয়ার শ্রমজীবী মানুষ ও কবি-শিল্পীগণ সবকিছু হারাতে রাজি কিন্তু তাঁদের সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিতে চায় না। তাঁদের সাহিত্য- সংস্কৃতির সংগ্রাম এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব ও যোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে।

পুরুলিয়ার বুকে অভ্রস্পর্শী মহিমায় মাথা তুলে আছে অযোধ্যা বাঘমুণ্ডি পঞ্চকোট জয়চণ্ডী পাহাড়। বেড়ো বাঁধা মৌতড় বুধপুর পাকবিড়বা দেউলঘাটার প্রাচীন ঐতিহামণ্ডিত ভাস্কর্য যেমন সবাইকে মুগ্ধ বিস্মিত করে তেমনি দামোদর দ্বারেকশ্বর কুমারী কংসাবতী নদীর বর্ষার উত্তাল জলতরঙ্গ মনে ও যৌবনে আছড়ে পড়ে।

পাহাড় নদী অরণ্য প্রান্তর, বসন্তের ফুটে ওঠা অশোক, পলাশ, কৃষ্ণচূড়া—শাল, মহুলের সাড়ম্বর প্রদর্শনী—পাহাড় ফেটে বেরিয়ে আসা ঝর্নার কলতান এবং শোভন সুন্দর নিসর্গ প্রকৃতি কবিতা গানের সৃজনশীল প্রতিভাকে উসকে দেয়। মাটি ও মানুষের কাছাকাছি থেকে কবিরা মনের আনন্দে মনের মতো করে লিখে যান কবিতা গান আর সংগীত। পশ্চিমবাংলার সাহিত্যের মানচিত্রে তারা আজ আর কেউ উপেক্ষিত অনাদৃত নয়। অফুরন্ত সাংস্কৃতিক সম্পদের উপর দাঁড়িয়ে পুরুলিয়া আপন ঐশ্বর্যে উজ্জ্বল।

একদিন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নজরুল ইসলাম সুকান্ত জীবনানন্দ দাস প্রভৃতি কবি-দিকপালেরা কালজয়ী কবিতা সৃষ্টি করে চিরস্মরণীয় হয়ে গেছেন। এখন আর কাব্য-সাহিত্যের আন্দোলন কোন ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সম্ভব নয়। কবি-সাহিত্যিকদের সমষ্টিগত আন্দোলনের উপর নির্ভর করছে বাংলা কাব্য-সাহিত্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

কবিতাকে নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জন মন্তব্য করেছেন। রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে জীবনানন্দ দাস বিষ্ণু দে পর্যন্ত অনেকেই অনেক কথা বলে গেছেন। তেমনি কবিতার ডেফিনিশন সম্পর্কে টি. এস. এলিয়েট, এজরা পাউন্ড, ডি. এইচ. লরেন্স ও ডি. লুইস প্রভৃতি কবিগণও তাঁদের মন্তব্য উল্লেখ করেছেন। ডি. লুইস বলেছেন, "Modern Poem whether written last year or five centuries ago that has nothing for us still." অভিজ্ঞতা ও জীবনবোধের ভেতর দিয়ে সার্থক কবিতার জন্ম। জীবনের পরম সত্যকে খুঁজে চলেছেন কবি। কবিতায় তাঁর ঋদ্ধি, সিদ্ধি এবং মুক্তি। টি. এস. এলিয়েট বলেছেন, "The poet must become more and more comprehensive, more allusive more indirect, in order to force to disolate if necessary languages into his meaning."

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কবিতার চেহারাটাই পালটে গেছে। বিষয়বস্তুতে এসেছে নতুনত্ব। ভাবে ভাবনায় প্রতীক চিত্রকল্পে কবিতা হয়ে উঠেছে বাস্তবমুখী ও ইঙ্গিতবাহী। ভাষার যেমন পরিবর্তন ঘটেছে তেমনি আঙ্গিকের দিক দিয়েও কবিতা হয়ে উঠেছে অনবদ্য। কোনো কোনো কবিতা শুধু কবিতার জন্যই কবিতা নয়—তার মূল স্লোগান হিসেবে ধ্বনিত হচ্ছে—Art for humanities sake–অর্থাৎ মানুষের জন্য শিল্প, মানুষের জন্য কবিতা কিন্তু কবিতা আজও সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছোতে পারেনি। স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় চলে গেল তবু আমাদের দেশের অনেক মানুষ নিরক্ষর, বর্ণপরিচয়হীন। কবিতা পড়ার ক্ষেত্রে এ সমস্যা তো আছেই যদিও জানি কোনকালেই কবিতার পাঠক বেশিরভাগ মানুষ ছিল না—সবাই কবিতা পড়তোও না। কবিতার পাঠক ছিল সীমাবদ্ধ। অন্য দিকে আবার সাম্প্রতিককালে প্রশ্ন উঠছে "আধুনিক কবিতা দুর্বোধ্য জটিল—কোনো কবিতাই মনে দাগ কাটে না।" আমরা দ্বন্দ্বহীন এক জটিল সময়ে ভয়ংকর বাঁক পার হতে চলেছি। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নানান সমস্যা যুদ্ধবিগ্রহ দাঙ্গা সন্ত্রাস অর্থনৈতিক সঙ্কট এবং সামাজিক বৈষম্য দারুণভাবে দেখা দিয়েছে। যে সমাজে এইসব উপসর্গগুলি বিদ্যমান সেই সমাজব্যবস্থায় কবিকেও অবস্থান করতে হচ্ছে—তাই কবির ভাষার যেমন জটিলতা দেখা দিচ্ছে তেমনি কবিতাও দুর্বোধ্য ও জটিল হয়ে উঠছে। কবিতা তো আকাশ থেকে দুম করে পড়ে না। সমাজে অবস্থানকারী কবির মনের ফসল কবিতা। কবিতা তো কবির অনুভূতির জ্বলন্ত প্রকাশ।

পুরুলিয়ারও সাম্প্রতিক কবিতায় কবির চিন্তাভাবনার যে প্রতিফলন ঘটছে তা সবসময় সহজবোধ্য হয়ে উঠছে না, হওয়াও সম্ভব নয়। যুগের প্রয়োজনে সমকালীন কবিতার সঙ্গে এখানের কবিতাকেও পাল্লা দিয়ে চলতে হচ্ছে। তাই পুরুলিয়ার কবিতাকে ভয়ংকর সময়ের পটভূমিকায় ভিন্নভাবে দেখার কোনো কারণ নেই। যদিও পুরুলিয়াব জল মাটি প্রকৃতিও সামাজিক অবস্থার সঙ্গে কবির সংযোগ চিরন্তন, তবু তাঁকে সার্বজনীন কবিতা রচনার ক্ষেত্রে শ্রম মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে কাজে লাগিয়ে সৃজনশীলতার পরিচয় দিতে হচ্ছে।

কেউ কেউ পোস্টমডার্ন কবিতার দিকেও ঝুঁকে পড়েছেন। পোস্টমডার্নিজম কবিতা সম্পর্কে মলয় রায়চৌধুরির বক্তব্য—"পোস্টমডার্নিজম একটি পাঠকৃতির সাহিত্যিকতা সম্পর্কে আগ্রহী। যাকিছু গুরুত্ব তা ডিসকোর্সের। কবিই কবিতা-বিশেষের একমাত্র—মানে উদ্‌গাতা নন।"

❑ রেল-শহর আদরায় কবিতা ও কবিতা আন্দোলনের ঢেউ :

শহর পুরুলিয়া যখন কুম্ভকর্ণের মতো গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন তখন রেল-শহর আদরার বুকে

কাব্য সাহিত্যের আন্দোলনের ঢেউ শত তরঙ্গে আছড়ে পড়েছিল। দিনের পর দিন গোষ্ঠীবদ্ধভাবে লেখা হচ্ছিল কবিতার পর কবিতা আধুনিক মননশীল গভীর জীবনবোধের কবিতা। শুধু কবিতা লেখাই সেখানকার শেষ কথা নয় ধারাবাহিকভাবে শুরু হয়েছিল কবিতা-পাঠের আসর, কবি সম্মেলন, পত্রিকা প্রকাশ এবং কবি-লেখকদের জমজমাট আড্ডা। আদ্রার কবিতা আন্দোলনে বাঙালি সমিতির অবদানকে অস্বীকার করা যাবে না। এই বাঙালি সমিতির উদ্যোগেই প্রকাশিত হয়েছিল সঙঘ, উষষী পত্রিকা। যে পত্রিকাগুলি আদরার শুধু কবিতাচর্চাকেই না সাহিত্য আন্দোলনকেও সজীব ও প্রাণবন্ত করে তুলেছিল। বাংলার ১৩৮৩ সালে আমার সম্পাদিত 'কেতকী' কবিতা পত্রিকার শারদ সংখ্যায় প্রাবন্ধিক বিমলাকান্তি ভট্টাচার্য লিখেছেন, পুরুলিয়া জেলার মধ্যে শুধু অতীতে নয় বর্তমানেও আদরা একটি গ্রহণীয় উল্লেখযোগ্য নাম। যেখানে সাহিত্য-আড্ডার মুখরতাকে খুঁজে পাওয়া অসাধ্য নয়। কবি কামাখ্যা সরকারের খোলা বারান্দায় ও কবি জগন্নাথ মুখোপাধ্যায়ের ছাতনার মিষ্টির দোকানে কবি-লেখকদের প্রায় প্রতিদিন আড্ডা জমে ওঠে।" তিনি ঐ নিবন্ধে সেই আড্ডায় অংশগ্রহণকারী কবি-লেখকদের মধ্যে কানন দত্ত, নৃপেশ চক্রবর্তী, নির্মল দে, বাসু মজুমদার, কমল চট্টোপাধ্যায়, কালিপদ কোঙার, দিলীপ গঙ্গে াপাধ্যায় প্রমুখের নামও উল্লেখ করেছেন।

জগন্নাথ মুখোপাধ্যায় আধুনিক কবিতা লেখায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি আদরায় অনেক তরুণকে কবিতা লেখায় উৎসাহিতও করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আজ সাহিত্যজগতে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর "নিশিকুটম্ব" কবিতার কিছু কিছু পংক্তি আমাদের মনে পড়ে যায়—"নাকি মধ্যরাতে ঝড় উঠলো/সমস্ত সাজানো বাসনাগুলোকে/তসবিরে তছনছ করে/আমার গায়ের গন্ধ শিউলিকে দিয়ে যাবে/ভয়ে ভয়ে জেগে উঠলাম/টুপটাপ শিউলির বুকে তখন/নিঃশব্দ শিশির তৃষা।" আরও এক অগ্রজ কবি যাঁর কবিতা অগণিত কবিতা-পাঠককে মোহিত করেছিল সেই কামাখ্যা সরকার আজ নেই কিন্তু তাঁর কবিতা এখনও মুখে মুখে ফিরে। তাঁর কবিতা প্রভাবশালী পত্রিকাগুলিতে নিয়মিত প্রকাশিত হত। কয়েকখানা কাব্যগ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর কবিতার ভাষা আলাদা, বক্তব্য আলাদা—"আশি বছরের বুড়ো নকুল মেট্যার/বার্ধক্য ভাতা পাওয়া চোখে/দূরের আকাশ জীবনের শেষ বেলায়/যেন নাতির পড়া বইয়ে দেখা/সেই রবি ঠাকুরের ছবির মতো/বুকের কাছটিতে ঘন হয়ে জড়ো করে ফোটে।"

বিমলকান্তি ভট্টাচার্য বহু গল্প কবিতা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এক সময় পত্রিকার পাতা খুললেই—তাঁর কবিতা না হয় অন্য কোনো লেখা আমাদের নজরে পড়ত। কিন্তু ইদানিং তিনি আর কোনকিছু লিখছেন না। তাঁর অনেকগুলি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে—বহু অপ্রকাশিত কবিতাও আছে—কিন্তু কেন তিনি সাহিত্যজগত থেকে সরে গেলেন বুঝতে পারছি না। অথচ তিনি যে কবিতা লিখেছিলেন তা আজও আমাদের কাছে দ্যুতিময় দীপশিখার মতো। তিনি লিখেছিলেন—"কিছুদূর গিয়ে যারা আসবে/যারা আসে/সবারই হৃদয়ের কিছু কিছু তারতম্য থাকে ঠিকানা হারিয়ে গেলে অবশেষে/ভারতবর্ষ নিশ্চয়ই ঘুমুবে।"

আদরা থেকেই কবি দিলীপ গঙ্গোপাধ্যায় "কৃষ্ণচূড়া" পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন—পরে "অযান্ত্রিক" পত্রিকাও তিনি সম্পাদনা করেন। শুধু কবিতা লেখা না অন্য ভাষার বহু কবিতাও তিনি বাংলায় অনুবাদ করে মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছিলেন।

ষাটের শেষ দিকে সত্তর দশকের গোড়ার দিকে প্রবীণদের কাছে থেকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত

হয়ে মঞ্জু ভাদুড়ি, তাপস পাঁজা, মানস কুণ্ডু, দিব্যেন্দু রায়, আলোক ভাদুড়ি প্রমুখ কবিতা লিখতে শুরু করেন ও পরিচিত হয়ে ওঠেন। নীলাশা, জোনাকী অর্বুদ প্রভৃতি পত্রিকাগুলিও রীতিমতো পাঠকমনে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

যে আদরা কবিতায় গানে একসময় সরগরম হয়ে উঠেছিল যে আদরার বুকে কবি-সাহিত্যিকেরা এসে সাহিত্যের অনুষ্ঠানকে ঐতিহ্যমণ্ডিত করে তুলেছিলেন সেই আদরা আজ নিষ্প্রভ। সেই আড্ডা নেই—সাহিত্য ও কবিতা পাঠের আসরও যেন ছুটি নিয়েছে। যদিও চঞ্চল দুবে, স্বরাজ মিত্র, নির্মল আচার্য, শীলা মুখোপাধ্যায় কিছু নতুন ও সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল মুখ কবিতার জগতে দেখতে পাচ্ছি তবু অতীতের মতো সেই গরিমা কোথায়? এখন শিব-রাত্রির প্রদীপের পলতেটুকুর মতো আলো জ্বেলে রেখেছেন সিরাজুল হক, সুভাষ নাগ, শীলা সরকার ও শিশু সাহিত্যিক তথা কবি অমল ত্রিবেদী।

আদরায় নজরুল মেলা হয়—প্রতি বছর আদরা উৎসব সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এই মেলা ও উৎসবকে কেন্দ্র করে জেলার কবিদের নিযে বড়ো মাপের কবি সম্মেলনও হয় কিন্তু সেই কবি সম্মেলনের "সকলেই কবি নয়—কেউ কেউ কবি।" একদিন আদরার কবিদের কবিতা সারা জেলাকে পথ দেখিয়েছে—আধুনিক কবিতা লেখার প্রেরণা জুগিয়েছে আর আজকে সেই আদরার কবি সম্মেলনে কবিদের কাছ থেকে কবিতার মতো কবিতার বড্ডো আকাল। কোথায় যেন হারিয়ে গেছে—সেই সবুজ সোনালি দিনের শুক্ল অহংকার।

দিব্যেন্দু রায়, অলোক ভাদুড়ি, সজল মুখোপাধ্যায় এক সময় পত্র-পত্রিকায় প্রচুর কবিতা লিখেছেন। সম্প্রতি ওদের কারও লেখা আর নজরে পড়ছে না। পরিণত বয়সে সিরাজুল হক মাঝে-মধ্যে জেলার কিছু ছোট পত্রিকায় বিভিন্ন স্বাদের কবিতা লিখলেও সে কবিতা তেমন কোনো সাড়া জাগাতে পারেনি। জেলার পত্র-পত্রিকা ছাড়া বাইরের কোনো পত্রিকায় তাঁর লেখা আমাদের নজরে পড়েনি। তাঁর গল্পের সংকলন প্রকাশিত হলেও কোনো কবিতা সংকলন প্রকাশিত হয়নি।

যাই হোক কবিদের সমবেত পদধ্বনিও ঐক্যবদ্ধভাবে কবিতার জন্য আন্দোলন আমাদের মনে আশার সঞ্চার করেছে যা আমাদের প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তা কম গৌরবের নয়।

❑ পুরুলিয়া শহরে কবি ও কবিতার কুচকাওয়াজ

ষাট দশকের শেষ দিকে পুরুলিয়া শহরে আধুনিক কবিতার জোয়ার কাব্য-সাহিত্যের পরিমণ্ডলকে উচ্ছ্বসিত করে দেয়। অধ্যাপক সুবোধ বসুরায়, অপূর্ব সান্যাল, শান্তি সিংহ, অমল প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বীনা বন্দ্যোপাধ্যায়, বেনুদেবী হাজরা, মহাবীর নন্দী প্রমুখ কবিরা তো অনেক আগের থেকেই লেখালেখি শুরু করেছিলেন। তাঁদের প্রভাবমুক্ত হয়ে দুর্দান্ত তেজী বেশকিছু তরুণ কবিতা লিখতে শুরু করলেন। "আমরা সত্তরের যীশু" পত্রিকায় দেখা গেল সেইসব তরুণদের নতুন আঙ্গিকের মর্মস্পর্শী ও হৃদয়গ্রাহী কবিতার পর কবিতা। পশ্চিমবাংলার অন্যান্য জেলাগুলির মতো এখানেও কবিতা নিয়ে কঠিন কঠোর পরীক্ষা-নিরীক্ষার শুরু হল। নির্মল হালদার, সৈকত রক্ষিত, মুকুল চট্টোপাধ্যায়, কল্লোল মজুমদার, অশোক দত্ত এদের কলম দিয়ে বেরিয়ে আসতে লাগল নতুন নতুন কবিতা। অন্যদিকে জ্যোৎস্না কর্মকার, তাঁর ভিন্ন ধরনের কবিতার জন্য স্বল্প দিনের মধ্যেই সবার পরিচিত হয়ে উঠলেন।

এই সময় সীমার মধ্যে আরও অনেক কবির উদার অভ্যুদয় হলেও তাঁদের অনেকেই শেষ পর্যন্ত কবিতা লেখা থেকে সরে গেছেন নয়তো কবিতাকে ছুটি দিয়ে কর্মব্যস্ততায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছেন।

কবি মুকুল চট্টোপাধ্যায় লিখলেন তাঁর মনের মতো করে কবিতা "ভেতরে ভেতরে ঘেমে উঠতেন বাবা/আর ভাবতেন কখন ঘণ্টা পড়বে / ঘরে ফিরে দেখতেন আমাদের রুগ্ন মাকে/সুড় সুড় করে ঢুকে পড়তেন বাথরুমে/আর মা এ-মাসের কথা ভেবে একদিনও বলতে পারেননি/ আহা কত রোগা হয়ে গেছ। বাবা দেখতেন আরও একটি ক্লাস/সারা মাস ধরে আমরা একটি প্রশ্নপত্র বানিয়ে রাখতাম তার জন্য/আর বাবা ভাবতেন কখন ঘণ্টা পড়বে/কখন সারা ক্লাস ঘুমিয়ে পড়বে লক্ষ্মী ছেলের মতো।" সাম্প্রতিক কালে মুকুল আরও পরিণত—তাঁর কবিতায় আছে নতুন চিন্তা-ভাবনার বিদ্যুন্ময় চিন্তা। তিনি লিখছেন—"যারা আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়/পূর্বাচলের দিকে/তারা আমার কেউ নয়/তারা কালের চারণ/ছন্দময় জীবনবোধ" কিংবা "আমি শূন্য গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে থাকলাম/দেখলাম পাতাকুড়ানিরা সব পাতা নিয়ে গেল/আগুন পোহাতে।" নির্মল হালদার আজকাল কবিতার অনেক গভীরে প্রবেশ করেছেন। সহজ কথায় কী অসামান্য ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করছেন কবিতায় "কাঙালের আলো নেই অন্ধকার নেই কাঙাল একটা পথ" কিংবা "বেলপাতা মানেই তিনটি পাতা। তিনটি পাতাই কি/তিনটি চোখ কার চোখ/ওই চোখের নীচে কি ছায়া পড়ে ছায়াতে কে শুয়ে পড়ে/শুকনো পাতারা/পাতাদের শিরায়-উপশিরায় জেগে জেগে থাকে অরণ্য।"

সৈকত রক্ষিত কবিতা থেকে সরে গেলেন গদ্যের দিকে। সম্প্রতি তিনি গল্প-উপন্যাস লিখছেন। রীতিমতো প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক। লোকসংগীত রচনাতেও হাত দিয়েছেন। তবু মাঝে-মধ্যে যে কবিতা লেখেন তাতে চমকে দেন সবাইকে। তিনি যেমন অনায়াসে লেখেন "অন্ধকার পূর্ণতর হবে যখন জেগে উঠুক শিশুর কান্না।" অশোক দত্ত লেখেন "কাঙ্ক্ষিত মরণের নেই/ ভোর নেই ভোর/সেই ভোর অনাময় যদি জয় স্বপনের।" অথবা "নাই বা পেলাম শতদল দেখেছি শশিকলা মাথার উপরে/অনন্ত সে হাসির মিলন।" জ্যোৎস্না কর্মকারের কবিতা "সফেদ বিধবার ওলটানো হাসির সঙ্গে/খুবলানো ভাতের সাদা/বাসি দেওয়ালে মাছ।"

হারাধন ব্যানার্জি ও হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় দুজনেই চুটিয়ে কবিতা লিখছেন। হারাধন ব্যানার্জির কবিতায় আছে সময় ও কালচেতনার সাক্ষর। হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেম ভালবাসার কবিতায় মনে ছায়া ফেলে যান তাঁর নিজস্ব ভাষায়।

দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক ঘোষ প্রমুখ কবিদের কবিতা নতুনভাবে মোড় নিচ্ছে। বেশকিছু কবির কবিতার পংক্তি নীচে উল্লেখ করা গেল—

১। যার জমি তার হেমন্ত আপন/আমার বাপের কি (হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়)

২। শ্মশানের পোড়া কাঠ জোগাড় করি খিদের চিন্তায় (অশোক ঘোষ)

৩। ইচ্ছে করলেই এখন ছুঁতে পারিনা পাতা বটের সবুজ (জগন্নাথ দত্ত)

৪। মনে ভাবি কী দোষে জনম যায় বাঁচা দেখি চুয়াড় চণ্ডালী। (অসিত সিংহ)

৫। ফেরার দিন যথারীতি সবকিছু জটিল হয়ে ওঠে। (দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়)

সত্যেন্দু গুপ্ত রাজনীতি সচেতন কবি। তাঁর কবিতায় মানুষের সংগ্রামের ভাষা যেমন কিছু পাই তেমনি শ্লেষ-বিদ্রূপও ঝলকে ওঠে "এক পাত্র পেটে পড়লে/সে করুণা মন বোধিসত্ব/শুয়োরের বাচ্চা তুলে কোলে বিলোয় নির্মল প্রেম।" পিনাকী রঞ্জন রক্ষিত লেখেন—"অভিসারী মেঘ দেখে বিরহী যক্ষের মন খোঁজে বিষ্ণুপ্রিয়া।"

শান্তি সিংহ ষাটের দশকের কবি। তিনি এখনও প্রবন্ধ ইত্যাদির সাথে কবিতা লিখে যাচ্ছেন।

কবিতা লিখে যাচ্ছেন শ্রমিক সেন। আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও তার কবিতা-সংকলন প্রকাশিত হয়েছে।

শ্যাম অবিনাশ কবিতা লিখছেন আজও। তিনি একটি কবিতা পত্রিকাও সম্পাদনা করছেন। সে পত্রিকায় বহু কবির কবিতা প্রতি সংখ্যায় লক্ষ করা যাচ্ছে।

গৌতম দত্ত, বংশী কুমার কবিতায় নতুনভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছেন। নতুন ধরনের কবিতা উপহার দেবার জন্য তাঁরা সর্বদা সচেষ্ট।

পুরুলিয়ার বুকে তুর্কি তিরন্দাজ কবিদের লংমার্চ ও কুচকাওয়াজ আমাদের উদ্দীপিত করতে সক্ষম হয়েছে—

❑ **পুরুলিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে কবিতা ছড়া ও আঞ্চলিক**
ভাষার কবিতা লেখার প্রয়াস।

পুরুলিয়া শহরের বাইরে বলরামপুর মানবাজার ঝালদা কাশীপুর থেকে অনেক কবিই কাব্যসাহিত্যের জগতে স্বকীয়তায় একসময় দ্যুতিময় হয়ে উঠলেও আজকে চিত্ত দাস, অমিয় পাল প্রমুখের কবিতা দেখা যাচ্ছে না। গোপাল কুম্ভকার ছোটদের ছড়া ও বড়দের কবিতা নিয়মিত লিখে যাচ্ছেন। তাঁর ছোটদের ছড়াগুলি আর্কষণীয় হলেও কবিতাগুলিতে তেমন কোন নতুনত্ব নেই। চেলিয়ামার সুভাষ রায় কবিতা ভালো লিখলেও এখন গবেষণামূলক প্রবন্ধেব দিকে ঝুঁকে পড়েছেন।

সরবড়িতে কবিতা লেখার জন্য অনেক কবি দল বেঁধে নেমে পড়েছেন। শান্তিপ্রিয় গুরু, শ্যামল গোস্বামী, প্রদীপ বাউরীসহ আরও অনেকেই। তাঁদের কবিতা নিয়ে আলোচনার সময় এখনো আসেনি। কারা শেষ পর্যন্ত কবিতা নিয়ে থাকবেন তা এখুনি বলা কঠিন।

আঞ্চলিক উপভাষায় কবিতা লিখে গৌরীশংকর দাস, জলধর কর্মকার, রমানাথ দাস, সিদ্ধিনাথ চট্টোপাধ্যায়, পার্থ সারথি বেশ সুনাম অর্জন করেছেন।

অধ্যাপক সুবোধ বসুরায়ের ও সুকুমার চৌধুরির আঞ্চলিক ভাষার কবিতাগুলি সাহিত্যের সম্পদ। তাঁদের কবিতার কেউ কেউ যেমন আবৃত্তির ক্যাসেট করেছেন তেমনি মুখে মুখে ফিরছে বহু কবিতা। আঞ্চলিক কবিতার এ জয়যাত্রাকে প্রতিহত করার ক্ষমতা কারও নেই।

আঞ্চলিক ভাষার কবিতা সম্পর্কে অনেকেই বিরূপ মন্তব্য করে থাকেন। কিন্তু মন্তব্য ধোপে টিকে না। আজ আঞ্চলিক ভাষার কবিতা নিয়ে রসবোদ্ধা পণ্ডিত সমালোচকগণ ভাবছেন এবং এর ধারাটিকে অব্যাহত রাখার জন্য কবিদের উদ্দীপ্ত করছেন। অনেক নতুন নতুন অপ্রচলিত শব্দসম্ভারে বাংলাসাহিত্য আজকে সমৃদ্ধ হতে চলেছে।

দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর আঞ্চলিক ভাষার কবিতাগুলিতে মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি শব্দচয়নে, অলংকারে কবিতাগুলিকে প্রাণবন্ত করে তোলার প্রয়াসী। ইতিমধ্যে তাঁর এই সব কবিতার দিকে অনেকের মনসংযোগ ঘটেছে।

আঞ্চলিক ভাষার কবিতার দিগন্তছোঁয়া শোভাযাত্রা দেখে তার প্রতি মানুষের আর্কষণ বাড়ছে বলেই আমার মনে হয়। আঞ্চলিক ভাষার কবিতা লেখা কিন্তু সহজসাধ্য নয়। এর জন্য কবিত্বশক্তির প্রয়োজন।

সদর শহর পুরুলিয়া থেকে আরম্ভ করে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে কবির সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। কবিতাগানের পীঠস্থান বলেই হয়তো এ জেলায় কবিদের উদার অভ্যুত্থান। আমরা চাই আরও কবিতা লেখা হোক। কবিতাকে হৃদয়গ্রাহী করে তোলার জন্য এই বৈদ্যুতিন প্রচার

মাধ্যমের যুগেও কবিতাকে পৌঁছে দেওয়া হোক মানুষের ঘরে ঘরে। কবিতা আমাদের জীবনের আশা আনন্দের সঞ্চার করুক। কবিতা হয়ে উঠুক জীবনের বীজমন্ত্র—অস্তিত্ব রক্ষার হাতিয়ার এবং মুক্তির অশনিসংকেত।

❑ পুরুলিয়ার সাম্প্রতিক কবি ও কবিতা প্রসঙ্গে

রাঢ় সীমান্ত বাংলার পুরুলিয়া তার কবিতার প্রবহমান ধারাটিকে অব্যাহত রেখেছে। দিনের পর দিন লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনের পাতা থেকে উঠে আসছে বহু নতুন মুখ নতুন কবিতা। এইসব প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন শক্তিমান কবিদের কবিতার ভাষা সম্পূর্ণ আলাদা। বিভিন্ন বিষয়বস্তু নিয়ে তাঁরা তাঁদের মনের মতন করে লিখছেন কবিতা। কবিতায় প্রতীক চিত্রকল্প বাক্ প্রতিমা অলংকারও সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। তাঁরা তাঁদের চারপাশ থেকে রসদ সংগ্রহ করছেন তাই কোনো লেখাই কষ্টকল্পিত নয় বরং স্বতঃস্ফূর্ততার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। এইসব কবিদের মধ্যে বিশ্বম্ভর নারায়ণ দেব, অভিমন্যু মাহাত, সোমেন মুখোপাধ্যায়, রঞ্জন আচার্য, আশিস গাঙ্গুলী, প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইতিমধ্যে কবিতার জগতে পরিচিত হয়ে উঠেছেন মুজিবর আনসারি সুজয় দত্ত, বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায়, নয়নতারা তন্তুবায়, স্বরাজ মিত্র, নীলোৎপল গঙ্গোপাধ্যায়, অতনু চক্রবর্তী প্রমুখ কবিগণ।

পুরুলিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে বসে বহু তরুণ কবি মনের তাগিদে প্রচুর কবিতা লিখলেও জেলায় লিটল ম্যাগাজিন ছাড়া বাইরের প্রতিনিধি স্থানীয় কোন সাহিত্যপত্রিকায় তাঁদের লেখা আমাদের নজরে পড়েনি। এখনো তাদের যথেষ্ট অনুশীলন ও কবিতা চর্চা করে যেতে হবে তাহলে হয়তো একদিন সাফল্যের চাবিকাঠিটি তাদের হাতে এসে যেতে হবে। কবির ভাষায় তাদের "এখনও অনেক দুর্গ জেতা আছে বাকি।" সেই দুর্গ জয়ের স্বপ্ন তারা সফল করতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস।

কবিতা সৃষ্টি করতে হয়। তার জন্য যে মেধা ও মনন দরকার তা কবিকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। শব্দে শব্দে গড়ে ওঠে কবিতার স্থাপত্যশিল্প। কবি স্বয়ং স্থপতি এ সত্যকে ভুললে চলবে না।

পুরুলিয়ার সাম্প্রতিক কবিদের কবিতায় জটিল দ্বন্দ্বদীর্ণ সময় উঠে আসছে স্বাভাবিকভাবেই। অনেকের কবিতায় প্রতিবাদের ভাষাও সোচ্চার। অত্যন্ত আনন্দের কথা তাঁরা শিল্পশর্তকে লঙ্ঘন করে কোনো কবিতাকেই শ্লোগানধর্মী করে তুলেননি—বরং কবিতাকে সত্যিকারের কবিতা করে তোলার প্রয়াসী তারা সকলেই। কারও কারও কবিতায় ক্রোধ বিচ্ছুরিত। সেইসব রাগী কবিদের ভাষাও ভিন্ন রকমের যা হৃদয়কে বিদ্ধ করে। রঞ্জন আচার্য সেরকম কবিতায় আক্রমণ করতে চান। যেমন—তার "বিপ্লবী কাকুর উপাখ্যান" কবিতার কিছু পংক্তি—

> অভিশাপ দিলো সময়ের হাততালি
> ঝাণ্ডা হাসলো রাক্ষসদের হাতে
> তেলের খুঁটিতে বাঁদর হলাম খালি
> দেশ ভরে গেলো বানচোতে বানচোতে
> গুছালো আখের আসছে আসছে বলে
> মিথ্যা আশায় মিছিলে ছোটালো পা
> সন্ধ্যে হলেই জিন মিশে যায় জলে

ভালোই আছেন বিপ্লবী কাকুরা।

স্বরাজ মিত্র সহজভাবেই লিখেছেন এক বিচিত্র ইঙ্গিতবাহী কবিতা—"রুধির টগরি তুমি স্পর্শ আঁকো পাতায় পাতায়/শব্দ আঁকো স্পর্ধা আর মধু বৃষ্টি ঝরে যাক ঘাসে/রচিত অন্ধপথ ধোঁয়া হয়ে উড়ুক আকাশে/নতুন জাতক আঁকো অবসন্ন পাতায় পাতায়।"

বিশ্বম্ভর নারায়ণ দেবের কবিতা মনে গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে—"হতাশার চরে বসে/ সূর্যাস্ত দেখে আমারই প্রৌঢ় দেশ/একদিন ব্যক্তি মালিকানার সন্ত্রাস/মুছে দিয়ে যাবে সমূহ বেদনা/নতুন মাত্রায় অন্নপতনের দিন সমাগত/নেপথ্যে ভাষণের নুন্‌চে ফেনায়/উত্তরকাল হাবুডুবু।"

সোমেন মুখোপাধ্যায় তাঁর নিজস্ব স্টাইলে কবিতায় জীবন যাপনের চিত্ররূপ দেন অন্যভাবে। যেমন—"খুচরো হাওয়ার পরে ভেসে যাচ্ছে মেঘ/ মঘের স্বর/বাবার হাতে বাঁশি খাপছাড়া স্বরলিপি / উনুনের আঁচে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো না।" "তোমাকে আবার ঘিরে নিয়েছে অক্ষম শালগাছগুলি—" এ কবিতার পংক্তি অতনু চক্রবর্তীর।

এক একটি মুহূর্তকে আশ্চর্যভাবে কবিতায় ধরে রাখেন বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায়। প্রতিদিনের বিকেলের আলো তাঁর কবিতায় কিরকমভাবে পরিস্ফুট লক্ষ করলেই বোঝা যাবে। তিনি লিখেছেন—"এখন বিকেল নেই/ফুটবলের গায়ে লেগে থাকা রোদ জানালায় উঁকিমারা ক্লেদ/কিংবা স্কুল ফেরৎ বাস থেকে টুপ করে রাস্তায় নেমে পড়া ছায়া/ওরা সবাই দূরের কোনো অফিসে চাকরি করে/আমাদের একটি রবিবার থাকে বিকেল দেখার।"

অভিমুন্য মাহাত বাঁশি কবিতায় প্রকাশ করেছেন তার মনের অভিব্যক্তিকে—"আজ সারাদিন মন খারাপ/মন খারাপ থেকে হাতে পেয়েছি বাঁশি/বাঁশির ভিতরে বাতাস বাঁশির ভিতরে আলো/বাঁশিতে ফুঁ বেজে উঠলো/আমার মন/বাজতে বাজতে এক সময় আমি শূন্য হয়ে/হয়েছি নীল।"

মুজিবর আনসাসির কবিতায় গুহাবাসীর জীবনসংগ্রাম উঠে এসেছে—"তুমি কি দেখিয়ে দেবে একবার/পাথরের অস্ত্রহাতে তোমার নগ্ন কালো/অমলিন রূপ।" সুজয় দত্তের কবিতার রং আলাদা—"অগত্যা সে বুঝলো/নিরাপদ খোলসের চেয়ে/ক্রুশকাঠ আক্রমণ চেনে।"

তরুণ কবিরা সল্প কথায় কী সুন্দব গভীর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে কবিতায় নিয়ে এসেছে চিন্ময় স্নিগ্ধতা। আমরা তাঁদের এক-একটি কবিতায় গভীর হৃদয়ানুভূতির স্পর্শ পাই। বার বার মনের খোলা জানালায় উঁকি দিয়ে যায় তাদের কবিতার স্মরণীয় পংক্তিগুলি যেগুলি কখনোই বিস্মৃতির অন্ধকার হারিয়ে যাবার নয়।

সুনীতি গাঁতাইত, চঞ্চল দুবে, রুদ্রপতি, বিদ্যুৎ পরামানিক, দেবাশিস সরখেল, প্রমুখ কবিদের কবিতায় পাওয়া যাচ্ছে মাটি ও মানুষের প্রতি গভীর ভালবাসার আস্বাদ। সুনীতির কবিতায় হতাশার ছাপ থাকলেও কোনো কোনো পংক্তি জীবনপরিক্রমার প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত হয়ে ঝলমল করে ওঠে। রুদ্রপতি প্রচুর লিখলেও অনেক অভিজাত পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হলেও ইদানিং তাঁর কবিতায় শুধু আত্মকেন্দ্রিকতাই না, গতানুগতিকতার ছায়াপাতও লক্ষ করা যাচ্ছে। প্রান্তিক চাষীর ঘরের সন্তান শিক্ষকতার গৌরবময় আসনে আজ বসেছেন তবু তাঁর কবিতায় তিনি নিজের দারিদ্র্য, দারিদ্র্য লাঞ্ছিত জীবনকে প্রকাশ করছেন কবিতায়। বার বার একই ঘুরে-ফিরে আসছে তাঁর কবিতায়। তাঁর যথেষ্ট শক্তি আছে—নিজস্ব ভাবনা প্রকাশ করার ভাষা আছে— আমরা তাঁর কাছ আরও সুন্দর কবিতা কামনা করি। তাঁর একটি কবিতার পংক্তি—"তাই এই চাষ জমি

উই লাগা মাটি/আকাশে চেয়ে দেখি হাত নাড়ে কাছে ডাকে মুমুর্ষু যুবতি/ওর সঙ্গেই পড়েছিলাম কেমিস্ট্রি পরে ইউক্লিডিয় জ্যামিতি।"

রাজচন্দ্রপুরে পাহাড় অরণ্য ঘেরা পরিবেশে কবিতা চর্চা করে আসছেন ব্রজ দুলাল চক্রবর্তী, শচীদুলাল চক্রবর্তী। ব্রজদুলালের কবিতায় সামাজিক শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে আছে তীব্র প্রতিবাদ। তিনি বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজিতে কবিতা লেখায় সমানভাবে দক্ষ।

"অমিয় অসীম চরিত" পত্রিকার সম্পাদক শচীদুলাল চক্রবর্তীর কবিতার সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। নিয়মিতভাবে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কবিতা লিখে আসছেন কয়েক দশক। তাঁর কবিতায় সমাজভাবনা এবং দেশের সংঘাতময় পরিস্থিতির যেমন চিত্ররূপ পরিলক্ষিত হয় তেমনি সেই সংকট থেকে মানুষকে মুক্ত করারও প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত দেখা যায়। অত্যন্ত আনন্দের কথা তিনিই এ জেলা আজ কয়েক বৎসর হল "অসীমানন্দ সরস্বতী" পুরস্কার প্রবর্তন করে কৃতি কবি-সাহিত্যিকদের সম্মানিত করার ব্যবস্থা করেছেন।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংবাদ পুরুলিয়া ঝালদার কবি সুকুমার চৌধুরি আজ একটি অত্যন্ত পরিচিত নাম। তিনি সুদূর মহারাষ্ট্রে কর্মসূত্রে অবস্থান করছেন। তাঁর সাম্প্রতিক কবিতাগুলি সর্বত্র উচ্চ প্রশংসিত। বেশকিছু কাব্যগ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। নিজে "খনন" নামে একটি পত্রিকাও সম্পাদনা করেন। তাঁর কবিতায় উত্তর আধুনিকতার আভাস পাওয়া যায়—"এমন গোপনগুলি গহন সুন্দর। আঁকাড়া সবুজগুলি/মিলে মিশে থাকে উন্মিলিনগুলি থাকে/নিষিদ্ধ আরতিগুলি যেমন হেমলক" অথবা "কত অল্প তবু খুঁজি/আমার লাগে না কাজে তবু খুঁজি/ আত্মজের জন্য খুঁজি খুঁজে খুঁজে মরি/যেটুকু লাবণ্য নিয়ে ফিরি/হ্যাঁ ও হাহাকারে সব উড়ে পুড়ে যায়।"

বিবর্তিত দুনিয়ার সবকিছুই ক্রমাগত পাল্টাচ্ছে। কবিতাও তাই একই জায়গায় অবস্থান করতে পারে না। স্বাভাবিকভাবে তারও পরিবর্তন অনিবার্যভাবে দেখা দিচ্ছে। কবিতা নিয়ে নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও শুরু হয়ে গেছে। তাই কোন কবির কবিতা দেখে বা পড়ে সে সম্পর্কে এখুনি কোনো শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে না। সত্যিকার কবিতা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে মনের মণিকোঠায়। আর যা অসার অন্তঃসারশূন্য তা মহাকালের বিচারে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপিত হবেই।

আমি মনে করি জগৎ ও জীবনকে বাদ দিয়ে কোন সার্থক কবিতা রচিত হতে পারে না। যে কবিতায় জীবনবোধ নেই চলমান সময়ের বাস্তব প্রতিফলন নেই—নেই সমাজ সভ্যতা মনুষ্যত্ববোধকে বিকশিত করার ইঙ্গিত। যে কবিতা বস্তুজগতের বিপরীত দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে সে কবিতা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির মুখের ভাষা হতে পারে কিন্তু কবিতা হতে পারে না।

সুন্দর সৃষ্টি করাই নয় সৃষ্টিকে সুন্দর করে তোলা কবির অন্য এক মহৎ দায়িত্ব। এই ভূমিকাকে প্রত্যাখ্যান করে হলুদ কবিতার জন্মদানে কবির কোনো ঐতিহ্য বা মর্যাদা নেই।

প্রাচীন চর্যাপদের যুগ থেকে কবিতা যে ঐতিহ্য বহন করে চলেছে এবং নিত্য-নতুন তরঙ্গ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে সেই কবিতার প্রবহমান ধারাকে আরও গতিশীল করার জন্য যে শ্রমনিষ্ঠা আন্তরিকতা ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োজন তার জন্য কবিকে তৎপর হতে হবে নতুবা কাব্য-সাহিত্যের কৌলিন্য নষ্ট হতে পারে।

বিজ্ঞানের যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেছে। বস্তুজগতেও দেখা দিয়েছে আলোড়ন। বিস্ফোরণের মুখে বসে আমরা জীবনে স্বপ্ন দেখছি। সেখানে কবিতাই শেষ কথা বলবে। আশা রাখি পুরুলিয়ার কবি ও কবিতা শতাব্দীর সোনালি সৈকতে রক্তপদ চিহ্ন রেখে এগিয়ে যাবে নতুন দিগন্তের দিকে।

পুরুলিয়ার নাট্যচর্চার ইতিবৃত্ত

অনুপ মুখোপাধ্যায়

পশ্চিম সীমান্ত বাংলার প্রত্যন্ত দেশে পুরুলিয়ার অবস্থান। তথাকথিত স্বাধীনতা প্রাপ্তির ন'বছর পর কেবলমাত্র বাংলা ভাষার দাবিতে এই জেলা তৎকালীন মানভূম নাম পালটে বিহার থেকে পশ্চিমবাংলায় স্থান পায়। নাম হয় পুরুলিয়া।

এই জেলার নাট্য ঐতিহ্যও বেশ গর্ব করার মতো। বিশ্বসংস্কৃতির হাটে যে 'ছো' আজ বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছে, তা পুরুলিয়া জেলার শ্রমজীবী মানুষের মেদ, অস্থি, মজ্জা দিয়ে গড়া একান্ত নিজস্ব সংস্কৃতি। ভাদু, টুসু, ঝুমুরের মতো বর্ণময় লোকসংস্কৃতির পাশাপাশি এই জেলার নাট্য ঐতিহ্য বেশ গর্ব করার মতো। স্বভাবতই এই জেলার নাট্য আন্দোলনের ইতিহাসও বেশ প্রাচীন। আজ থেকে ১২২ বছর আগে এই জেলায় নাট্যচর্চার সূত্রপাত। নাট্য আন্দোলনের এত প্রাচীন ইতিহাস আর কোনো জেলার আছে কিনা সন্দেহ।

১৮৭২ সালের ৭ ডিসেম্বর কলকাতার জোড়াসাঁকোর দীনবন্ধু সান্যালের বাড়িতে সাধারণ রঙ্গালয়ের যে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, তার ঢেউ পুরুলিয়ায় পৌঁছতে দশবছরও লাগেনি। এটা খুবই শ্লাঘার কথা। ১৮৮১ সালে ভাগাবাঁধ পাড়ার বাসিন্দা পুন্ডরীকাক্ষ কোলে মহাশয়ের ঘরে বসে জগদানন্দ বন্দোপাধ্যায়, নারায়ণ চৌধুরী, জ্যোতিষ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মিহির মুখোপাধ্যায়-সহ কিছু নাট্যমোদী যুবকের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হল এক নাট্যসংস্থা। নাম দেওয়া হল 'পুরুলিয়া সংগীত সমাজ'। সে সময়কার নাটকে সংগীতের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। হয়তো সে কারণেই নাট্যদলের নামেও 'সংগীত' শব্দটির এই অনিবার্য প্রকাশ। কলকাতা থেকে মতি পেন্টার নামে এক শিল্পী এসে নাটকের দৃশ্যপট অঙ্কন করেছিলেন গুনেন বাবুর বারান্দায় বসে। মঞ্চস্থ হল তাঁর নাট্যরূপায়িত 'সরলা'। উমেশ চট্টোপাধ্যায় পুরুলিয়া সংগীত সমাজ-এর থিয়েটার দেখে এই সংস্থার উদ্দেশ্যে নামোপাড়ায় দান করলেন এক বিঘা জমি। সংগীত সমাজ-নাম পালটে হল 'মিউজিক্যাল ইনস্টিটিউট'। এই সময় হরিপদ চট্টোপাধ্যায় নামে জনৈক সরকারি কর্মচারীর লেখা 'জয়দেব' এবং 'পৃথ্বীরাজ সংযুক্তা' নাটক দুটি কলকাতার গ্র্যান্ড ন্যাশনাল এবং মনমোহন থিয়েটারে সুধীজনের প্রশংসা কুড়িয়েছিল। এই সংস্থার সুধাংশুশেখর, বিজয় সরকার, নারায়ণ দাস চৌধুরীর অভিনয় সে সময় দর্শককুলের নজর কেড়েছিল। 'শাজাহান' নাটকে ঔরংজেব এবং 'ধর্মবিপ্লব' নাটকে কালা পাহাড়-এর চরিত্রে সুধাংশু শেখরের অভিনয় আজও কিংবদন্তীতে পরিণত হয়ে আছে।

এখনকার মতো তখনও নিজেদের মধ্যে মতান্তরকে কেন্দ্র করে নাট্যদল ভেঙেছিল। তৎকালীন 'সান্ধ্যবান্ধব' ক্লাব এভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরে এই সংস্থা নাম বদলে হয় 'ফ্রেন্ডস ইভনিং

ক্লাব'। এদের 'শির্হীফারাদ', 'ইরানের রানী' স্মরণীয় প্রযোজনা। তৎকালীন পুরুলিয়ায় এই নাট্যসংস্থা সেদিন প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সংস্থা দুটির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক বন্ধুত্ব ছিল দেখার মতো। এদের নাট্যচর্চার প্রভাবে জেলার রঘুনাথপুর, আদ্রা, ঝালদা, মানবাজার-সহ বিভিন্ন গ্রাম-শহরে গড়ে উঠেছিল নানান নাট্যসংস্থা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সেদিন অন্যান্য অংশের মানুষের মতো এই জেলার নাট্যকর্মীরাও তাদের নাটকের শাণিত হাতিয়ার নিয়ে হাজির হয়েছিল মঞ্চ রণাঙ্গনে। পেরুবাবু, পুটুবাবু, সন্তোষবাবুর অভিনয়ধন্য 'পথের শেষে', 'বঙ্গে বর্গী', 'রমা', 'শ্রীদুর্গা' অথবা 'দেবদাসী'র মতো প্রযোজনা ১৯৬৬ সালে সরকারি দমননীতিকে অগ্রাহ্য করে যেভাবে মঞ্চস্থ হয়েছিল তা নিঃসন্দেহে দুঃসাহসিক।

হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের সাহায্যকল্পে ১৯৩৯ সালে পি.এম.আই এবং ফ্রেন্ডস ইভনিং ক্লাব যথাক্রমে 'সংগ্রাম ও শান্তি' এবং 'মাটির ঘর' মঞ্চস্থ করে। এই সংস্থাদুটির উত্তরাধিকারী হিসাবে এরপর বিভিন্ন সময়ে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন সংস্থা। যেমন নীলকুঠি ডাঙ্গার পশুপতি গঙ্গাধর বিদ্যালয়-এর ব্যানারে প্রযোজিত হয়েছিল 'চন্দ্রগুপ্ত', 'কালিন্দী' এবং 'কেদার রায়'-এর মতো প্রযোজনা যার উদ্যোক্তা ছিলেন ধীরেন ভট্টাচার্য, প্রফুল্ল দাশগুপ্ত, করুণা মুখার্জী, ভুজঙ্গ ঘোষের মতো বিদগ্ধ ব্যক্তি।

বলে রাখা ভালো পুরুলিয়ার নাট্যচর্চার ইতিহাসে এই সংস্থা সে সময় নবযুগ এনেছিল। এঁদের 'কেদার রায়' নাটকে প্রথম অভিনেত্রীর আবির্ভাব ঘটেছিল মঞ্চে। বলাবাহুল্য অর্থের বিনিময়ে পেশাদার অভিনেত্রীদের সেদিন কলকাতা থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল।

পরবর্তী সময় নডিহা ড্রামাটিক ক্লাব, রেলওয়ে ইনস্টিটিউট, মিলন সংঘের মতো নাট্যদল পুরুলিয়ায় নাট্যচর্চাকে সমৃদ্ধ করেছে। এঁদের 'দুই মহল', 'কর্ণার্জুন', 'মিশর কুমারী', 'গৈরিক পতাকা', 'পঞ্জাব কেশরী', দেশাত্মবোধের প্রতি উল্লেখযোগ্য শ্রদ্ধাঞ্জলি। পঞ্চাশ দশকের এই সময় অনাদি ভট্টাচার্য, বঙ্কিম মুখার্জী, অমিয় সরকার, অনিল বক্সী, গোপাল নন্দীর মতো কৃতী অভিনেতারা মঞ্চ দাপাতেন।

বিভিন্ন পেশার সাথে যুক্ত ব্যক্তিত্বরাও পুরুলিয়ার নাট্যকলাকে সমৃদ্ধ করেছেন ষাট এবং সত্তর দশকে। জে. কে. কলেজের অধ্যাপকমণ্ডলীর প্রযোজনায় ইংরেজিতে 'জুলিয়াস সীজার' এবং বার্ণাড শ'র 'আর্মস্ এ্যান্ড দি ম্যান্' এক স্মরণীয় ঘটনা। নির্দেশনায় ছিলেন ইংরেজি বিভাগের দুই অধ্যাপক অপূর্ব স্যান্যাল এবং সুবোধ বসুরায়।

চিকিৎসকদের সংগঠন আই. এম. এ ডাঃ প্রভাত মল্লিকের পরিচালনায় মঞ্চস্থ করেছিল 'দায়ী কে', 'পথিক', 'চিকিৎসা সংকট'-এর মতো নাটক। হাসপাতালের চিকিৎসাকর্মীদের সম্মিলিত প্রযোজনায় মঞ্চস্থ হয়েছিল 'দুইপুরুষ', 'রাণাপ্রতাপ', বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'ক্ষুধা'র মতো নাটক।

শান্তময়ী বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকারাও সেদিন নাট্যচর্চায় অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। প্রধান শিক্ষিকা নিভা রায়চৌধুরীর উদ্যোগে মঞ্চস্থ হওয়া নাটকগুলো 'শকুন্তলা', 'নিষ্কৃতি', 'বিন্দুর ছেলে' আজও উদাহরণ।

পুলিশ ক্লাবের ব্যানারে সেদিন পুলিশকর্মীরাও নাট্যাভিনয়ে ব্রতী হয়েছিলেন। সে সময় জেলা শাসক, পুলিশ সুপারের মতো পদস্থ সরকারি আধিকারিকরাও কেউ কেউ নাট্যচর্চায় উৎসাহী ছিলেন। অফিসার্স ক্লাবের প্রযোজনায় 'বিশবছর আগে' সে সময়ের এক উল্লেখযোগ্য নাট্য প্রযোজনা।

পুরুলিয়া শহরে অবাঙ্গালী মানুষের সংখ্যাও কম না। তাই হিন্দি ভাষায় নাট্যচর্চারও ইতিহাস

রয়েছে এই শহরে। মাড়োয়ারি যুবক সংঘ সেদিন রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন', 'মেবার পতন'-এর মতো নাটকের অনুবাদ করে দর্শকদের সামনে হাজির করেছিলেন।

ষাটের দশকে পুরুলিয়া শহরের নাট্যচর্চায় আমলাপাড়া ইউনিটও এক উল্লেখযোগ্য নাম। রতন ঘোষের 'পিতামহদের উদ্দেশ্যে' মঞ্চস্থ করে এই সংস্থা জনমানসে প্রভাব ফেলেছিল বিস্তর। পরবর্তী কালে এঁরাই আয়োজন করেছিলেন একাংক নাটক প্রতিযোগিতার। নাটক প্রতিযোগিতার কথা উঠলে পি. এম. আই-এর উল্লেখ করতেই হয়। এঁদের আয়োজনে পুরুলিয়ার নামোপাড়ায় একাংক নাটক প্রতিযোগিতার আসর বসত বছরের পর বছর। আশির দশকের শেষদিকে এই ঐতিহ্যবাহী প্রতিযোগিতা বন্ধ হয়ে যায়। এই মঞ্চে অভিনীত বহু প্রযোজনা আজও উজ্জ্বল স্মৃতি হয়ে আছে। এই ঐতিহ্যের পথ ধরেই বিদ্যানাট্যসংস্থা রবীন্দ্রভবনে আশির দশকে আয়োজন করেছিল ছোট নাটক প্রতিযোগিতার। বলা যায় এ যাবৎ শেষ স্মরণীয় নাট্য প্রতিযোগিতার আয়োজক বিদ্যাই। নাট্যকার চিররঞ্জন দাসের বিচারত্বে এই মঞ্চে জেলা এবং জেলার বাইরের বহু প্রসিদ্ধ নাট্যদল এই অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিল তাদের সু-প্রযোজনা নিয়ে। নয়ের দশকে 'বীণা' সংস্থা কয়েকবার ছোটদের নাটক প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল শহরের বুকে। বর্তমানে তাও বন্ধ হয়ে গেছে। সাম্প্রতিক কালে জেলা বিজ্ঞানকেন্দ্রের পরিচালনায় ছোটোদের বিজ্ঞানভিত্তিক নাটক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

হরিপদ সাহিত্য মন্দিরও নয়ের দশকে একবার একাংক নাটক প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল তাদের নিজস্ব প্রেক্ষাগৃহে। ষাট থেকে সত্তর দশকের কিছু সময় পর্যন্ত চকবাজারের শক্তিসংঘের নাট্য প্রযোজনা ছিল নিয়মিত।

এঁদের 'ঝিঁ ঝিঁ পোকার কান্না', 'বিদেহীর শপথ' এবং 'সমাধান' উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা। আজকের নাট্যাভিনেতা রামময় দরিপা, অশোক দরিপা, গোপাল পাল এই সংস্থা থেকেই আত্মপ্রকাশ করেন। এই একই সময়ে আমডিহার বি. এফ. ক্লাব পুরুলিয়ার নাট্যমোদী জনগণকে বহু উৎকৃষ্ট নাট্য প্রযোজনা উপহার দিয়েছিল। এদের 'কবয়', 'কালোমাটির কান্না' দর্শকমনে স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছিল। এই সংস্থার অভিনেতা হিসাবে শ্রীরঞ্জন রায়, অক্ষয় রায় ও সলিল বক্সীর নাম মানুষের মুখে মুখে ফিরত।

স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে এদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থায় অন্যান্য অংশের মানুষের মতো নাট্যকর্মীরাও খুশী হতে পারেনি। তাই স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, প্রতিবাদ নাট্যনির্মাণের মধ্যেই ধ্বনিত হয়েছে বারে বারে। এক্ষেত্রে পুরুলিয়ার নাট্যজগতও ব্যতিক্রম ছিল না। তাই সমাজ বিকাশের ধারায় আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে নাট্যসংস্কৃতিতেও তার প্রতিফলন ঘটেছে। চল্লিশ দশকের গণনাট্য সংঘের ঢেউ এই জেলার মাটিকেও স্পর্শ করেছে। ওই সময়ে বিভিন্ন নাট্যদলের প্রযোজনাগুলিই সেই সাক্ষ্য বহন করছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের গর্ভ থেকেই ক্রমে এখানে জন্ম নিয়েছে গ্রুপ থিয়েটারে যা মূলত গণনাট্য সংঘের ভাবাদর্শেই উদ্বুদ্ধ। তাই মানুষের কাছে পৌঁছানোর তাগিদেই এই জেলায় একে একে জন্ম নেয় উদয়ন, অনুষ্টুপ, বিদ্যা, নাট্য নিকেতন, সমবেত, ঐকতান, জোনাকী, আনাড়ার উদয় সংঘ, সাঁওতালডির ঋত্বিক, আদ্রার থ্রি এ, অগ্রণী সীমান্তিক, যোদ্ধা-সহ বহু জানা-অজানা গ্রুপ থিয়েটার যারা প্রগতি নাট্যের জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ়।

সত্তর দশকের উত্তাল সময়ে এই জেলার নাট্যকর্মীরা ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বাহাত্তর সালে জন্মনেওয়া উদয়ন, 'সময়ের ঘড়ি'. 'বর্ণবিপর্যয়', 'শতাব্দীর পদাবলী', 'কেননা মানুষ' -এর মতো প্রযোজনা করে সেদিন পুরুলিয়ার দর্শককে চমকে দিয়েছিল। আঙ্গিক এবং বিষয়বস্তুর

এক অসাধারণ মেলবন্ধন। বাহাত্তর থেকে ছিয়াত্তর উদয়নের স্বর্ণযুগ। এই নাট্যদলের স্থপতি নির্দেশক সলিল রায় শুধু উদয়ন না বাংলার নাটকেরই এক মূল্যবান সম্পদ। এঁর নির্দেশনায় 'স্ফিংস', 'ক্যালিগুলা', '৭৫', 'লাশ বিপণি', 'ইজ্জত' আজও দর্শকস্মৃতিতে উজ্জ্বল। আশির দশকে এই সংস্থার 'লোকটা', 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'চাপাপড়া মানুষ' দর্শকের বিপুল অভিনন্দন কুড়িয়েছিল। শুধু নাট্য প্রযোজনা নয়, এই দলের পরিচালক একজন শক্তিমান নাট্যকারও। তাঁর লেখা 'মধ্যবিত্তের থিয়েটার' (দীপেন্দু চক্রবর্তীর প্রবন্ধ অবলম্বনে) উয়নের সেরা নাটকগুলোর অন্যতম। বলা যায় বাংলার দর্শকের কাছে উদয়নের শ্রেষ্ঠ উপহার। দিলীপ দত্ত, স্বপন মহিন্দার, সতীনাথ ব্যানার্জী, জয়দীপ মুখার্জীর মতো দক্ষ অভিনেতা এই দলই পুরুলিয়াবাসীকে উপহার দিয়েছিল। সেই সময় চরম সামাজিক প্রতিকূলতার মধ্যে দাঁড়িয়েও ঝুমা রায়, পাপিয়া রায়, জাপু হাজরার মতো একদল প্রতিভাময়ী অভিনেত্রীকে মঞ্চে হাজির করে এক অভাবনীয় কাজ করেছিলেন পরিচালক। আবার এঁরাই 'বারবধূ' মঞ্চায়নের আয়োজন করে বিতর্ক সঞ্চার করেছিলেন পুরুলিয়ার বুকে। আশির দশকের শেষদিকে এই দলের প্রাণপুরুষ সলিল রায়কে রুটিরুজির জন্য পুরুলিয়া তথা এই রাজ্য ত্যাগ করতে হয়। তার কিছুদিনের মধ্যেই উদয়ন-এর মতো সংস্থার নাট্যকর্ম বন্ধ হয়ে যায়। দুর্ভাগ্য আমাদের।

এই দশকেই পুরুলিয়ায় জন্ম নিয়েছিল আজকের বিশিষ্ট নাট্যসংস্থা 'বিদ্যা'। সাতাশ বছর বয়সী এই নাট্যদলটি বহু উল্লেখযোগ্য নাট্য প্রয়োজনা উপহার দিয়েছে আমাদের। 'বর্ণ বিপর্যয়, 'হোমো স্যাপিয়েন্স', 'শতাব্দীর পদাবলী'র মতো একই ধারার নাটকের পাশাপাশি 'গ্রাম নগর বন্দরে', 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী', 'আসামী হাজির', 'অশ্বমেধ' সত্তর থেকে আশির দশকে এক-একটি মূল্যবান প্রযোজনা।

নয়ের দশকে আর সবকিছুর মতো এই নাট্যদলেও ধারাবাহিকতার অভাব চোখে পড়ে। শুরু থেকে আজ পর্যন্ত এই নাট্যদলের নির্দেশক তথা অন্যতম উদ্যোগী অনুপকর এখনও পুরুলিয়াবাসীকে নতুন নতুন প্রযোজনা উপহার দিয়ে থাকেন। এই দশকে এঁদের উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা 'গুলশন', 'প্রফেসর বংকু' যার বিষয়বস্তুও সময়োপযোগী। শুভেন্দু দাস, তাপস চেলের মতো কুশলী অভিনেতার অভিনয় এই দলের সম্পদ। অতীতে শ্যামলী ঘোষ এবং পরবর্তীতে তনুশ্রীর মতো অভিনেত্রী বহু নাটকে অভিনয় করে বিদ্যার প্রযোজনাকে সমৃদ্ধ করেছেন। একসময় শক্তি কর্মকার, প্রমোদ পান্ডে, সুবীর বিশ্বাস, সুশান্ত দাঁ এই দলের কৃতী অভিনেতা হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন।

আজকের নাট্যনিকেতনের জন্ম উন আশি সালে। 'ঈশ্বর ফিরে যাও'-এর মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ ঘটলেও আশি সালে অভিনীত 'সাজানো বাগান'ই পুরুলিয়ার দর্শকদের কাছে ব্যাপক পরিচিত এনে দেয় নাট্যনিকেতনের। এদের 'চাকভাঙ্গামধু' মঞ্চস্থ হয় আশির দশকে। এই দশকেই পুরুলিয়াবাসীকে নাট্যনিকেতন উপহার দিয়েছেন জ্যোৎস্নাময় ঘোষের কালজয়ী একাংক 'স্বরবর্ণ'। 'স্বরবর্ণ' নাট্যনিকেতনকে বাংলার নাট্যজগতে বিপুল পরিচিত এবং খ্যাতি এনে দিয়েছে সন্দেহ নেই। এরপর একটু ভাটার টান পড়ে নাট্যনিকেতনের কাজে।

পরবর্তী সময় এরা প্রযোজনা করেছেন মনোজমিত্রের 'কিনু কাহারের থেটার' যা আদৌ সু-প্রযোজনা হয়নি। বরং কুচিল মুখার্জীর 'ব্যাধি' এবং জ্যোৎস্নাময় ঘোষের 'ক্যান্সার' নাট্যনিকেতনের সুনাম বৃদ্ধি করেছিল।

এই সংস্থা বেশকিছু দক্ষ এবং পটু অভিনেতার জন্ম দিয়েছে। যার মধ্যে অশোক দরিপা, অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, বাদল দত্ত, রণজিৎ সিন্হা এবং কুচিল মুখার্জীর নাম উল্লেখযোগ্য। প্রথম দিকে

কল্লোল মুখার্জী এবং পরবর্তী সময়ে অশোক দরিপা এই নাট্যসংস্থার পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

সোমালী গাঙ্গুলী এবং পিংকি মিত্র এই সংস্থার কয়েকটি নাটকে নারীচরিত্রে রূপদান করেছিলেন। এই নাট্যনিকেতনই ছায়া, মায়া নামে দুই পেশাদার যাত্রাশিল্পীকে দিয়ে একসময় নাটকে অভিনয় করে অসাধ্য সাধন করেছিল। পুরুলিয়ার নাটকে এই দুই অভিনেত্রীর অবদানও কম না।

শহরের এ. টি. এফ. সি.-র সাংস্কৃতিক শাখা ঐকতান পুরুলিয়ার নাট্যচর্চায় আব এক উল্লেখযোগ্য নাম। বহুদিন থেকে নাটক করলেও মূলত আশির দশকেই বৃহত্তর দর্শকদের সাথে এই সংস্থার পরিচয় ঘটে। 'রক্তস্নাত', 'মুচকি মঙ্গলকাব্য', 'নীলকণ্ঠের বিষ', 'কুম্ভকর্ণের ঘুম' এক-একটি উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা। প্রথম দিকে সমীর দত্ত ছিলেন সংস্থার পরিচালক। পরে চাকরি সূত্রে আসা এক সরকারি কর্মচারী শৈবাল চক্রবর্তী পরিচালনার দায়িত্ব নেন। উদয়ন থেকে বেরিয়ে গিয়ে পরে শিবনাথ কুণ্ডুও একটি নাটক পরিচালনা করেছিলেন ঐকতানের প্রযোজনায়।

পরবর্তী সময় এই সংস্থারই কৃতী অভিনেতা অরূপ মণ্ডল পরিচালনার দায়িত্ব পান। অকালে চলে যাওয়া এই কৃতী পরিচালকের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি 'গফুর আমিনা সংবাদ', 'ভুয়ো দর্শন', 'বিষ'-এর মতো সমাজ-সচেতন নাটক। ঐকতানের জনপ্রিয় প্রযোজনা পুরুলিয়ার আঞ্চলিক ভাষায় রচিত 'আলোটা জ্বালবই' অরূপের এক উল্লেখযোগ্য নাট্যকর্ম। সমীর, প্রদীপ, অমিতাভ এই সংস্থার কৃতী অভিনেতা।

কেতিকার অনুষ্টুপ ও সত্তর থেকে আশির দশক পর্যন্ত সক্রিয় থেকে বহুদিন তারা ইতিহাস। এই দলের প্রথম প্রযোজনা রতন ঘোষের 'তৃতীয় কণ্ঠ'। পরবর্তী সময় 'ইতিহাস কাঁদে', 'হারাধনের দশটি ছেলে', 'কেয়াকুঞ্জ', 'নানা রঙের দিনগুলি', 'প্রস্তাব' এক-একটি উল্লেখযোগ্য নাট্যায়ন। স্বপন সিন্হা, সুভাষ সিন্হা, অভীক চট্টোপাধ্যায়, চন্দন মুখার্জী ছিলেন এই দলের সম্পদ। ইতা চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সে সময় অনুষ্টুপের দক্ষ অভিনেত্রী। পুরুলিয়া শহরে 'সমবেত' নামে হিন্দীভাষায় একটি সাহিত্য-পত্রিকা প্রকাশিত হত। এক সময় এঁরাও নাট্যচর্চায় আগ্রহী ছিলেন। 'সাহুকার আউর কোতোয়াল' মঞ্চস্থ করে এরা পরিচিতি অর্জন করেছিলেন।

আমরা আশির দশকে পুরুলিয়া শহরে অফিস ক্লাবের সিরিয়াস নাট্যচর্চার প্রমাণ পেয়েছি। যেমন সমবায়ী ক্লাব এই দশকেই মঞ্চস্থ করেছে, 'হারানের নাতজামাই শুভঙ্কর চক্রবর্তীর 'শৃঙ্খলে শব্দ' একাংক। মাইনস্ অ্যান্ড মিনারেলস্ রিক্রিয়েশন ক্লাব মঞ্চস্থ করেছিল 'পাথর', একটি 'অবাস্তব গল্প', 'সত্যি ভূতের গপ্পো', 'বেকার বিদ্যালংকাব'-সহ বেশকিছু একাংক প্রযোজনা। একইভাবে স্টেটব্যাঙ্ক পুরুলিয়া শাখার 'পাবলিক সারভেণ্ট' এর কথা মনে পড়ে।

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাংস্কৃতিক শাখা আশির দশক থেকে এযাবৎ বহু একাংক, পূর্ণাঙ্গ, পথনাটিকা উপহার দিয়েছে। 'রূপান্তর', 'প্রহরী', 'আদাব', 'শাস্তির' পাশাপাশি সফদর হাসমির 'আউরত', 'হল্লাবোল'-এর মতো পথনাটিকার সার্থক মঞ্চায়ন করেছে এঁরা। এই সংস্থায় অধিকাংশ প্রযোজনারই নির্দেশক শৈবাল চক্রবর্তী। এদের নাটকে নির্মল ব্যানার্জী, লালমোহন গ্রহাচার্য, সুবোধ রায়, অনিল বিশ্বাস, সুবোধ রজক বিভিন্ন সময় অভিনেতা হিসাবে অভিনয় করেছেন।

নয়ের দশকে আমরা দেখলাম চলতি দলগুলো ছাড়াও কিছু সংস্থা বিক্ষিপ্তভাবে হলেও দুএকটি অন্যমাত্রার প্রযোজনা করতে সক্ষম হল। প্রমোদ পান্ডের (নিউটন) নির্দেশনায় নাট্যম প্রযোজিত 'কৃষ্ণকলি কথা', 'কালু শেখের অন্তর্ধান রহস্য' অথবা পুরুলিয়ার আঞ্চলিক ভাষায় 'দানসাগর'-

এর মতো নাট্য নির্মাণ নিঃসন্দেহে পুরুলিয়ার বুকে সাহসী পদক্ষেপ।

এই দশকেই 'প্রয়াস' নাট্য-সংস্থার প্রযোজনায় অরূপ মন্ডলের নির্দেশনায় 'দায়বদ্ধ' পুরুলিয়ার সাধারণ মানুষকেও নাটক সম্পর্কে আগ্রহী করে তুলেছিল। এই নাট্যব্রতী শিল্পীর অকালমৃত্যু পুরুলিয়ার নাটকের জগতে অনেকটাই ক্ষতিসাধন করে গেল।

পুরুলিয়ার নাটকের স্বর্ণযুগ ছিল আশির দশক। প্রায় গোটা আশির দশক জুড়ে সামাগ্রিকভাবে পুরুলিয়ার নাটকের চেহারা ছিল বেশ স্বাস্থোজ্জ্বল। বিভিন্ন নাট্যদলের সমন্বয়ে 'পুরুলিয়া নাট্য পরিষদ' গড়ে উঠেছিল এই দশকের প্রথম দিকে। সমবেত শিল্প নিয়ে সমবেত প্রতিরোধের ধারায় গড়ে ওঠা নাট্যদলগুলো অবশ্য বেশিদিন একসাথে চলতে পারেনি। খুব অল্পদিনেই ভেঙ্গে যায় এই যৌথ মোর্চা। নাট্য পরিষদ আজ ইতিহাস। পরবর্তী সময় এই সংস্থাকে বাঁচানোর চেষ্টা হলেও, তা বাস্তবায়িত হয়নি, কেননা এককভাবে নাট্যদলগুলোর ভিত্তিই আজ দুর্বল। নিজেদের নাট্য প্রযোজনার কাজেই আজ নিষ্ক্রিয়তা চোখে পড়ার মতো। গোটা জেলা জুড়েই নাটকের বেগবান স্রোত অনেকটাই স্তিমিত। আজ দুহাজার তিন সালে পুরুলিয়া শহরে আবার নতুন করে নাট্যনিকেতন, বিদ্যা, তাদের অতীত ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনতে চাইছেন। হাত দিয়েছেন নতুন প্রযোজনায়। অভিজ্ঞ নাট্যমর্কীরা কেউ কেউ নতুন দল তৈরি করে নতুন প্রযোজনার মহড়া শুরু করেছেন—অবশ্যই আশার কথা। জেলাস্কুল, বাবলিং বার্ডস নবোদয়-এর মতো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোও ছোটদের নাট্যচর্চায় গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এটা কম কথা নয়। তাহলে কি পুরুলিয়ার নাট্যকর্মীরা আবার তাঁদের ক্ষমতার প্রমাণ রাখবেন? আগামী দিনেই এর সত্যতা প্রমাণিত হবে।

পুরুলিয়া শহরের পাশাপাশি আদ্রা, আনাড়া এবং সাঁওতালডির নাট্যচর্চা উল্লেখ করার মতো। রেলশহর আদ্রার নাট্য ঐতিহ্যও বেশ গর্ব করার মতো। বিশিষ্ট যাত্রাশিল্পী নিমাই কাঞ্জিলাল, সুনীল সমাদ্দার, এই শহরেরই মানুষ। আরেক বিখ্যাত যাত্রাশিল্পী তারাপদ ঘোষ অবশ্য নট্ট কোম্পানির ডাক প্রত্যাখ্যান করেন। ষাটদশক থেকেই আদ্রায় মোটামুটিভাবে নাটক অভিনয়ের উল্লেখযোগ্য সূত্রপাত। এর আগে ১৯৫০ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত আদরা বাঙ্গালী সমিতির ব্যবস্থাপনায় মঞ্চায়িত হয়েছে কিছু কিছু নাটক। এই শহরে নাটক প্রযোজনার ক্ষেত্রে অ্যামেচার আর্টিষ্ট অ্যাসোসিয়েশন (থ্রি এ) ছিল উল্লেখযোগ্য নাট্যসংস্থা। এই সংস্থা ষাটের দশকে আদ্রার বুকে নাট্যজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। 'কাবুলিওয়ালা', 'কাঞ্চনরঙ্গ', 'আমরা কবরে যাব না' সে সময়কার উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা। থ্রি এ সংস্থার নাট্যব্রতীরা হলেন পরিচালক সরোজ মুখার্জী, সীতাংশু গাঙ্গুলী, অনিল দে, দীপক ভট্টাচার্য, সুভাষ সরকার। মহিলা অভিনেত্রীদের মধ্যে সান্ত্বনা সরকার, দীপালী নাগ, গীতা রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

ষাটের দশকেরই শেষ দিকে 'শিল্পীগোষ্ঠী' নাট্যসংস্থার জন্ম। শিল্পীগোষ্ঠীর পরিচালক ছিলেন দক্ষ অভিনেতা দীপ্তেন রায়। এই গোষ্ঠীর 'জ্বালা', 'কঙ্গোর কারাগারে, 'কাকদ্বীপের এক মা' স্মরণীয় প্রযোজনা।

সত্তর সালে আধুনিক ভাবনা এবং মননে সমৃদ্ধ হয়ে কিছু যুবক 'অগ্রণী' নামে এক নাট্যসংস্থার জন্ম দিয়েছিলেন। নাট্য প্রযোজনার মধ্য দিয়ে এরা সময়ের দায় মিটিয়েছেন অনেকখানি। অগ্রণীর সফল প্রযোজনা তালিকায় রয়েছে 'নরক গুলজার', 'লাটাখাম্বা' 'রক্তে বোনা ধান', 'বিবর্ণ বিস্ময়' ইত্যাদি। অগ্রণীর পরিচালক হিসাবে দীপ্তেন রায়ের নাম আজও মুখে মুখে ফেরে। অগ্রণীর জনপ্রিয় অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের মধ্যে আছেন সমীর দে, অসিত কুন্ডু এবং দীপালী নাগ।

ডি. আর. এম. অফিসের অ্যাকাউন্টস্ বিভাগের রিক্রিয়েশন ক্লাবও প্রগতিনাট্যের ধারাকে

অনুসরণ করে আদ্রার নাট্য আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করেছে বিভিন্ন সময়। এদের প্রযোজিত নাটকগুলোর মধ্যে ফেরারী ফৌজ, মৃচ্ছকটিক, বিসর্জন, টিনের তলোয়ার-এর মতো কালজয়ী নাটক উল্লেখযোগ্য। এই ক্লাবের যে সব অভিনেতার অভিনয় মানুষের মনকে নাড়া দিয়েছে তারা হলেন দিবাকর ভট্টাচার্য, সতীন রায়, রঙ্গীন রায় এবং অবশ্যই দীপ্তেন রায়।

নয়ের দশকে অগ্নিবীণা, যোদ্ধা, সীমান্তিক নাট্যগোষ্ঠী আদ্রার নাট্যচর্চায় প্রাণসঞ্চার করলেও, এই মুহূর্তে আদ্রার নাটকে ভাটার টান। কয়েক বছর আগে আদ্রার একটি নাট্যসংস্থা হিন্দী নাটক মঞ্চস্থ করত, এখন সবই ইতিহাস। অতীতের বহু মঞ্চ সফল প্রযোজনার প্রসূতিগৃহ আদ্রার নর্থ ইনস্টিটিউট বন্ধ হয়ে যাওয়া বড়ই বেদনার।

পুরুলিয়া জেলার সাঁওতালডি বিদ্যুৎ নগরীতে পেশার সূত্রে আসা মানুষজনের প্রচেষ্টায় এই জনপদে সুস্থ নাটকের বাতাবরণ গড়ে ওঠায় প্রগতি নাটকের চেহারা স্বাস্থ্যবান হয়েছে নিঃসন্দেহে। এ ব্যাপারে বরাবরই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে ঋত্বিক নাট্যসংস্থা। এছাড়াও বিদ্যুৎ দপ্তরের বিভিন্ন বিভাগীয় রিক্রিয়েশন ক্লাব এবং অফিসার্স ক্লাবের দৈনন্দিন কর্মসূচিতেই নাট্যাভিনয় বড় জায়গা দখল করে রয়েছে। এঁদের রিক্রিয়েশন ক্লাব পরিচালিত একাংক নাটকের বাৎসরিক প্রতিযোগিতা এখনো তারিফ করার মতো মহতী উদ্যোগ।

এই অঞ্চলে আনাড়া রেল শহরেও এক সময় নাট্যচর্চা সাড়া ফেলেছিল। উদয় সংঘের উদ্যোগে এই অঞ্চলে নাট্য আন্দোলন সংগঠিত চেহারা নেয়। ৭০ থেকে ৮০-এর দশকে এই নাট্যসংস্থা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। রেলকর্মী অসিত কুন্ডুর নির্দেশনায় 'সারি সারি মৃতদেহ', 'মারীচ সংবাদ', 'ঝড়ের খেয়া' সে সময়ের উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা।

পুরুলিয়ার জয়পুর গ্রামের নাট্যচর্চাও উল্লেখ করার মতো। এখানকার অন্বেষা নাট্যসংস্থা শুধু নাট্যাভিনয়ই নয়, বিগত কয়েকবছর ধরে এঁদের উদ্যোগ অনুষ্ঠিত হচ্ছে একাংক নাটক প্রতিযোগিতা। পুরুলিয়ার নাট্যচর্চায় পুরুলিয়ার আঞ্চলিক ভাষায় রচিত নাটকের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। বাংলা থিয়েটারের মূলধাবার কয়েকটি নাটক এবং চলচ্চিত্রেও এই ভাষার সুন্দর প্রয়োগ বাঙ্গালীর সংস্কৃতি চর্চায় আজও স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। অজিতেশ বন্দোপাধ্যায়ের চেকভ্ অবলম্বনে 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী' এবং 'হাটে বাজারে' চলচ্চিত্রে পুরুলিয়ার আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ সেদিন আমজনতার মুখে মুখে ফিরত। সম্ভবত এই জনপ্রিয়তা থেকেই সত্তর দশকে অমল দে (খোকা দা) পুরুলিয়ার আঞ্চলিক ভাষায় নাট্যরচনায় ব্রতী হন। পুরুলিয়ার সামাজিক এবং পারিবারিক নানান ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে অমল দে বেশকিছু নাটক লিখে গেছেন। যার মধ্যে বেশকিছু মঞ্চস্থ হয়েছিল সার্থকতার সাথে। যার মধ্যে 'ভাদৈরার দ্বিরাগমন', 'প্যালারামের কীর্তি, 'জামাইফোঁটা,' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অমল দের সার্থক উত্তরসূরী মুনসেফডাঙ্গার আর এক নাট্যকার চন্দন সেন আশির দশকে এই একই ধারার বেশকিছু নাটক লিখেছিলেন। তবে এই নাটকগুলো পাড়ার পুজো উপলক্ষে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানের পরিধি অতিক্রম করতে পারেনি। আরেক কুশলী নাট্যকার কুচিল মুখার্জীর লেখা 'মেহেরারু', 'ব্যাধি' আশির দশকে অভিনীত হয়েছে সফলতার সাথেই। এই নাট্যকারের লেখা আরো একটি উল্লেখযোগ্য নাটক ছো-নাচের পটভূমিকায় লেখা 'অথ মুখোশ কথা'। এ নাটকের প্রয়োজনাও করেছিল পুরুলিয়ার নাট্যনিকেতন নাট্যসংস্থা। পুরুলিয়ার পি. এম. আই একসময় মঞ্চস্থ করেছিল এই উপভাষায় রচিত উদয়ন মজুমদারের নাটক 'শূলের ব্যথা।' এই আঞ্চলিক ভাষায় নাটক লিখে নয়ের দশকে সবার নজর কেড়েছেন ছড়রা গ্রামের বাসিন্দা স্বপন হুজুরি। তাঁর 'আলটা জ্বালবই', 'তেল' এই সময়ের উল্লেখযোগ্য নাটক। একইভাবে সিদ্ধিনাথ

চট্টোপাধ্যায়ও জেলার উপভাষায় কিছু পথনাটিকা লিখে বামপন্থীদের সমর্থনে বিভিন্ন নির্বাচনের সময় মঞ্চস্থ করেছেন। এছাড়াও পুরুলিয়ার বিভিন্ন নাট্যসংস্থা গ্রামীণ পটভূমিকার বহুনাটককে আঞ্চলিক ভাষায় রূপান্তরিত করে মঞ্চস্থ করেছেন। এক্ষেত্রে নাট্যনিকেতনের 'নতুন বৌ', 'পাকে বিপাকে' উল্লেখযোগ্য। সমাজসেবী সংস্থা ভানাস একইভাবে 'বিষ' এবং 'জীবনযাপন' মঞ্চস্থ করেছিল।

পুরুলিয়ার নাট্য আন্দোলনে বিভিন্ন সময় কয়েকটি নাট্য-বিষয়ক পত্রিকারও প্রকাশ লক্ষ করা যায়। বিগত আশির দশকে উদয়ন-এর কর্ণধার সলিল রায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল 'নাট্যব্রতী'। পাশাপাশি নাট্যনিকেতন প্রকাশ করেছিল 'মুখোশ' নাট্যপত্র। অন্যদিকে ঐকতান সাংস্কৃতিক বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশ করেছিল এই দশকেই। এখন অবশ্য সবই বন্ধ হয়ে গেছে।

পরিশেষে একটা কথা বলা প্রয়োজন, এই আলোচনা স্বয়ংসম্পূর্ণ এমন দাবি করেন না বর্তমান নিবন্ধকার। দীর্ঘদিন নাট্য আন্দোলনের সাথে একজন সাধারণ নাট্যকর্মী হিসাবে যুক্ত থাকার অভিজ্ঞতা, বহু মানুষের সাথে সাক্ষাৎকার আর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এই নিবন্ধ পুরুলিয়ার নাট্য আন্দোলনের ইতিহাস লেখার একটি প্রয়াস মাত্র।

পুরুলিয়ায় হিন্দি সাহিত্যচর্চার চালচিত্র

রাওয়েল পুষ্প

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালীন মানভূম তার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করে নেয় এবং নিজের অবস্থান ও ভূমিকাকে যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য করে তোলে। এই আন্দোলনে মানুষ যখন স্বাধীনতার জন্য নিজেদের উৎসর্গীকৃত করছিলেন তখন তাঁদের অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করার জন্য মানভূমের মাটি থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা তাদের যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। একদিকে যখন বাংলায় বিভিন্ন পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছিল ঠিক যে সময়ই হিন্দিতেও বেশকিছু পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। ঐ সমস্ত পত্র-পত্রিকার সম্পূর্ণ তালিকা পেশ করা কার্যত সম্ভব নয়। তবে প্রাপ্ত সূত্র অনুযায়ী স্বাধীনতার আগে থেকে শুরু করে অধুনা পুরুলিয়া জেলা গঠনের সময় অর্থাৎ ১৯৫৬ পর্যন্ত প্রকাশিত পত্রিকাগুলি হল; লক্ষ্মীনারায়ণ ত্রিবেদীর সম্পাদনায়—'প্রগতি' ও 'নিরালা' ; শ্যামলাল সুরেকার সম্পাদনায় জনসেবক, স্বাধীনতা সংগ্রামী সত্যানারায়ণ চৌধুরীর সম্পাদনায় 'জনজাগরণ; ঋষিকেশ শর্মার সম্পাদনায় 'নির্মাণ'; এছাড়াও 'জনবিদ্রোহ' 'প্রজাতন্ত্র' 'সমবেত' ইত্যাদি পত্রিকাগুলিও প্রকাশিত হত। উল্লিখিত পত্রপত্রিকাগুলিতে যে সমস্ত কবি-সাহিত্যিকরা লিখেছিলেন তার কোন তালিকা এই মুহূর্তে দেওয়া সম্ভব নয়।

পুরুলিয়ার মাটিতে হিন্দি সাহিত্যচর্চার প্রসঙ্গ যদি আমরা উত্থাপন করি তাহলে প্রথমেই যে নামগুলি উল্লেখ করতে হয় সেগুলি হল—বিশ্বনাথ বুটালিয়া, পান্নালাল শুকুল, এবং সিদ্ধেশ। বিশ্বনাথ বুটালিয়া মূলত গীত ও কবিতা রচনা করেছেন। ওঁর সঙ্গে সেসময়কার কলকাতাবাসী সাহিত্যিকদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। উনি বিভিন্ন কবি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতেন এবং 'লকড় হারিন' কবিতা অবশ্যই পাঠ করতেন। ওঁর একটি কাব্য গ্রন্থ 'স্পাইক' মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। পান্নালাল শুকুল প্রধানত গল্প লিখতেন। সে সময়কার কিছু উল্লেখযোগ্য পত্রিকায় তাঁর গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। সিদ্ধেশ তাঁর ছাত্রাবস্থায় গল্প লেখা শুরু করেন। এখনও তিনি গল্প লেখা বজায় রেখেছেন। এক সময় তিনি আনন্দবাজার গোষ্ঠীর শিশু পত্রিকা 'মেলা (হিন্দি)'- র সম্পাদনা করতেন। বর্তমানে তিনি ভারতীয় ভাষা পরিষদের পত্রিকা 'ওয়াগর্থ'—এর সম্পাদকমন্ডলীর একজন। সম্প্রতি পুরুলিয়ার সঙ্গে সিদ্ধেশের সম্পর্ক অত্যন্ত ক্ষীণ।

স্বাধীনতা সংগ্রামী সত্যানারায়ণ চৌধুবী বেশকিছু নিবন্ধ ও কবিতা রচনা করেছিলেন যা সাপ্তাহিক রাঁচি টাইমস্ ও বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ষাটের দশকে আরও বেশকিছু কবি সাহিত্যিকের

নাম সংযোজিত হয়। তার মধ্যে প্রমোদ বেড়িয়ার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রমোদ বেড়িয়া গল্প ও কবিতা উভয় ক্ষেত্রেই দক্ষ। পশ্চিমবঙ্গ হিন্দি একাডেমির প্রাক্তন সদস্য। সেই সঙ্গে উনি 'সমবেত' নামের এক সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশের দায়িত্ব নেন। এই পত্রিকাটির মাত্র চারটি সংখ্যাই প্রকাশিত হয়। কিন্তু 'সমবেত'-এর প্রকাশকে কেন্দ্র করে এক উৎসাহী ও সক্রিয় সাহিত্যগোষ্ঠী গড়ে উঠে। এখনও 'সমবেত'-এর সাহিত্য আড্ডা বসে কিন্তু সেই আড্ডার জৌলুম এখন অনেকটাই কমে গেছে। প্রমোদ বেড়িয়ার বেশকিছু লেখা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। একদীর্ঘ সময় থেমে থাকার পর শ্রী বেড়িয়া আবার নতুন করে লেখালেখি শুরু করেছেন। দিনদয়াল একটু অন্য ধরনের কবিতা চর্চা ও সেই সঙ্গে ছবি আঁকার অনুশীলন করতেন। কিন্তু তাঁর এই চর্চা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। এই সময় বিজয় সরৌগীও বেশকিছু কবিতা লেখেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অল্প বয়সেই তিনি এই সংসার ছেড়ে চলে যান।

১৯১৮-র ১৫ই আগষ্ট মানভূম জেলায় জন্মগ্রহণকারী হংসকুমার তেওয়াড়ী, যাঁর শিক্ষাগ্রহণ পুরুলিয়া তথা মানভূম জেলাতেই বাংলা মাধ্যমে সম্পন্ন হয়, তিনি একজন সফল অনুবাদক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গীতাঞ্জলি', 'চোখের বালি', তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের 'গণদেবতা', বিমল মিত্রের 'সাহেব-বিবি-গোলাম';শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দেবদাস', গৃহদাহ', বড়দিদি' ; এছাড়া মনোজ বসু, শঙ্কর ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকদের বিভিন্ন রচনার অনুবাদ করছিলেন। হংসকুমার তেওয়াড়ী কতদিন পুরুলিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তা এখন অনেকটাই অনুসন্ধানের বিষয়।

পুরুলিয়া জে.কে. কলেজে আগত কয়েকজন অধ্যাপক হিন্দি সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে নিজেদের সক্রিয়ভাবে উপস্থাপন করেন। যাঁদের মধ্যে মুরুলী মনোহর সিং এবং হরনারায়ণ মিশ্র-র নাম উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া অধ্যাপক দেবেন্দ্রপ্রসাদ সিং বেশকিছু কাব্যরচনা করেন যার মধ্যে বীররস ও ব্যঙ্গ লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে। 'চেতনা' নামে তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাঁর তেজস্বী পূর্ণ কবিতা পাঠের কারণে শহরের সবাই তাঁকে 'কবিজি' নামে অভিহিত করেন। 'লোক জাগরণ ও হিন্দি সন্ত কাব্য' বিষয়ক গবেষণাপত্রের জন্য তিনি ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন।

হিন্দি সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে অন্য এক উল্লেখযোগ্য নাম হল শ্রী শ্যাম অবিনাশ, যিনি কবিতা চর্চার পাশাপাশি গল্পও লেখেন। তাঁর গল্প কবিতা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়। শ্রী অবিনাশের কাব্যগ্রন্থ 'সবকে জীবন মে' ও গল্প গ্রন্থ 'হপ্তেকা দিন' ইতিমধ্যে প্রকাশিত। তাঁর কিছু গল্পের একটি অনুবাদ পুস্তিকা 'ফাগুনের রাত' প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া শ্যাম অবিনাশ ও শঙ্কর আগ্রয়াল-এর সম্পাদনায় বুলেটিন 'সরোকার'-এর কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশিত হয় যাতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর লেখা স্থান পায়। প্রাথমিকভাবে শঙ্কর আগ্রয়াল একজন কবি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন এবং পরে তিনি লেখালেখি থেকে স্বেচ্ছাবসর নেন। বর্তমানে শ্রী আগ্রয়াল হিন্দি সাহিত্যের এক নিষ্ঠাবান ও গুণগ্রাহী পাঠক। শ্যাম অবিনাশ তাঁর কবিতা ও গল্প রচনার পাশাপাশি সম্প্রতি ইলেকট্রনিক মাধ্যমের সহযোগিতায় এক সি.ডি. পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছেন। তিনি ইতিমধ্যে কবি নির্মল হালদার ও ঝুমুর শিল্পী কুচিল মুখোপাধ্যাযকে নিয়ে দুটি সি.ডি. সংখ্যা রিলিজ করেছেন। পত্রিকা প্রকাশে বিশেষ আগ্রহ থাকার কারণে তিনি ২০০২-এর শেষের দিকে প্রকাশ করেন 'এবং প্রতিশব্দ'। তাঁর আরও একটি গল্পের বই প্রকাশের অপেক্ষায়।

পুরুলিয়া থেকে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত সংবাদ পত্রিকা হিসেবে উল্লেখ-এর দাবি রাখে 'পুরুলিয়া প্রপার' যার সম্পাদক সচ্চিদানন্দ প্রসাদ। শ্রী প্রসাদ সংবাদ পরিবেশন-এর পাশাপাশি সাহিত্য রচনায় নিয়মিত চর্চাও করে থাকেন। উনি একজন প্রশংসাযোগ্য কবি। তিনি আগে 'যুগছায়া' নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করতেন। ইন্দ্র বিকল ও কেদার মোহতাও কবিতা চর্চা করেন। সেই সঙ্গে সমসাময়িক বিষয়ের ওপর তাঁরা ব্যাঙ্গাত্মক রচনা প্রকাশ করেন।

চাকরিসূত্রে ১৯৯৩ সালে কবি রাওয়েল পুষ্প-এর পুরুলিয়া আগমন। সময়ের হিসেবে একটি দশকের মধ্যে তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও প্রচার মাধ্যমের সহযোগিতায় নিজের অবস্থানকে সুনিশ্চিত করেন। পুরুলিয়ায় আসার পর তিনি স্থানীয় কবি-সাহিত্যিকদের সহযোগিতায় 'অভিব্যক্তি নামে একটি সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা গড়ে তোলেন। 'অভিব্যক্তি'-র মাধ্যমে প্রথমে হিন্দি কবি গোষ্ঠী ও পরবর্তী সময়ে হিন্দি বাংলা ও উর্দু এই ত্রিভাষা কবি গোষ্ঠীর সূত্রপাত হয়। এরই সুবাদে হিন্দির পাশাপাশি বেশকিছু উর্দু কবির সান্নিধ্য আমরা পাই। এঁরা হলেন—হাসান পুরুলিয়া বি, তৈমুর কামার, ইউসুফ আহমেদ ইউসুফ, সালাউদ্দিন স্যারয় এবং মহঃ আসরাফ। রাওয়েল পুষ্প-এর কবিতা দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হয়। আকাশবাণী ও দূরদর্শনেও তাঁর কবিতা সম্প্রচারিত হয়ে থাকে। শ্রী পুষ্প-এর একটি কাব্যগ্রন্থের নাম 'মুঝে গর্ভ মে হি মার ডালো', যার একটি কবিতা 'পুরুলিয়া' অমিয় সেনগুপ্ত সম্পাদিত 'বিংশ শতাব্দীর মানভূমী কবিতায় স্থান পায়। পুরুলিয়ার সংস্কৃতি ও মানভূমের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিয়ে লেখা বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত। এর মধ্যে 'জনসত্তা সবরঙ'—(ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের হিন্দি সংস্করণ)-এ বেশ কয়েকটি কভার স্টোরি হিসেবে মুদ্রিত।

হিন্দি সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে আরও বেশকিছু নাম মাঝেমধ্যেই চোখে পড়ে। যেমন — মনীন্দ্র শ্রীবাস্তব, গোপাল চৌবে, শঙ্করলাল শর্মা, লালচাদ শর্মা ইত্যাদি।

পুরুলিয়ায় মহিলা হিন্দি লেখিকাদের নামের তালিকায় আবশ্যিকভাবে দুটি নাম উল্লেখযোগ্য— সুশীলা বুটালিয়া ও রেনুকা আনন্দ। একজন গৃহবধূ হয়েও রেণুকা আনন্দ সুন্দর গীত ও গজল রচনা করেন ও সুরের মাধ্যমে তা তুলে ধরেন।

পুরুলিয়ায় প্রচলিত হিন্দি সাহিত্যধারা থেকে একটু স্বতন্ত্রভাবে যদি কেউ সাহিত্যচর্চা করে থাকেন তিনি হলেন শিবেন্দ্র কুমার পান্ডে। তিনি বিজ্ঞান বিষয়ক রচনাকেই বেছে নিয়েছেন। কোল ইন্ডিয়ার একজন ভূ-বিজ্ঞানী শ্রীপান্ডে অবসর গ্রহণের পর বিগত এক দশক ধরে পুরুলিয়াতেই বসবাস করছেন। দেশের বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকায় তাঁর পর্যাবরণ, ভূগর্ভ বিজ্ঞান ও কারিগারি বিষয়ক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। যেমন পর্যাবরণ চেতনা, বিজ্ঞান প্রগতি, যোজনা ইত্যাদি। ওঁর একটি গ্রন্থ 'কয়লা কি কহানি' ভারত সরকারের প্রকাশন বিভাগ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। বিজ্ঞান লেখক হিসেবে তিনি ডঃ গোরখ প্রসাদ বিজ্ঞান পুরস্কার'-এ সম্মানিত হন। ২০০৩-এ আমেরিকার বিশ্ব হিন্দি পরিষদ থেকে প্রকাশিত 'হিন্দি মে বিজ্ঞান ভাবনা' গ্রন্থে দেশের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী যেমন প্রফেসর যশপাল, ডঃ জয়ন্ত বিষ্ণু নার্লিকার-এর সঙ্গে তাঁর একটি লেখা প্রকাশিত হয়।

হিন্দি সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে যে চিত্রটি একসময় পরিলক্ষিত হয় বর্তমানে তার এক বিপরীত চিত্র আমরা দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি। অতীতে হিন্দি কবি-সাহিত্যিকরা অত্যন্ত নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার সঙ্গে নিজেদের সৃজনশীলতাকে উপস্থাপন করেছেন। তুলনায় নতুন প্রজন্মের অনুশীলনকারী কবি

সাহিত্যিকের সংখ্যা হাতে গোনা মাত্র কয়েকজনও নেই। এভাবে চলতে থাকলে আগামী দিনে হিন্দি সাহিত্য-চর্চার ভবিষ্যৎটি অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে না তো? তবু এই বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার মধ্যেও লক্ষ্য কবি নবীন প্রজন্মের রাহুল খানুজা প্রতিষ্ঠিত গল্প পত্রিকা পাঠের প্রক্রিয়া হিসেবে সমীক্ষামূলক চিঠিপত্র লিখছেন। এই ধরনের সাহিত্য প্রয়াস নতুন প্রজন্মের মধ্য থেকে আরও সফলভাবে উঠে আসবে এই প্রত্যাশা নিয়ে আমরা আরও অনেক তরুণ ও নবীনদের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ভাষান্তর: জগন্নাথ দত্ত

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

পুরুলিয়া—তরুণদেব ভট্টাচার্য
আমাদেব পুরুলিয়া—অমিযকুমার সেনগুপ্ত
বিংশ শতাব্দীর মানভূম কবিতা—অমিয়কুমার সেনগুপ্ত
সাহিত্যকোষ—জ্ঞানমণ্ডল, বারানসী
লিটল ম্যাগ মেলাব স্মরণিকায প্রকাশিত শ্যাম অবিনাশের নিবন্ধ

পুরুলিয়ায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস

সুশান্ত হাজরা

ভারতবর্ষে তথা পশ্চিমবাংলার সীমানাব মধ্যে অক্ষহীন, প্রতিবন্ধী, একদা মানভূম জেলার একাংশ আজকের জেলা পুরুলিয়া। গুণীজন বলে থাকেন, পুরুলিয়া 'পশ্চাৎপদ'। মাদৃশ নির্গুণ ব্যক্তিগণ কিন্তু তা বলে না। বরং, আমরা বলি, পুরুলিয়া অবহেলিত। কারণ, পুরুলিয়া কাঁদে না, তাই সে মাতৃবক্ষের পীযূষধারা থেকে নিয়ত বঞ্চিত, কাজেই কিঞ্চিৎ অপুষ্ট। গ্রামাঞ্চলে, নিঃস্ব, রিক্ত, নিরক্ষর মানুষ বলেন,—'পুরুলিয়া পছিম বাংলার, কুঢ়াই পাওয়া ছেল্যা'।

বস্তুত, পুরুলিয়া জেলার মূল্যায়নের কথা অদ্যাপি কোন বিদগ্ধজন ভেবে দেখেননি। এমনকি সরকার বাহাদুরও না। তথাপি, সন্নিহিত জেলাগুলি যে হারে তাদের অগ্রগতির প্রমাণ রেখে চলেছে আমরাও কিন্তু ঠিক সেই হারেই এবং সমলয়ে এগিয়ে যেতে পারছি। তার প্রমাণ আমরা চোখ চাইলেই দেখতে পাবো। কাব্য-সাহিত্য-শিল্পের মৌলিকতায় পুরুলিয়ার জানপদী সারস্বতমনীষা নিখিল বঙ্গীয় সংস্কৃতির এক যোগ্যতর সহযোগী হিসাবে স্বীয় স্থান দাবি করার স্পর্ধা রাখে। বিদগ্ধজন, বিশেষত, উচ্চ রাজকর্মচারীগণের অবিরাম উল্লেখ সত্ত্বেও পুরুলিয়ার একমাত্র অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা ব্যতীত আর কোনো ক্ষেত্রে তার পশ্চাৎবর্তিতা পরিলক্ষিত হয় না। মানভূম পুরুলিয়ার নরনারী তাদের জীবনচর্যায় নিরক্ষরতা সত্ত্বেও ধ্রুপদী সভ্যতা, সংস্কৃতি ও কাব্য-সাহিত্যে উন্নততর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে। এমনকি বিগত শতবর্ষব্যাপী স্বদেশী আন্দোলনে এবং বহমান রাজনৈতিক প্রবাহে তাঁদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা সন্নিহিত কোনো জেলার চেয়ে ন্যূন নয়। স্ত্রী-শিক্ষার ক্ষেত্রেও মানভূম পুরুলিয়ার অবদানও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নয়। ১৮৭০/৭১ খ্রিস্টাব্দ থেকে এ অঞ্চলে শিক্ষাব্যবস্থা সূচিত হয়েছিল যার ধারা অদ্যাপি বহমান। সরকারি সূত্রে জানা যায়, ১৯০৮/০৯ খ্রিস্টাব্দে এতদ্‌অঞ্চলে স্ত্রী-শিক্ষার জন্য ২৯টি বিদ্যালয় চলিত ছিল। জেলা শহরেও ছিল 'পুরুলিয়া হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় ও একটি 'মক্তব'।

১৯১৬ থেকে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দেশবন্ধু ভগিনী শ্রীমতী অমলা দাস স্বীয় গৃহেই সর্বপ্রথম বয়স্কা মহিলাগণকে শিক্ষিত করার প্রয়াসে একটি বিদ্যালয় গড়ে তোলেন।

১৯৩৪/৩৫ খ্রিস্টাব্দে র‍্যাডিক্যালিস্ট শ্রীযুক্ত হরিপদ রায় মহাশয়ের বিদ্যোৎসাহী পিতৃদেব শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র রায় মহাশয়ের কোচিং ইন্সটিটিউশনে বয়স্কা মহিলাগণকে শিক্ষিত করার সুবন্দোবস্ত করা হয়েছিল। বহু মহিলা সেখান থেকে ম্যাট্রিক পাসও করেছিলেন।

অধুনালুপ্ত 'প্রবাসী' মাসিক পত্রিকার ১৩৪১ ভাদ্র সংখ্যার ৭৫৫ পৃষ্ঠার পত্রিকা লিখছেন—"পুরুলিয়ার হরিপদ দাঁ মহাশয় যে যে বালক-বালিকা বৎসরে ন্যূনকল্পে দশজন লোককে লিখন-পঠনক্ষম করিয়াছিল তাহাদিগকে স্বর্ণপদক দিয়াছিলেন।" সাক্ষরতা অভিযানের এই অগ্রপথিক শ্রদ্ধেয় হরিপদ দাঁ মহাশয়ের সামাজিক দিনচর্যার ক্ষেত্রে এরূপ আরও বহুতর দানে সমৃদ্ধ পুরুলিয়ার সাংস্কৃতিক অঙ্গন।

সেই ধারাকে অনুসরণ করেই আজকের পুরুলিয়া জেলা নব নব সৃষ্টির প্রয়াসে নিয়ত নানা আন্দোলনের পথিকৃৎ। যুগান্তরের সেই সার্বিক সিসৃক্ষার এক ক্ষুদ্র খণ্ড এই 'গ্রন্থাগাব আন্দোলন'।

মানভূম-পুরুলিয়ায় এই গ্রন্থাগার আন্দোলন কবে, কোন কালে সূচিত হয়েছিল তা এই প্রতিবেদকের জানা নেই। তবে, এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে। মানভূমের জেলা সদর কার্যালয় পুরুলিয়ায় স্থানান্তরিত হবার পর, সরকারি দপ্তর গৃহ নির্মাণ হলে—কালেক্টরীতে একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়, যা মূলত সরকারি প্রকাশনা ও আইন বিষয়ক পুস্তকাদি নিয়ে। যেটি অদ্যাপি বর্তমান এবং যেহেতু জেলা সদর কার্যালয় ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে পুরুলিয়ায় স্থানান্তরিত করা হয়েছিল, সেহেতু অনুমিত হয় যে, উক্ত গ্রন্থাগার উক্ত সময়ের সমকালেই স্থাপিত হয়েছিল। অর্থাৎ আনুমানিক ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে।

পূর্বকালে পুরুলিয়া শহরের বুকে (বর্তমান চিত্তরঞ্জন হাই ও এম. এম. হাই স্কুলের জমির ওপর) 'ইউরোপিয়ন ক্লাবের' একটি গ্রন্থাগার ছিল। ১৯৪২ সালের পর সে ক্লাব উঠে গেলে তার কিছু পুস্তক হরিপদ সাহিত্য মন্দির ও স্থানীয় ইউনিয়ন ক্লাবে স্থানান্তরিত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে একটি গ্রন্থাগারের সন্ধান পাওয়া যায়। জেলা শহরের অন্তর্গত আমলাপাড়ায় একটি গ্রন্থাগার প্রচলিত ছিল। যার নাম ছিল 'রায় লাইব্রেরি'। তার গৃহটি আজিও বর্তমান। সেই গ্রন্থাগারে জনৈক শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র মুখার্জী ৮-৩-১৯০০ 'অশ্রু সঞ্জম' নামে একটি পুস্তক উক্ত 'রায় লাইব্রেরি'কে দান করেছিলেন। বইটির প্রথম পৃষ্ঠায় সেই লিপি অদ্যাপি বিদ্যমান। সুতরাং অনুমানে বাধা নেই যে গ্রন্থাগারটি ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বেই স্থাপিত হয়েছিল। বস্তুত গ্রন্থাগারটির জন্ম সাল ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দ।

বিংশ শতকের প্রথম পাদ থেকে জেলা-শহরে দু-একটি গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব জানা যায়। "বান্ধব-সান্ধ্য-সম্মেলনী" নামক একটি প্রাচীন স্থানীয় নাট্যসংস্থায় একটি গ্রন্থাগার ছিল। ঐ সংস্থাটির শেষ অধ্যায়ে তার দায় ও দায়িত্ব একমাত্র জীবিত সভ্য শ্রীযুক্ত হরিশ দে মহাশয়ের উপর বর্তেছিল। তিনি মুনসেফ্‌ডাঙ্গার অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পরিবারের লোকজন আজও সেখানে বসবাস করছেন। গ্রন্থাগার ছিল মূলত নাটকগ্রন্থ সংগ্রহের আধার।

১৯০৮/৯ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত ইউনিয়ন ক্লাবের গ্রন্থাগার ছিল বলে শুনেছি। সে গ্রন্থাগার উঠে গেলে তার সমুদয় পুস্তক হরিপদ সাহিত্য-মন্দিরে দান করে দেওয়া হয়। সম্পাদক ডা. অনিল গুপ্তের আমলে। ইউনিয়ন ক্লাবের ইত্যকার বদান্যতার প্রতিদানস্বরূপ ইউনিয়ন ক্লাবের সম্পাদককে পদাধিকারবলে সাহিত্য-মন্দিরের দাতা সদস্যরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হল।

স্বদেশি যুগের পরিমণ্ডলে মানভূম জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে স্বদেশি ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে কিছু গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে একান্তভাবে জনসাধারণের উদ্যোগে ও আর্থিক সহযোগিতায়। তারই

মধ্যে পুরুলিয়া শহরে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে জন্ম নিয়েছিল আজকের এই 'হরিপদ সাহিত্য মন্দির'। কালের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে পুরুলিয়ার বুকে তার দীর্ঘ ৮২ বৎসরের পরিক্রমার এরূপ সার্থক উত্তরণ পশ্চিম বাংলার জেলান্তরে বিরল। এই বিগত দীর্ঘ সময়ের দুস্তর সাধনায় এই গ্রন্থাগারে গড়ে উঠেছে তার 'ভ্রাম্যমান শাখা' এবং একটি মূল্যবান 'সংগ্রহশালা'। যথাক্রমে ১৯২৮ ও ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে। যা পশ্চিমবাংলা তথা ভারতের জেলান্তরেও অনিবিড়। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সাহিত্য মন্দিরের এই সংগ্রহশালাটি বিগত ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে আন্তর্জাতিক (International Council of Museums) স্বীকৃতি পেয়েছে। সবকিছু মিলিয়ে তাই আজ রাজ্য তথা জাতীয়স্তরে হরিপদ সাহিত্য মন্দির একটি গৌরবোজ্জ্বল নাম—যার জন্ম এই তথাকথিত পশ্চাৎপদ পুরুলিয়ার মাটিতেই। 'কুড়্যাই পাওয়া ছেল্যা'র রাজৈশ্বর্যের একটি টুকরো।

স্বদেশি আমলের সাতুড় থানার অন্তর্গত রামচন্দ্রপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার চক্রবর্তী মহাশয়ের প্রযত্নে যে গ্রন্থাগারটি গড়ে উঠেছিল, ইংরেজ জমানায় তা অগ্নিদাহ ভস্মলাশ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে সরকার পোষিত হয়ে পুনরায় 'নেতাজী গ্রন্থাগার' নামে আত্মপ্রকাশ করে।

১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে শহরের কেন্দ্রে বড়মসজিদের সংলগ্ন গৃহে জেলা তথা শহরের একমাত্র মুসলিম লাইব্রেরি গড়ে ওঠে, যেটি অদ্যাপি সুপরিচালিত।

এ ছাড়াও পুরুলিয়ার মফঃস্বল অঞ্চলে আরও কিছু গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল ইংরেজ আমলেই। ১৯২১/২২ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূত্রে 'বিদেশি বর্জনের কর্মসূচি অনুযায়ী সকল স্থানের মতো ঝালিদাতেও 'সরস্বতী মন্দির' নামে একটি জাতীয় বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে উক্ত নামেই সেখানে একটি পাঠাগার জন্ম নেয়। শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার চক্রবর্তী মহাশয় উক্ত পাঠাগারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন বলে জানা যায়।

এভাবেই নানা উত্থান-পতনের বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয়ে আসছিল জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলন। ভারতের কয়েকটি প্রদেশে তখন কংগ্রেসী সরকার গড়ে উঠেছিল। বিহার তারই অন্যতম। বিস্মৃত মানভূম-জেলা তখন বিহারের অন্যতম জেলা হিসাবে পরিচিত ছিল। কিন্তু, বিহারের তদানীন্তন কংগ্রেসী সরকারও সে সময় মানভূম-পুরুলিয়ার প্রতি যথোচিত সহৃদয় ব্যবহার করেননি। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে দিল্লিতে গান্ধী বধের পর থেকেই বিহার সরকার মুখ্যত রাজতন্ত্রীয় আচরণে অভ্যস্ত হয়ে পড়লেন। বিহারের উগ্র হিন্দিবাদ মানভূম-সিংভূম অঞ্চলে নিরন্তর বঙ্গভাষী অধিবাসীগণকে পর্যুদস্ত করতে থাকল। যেহেতু এ অঞ্চল বঙ্গ সংস্কৃতির শাশ্বতক্ষেত্র, সেই হেতু, মানভূম বিহারের চক্ষুশূল রূপে পরিগণিত হয়ে ওঠে। চির-প্রচলিত বঙ্গসংস্কৃতির পরে আঘাত হানতে সরকার প্রথমেই জেলার গ্রন্থাগারগুলিকেই তাঁদের লক্ষ্যবস্তু স্থির করলেন। জেলা শহরের তথা গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির প্রতি নানা আদেশ-প্রত্যাদেশে নিয়ত জর্জরিত করা হতে থাকল। ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থগারগুলি, যারা কোনোমতে আপন অস্তিত্ব বজায় রেখে চলছিল—তাদের তাৎক্ষণিক অবলুপ্তি অবধারিত হল। কিন্তু জেলাসদরের ঐতিহ্যমণ্ডিত সর্বজনপ্রিয় 'হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের উন্নত শিরকে অবনমিত করা গেল না। জেলা তথা শহরবাসীর প্রাণের সম্পদ এই গ্রন্থাগারের দেহ স্পর্শ করার সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারলেন না বিহার সরকার। কিন্তু, সংযতও হলেন না। সৃষ্টি করলেন 'স্টেট লাইব্রেরি'। বিনা শুল্কে সেখানে গ্রন্থাগার ব্যবহার করা যাবে বলে ঘোষিত

হল। ভবতারণ সরকার রোডে কলিকাতাবাসী শ্রীযুক্ত শিশির মজুমদার মহাশয়ের বাড়ি খরিদ করে (১৯৫০?) প্রচুর হিন্দি পুস্তক সম্বলিত স্টেট্ লাইব্রেরি চালু হল। কর্মচারী নিয়োগ ও অবৈতনিক পাঠাগার বহুতর পত্র-পত্রিকা (প্রধানত হিন্দি) আমদানি করা হলেও পুরুলিয়ার আত্মসচেতন মানুষ তা সর্বতোভাবে প্রত্যাখ্যান করে।

১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১লা নভেম্বর রাজ্য-পুনর্গঠন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী নিহত মানভূমের কর্তিত অংশ 'পুরুলিয়া জেলা' নামে আত্মপ্রকাশ করল এবং পশ্চিমবাংলার সঙ্গে যুক্ত হল, অন্যদিকে সনাতন মানভূম জেলা দেশের মানচিত্র থেকে চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে গেল। অতঃপর ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে উক্ত পশ্চিমবাংলা সরকার কর্তৃক পোষিত হয়ে 'জেলা গ্রন্থাগার' নামে পরিচিত হল। বাংলা সরকার অনুদান দিলেন—১২,০০০ টাকার পুস্তকরাশি, ১৫,০০০ টাকার আসবাব, গ্রামীণ পরিষেবার জন্য ২৫,০০০ টাকা মূল্যের মোবাইল ভেন এবং অপেক্ষাকৃত স্বল্প বেতনে ১০ জন কর্মচারী। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত গ্রন্থাগার গৃহ বাবদ কোন অর্থ মঞ্জুর করা হল না। এই জেলা সমাজ শিক্ষা বিভাগের মাধ্যমে সরকার সমগ্র জেলায় গ্রন্থাগার আন্দোলন ছড়িয়ে দিলেন। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ৩৮টি গ্রামীণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হল—নিতান্ত আর্থিক সীমাবদ্ধতায়। প্রতি গ্রন্থাগারকে পুস্তক ও আসবাবের জন্য মঞ্জুর করা হল বৎসরে ৬০০ টাকা মাত্র। মাসিক ৭৫ টাকা ও ৪০ টাকা হারে যথাক্রমে একজন গ্রন্থাগারিক ও একজন সাইকেল পিওন দেওয়া হল। স্থানীয় জনসাধারণ জমি দান করলে ও নগদে ২০০০ টাকা ব্যয় করলে সরকার থেকে গৃহ নির্মাণের জন্য আরও ৩০০০ টাকা অনুদান এবং বই ও আসবাবপত্রের জন্য মাত্র ১০০০ টাকা দেওয়া হত। কিন্তু বর্তমান সরকার নিজস্ব জমি থাকলেই এবং বিধিমতো প্রয়োজনীয় দলিলপত্র দাখিল করতে পারলে গ্রন্থাগার গৃহ নির্মাণের সমুদয় অর্থ দিচ্ছেন। ফলে এই জেলায় সরকারি অনুদানে ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি গ্রন্থাগার ভবন নির্মিত হয়েছে। পঞ্চায়েতের উদ্যোগেও কয়েকটি ভবন হয়েছে। বর্তমানে ৭/৮ গ্রন্থাগার ব্যতীত প্রত্যেকটি গ্রন্থাগারে ভবন নির্মিত হয়েছে এবং বেশ কয়েকটি গ্রন্থাগারের ভবন সম্প্রসারিত হয়েছে।

১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে তদানীন্তন শিক্ষা ও গ্রন্থাগার মন্ত্রকের আনুকুল্যে ৭৫টি গ্রামীণ শহর ও মহকুমা-কেন্দ্রিক গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। 'জেলা গ্রন্থাগার উপদেষ্টা সমিতি' ও 'স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যক' গঠিত করে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে গতিশীল করার প্রয়াস করা হল। এখানে উল্লেখ থাকে যে, জেলা গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য যে 'তদর্থক পুরাতন জেলা গ্রন্থাগার সমিতি' গঠিত হয়েছিল, স্বনামধন্য শ্রী অশোক চৌধুরী মহাশয় সে সমিতির সভ্য ছিলেন এবং বলা যায় তিনি এই জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের একজন অন্যতম পথিকৃৎ।

১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের পর অযোধ্যা পাহাড়ে প্রতিষ্ঠিত হল সরকারি গ্রন্থাগার। অতঃপর বাগমুণ্ডি, মানবাজার, বান্দোয়ান প্রভৃতি দূরবর্তী অঞ্চলে ধীরে ধীরে আরও অনেক গ্রন্থাগার স্থাপিত হতে থাকল। শ্রীযুক্ত নকুল চন্দ্র মাহাতো মহাশয়ের প্রস্তাবানুযায়ী দুই গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি—'এই হারে গ্রামীণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হতে থাকে। ফলে সমগ্র জেলাতে গ্রন্থাগার আন্দোলন গতিপ্রাপ্ত হয়।

কয়েক বৎসর পূর্বে বেসরকারি, অপোষিত গ্রন্থাগারগুলিকেও পুস্তক অনুদান দেওয়া হত।

সেরূপ গ্রন্থাগারের সংখ্যা ছিল ৩৭/৩৮। কিন্তু বর্তমানে তাদের সংবাদ আর জানা যায় না। তবে, সাঁওতালডির নিকটস্থ 'বগড়া', আনাড়ার সন্নিহিত 'বাসুদেবপুর', আদরার 'মুক্তদল পাঠাগার', মানবাজারের প্রতিবেশে 'মধুপুর গ্রাম', গ্রন্থাগার', হুড়ার কাছে 'ডমনকিয়ারী বিবেকানন্দ পাঠাগার, বাগমুণ্ডি সম্মিলনী গ্রন্থাগার, গোলামারার আজাদ হিন্দ তরুণ গ্রন্থাগার, নডিহা জমানাথ স্টিক গ্রন্থাগার, নব কিশলয় গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব অদ্যাদি বর্তমান। এছাড়া, ঝালিদার হরিজন পুস্তকালয়, রঘুনাথপুর সন্নিকটে মঙ্গলদা গ্রামে 'সুকান্ত পাঠাগার', পুরুলিয়া শহরের কয়েকটি ক্লাবে গণসংগঠনের প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার আছে। শহরের চিত্তরঞ্জন পাঠাগার', নডিহার 'পাঠচক্র' (মূলত পাঠ্যপুস্তকের আসর) , স্টুডেন্টস হেলথ হোমে অবস্থিত 'মৌনী স্মৃতি পাঠাগার', এবং পুরুলিয়া শহরের সরকারি কর্মচারীগণের (W B M O A) প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার। এই গ্রন্থাগারটির নাটক-গ্রন্থের সংগ্রহ প্রশংসনীয় ও আদ্রার পাশে অতি সম্প্রতি কাঁটারাঙ্গুনীতে একটি গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে।

১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থাগার আইন পাশ হওয়ার পর জেলাস্তরে গ্রন্থাগার অনুদান বহু পরিমাণে বর্ধিত করা হয়। সেই সঙ্গে কর্মীগণের বেতন বৃদ্ধি যেমন হল, তেমনি চাকুরিক্ষেত্রে তাঁদের মর্যাদাও বৃদ্ধি পেল। তাঁরা শিক্ষকগণের সম-মর্যাদায় উন্নীত হলেন। ১৯৯৮/৯৯ থেকে উক্ত অনুদানের হার (কর্মীদের বেতন ছাড়া) গ্রামীণ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে বার্ষিক ১১,০০০ টা, শহরের ক্ষেত্রে ২৭,০০০ টাকা ও জেলা গ্রন্থাগারে ৯০,০০০ টাকা করা হয়েছে। বর্তমানে এমন কোন পঞ্চায়েত সমিতি নেই যেখানে ন্যূনতম ৪টি গ্রামীণ গ্রন্থাগার নেই। কোন কোন পঞ্চায়েত সমিতিতে ৭টি গ্রন্থাগার আছে।

গ্রামাঞ্চলে গ্রন্থাগার গৃহ নির্মাণের জন্য সকল প্রকার আবেদন অতি যত্ন সহকারে পরীক্ষার পর গৃহ-নির্মাণের অর্থ মঞ্জুর করা হতে থাকল। বহু গ্রন্থাগার ইতিমধ্যে তাঁদের গৃহ নির্মাণ করেও নিয়েছেন। বিগত ১১টি 'বইমেলা'র মাধ্যমে সরকার গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিকে সাধ্যমতো পুস্তক সরবরাহ করেছেন। সম্প্রতি সাংসদ (M.P. কোটা) যথাংশ থেকে সর্বশ্রী বাসুদেব আচারিয়া ও বীরসিং মাহাতোর উদ্যোগে বেশ কয়েকটি গ্রামীণ গ্রন্থাগারকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে (২০০৩ খ্রিঃ) পুরুলিয়া জেলায় গ্রন্থাগারের সংখ্যা মোট ১১৮টি। তার মধ্যে গ্রামীণ গ্রন্থাগার ১১১টি, শহর / মহকুমা গ্রন্থাগার ৫টি, জেলা গ্রন্থাগার ১টি এবং সরকারি গ্রন্থাগার ১টি।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের ঈদৃশ অগ্রগতি সত্ত্বেও বর্তমানে গ্রন্থাগারকেন্দ্রিক কর্মতৎপরতার কিঞ্চিৎ ব্যত্যয় ঘটছে। মানভূম-পুরুলিয়ার গ্রন্থাগার আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় লক্ষ করা যায় যে, বিগত ১৯২১/২২ সাল থেকে সদর গ্রন্থাগার হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের বার্ষিক উৎসবগুলি নিয়মিত প্রতিপালিত হয়ে এসেছে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এর মধ্যে ১৯৫৭ ও ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের 'বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন', সাহিত্যে মন্দিরের সুবর্ণ জয়ন্তী ও বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন (১৯৭৪) প্রভৃতি রাজ্যস্তরের বড় বড় অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছে। ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দের পর 'বঙ্গীয় গ্রন্থাগাব রাজ্য সম্মেলন'ও অনুষ্ঠিত হয়েছে এখানকার সারস্বত মনীষার পরিমণ্ডলে। যার উদ্যোক্তা ছিলেন সর্বশ্রী নকুল চন্দ্র মাহাত, নিখিল মুখার্জী, অশোক চৌধুরী, মহাদেব মুখোপাধ্যায়, নিশিকান্ত মেহেতা প্রমুখগণ। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দ থেকে তৎপরবর্তী ৫০ বৎসর যাবৎ নিয়মিত হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের বার্ষিক অনুষ্ঠানগুলিতে একমাত্র শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যতীত এমন কোন কবি-

সাহিত্যিক-প্রাবন্ধিক সে সময় পশ্চিমবাংলায় ছিলেন না যিনি আমাদের সাহিত্য মন্দিরকে গৌরবান্বিত করেননি। দেশপ্রসিদ্ধ গায়ক-নর্তক এমনকি শ্রেষ্ঠ যাদুকরগণও সাহিত্য মন্দিরের অঙ্গনকে একদা ধন্য করেছিলেন। কিন্তু, পরম পরিতাপের বিষয় হল যে, সেই ১৯৭০/৭২ সালের পর থেকে পুরুলিয়ায় গ্রন্থাগারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও যতটা জনপ্রিয় করা যেত ততটা করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু বর্তমান সরকার এক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গ্রন্থাগারগুলিকে জনমুখী করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ কর্মীদের বেতনবৃদ্ধি, নিয়মিত বেতন ও পেনশন প্রদান, সর্বস্তরের গ্রন্থাগারের প্রভূত পরিমাণ অনুদান বৃদ্ধি পৃথক গ্রন্থাগার মন্ত্রীপদের সৃষ্টি, গ্রন্থাগার অধিকর্তা ও উপ-গ্রন্থাগার অধিকর্তা নিয়োগ ও জেলায় জেলায় জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিকের পদসৃষ্টি, যা অন্য রাজ্যে বিরল। তবু গ্রন্থাগারগুলি অতীতে অনুষ্ঠান করতে পারত সাধারণের নিকট থেকে সংগৃহীত অর্থের সহায়তায়, অর্থাৎ মূলত চাঁদার সাহায্যে। কিন্তু, বর্তমানের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং সাধারণ মানুষের অর্থকৃচ্ছ্রতার ও অনীহার কারণে অর্থসংগ্রহ কঠিন হয়ে পড়েছে। সরকারি অনুদানের পরিমাণও যথেষ্ট না হওয়ায় এরূপ অনুষ্ঠানাদি প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে জনপ্রিয়তা হ্রাস পাচ্ছে।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের এরূপ ধারাবাহিকতা ও সামগ্রিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কিন্তু গ্রন্থাগারের সঠিক মূল্যায়ন করে উঠতে পারা যায়নি বলেই অনুমিত হয়। সরকার যে হারে অর্থব্যয় করছেন তাতে পাঠক-সাধারণ কতখানি পরিতৃপ্ত ও উপকৃত হচ্ছেন সে কথা অবগত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কারণ, কয়েকটি মাত্র গ্রন্থাগার ব্যতীত অধিক সংখ্যাকেই বিগত ২২ বৎসরে পাঠক ও সদস্য সংখ্যা যতটা বৃদ্ধি পাওয়া উচিত ছিল তা পায়নি। পুস্তকের আদান-প্রদান ও উৎসাহব্যঞ্জক নয়। গ্রন্থাগারে পাঠকগণের দৈনিক গড়-উপস্থিতি নিতান্ত হতাশাজনক। যদিও পুস্তকের প্রতি মানুষের আগ্রহ বর্ধিত করার জন্য বিগত ১৮টি বইমেলার সাহায্যে যে প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে, তাতেও বিশেষ ফললাভ হয়নি। এ ত্রুটির জন্য সমগ্র দায়-দায়িত্ব গ্রন্থাগার কর্মীর পরে আরোপ করে দিলেই মূল সমস্যার সমাধান হবে না। গ্রন্থাগার সম্পর্কে সাধারণ মানুষের চেতনার একান্ত অভাব আছে। দু দিন স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকলে তার কারণ সম্বন্ধে মানুষ জিজ্ঞাসু হয় কিন্তু গ্রন্থাগার বন্ধ থাকলে মানুষ ভ্রূক্ষেপও করেন না। জেলাস্তরে অনুসন্ধানে জানা যায় এসব কথা ও কাহিনী। যে মানসিকতা থাকলে জনসাধারণের গ্রন্থাগার সম্বন্ধে এরূপ সচেতনতা ও আগ্রহ যথার্থভাবে প্রকাশ পাবে—সেইরূপ বাতাবরণ আমরা এখনও সৃষ্টি করে উঠতে পারিনি। গ্রন্থাগার কমিটিগুলিতেই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আছে। কমিটির সভ্যগণের সভায় উপস্থিত হওয়ায় অনীহা ও নিষ্ক্রিয়তার প্রবণতা গ্রন্থাগারের কর্মসূচি রূপায়ণে দুস্তর বাধা সৃষ্টি করে। দলমত নির্বিশেষে, সর্বস্তরের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, গণ-সংগঠন, কর্মচারী সংগঠন ও শিক্ষিত সমাজ যুগপৎ অগ্রসর না হলে ঈদৃশ বৃহৎ কর্মসার্থকতা লাভ করতে পারেনা। জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিককে আরও গতিযুক্ত হতে হবে। গ্রন্থাগারগুলির পরিদর্শন নিয়মিত ও আবশ্যিক করে তুলতে হবে। জেলা আধিকারিককে এজন্য সর্বপ্রযত্নে উপযুক্ত উপকরণ ও সরঞ্জামে সজ্জিত করাও প্রয়োজন। 'স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যক' এবং জেলাধীশের সতত সক্রিয় হস্তক্ষেপ গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সুস্থসবল করে তুলতে পারে। জেলার গ্রন্থাগার আধিকারিকের পৃথক দপ্তর (Office) হওয়া দরকার।

গ্রন্থাগার আন্দোলনকে বস্তুত চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা সমীচীন হবে না।

এর বহিরঙ্গ বেষ্টন করে বহুতর আঙ্গিক থাকে। যেমন, সাংস্কৃতিক পরিকাঠামো ও তার প্রকাশ, পুস্তক গ্রন্থণা ও পত্র-পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশনা। নিরক্ষরতা দূরীকরণও এ আন্দোলনের এক অগ্রগণ্য বিষয়। জেলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিষয় পূর্বেই বিবৃত হয়েছে। পুস্তক-গ্রন্থণায় এবং পত্র-পত্রিকা প্রকাশনে মানভূম-পুরুলিয়ার ইতিহাসও গৌরবময়। শতাধিক বর্ষের পুস্তক গ্রন্থণার ধারা তথা পত্র-পত্রিকার প্রকাশনার প্রবাহ অদ্যাপি পরিপূর্ণ আবেগে বয়ে চলেছে। সার্বিক সাক্ষরতাতেও পুরুলিয়া জেলা তার হার বৃদ্ধি করে নিয়েছে বহুলাংশে। প্রাক্তন গ্রন্থাগার মন্ত্রী মাননীয়া শ্রী তপন রায় মহাশয়ের আমলে গ্রন্থাগার পরিষেবার সার্বিক উন্নতির জন্য বেশ কয়েকটি আদেশ বার হয়েছিল তন্মধ্যে প্রতিটি গ্রন্থাগারে নিয়মিতভাবে প্রতি তিনমাস অন্তর পাঠক-পাঠিকা ও গ্রন্থাগার পরিচালিত সমিতির সদস্যদের নিয়ে আলোচনা সভা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তা কিন্তু চালু করা সম্ভব হয় নাই। সেটা অবিলম্বে চালু করা হউক এবং পাঠক-পাঠিকাদের মতামত নিয়ে পুস্তক নির্বাচন করা হউক এবং সবথেকে বড় কথা এই নব-সাক্ষরগণকে গ্রন্থাগারমুখী করে তুলতে না পারলে গ্রন্থাগার আন্দোলনও পূর্ণ সফলতা লাভ করবে না বলেই মনে হয়।

পরিশেষে, সবিনয়ে এই প্রস্তাব দেওয়া যেতে পারে যে, শিক্ষাজগতের অপরাপর ধারার মতো গ্রন্থাগার কর্মীদেরও রাষ্ট্রপতি পুরস্কার না হোক, রাজ্যস্তরে অথবা জেলাস্তরে তাঁদের পুরস্কৃত করণের কথা চিন্তা করা হোক এবং স্থানীয় বেসরকারি ও অ-পোষিত গ্রন্থাগারগুলিকেও নিরপেক্ষভাবে বার্ষিক অনুদান দেবার কথা সরকার বাহাদুর চিন্তা করুন। কয়েক বছর পূর্বে পুরাতন গ্রন্থাগার অর্থাৎ যাদের একশত বৎসর, পঞ্চাশ বৎসর ও ২৫ বৎসর পূর্ণ হয়েছে বিশেষ অনুদান দেওয়া হয়েছিল। এ বছর তা আবার চালু হয়েছে। হরিপদ সাহিত্য মন্দির, সুকান্ত পাঠাগার, ঝালদা বি. এফ ক্লাব গ্রন্থাগার ও গোলামারা গ্রন্থগার এই অনুদান পেয়েছে। বহু পদ গ্রন্থাগারে খালি আছে তা অবিলম্বে পূরণ করতে হবে এবং পুরুলিয়া জেলা গ্রন্থাগারে পৃথক শিশু-বিভাগ, পাঠ্যপুস্তক বিভাগ এবং নব সাক্ষরদের বিভাগ চালু করার চেষ্টা করতে হবে। তাছাড়া ভ্রাম্যমান গ্রন্থযানের মাধ্যমে পূর্বে যেমন গ্রামীণ গ্রন্থাগার ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী গ্রন্থাগারগুলিকে পুস্তক ঋণ দেওয়া হত তা শুরু করার কথা জেলার স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যক ভাববেন এই অনুরোধ করছি। এছাড়া ১৯৮০ খ্রিঃ পর্যন্ত গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির চতুর্থকর্মীর মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে বই দেওয়া হত। সেই ব্যবস্থার প্রচলন হওয়া প্রয়োজন।

১৯৯০ খ্রিঃ এরপর হরিপদ সাহিত্য মন্দির ও জেলা গ্রন্থাগারের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের নতুন ভবন নির্মিত হয়েছে। পুরাতন ভবনের সংস্কার ও সম্প্রসারণ করা হয়েছে। শিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আবক্ষ মূর্তি স্থাপন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাজ। পাশাপাশি পুস্তকের সংখ্যা ও পড়ুয়াদের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। নিয়মিতভাবে সাহিত্য সভা, কবি সম্মেলন সেমিনার ও বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হচ্ছে ফলে হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের জনপ্রিয়তা বেড়েছে। মানভূম ইতিহাস বিষয়ক শিবির সংগঠিত করার ফলে এই প্রতিষ্ঠানের সুনাম বেড়েছে। হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের এরূপ উন্নতির পিছনে রয়েছেন শ্রী হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী নিলয় মুখার্জি। এই দুজনের নিরলস পরিশ্রম ও প্রচেষ্টায় হরিপদ সাহিত্য মন্দির পশ্চিমবঙ্গে এক বিশেষ স্থান অধিকার করার কৃতিত্ব অর্জন করেছে, এককথায় বলা যায় লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে এনে দেওয়া।

জেলা গ্রন্থাগারের এই সময়কালে যথেষ্ট উন্নতি পরিগণিত হয়। নতুন ভবন নির্মাণ, পুরাতন ভবনের সংস্কার ও সম্প্রসারণ ঘটানো হয়েছে। পুস্তক সংখ্যা ও পত্র-পত্রিকার সংখ্যা বেড়েছে। পড়ুয়াদের উপস্থিতি ও পড়ার হার অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রচুর পাঠ্যপুস্তক ক্রয় করা হয়েছে। বৃত্তি সহায়ক, বিভাগ খোলা হয়েছে। এই বিভাগে ৮০,০০০ টাকার বই কেনা হয়েছে। W.B.C.S পরীক্ষার কোচিং ক্লাস শুরু হয়েছে। জেলা গ্রন্থাগার ও হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের সর্বপ্রকার উন্নতির জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন শ্রী দেবপ্রসাদ জানা আই.এ.এস জেলা সমাহর্তা মহাশয়। তাঁর এই অবদানের কথা এই জেলার মানুষ সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করবে। এ বছর (২০০৩ খ্রিঃ) ১৭-তম বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল তা জেলাবাসীর নজর কেড়েছে। বর্ণাঢ্য সুসজ্জিত বিশাল মিছিল, মেলা কয়দিন জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি, প্রথিতযশা সাহিত্যিক, কবি ও শিল্পীদের অংশগ্রহণে বইমেলা হয়েছিল অভূতপূর্ব। শতাধিক পুস্তক প্রকাশনাগুলির যোগদান, প্রতিদিন কয়েক হাজার মানুষের উপস্থিতিতে বইমেলা এক উৎসবে পরিণত হয়। এই বইমেলাকে সফল করার জন্য শ্রী প্রসাদ জানা, জেলা সমাহর্তা মহাশয়ের অবদান মানুষের মনে গভীর দাগ কেটেছে। আমাদের জেলায় ১৭০টি গ্রামপঞ্চায়েত আছে, গ্রন্থাগার আছে ১১৮টি। ৫২টি গ্রামপঞ্চায়েতে গ্রামীণ গ্রন্থাগার নেই। অনুরূপভাবে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে দেড় হাজার গ্রামপঞ্চায়েতে কোন গ্রন্থাগার স্থাপিত হয় নাই। এসব অঞ্চলের মানুষকে গ্রন্থাগারের আওতায় আনার জন্য জন-গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র নামে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন রাজ্য সরকার। তার প্রথম ধাপ হিসেবে পুরুলিয়া জেলাতে কুড়িটি এইরূপ কেন্দ্র খোলা হয়েছে যেগুলি পরিচালিত হচ্ছে জেলা পরিষদের মাধ্যমে। পরিশেষে বলা যায়, বিভিন্ন সময়োপযোগী ও বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ ও তার রূপায়ণের ফলস্বরূপ পুরুলিয়া জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলন রাজ্যে এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, জেলা শাখা ও পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির সক্রিয় সহযোগিতা এ জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলনকে গতিশীল করেছে। পুরুলিয়া জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথিকৃৎ ছিলেন প্রয়াত অশোক চৌধুরী। তাঁর প্রয়াণে গ্রন্থাগার আন্দোলন বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। বর্তমানে শ্রদ্ধেয় নিখিল মুখার্জি জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য যেভাবে পরিশ্রম কবে চলেছেন ও সাহায্য করেন তা প্রশংসার দাবি রাখে। বর্তমান গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম রূপকার ও প্রাণপুরুষ নিখিল মুখার্জি। আমার বিশ্বাস শ্রদ্ধেয় নিখিলবাবুর সক্রিয় সহযোগিতায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের গৌরবময় জয়যাত্রা অব্যাহত থাকবে।

পুরুলিয়ার পত্র-পত্রিকা

জগন্নাথ দত্ত

সংবাদপত্রসহ পুরুলিয়া জেলার পত্রপত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রটি নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা প্রকৃতপক্ষে এক দুরূহ কাজ। দুরূহ এই অর্থে যে পুরুলিয়া যখন পুরুলিয়া হয়ে ওঠেনি, প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে ব্রিটিশ শাসনাধীন এই ভূখণ্ড যখন ক্রমাগত বিবর্ধিত হয়েছে সামাজিক, রাজনৈতিকভাবে, তখনই এই মাটি ও মানুষের ভাষা ও ভাবনার প্রতিফলন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে। ১৯৫৬-তে খণ্ডিত মানভূম পুরুলিয়া নামে অভিহিত হল। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় এটা। পত্র-পত্রিকা প্রকাশের প্রক্রিয়াটি কিন্তু বিগত ঊনবিংশ শতাব্দীতেই সূচিত হয়েছিল যথাযোগ্যভাবে। বজ্রভূমি থেকে মঙ্গলমহল, মানভূম ও মানভূম থেকে পুরুলিয়া—এই দীর্ঘ পরিক্রমায় পত্র-পত্রিকা প্রকাশের ইতিহাস মাত্র শতবর্ষ প্রাচীন।

তথ্য যা হাতে এসেছে আমাদের সে অনুযায়ী ঊনবিংশ শতকের ১৮৭২-এ পুরুলিয়া থেকে প্রকাশিত হয়েছে 'জ্যোতিরিঙ্গন' পত্রিকা। খ্রিস্টান মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত এই পত্রিকায় কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের দুটি কবিতা পৃথক দুটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সময়ে কাব্যানন্দ রাখালদাস ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'মানভূম'। সাপ্তাহিক এই কাগজটিকে এ অঞ্চলে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম পত্রিকা হিসেবে গণ্য করা হয়। ১৮৯৯ থেকে ১৯২০ অব্দি এই পত্রিকার প্রকাশক হিসেবে যুক্ত ছিলেন কালীচরণ ত্রিবেদী। শহর পুরুলিয়ার অন্নপূর্ণা প্রেসে ছাপা হত এই কাগজ। তিন বছরের ব্যবধানে ১৯০২ সালে প্রকাশিত হয় বগলাচরণ ঘোষের সম্পাদনায় পাক্ষিক ইংরেজি সংবাদপত্র 'দি মালভূম'। শতবর্ষ অতিক্রম করে ২০০২ সালে সাম্প্রতিক পুরুলিয়া থেকে আরেক ইংরেজি সাপ্তাহিকের প্রকাশ লক্ষ করলাম আমরা। রমেন গুপ্ত সম্পাদিত 'দি পুরুলিয়া টাইম্‌স্' কাগজটির প্রকাশ মোটামুটি নিয়মিত। অন্য একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক 'দি খবরওয়ালা'-র প্রকাশও চোখে পড়ে আমাদের। তবে ইদানীং কাগজটি অনিমিয়ত। বাংলা ভাষায় বগলাচরণ ঘোষের সম্পাদনায় ১৯০৫ সালে যে কাগজটির প্রকাশ শুরু হয় তা ছিল সাপ্তাহিক 'রাজশক্তি'। পাশাপাশি অমূল্যরতন চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় আরও একটি সাপ্তাহিক কাগজ 'পুরুলিয়া দর্পণ'-এর কথা জানতে পারি আমরা। ১৯২৫-এর 'দি ছোটনাগপুর টাইম্‌স্' নামক ইংরেজি কাগজটির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পরবর্তী সময় সুধাংশু মুখোপাধ্যায়ের নামটিও এর সঙ্গে যুক্ত হয়। অন্নদাপ্রসাদ চক্রবর্তীর সম্পাদনায় ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হয় 'মানভূম সমিতি পত্রিকা'। এটির প্রকাশ ছিল মাসিক। এর আগে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে মানভূম তথা পুরুলিয়ার এক অগ্রগণ্য পত্রিকা 'মুক্তি'-র প্রকাশ সূচিত হয় প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক

নিবারণ চন্দ্র দাসগুপ্তের যোগ্য সম্পাদনায়। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক পর্যায় থেকে শুরু করে একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ অব্দি পর্যায়ক্রমে নিবারণ চন্দ্র দাসগুপ্ত, অতুল্য ঘোষ, বিভূতিভূষণ দাসগুপ্ত, বীর রাঘব আচারিয়া ও সাম্প্রতিককালে অরুণচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ গুণীজনের সম্পাদনায় 'মুক্তি' কাগজটি তার দীর্ঘ অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সংবাদ বা সাহিত্য পত্র হিসেবে আর যেসব কাগজের নাম উঠে আসে সেগুলি হল ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সম্পাদিত 'দেশের কথা', 'ব্রাহস্পর্শ', অন্নদাপ্রসাদ চক্রবর্তী সম্পাদিত 'তরুণশক্তি', হরিদাস সরকার সম্পাদিত 'মজলিশি' ইত্যাদি।

যে সময়কে ভিত্তি করে আমরা পত্র-পত্রিকার অলোচনা শুরু করেছি তাতে একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ অব্দি আমরা জেনেছি যে, সংবাদ সাহিত্য, ধর্ম, চিকিৎসা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করে যে সমস্ত পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার সংখ্যা চারশোর কিছু বেশি। এর সিংহভাগই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সাময়িক, ক্ষণজীবী ক্ষুদ্র পত্রিকা। প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে তৎকালীন মানভূমে সংগত কারণে পত্র-পত্রিকাই প্রকাশের ক্ষেত্রটি তেমন উর্বর ছিল না। স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে, বিশেষত ১৯৫৬-এ পরবর্তী সময়ে সংবাদ পত্রের পাশাপাশি সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক পত্র-পত্রিকার প্রকাশ বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। প্রসঙ্গত বলা দরকার, যে চার শতাধিক পত্র-পত্রিকার কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে বাংলার পাশাপাশি কিছু আঞ্চলিক ভাষা, কিছু হিন্দি, ইংরেজি ভাষার কাগজও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা প্রথমে সংবাদপত্রগুলির একটি তালিকা সম্পাদকের নাম, প্রথম প্রকাশের সময়, প্রকাশস্থান ইত্যাদির উল্লেখসহ তুলে ধরি। এই তালিকাকে কোনোভাবেই চূড়ান্ত বা অভ্রান্ত বলে ধরে নেওয়া ঠিক হবে না। বিভিন্ন তথ্যসূত্র থেকে সংগৃহীত এই তালিকায় সংযোজন বা বিয়োজনের প্রয়োজনীয়তা থাকতেই পারে। যে কাগজগুলি বাংলা বাদে অন্য কোন ভাষায় প্রকাশিত সেগুলির পাশে সংশ্লিষ্ট ভাষায় উল্লেখ থাকবে।

সংবাদপত্রে নাম	প্রথম প্রকাশ	সম্পাদক	প্রকাশের স্থান
মানভূম	১৮৯৯	রাখালদাস ভট্টাচার্য	পুরুলিয়া
দি মালভূম (ইংরেজি)	১৯০২	বগলাচরণ ঘোষ	পুরুলিয়া
পুরুলিয়া দর্পণ	১৯০৫	অমূল্যরতন চট্টোপাধ্যায	,,
রাজশক্তি	১৯০৫	বগলাচরণ ঘোষ	,,
দি ছোটনাগপুর টাইম্‌স	১৯২৫	ভূতনাথ বন্দোপাধ্যায়	,,
মুক্তি (সাপ্তাহিক)	১৯২৫	নিবারণ চন্দ্র দাসগুপ্ত	,,
মানভূম সমিতি পত্রিকা	১৯৩৫	অন্নদাপ্রসাদ চক্রবর্তী	,,
মানভূম জেলাবোর্ড গেজেট	১৯৩৯	মনীন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত	,,
রাইটার্স জার্নাল (ইংরেজি)	১৯৩৪	নির্মলপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	,,
কিষাণসভা বুলেটিন	১৯৫৫	অশোক কুমার চৌধুরী	,,
কোলফিল্ড টাইম্‌স্ (ইংরেজি)	১৯৪৬	হীরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়	ধানবাদ(মানভূম)
কল্যাণবার্তা	১৯৫৮	জিমূতবাহন সেন	পুরুলিয়া
পুরুলিয়া জেলাহিতৈষী	১৯৫৮	শিবশঙ্কর বক্সী	,,
জেলা সমাচার	১৯৫৯	অরূপ কুমার পাঠক	,,
মর্মবীণা (পূর্বনাম মর্মবাণী)	১৯৬০	ভবানীপ্রসাদ সরকার ও উপেন্দ্রনাথ সরকার	,,

সংবাদপত্রে নাম	প্রথম প্রকাশ	সম্পাদক	প্রকাশের স্থান
পুরুলিয়া প্রভাকর	১৯৬১	চিত্তরঞ্জন দত্ত	,,
জয়যাত্রা	১৯৬১	মৃগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	পুরুলিয়া
পুরুলিয়ার কথা	১৯৬৫	প্রবীর কুমার মল্লিক	,,
পুরুলিয়ার গেজেট	১৯৬৩	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়	,,
জন আহ্বান	১৯৬৪	দেবেন্দ্রনাথ মাহাত বিশ্বনাথ সাউ সুকুমার রায়	,,
পুরুলিয়া বার্তা	১৯৬৫	সুনীতিকুমার পাঠক	,,
জনজাগরণ (বাংলা/হিন্দি)	—	সত্যনারায়ণ চৌধুরী	,,
ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড গেজেট	—	ফণীন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত	,,
যুক্ত আন্দোলন	১৯৬৯	মহাদেব মুখোপাধ্যায়	পুরুলিয়া
কংসাবতী	১৯৭১	শ্যামলকুমার দে	মানবাজার
দেশকল্যাণ	১৯৭৩	শ্যামাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়	পুরুলিয়া
মানভূম এক্সপ্রেস	—	মোহনলাল আগ্রয়াল	ঝালদা
মালভূমি	১৯৭৮	অসিত বসু	পুরুলিয়া
লোকপত্র	১৯৭৪	অরুণচন্দ্র ঘোষ	,,
শিখরভূমি	১৯৭৭	অনাথ মহান্ত	রঘুনাথপুর
করমতীর্থ	১৯৮০	পার্বতী চরণ মাহাত	পুরুলিয়া
রঘুনাথ	১৯৮১	অজিত কুমার সিকদার	রঘুনাথপুর
সুন্দরী পঞ্চকোট	—	তপন কুমার কর	,,
মজদুর দর্পণ	১৯৭৮	পিনাকীরঞ্জন রক্ষিত	ঝালদা
পঞ্চকোট বার্তা	১৯৮১	রঘুনাথপুর জনকল্যাণ সমিতি	কাশিপুর
সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দু রাঢ়	—	আচারি বিমুখানন্দ অবধূত	পুরুলিয়া
লয়া সুরজ	·	জয়দেব মাহাত	পুরুলিয়া
দৈনিক দিনদুনিয়া	১৯৮১	চিত্তরঞ্জন দত্ত	,,
পঞ্চকোট সংবাদ	১৪০১	চন্দ্রশেখর সরকার	ভামুরিয়া
মানভূম সংবাদ	১৯৯৯	অসিত বসু	পুরুলিয়া
সূর্যেন্দু সঙ্গম	১৯৯৮	আকুলচন্দ্র দত্ত	মানবাজার
ভিন্ন চোখে (পূর্বনাম চেতনা)	১৯৮২	দেবাশীষ দাসগুপ্ত	পুরুলিয়া
পুরুলিয়া প্রপার (হিন্দি)	১৯৮৮	সচ্চিদানন্দ প্রসাদ	পুরুলিয়া
চৌদ্দশ সাল	১৪০০	ব্যোমকেশ দাস/সুধজ্যা দরিপা	,,
পুরুলিয়া দর্পণ	১৯৯৬	উৎপল মিশ্র	,,
পুরুলিয়া সংবাদ	২০০১	সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়	পুরুলিয়া
দৈনিক প্রভাতী	—	অমিত বসু	,,
পুরুলিয়া এক্সপ্রেস	১৯৯৯	অরূপ সিংহ	পুরুলিয়া
পুরুলিয়া জেলা সমাচার	—	অরূপ পাঠক	হুড়া

সংবাদপত্রে নাম	প্রথম প্রকাশ	সম্পাদক	প্রকাশের স্থান
মম স্বদেশবার্তা	২০০২	অরূপ সিংহ	,,
বর্ডার লাইন দি	২০০২	শ্যামলকুমার তেওয়াড়ী	,,
মালভূমি বাংলা	২০০২	বংশীধর কুমার	,,
পুরুলিয়া খবর	২০০২	অভিজিৎ চৌধুরী	জয়পুর
দি পুরুলিয়া টাইম্স (ইংরেজি)	২০০২	রমেন গুপ্ত	পুরুলিয়া
দি.খবরওয়ালা	২০০২	রাজকুমার ভট্টাচার্য	,,
পুরুলিয়া সমাচার	২০০৩	নিখিল মুখার্জী	,,

সংবাদপত্রের প্রদত্ত তালিকায় যে ৫৬টি কাগজের উল্লেখ করা হল এর বাইরেও কিছু কাগজ থেকে যেতে পারে। তাই এই তালিকাকে একটি অসম্পূর্ণ তালিকা হিসেবে ধরে নেওয়াই ভাল। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে পুরুলিয়া তথা মানভূম থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকায় সংখ্যা চারশ'র অধিক। সম্প্রতি শ্রী মৃণাল কান্তি মণ্ডল ও শ্রী বিপ্লব কবিরাজ পুরুলিয়া জেলার পত্র-পত্রিকার একটি পঞ্জি প্রকাশ করেছেন। তাঁদের শ্রমসাধ্য এই কাজ নিঃসন্দেহে মূল্যবান ও প্রশংসাযোগ্য। আমরা তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। প্রকাশিত এই পঞ্জি অনুযায়ী জেলা থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ৪৪২, দু-একটি নাম এর সঙ্গে যুক্ত হতেই পারে। নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে এমন কাগজের সংখ্যা বেশি নয়। নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে এমন কাগজও খুব একটা বেশি নয়।

সংবাদের পাশাপাশি যে সমস্ত সাহিত্য-পত্রিকা লিট্‌ল ম্যাগাজিনের আঙ্গিকে প্রকাশিত হয়েছে জেলা জুড়ে তার মধ্যে প্রাচীনত্ব ও ঐতিহ্যের বিচারে উল্লেখযোগ্য—কিরণচাঁদ দরবেশজী প্রবর্তিত 'মন্দির'—যার প্রকাশ রামচন্দ্রপুর বিজয়কৃষ্ণ আশ্রম থেকে; অন্নদাপ্রসাদ চক্রবর্তীর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'সংগঠন', সুবোধ বসু রায় সম্পাদিত মানভূম লোকসংস্কৃতির মুখপত্র 'ছত্রাক', প্রতুল দত্তর সম্পাদনাও সৈকত রক্ষিত নির্মল হালদারের প্রত্যক্ষ উদ্যোগে প্রকাশিত পত্রিকা 'আমরা সত্তরের যীশু', মোহিনী মোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কেতকী', আদ্রা থেকে সুভাষ নাগ, যুধিষ্ঠির মাজি প্রমুখের সম্পাদনায় 'ডহর'; কমল চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সাহিত্য বিচিত্রা', অলোক ভাদুড়ীর 'নীলাশা', কাশীপুর থেকে সজল দাসগুপ্তের সম্পাদনায় গল্পের কাগজ 'চৌমাথা সরীসৃপ জাতীয়' , নিবন্ধকার সম্পাদিত ত্রৈমাসিক 'এবং আমরা', জেলা শহর থেকে অমল চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'অলস সময়', অসিত সিংহের 'আকরিক', অশোক দত্তের সম্পাদনায় 'উপসংহার', মুকুল চট্টোপাধ্যায়-এর নিয়মিত কাগজ 'জিরাফ', অতিন্দ্রিয় পাঠক সম্পাদিত 'অব্যয়', বিশ্বদেব চট্টোপাধ্যায়-এর 'ভগীরথ', রঘুনাথপুর থেকে দেবাশিস সরখেল ও বিদ্যুত পরামাণিকের 'শঙ্খচিল', পুঞ্চা থেকে মবিনুল হকের 'পিরামিড', ঝালদা থেকে 'অস্তযীশু' ইত্যাদি। ষাটের পরবর্তী সময়ে জেলাজুড়ে বহুসংখ্যক ছোট পত্রিকার প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। সত্তর দশকে জেলার প্রায় প্রতিটি এলাকা থেকে প্রতিনিধিত্বমূলক কাগজ প্রকাশ পায়। লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনকে ঘিরে এক উৎসাহ ও চাঞ্চল্য লক্ষ করা যায়। পঞ্চাশের দশক থেকে শুরু ক'রে নব্বই দশক অব্দি সাহিত্য পত্রিকা যে বিপুল সংখ্যায় প্রকাশ পায় তার সামগ্রিক আলোচনা একটি ক্ষুদ্র পরিসর নিবন্ধে কোনভাবেই সম্ভব নয়। এ অক্ষমতাকে ত্রুটি হিসেবে স্বীকার ক'রে নিয়ে সাহিত্যনুরাগী পাঠকদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করা ছাড়া এই প্রতিবেদকের উপায়ান্তর নেই। এই সীমিত পরিসরে পত্র-পত্রিকাগুলির

নামোল্লেখ মাত্র করা যেতে পারে। জেলাশহর পুরুলিয়া থেকে বর্তমানে প্রকাশিত কাগজ :— জিরাফ (সঃ মুকুল চট্টোপাধ্যায়), অনুভাব (সঃ অশোক ঘোষ, ছত্রাক (নবপর্যায়, স: অনিল পাত্র) , নাট মন্দির (স: অংশুমান কর ও অন্যান্য), হিমযুগ (স: সোমনাথ হাজরা), ছাতিমতলা (স: ছাতিমতলার বন্ধুরা), চৌদ্দশ সাল (স: সুধন্বা দরিপা), কৃষ্টি (স: দয়াময় ভট্টাচার্য), তথাগত (স: হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়), অড় (স: রমানাথ দাস), ফিনিক (স: তপতী দাস/শাশ্বতী হালদার) , সংলাপ সাহিত্য (স: অলোক কৃষ্ণ সেন), সাহিত্য মন্দির পত্রিকা (হরিপদ সাহিত্য মন্দির), খেলার জগৎ (ম: সুদীপ মণ্ডল), বিকল্প অনুশীলন (স: স্বপন দে), ঝলক (স: মানস রিপা) ইত্যাদি। যেগুলির প্রকাশ অনিয়মিত বা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে এমন কাগজ—আকরিক, উপসংহার, আমরা সত্তরের যীশু, অব্যয়, সমবেত (হিন্দি), রু, সূর্যাবর্ত, বাঁশের কেল্লা, বনসাই, চেতনা, দাঁড়, কল্পতরু, ঢেউ, প্রগতি বালার্ক, কথামঞ্জরী, ইন্ধন, এলান, এষণা, কণা, অনু, অনিকেত, অভিমণ্যু, নারীকণ্ঠ, নাট্যব্রতী, সংঘর্ষ, ইত্যাদি। আদ্রা থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলি নিম্নরূপ। তারকা চিহ্নিত পত্রিকাগুলির প্রকাশ অব্যাহত আছে—সাহিত্য বিচিত্রা, ডহর, নীলাশা (সুবজ সংকেত), জোনাকি, অন্নজল, কেকা*, শঙ্খ*, যোদ্ধা, আবির্ভাব, খেলাধুলো, *সঞ্চিতা ছড়া কার্ড,* কৌম,* অর্বুদ ইত্যাদি।

মহকুমা শহর রঘুনাথপুর থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকাগুলি হল—শঙ্খচিলের ভাষা (পূর্বনাম শঙ্খচিল), স: দেবাশীষ সরখেল), টক্ ঝাল (চণ্ডীচরণ দাস, যাদব দাস), টুকলু (হারাধন কর, অমল ত্রিবেদী), জবালা (ছন্দা মৈত্র), নিশান্তে (বাদল দেওঘরিয়া), স্বদেশ (প্রবোধ দাস), কিশোর জগৎ (আদিত্যকিশোর দাস), অহনা (সুব্রত বন্দোপাধ্যায়, অরুণাভ সেনগুপ্ত), অযান্ত্রিক (দিলীপ গঙ্গোপাধ্যায়, ননী গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়)।

চেলিয়ামা থেকে নিয়মিত প্রকাশ হচ্ছে সুভাষ রায় সম্পাদিত 'অনৃজু'। মানভূম লোকসংস্কৃতি নির্ভর কাগজ এটি। এখান থেকে 'বিশ্বমানবধর্ম' নামে একটি আধ্যাত্মবাদের কাগজ বেরোয়। সম্পাদনা করেন বামাপদ চক্রবর্তী। 'নাবিক' বা 'নবারুণ' বন্ধ হয়ে গেছে। সাঁওতালডি থেকে কে. এল. খানের সম্পাদনায় 'অরনি' প্রকাশিত হচ্ছে মোটামুটি নিয়মিতভাবে। 'মোরাম-অনু' এখান থেকেই প্রকাশিত অন্য এক কাগজ। এক সময় মহ: আবু হেনার 'দিগন্ত' বেরোতো সাঁওতালডি থেকেই। সাঁতুড়ি, সরবড়ি, নিতুড়িয়া এলাকা থেকে প্রকাশিত কাগজগুলির মধ্যে রয়েছে নবজাগৃতি, আমানি, সাধনা, স্বজনস্বদেশ, বৃশ্চিক, বিপন্ন সময়, মন্দির, প্রতিভা, অমিয় অসীম চরিত, সীমানা ছাড়িয়ে, আলোড়ন, একলব্য, সবুজ আকাশ, রোদ্দুর এলোরে ইত্যাদি। কাশিপুর থেকে প্রকাশিত কাগজ—'এবং আমরা,' উক্তি, মৌরি ফুল, অমিত্রাক্ষর মৈত্রেয়ী, মহুল ইত্যাদি। এখান থেকে প্রকাশিত সজল দাসগুপ্ত সম্পাদিত গল্পের কাগজ 'চৌমাথা সরীসৃপ জাতীয়'। পুঞ্চা থেকে মবিনুল হকের সম্পাদনায় বের হত 'পিরামিড'। জয়পুর থেকে প্রকাশিত কাগজ শালপলাশ, শতাভিষা, মৃত্তিকা, বল্লরী, মন খারাপ ইত্যাদি। মানবাজার থেকে গৌতম দত্ত প্রকাশ করেন 'কথাভূমি'। এছাড়া অভিব্যক্তি, দিশারী, জন্মভূমি, আবর্তিতা, মশাল, শবরী, মধুবন ইত্যাদি কাগজগুলি এই এলাকা থেকেই প্রকাশিত। জেলায় অন্যান্য যে সমস্ত ছোট পত্রিকা প্রকাশ পেয়েছে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সেগুলি হল—সোনাবন্ধু, ভোরের সানাই সবুজ চিঠি, আগডুম-বাগডুম, আনার বানার, কালেন্দ্র মাণ্ডির, 'শিলি', 'অশনি', আমান, গ্রামবাংলার ঝংকার, জাগরণ, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, দিশারী, বিসর্গ, বৈতালিক, যৌথ খামার, রাঢ়ভূমি, শিখী, শ্বেতপলাশ ও আরও অনেক। কেবলমাত্র নামোল্লেখ করার মধ্যে অতৃপ্তি ও অপরাধবোধ কাজ করে স্বাভাবিক কারণে। পত্রিকার বিবরণ না দেওয়া

বা সম্পাদক সম্পর্কে কিছুমাত্র উল্লেখ না করার যে ত্রুটি সেজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। বহু কাগজই হয়তো এ অলোচনার মধ্যে স্থান পেল না। সেজন্যও ক্ষমা প্রার্থনা। প্রতিবেদক হিসেবে শুধু এটুকুই বলার —আরও যোগ্যতর কোন গুণীজন যিনি বিষয়টিতে আরও বেশি সম্পৃক্ত হয়ে আছেন, এগিয়ে এলে আলোচনাটি আরও সমৃদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠত। এই নিবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে আমি যাঁদের কাছে ঋণী তাঁদের নাম ও গ্রন্থনাম উল্লেখ করলাম।

ঋণস্বীকার :

- West Bengal Dist. Gazetteers, Purulia.
- Annals of Rural Bengal, W.W. Hunter.
- পুরুলিয়া জেলা পত্র-পত্রিকাপঞ্জী : মৃণালকান্তি মণ্ডল / বিপ্লব কবিরাজ।
- আমাদেব পুরুলিয়া, অমিয়কুমার সেনগুপ্ত।
- নিলয় মুখার্জী : সম্পাদক, হরিপদ সাহিত্য মন্দির।

লোকসংস্কৃতি : লোক বিশ্বাস : সংস্কার

লোকসংস্কৃতির উৎসসন্ধানে

সুবোধ বসু রায়

পুরুলিয়া জেলার অন্যতম সেরা সম্পদ তার লোকসংস্কৃতি। এ বিষয়ে যাঁরা সামান্য খবরও রাখেন তাঁরা অভিভূত হন এর বৈচিত্র্য, প্রাচুর্য এবং প্রাচীনত্ব দেখে।

সম্প্রতিকালে পশ্চিমবঙ্গ মেতে উঠেছে লোকসংস্কৃতির উপকরণ—সংগ্রহ, সংগ্রহশালা স্থাপন, আলোচনা সভা, কর্মশালা, প্রদর্শনী, গ্রন্থাদি প্রণয়নের বহুবিধ প্রচেষ্টায়। নিদর্শনস্বরূপ প্রতিবেশি জেলা বাঁকুড়ায় মাণিকলাল সিংহের উল্লেখই যথেষ্ট হবে। তারও আগে দীনেশচন্দ্র সেন, এল্যুইন ভেরিয়ার, শরৎচন্দ্র রায়, সুনীতি চ্যাটার্জি, ডক্টর শহীদুল্লাহর কথা কে না জানে?

এই ক্ষুদ্র পরিসর নিবন্ধের উদ্দীষ্ট অন্যবিধ। মনীষীজনের অবদান সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণে রেখেও স্বীকার করতেই হবে, 'মানভূমী উপভাষা', 'কাঁসাই সভ্যতা' ইত্যাকার তত্ত্বগত আলোচনার কোন ছায়াপাতই ঘটেনি গম্ভীর সিং মুড়া, বা সিন্ধুবালা দেবীর নৃত্যকর্মে। পুঁথিগত শিক্ষার অপেক্ষা করে না লোকসংস্কৃতি। তার উদ্ভাবনী শক্তির উৎসমুখ অন্যত্র। সৃষ্টির পিছনে সবসময়ই সক্রিয় রয়েছে যে মাতৃকাশক্তি তারই সামান্য আভাস দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এই নিবন্ধে। কালবিলম্ব না করে সেই প্রসঙ্গেই আসা যাক।

(১)

পুরুলিয়া জেলার অবস্থান দক্ষিণ রাঢ়ে। মানুষের বেশভূষা, আচরণ রুক্ষ, ভাষা রূঢ়, যে রড়া দিয়ে তৈরি হয় বাড়ির ভিত্তি, তেমনই কঠিন সঙ্কল্পবদ্ধ এদের মন। সাঁওতালি 'রোড়ো' শব্দের অর্থ 'নদীগর্ভস্থ শৈলমালা'— a river-bed full of rocks and large stones, a cataract। চাঁইবাসার পাশে রোড়ো নদী বা অযোধ্যা পাহাড়ের বামনী ফল্‌স দেখে এলেই আর সন্দেহ থাকবে না।

এখন অনুসন্ধান করা যাক ভূতত্ত্বে।

ভূতাত্ত্বিকরা বলেন প্রায় ১০-১২ কোটি বৎসর আগে ভারতীয় ভূভাগের দাক্ষিণাত্য অঞ্চল ছিল আন্টার্টিকা, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকার সঙ্গে একই বলয়ে যুক্ত হয়ে। পরে, ভূসঞ্চালনের ফলে বিচ্ছিন্ন হয়ে গণ্ডোয়ানা প্লেটে অবস্থিত এই ভূভাগটি উত্তর-পূর্বাভিমুখী যাত্রা শুরু করে। একই সময় উত্তর গোলার্ধের লরেশিয়া প্লেটটি দক্ষিণাভিমুখী হয়। দুটি প্লেটের সংঘাত ঘটলে মধ্যবর্তী অগভীর টেথিস সাগরের তলদেশ উর্দ্ধগামী হতে থাকে। প্রায় ৭ কোটি বছর আগে দেখা দেয়

হিমালয় পর্বতশ্রেণী। তুষার যুগের শুরুতে হিমবাহগুলি বয়ে আনে বিশাল জলস্রোতের সঙ্গে পাহাড়ের অস্থিপঞ্জর ভেঙে স্তূপ স্তূপ শিলাখণ্ড, নুড়ি, বালি, পলিমাটি। টেথিস সাগর বুজে গিয়ে সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকাভূমি গঠিত হয়।

এসবের বহু পূর্বে পৃথিবীর প্রাচীনতম শিলাস্তরের সৃষ্টি হয়ে গেছে আর্কিয়ান যুগে। সোনা, রূপো, লোহা, কঠিনতম আগ্নেয় এবং রূপান্তরিত শিলার সঞ্চয়গুলি থাকে থাকে সাজানো হয়ে গেছে বিভিন্ন শিলাস্তরে, যদিও সে প্রক্রিয়া কখনোই থেমে থাকেনি। ৬০ কোটি বছর আগে আর্কিয়ান যুগের অবসান হয়, Paloezoic যুগের আবির্ভাব ঘটে। আবির্ভাব ঘটে জীবজগতেরও। এরই শেষভাগে কার্বনিফেরাস পর্বে বিশাল বিশাল অরণ্যগুলি ধুলো, বালি, পলির নীচে বারবার চাপা পড়তে থাকে যার ফলে সৃষ্টি হয় চুনাপাথর আর কয়লার খনি।

কোটি কোটি বৎসর পরে উদ্ভূত হোমো স্যাপিয়েন্স বা মনুষ্যপ্রজাতিকে সম্মুখীন হতে হয়েছে এইসব ক্রিয়াবিক্রিয়াজনিত পরিস্থিতির সঙ্গে। অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে ছুটে যেতে হয়েছে প্রাকৃতিক শক্তি এবং বস্তুসম্ভারের কাছেই। এই করেই গড়ে উঠেছে তার সংস্কৃতি। তারই এক পর্বের নাম লোকসংস্কৃতি।

ভণিতা থামিয়ে সামান্য একটা তালিকা পেশ করে দেখাই যাক না কি বেরিয়ে আসে।

বরাবাজার থানার বেলডিতে পাওয়া গেছে দুর্লভ খনিজ সার রক ফসফেট। বিশ্বের বাজারে ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে 'পুরুলিয়া ফস'-এর চাহিদা। বলরামপুরের কাছে রেললাইন পেরোলেই রাঙাডির ছোট্ট কারখানায় গুঁড়ো করে প্যাকেটে ভর্তি করা হচ্ছে চালানের জন্য।

মানবাজারের চিরুগড়া, পুরুলিয়ার পাঁড়কিড়িতে রয়েছে আরও সম্ভার, ভবিষ্যতের প্রয়োজন মেটাতে।

পাষাণময় এই দেশে পাষাণই সবচেয়ে বড় সম্পদ। খেয়াল করলেই চোখে পড়বে পাহাড়ের ধারে, শুকনো টাঁড়ে স্তূপাকারে জড়ো করা রয়েছে নানা সাইজের পাথরের টুকরো। মাঠ থেকে কুড়ানো কিংবা হাতুড়ি হাম্বর দিয়ে ভাঙা এই প্রস্তরখণ্ডই হচ্ছে এ জেলার প্রধান হস্তশিল্প। এই দিয়েই ময়দানবরা তৈরি করছেন কলকাতার হর্ম্য, ইমারত, পাতালরেল, হলদিয়ার কারখানা, ন্যাশনাল হাইওয়ে, মেরামত করছেন শেরশাহের গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড, বেঁধেছেন মুরগুমা, পাঁচেৎ, কুমারীর জলাধার। পাথর দিয়েই গড়া সারা জেলায় ছড়ানো জৈন মন্দিরগুলি, তীর্থঙ্করমূর্তি। মুণ্ডাদের বীরস্তম্ভ, শালগ্রামশিলা, এমনকী গৃহস্থজীবনের শিলনোড়া, পাথরবাটিতে পাথরেরই একাধিপত্য। ভাষাতেও প্রবলভাবে উপস্থিত 'পুরুলিয়ার টাঁড়'। লোকগীতিতেও হাজির 'উপরে ডুঙ্গরিয়া, নীচে পুখরিয়া'।

তামার সন্ধান পাওয়া গেছে মানবাজারের তামাখুনে। এই সেদিন বান্দোয়ানের টটকো নদীতে সোনার কুচির আবিষ্কার প্রচারমাধ্যমের দৌলতে হই-চই ফেলে দিয়েছিল বিজ্ঞানীমহলে। স্থানীয় অভাবী মানুষরা যে প্রজন্ম প্রজন্ম ধরে সোনার কুচি সংগ্রহ করে চলেছে সুবর্ণরেখার বালি ছেঁচে সে খবরটা যেন আর মনে থাকছিল না। 'ব্যাঙ মাইত্তে সনার কাঁড়' প্রবাদটি কী এমনি এমনি সৃষ্টি হয়েছিল?

শ্রুতিস্মৃতিই তো লোকসংস্কৃতির প্রধান অবলম্বন। মুণ্ডাদের লোককাহিনীতে আছে অসুরদের কথা। এদেরই এক শাখা যারা কাঠকয়লার আঁচে বড় বড় চুল্লিতে লোহা গলাত পাহাড়ের খাঁজে। ঝালদার পাহাড়ে চুল্লি, ছাইভস্ম, জমে থাকা লোহার টুকরোর ভগ্নাবশেষ এখনও দেখা যায়। ছুরি, কাঁচি, বল্লমের ফলা, বঁটি কাটারির জন্য ঝালদার লোহারা এখনও বিখ্যাত। PETCO কারখানার

আগর বিক্রি করে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন তুলসী কর্মকার।

সিরামিক্‌স শিল্পে মিরমির কোয়ার্ৎজের খাতিরই আলাদা। সোজা চলে যায় বেঙ্গল পটারীজে। ফিরে আসে চিনেমাটির চিত্রবিচিত্র পাত্র হয়ে। তুচ্ছ নুড়ি পাথরের সমাদরও কম না মাঠার ডাকবাংলোয় কিংবা কলকাতার রবীন্দ্রসদনে। অঢেল বিছানো না থাকলে ফ্যাকাসে দেখাবে মেহেদিলতার হেজ, মরশুমি ফুলের বাহার।

১৮৩২/৩৫ সাল থেকে জেলার অর্থনীতি আর লোকজীবনে অনপনেয় ছাপ পড়েছে কয়লার। কার্বনিফেরাস যুগের শেষে দাক্ষিণাত্যের মালভূমি ঢেকে যায় গভীর অরণ্যে। আদিমানবরা তারই অভ্যন্তরে ঘুরে বেড়াত পশুপাখি শিকার, ফলমূল আহরণ করে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে। ব্যাধ, শবর, বিরহড়, পাহাড়িয়ারা সে জীবনচর্যা এখনও ছাড়তে পারেনি। একটা ছোট পাখি মেরেও গানে গানে উচ্ছল হয়ে পড়ে

পহিল শিকারে ফুচু মারল রে
সেহ ফুচু হাথি লাদল যায়...

ভেঙে পড়ে বুদ্ধ পূর্ণিমায় অযোধ্যা পাহাড়ের শিকার পরবে। শিকার না করলে বুঝি পৌরুষের প্রমাণ হয় না। নিষাদ রাজপুত্র একলব্যের শরসন্ধান এবং সাঁওতালদের বেজাবিঁধা একই সূত্রে গাঁথা।

ভামুরিয়া, পারবেলিয়া, ঝরিয়া, আসানসোল, রানিগঞ্জ-র কয়লাখাদেও সেই সাঁওতাল।

পাথর এমনি করেই মিশে আছে লোকজীবনে, লোকসংস্কৃতিতে।

(২)

পাহাড়ে পরবতে ঘর
তায় আইসেছে সাঙঘাইল্যা বর
আর বর দেইখে কইন্না বেয়াকুল।
শ্বশুরে জামাইয়ে গ্যান্দাফুল।।

এই শিবঠাকুরের দেশে কোল, ভীল, সাঁওতাল, মুণ্ডা, ভূমিজ, অসুর, বিরহড়, ডোম, কালিন্দী, বাউরী, রাজোয়াড়, কামার, কুমার, কুর্মী, মাহালি, কুইরী, ওঁরাও, হো, শবর, খেড়িয়া, মাহোয়াড়দের ইতিকথায় আসা যাক।

গাছের সঙ্গে থেকে থেকে এরা ভালোবাসত গাছকে। মনে করত বিদেহী আত্মারা ঘুরে বেড়ায় গাছে গাছে। সবচেয়ে প্রিয় গাছ ছিল সারহুল (শাল), মাতকম (মহুয়া), কুসুম। কোন মূর্তি বা মন্দির ছিল না এই আত্মাদের। তবে থান ছিল। পূর্বপুরুষদের আত্মারা থাকত শালগাছ দিয়ে ঘেরা জাহেরাথানে। বুরু, বোঙা, কুদরা, সিনিরা থাকত পাহাড়ের মাথায়, ফাঁকা মাঠে, গৃহস্থবাড়িতে, নদীনালার ধারে। কোথায় নয়? এমনকি খাতির পেলে গ্রামেও, কোমর বেঁধে গ্রামকে রক্ষা করতে। কত যে লোককথা আছে এসব ঘিরে।

জাতিবিন্যাসের ইতিহাস বিশ্বস্তভাবে লেখা আছে পুরুলিয়া জেলার স্থাননামে। একনজর দেখা যেতে পারে: অধিবাসীদের পাশের বন্ধনীতেই দেওয়া হয়েছে স্থাননাম:

পুনিয়ান (পুনিয়াশাসান), পুরাণ (পুরাণডি), পাতর (পাতরডি), গদব (গদিবেড়ো = গদব + অড়া), সাঁওতাল (সাঁওতালডি), মাহাত (মাহাতমারা), মুরাডি (মুড়া), কড়াডি (কড়া), খেরোয়ার (কেরোয়া), খেড়িয়াডি (খেড়িয়া), পদলাড়া (পোদ), সরাকড়ি (সরাক), কোলডি (কোল), মণিহারা (মানি), মানিকুই (মানি + কুই), লায়াকুই (লায়া + কুই), সুইসা (সুই = কুই), ভাণ্ডড়া (ভাণ্ডড়),, তিলুড়ি (তুলু), সাকা, সাকচি (সাকই), কুরুকতুপা (কুরুখ), নূতনডি (নূতন), মানাড়া, মানকিয়ারী, মানভূম (মান), বাবুইটাঁড় (ব্রাহুই), লোহারসোল (লোহার), বরাকডি (বরাক), কুরুম্বেড়া (কুরুম্ব কুর্মী), খামার (খমের), কাঁটাডি (কণ্টু), ভুইয়াডি (ভুইয়া = ভূমিজ), দিগারডি (দিগার), যুগীডি (যোগী), ডমিনদহ (ডোমিন), চরগলি (চোর), কনাপাড়া (কনিয়ান), মালতি (মাল) , বিরহড়ডেরা (বিরহড়), রালিবেড়া (ইরুল), কাশুরা (কাদির), সিমনপুর (সেমাঞ), হাতিনাদা (হাতিন্)।

বর্ণ অনুযায়ী : তেলিডি, মুদিডি, বামনডিহা, মোমিনপুর, পাঁড়েডি, মিশিরডি। বৃত্তিবাচক নামগুলি পরবর্তীকালের।

গোত্রবাচক টটেম চিহ্নিত স্থাননামগুলি কৌতূহলোদ্দীপক। যেমন : মানবাজার, মানভূম (মান = হরিণ), ধলভূম (দল = পাথর), বরাভূম (বরাহ), তোড়াং (পাথর), ডাঙ্গডুঙ্গ (মাছবিশেষ), শালডিহা (শাল = একরকমের মাছ), বালিয়া (ঐ), কুইলাপাল (কুইলা = খরগোস), সামরডি (= সম্বর), আনাই, আনাড়া (আন = হাতি), কুলবেড়া (কুল = বাঘ), কিরুবুরু (কিরু = বাঘ), নাগপুর (নাগ = কেউটে সাপ), ঘণ্ডা (= বড় শামুক), সারুগাড়া (সারু = কন্দবিশেষ) সারিডি (সারি বন্যলতা বিশেষ), হুটমুড়া (মুড়া = কচ্ছপ), চকাহাতু (চকা = ব্যাঙ)।

স্থাননাম আলোচনায় এসে পড়েছে ভাষা প্রসঙ্গ। এত জনগোষ্ঠী—মাতৃভাষাও সমসংখ্যক হওয়ার সম্ভাবনা। কার্যত তা হয়নি। সাঁওতালি ছাড়া সবই লুপ্ত হয়ে গেছে কালক্রমে। দুটি কারণ সুস্পষ্ট : ১। শ্রুতি স্মৃতিনির্ভর অন-আর্য ভাষাগুলির লিখিত রূপ নেই, ২। সামাজিক ক্ষেত্রে আর্যীকরণের প্রবল চাপ। তুলনায় রাঁচির ছবি অনেক ভালো। ১৯৭০ সালের গেজেটীয়ার অনুযায়ী :

Hindi - 5,45,886. Kurukh / Oraon - 4,08,626 , Mundari - 4,36,244 ; Sadan / Sadri - 3,54,719, Nagpuria - 89,0111, Panch Pargania - 57,946, Kharia - 90,668.

—দেবনাগরী একমাত্র ব্যবহৃত লিপি হওয়া সত্ত্বেও।

দৃশ্যত তাই, বাস্তবে ভিন্ন। ছত্রাক প্রকাশিত 'মানভূমী শব্দকোষ' ও সুধীর করণ সঙ্কলিত 'সীমান্ত রাঢ় ও ঝাড়খণ্ডী বাংলার গ্রামীণ শব্দকোষ' প্রণিধান করলে স্পষ্ট হয়ে উঠবে এক বিপরীত সত্য। দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক পরিবারভুক্ত ভাষাগুলি ভারতের পূর্বপ্রান্তের আর্য ভাষাগুলিকে তাদের শব্দভাণ্ডার, উচ্চারণপদ্ধতি ও ভাষাপ্রকরণ দিয়ে এমন আচ্ছন্ন করে ফেলেছে যে সেগুলিকে উপভাষা বলে চিহ্নিত করতে বাধ্য করেছে। ধর্মের ক্ষেত্রে যা ঘটেছিল জৈন, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য, বৈষ্ণব—যেভাবে তন্ত্রসাধনার মাধ্যমে নেড়ানেড়ি সম্প্রদায়ে রূপান্তরিত হয়েছিল—কুর্মালি, মানভূমি বাংলার ক্ষেত্রেও সেই একই প্রক্রিয়া কার্যকরী হয়েছে। কারণ খুবই স্পষ্ট, মানুষগুলো ত বদলায়নি। ঠাট বদলেছে কিছুটা।

ভাষাচার্যেরা এবিষয়ে কী মন্তব্য করেছেন দু-এককথায় এখানে তার পুনরুল্লেখ করা যায়।

Adibasi literatures of India প্রবন্ধে সাধু রামদাস মাঝি সম্বন্ধে আচার্য সুনীতিকুমার লিখছেন : "This old gentleman was very well informed about the traditions of his people and its religious and social culture and this book is known Kherowal Bangsa Dharam Puthi or the Sacred Book of the Kherowal Race. This book was published by him

in the Bengali Script. পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রাহুল সাংকৃত্যায়ন রামদাস টুডুর বই-এর সংগ্রহ এবং আঁকা ছবি দেখিয়া আমারই মতো বিস্মিত ও প্রীত হন। তিনি বলেন যে, রুশ দেশ হইলে সরকার হইতে এই বই ছাপাইয়া দিবার ব্যবস্থা হইত।" ভূপেন্দ্রনাথ দত্তর 'ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি' এবং অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর 'হিন্দু সমাজের গড়ন' পুস্তকের বিশ্লেষণ অনুসারে বলা যায়, "হিন্দু সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে ভারতের বিচিত্র জাতি উপজাতির সম্মিলনে...।" ডক্টর ধীরেন সাহা নিঃসন্দেহ হয়ে বলেছেন : "মূলতঃ অন-আর্য্য মানুষের বিশেষ উচ্চারণ ও বাকভঙ্গীগত বৈশিষ্ট্যের তাপে ও চাপে আদি মধ্যযুগীয় বাংলাভাষার যে একটি স্বতন্ত্র রূপ ও অবয়ব গড়ে উঠেছে তাই হল সীমান্তভূমির উপভাষার নিজস্ব পরিচয়।"

ভাষা বলতেই সাহিত্য। পুরুলিয়ার লোকসাহিত্যে গদ্য, পদ্য, নাটক সব মুখে মুখে। উচ্চারণ আর বাচনভঙ্গিব কলাকৌশল বাদ দিলে অর্ধেক রস মাটি। এমনিতে রুক্ষ নীরস শুকনো টাঁড়ের মতো এখানের মানুষের কথাবার্তা, কিন্তু গল্প বলতে বসলেই আশ্চর্যরকম নরম মিহি গলা, টেনে টেনে সুর লাগিয়ে, কখনো গান গেয়ে। কে চিনবে তাদের, তখন তারা কল্পলোকে।

সারাদিনের পরিশ্রমের পর বিশ্রাম। নিতে নিতে একসময় মন খুলে যায়, বেরিয়ে আসে কথা—ইতিকথা, অতিকথা, পুরাণকথা, রাতকথা, জানকথা—কথার কী আর শেষ আছে ? কোত্থেকে আসে এইটুকুই বলা।

এখানের লোকজীবনের সঙ্গে অপবিহার্যভাবে জড়ানো মহুয়াগাছ। গন্ধে মাতিয়ে দেয় ফুল। কচড়ার জাব দিলে দুধ বাড়ে গোরুর। ঘানিতে ঘুরোলেই তেল। কচড়ার খোলে মাটি উর্বর হয়। আর—মদের সেরা মাত্কম। ভালো করে জেনে রাখে, বাচ্চারা তাই জানকথা। ধাঁধার ছলে, একের পর এক প্রশ্নোত্তরে, গল্পের রসে জারিয়ে।

জল আনতে গেছে গৃহবধূ। গামছায় বেঁধে চিঁড়ে ভিজোচ্ছে পৈতেধারী এক ভিনদেশি মানুষ। মজা করার লোভ সামলাতে পারছে না বধূ : বলছে—

> বাপকা নাম যেইসা
> পুতেক নাম তেইসা ;
> লাতিক নাম দুসর
> এহ বাত কহ ঠাকুর, তবে উঠাব্ কর॥

বামুন আর হাত উঠাতে পারে না। ঐ অবস্থায় সে'ও বলছে—

> যেসা শিকরমে পাতাল খিলাওয়ে
> উপ্রে ধরে আগুা ;
> এহা বাত কহ পনরি
> তবে উঠাব হাণ্ডা॥

খর বাস্যাম হল, মায়্যালকটা ধর ঘুরে নাই। যা ন, দেখবি। দেখে চক্ষুস্থির। পনরীর হাঁড়িটা আঁবুতে লাদাই আছে, ঠাকুরের হাথও। উত্তর না দিতে পেরে।

অঃ, এইজন্য? শুনে লে—

> যেসা রসমে মহী মাতয়ে
> আর ঘুরয়ে ঘানি ;
> ঠাকুর উঠাক কর
> পনরি লিয়ে যাক পানি।

এবার রাতকথা। চোখে দেখেছেন রাত দুটোয় ক্ষেতপাহারাদের কি হয়? ভাল্লুক, হরিণ, সজারু, গণেশঠাকুর কখন আসবে চুপিসাড়ে—জাগার তাগিদে বলইয়া বলেই চলে গল্প, শুনইয়া'ও হুঁ দেয় একই উদ্দেশ্যে। ঘুমজড়ানো চোখে জড়িয়ে যায় কথা, ধীর লয়ে লেহরাই লেহরাই বেরিয়ে আসে... কি বেরিয়ে আসে খেয়ালই থাকে না। ঝাপসা চোখে জন্তুজানোয়াররা হয়ে ওঠে দত্যিদানা।

প্রবাদের মধ্যে রয়েছে আরেক বিশাল ভাণ্ডার। ভাষা ও সাহিত্যের এমন সমন্বয় ঘটেছে নিঃসন্দেহে সংক্ষিপ্ততার কারণে। প্রয়োগমাত্রই লক্ষ্যবস্তুকে সঙ্গে সঙ্গে পেড়ে ফেলে। কিছুটা উৎকট লাগতে পারে বাইরের মানুষের কানে। কিন্তু শব্দচয়নের আঞ্চলিকতাই চিহ্নিত করে তার উৎপত্তিস্থল। প্রাণিত করে তার বক্তব্যকেও।

এই মুহূর্তে যা মনে আসছে গড়গড় করে ক'টা নমুনা তুলে নেওয়া যাক তার মধ্যে থেকেই:

হুড়ারকে ছাগল রাখা, আঘাইলে বক পুঁটি তিতা, দই চিঁড়া খাবি ন বঙাবাড়ি যাবি, দূরকে সল ভারি, গাছে ঘুঘি হিড় ফাট, একটা হর্তুকি সারা গাঁয়ের আদ্দাসি, কত কত উঁট বহায় গেল গাধা বলে কেতেক পানি, আখবাড়িয়ে শিয়াল রাজা, আঢ়াই ডেগের পনরি আশি কষের মেঘ, অঙা গুণে পঙা গাছ গুণে ঝিঙ্গা, খুঁটার জেরে পাড়কা লড়ে, ক্যাঁকলাসের দৌড় বাদাড় গড়া, কাম নাই ত ধানে কাপাসে, কাইলা কুদ্‌রা বাড়ির ভূত চেঙ্গি পালেই চাপচুপ, আপনার যাতরা পরকে দিয়ে গণক মাগে ভিখ, আইড়ে চিন্‌হায় চাষা পাইড়ে চিনহায় জল্‌হা, খঁড়া বিলের আড়সলা পথ্যি, নাপতে নাই তার বুচা পইলা, বারে বারে শালুক সিঝা, বিহন দবড় পুয়াল লাভ, ব্যাঙ মাইত্তে সনার কাঁড়। গায়ের বাসে ভূত পালায় বিটির নাম চাঁপা, মকরে পানি টিকরে ধান...

উল্লিখিত প্রবাদগুলির বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই বর্তমান প্রসঙ্গে। আঞ্চলিক শব্দসমূহ, তাদের উচ্চারণ এবং প্রয়োগবৈশিষ্ট্যের দিকে নজর রাখলেই ধরা পড়বে জনজীবন কিভাবে পর্যবসিত হয়েছে পুরুলিয়ার লোকসংস্কৃতিতে।

এইসঙ্গে আর একটি ব্যাপার লক্ষ করার মতো। লোকসংস্কৃতির চরিত্র বহুরূপী—একরূপ ছেড়ে আরেক রূপ ধারণ করতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করে না। মূলে ছিল চার চরণের দাঁড়ঝুমুর :

চাষে চিন্‌হায় চাষা
জল্‌হা চিন্‌হায় পাইড়ে;
লিভাতারি মায়্যা চিন্‌হায়
গবরকুড়া টাইড়ে॥

শেষ দু'টি চরণ ছেঁটে দিতেই হয়ে গেল প্রবাদ। যেমন হয়েছে 'বাপকা বেটা'র বেলায়।

সেইরকমই 'ঝাগুড় ঝাগুড় ঝাগুড় / বাপ থাকতে ব্যাটার লেগুড়'। এটি মূলত হেঁয়ালি। উত্তর—ব্যাঙাচি। এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে কুঁড়া খাঁয়ে মইল্ল বাপ / তার ব্যাটার বিদ্যাপ'-এর সামিল। ঠিক তেমনি 'আখড়ায় সামহাইল মুসলমান / দাড়ি হইল বুকেরই সমান'। উত্তর—ভুট্টা। প্রবচন হিসাবে ধরলে যুগান্তকারী এক সামাজিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বোষ্টমদের আখড়ায় জাতপাতের বিচার নেই : দাঁড়িয়ালা ন্যাড়া মুসলমানদেরও সমান সমাদর।

'ছেল্যার মা ছেলা সরা / আসছে একটা অঁড়কাধরা' ঘুমপাড়ানি এই ছড়াটির মধ্যে অনর্থ কাণ্ড বাধিয়েছে 'অঁড়কা' শব্দটি। মুণ্ডারিতে এর অর্থ ওঁয়াও ওঁয়াও করা শিশু। শিশু-বলির অভিপ্রায়টি অতি স্পষ্ট। এই ভাষা, এই সমাজ, এই লোকবিশ্বাস কাদের আর বলে দিতে হবে না।

অবাক হতে হবে শুনলে এত কাব্য, তবু কবিতা নেই। কারণ খুব সহজ। এখানে চললেই নাচ, বললেই গান—সেনগে শুশুঙ, কাজিগে দুরুঙ। অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স নয়, ভরতের

নাট্যশাস্ত্র—মিলেমিশে একাকার, একই সূত্রে বাঁধা আছে সহস্র জীবন।

মন্তব্য না করে নমুনা দেওয়া যাক এক ধরনের লৌকিক ঝুমুর 'উধোয়া'র-ঝালদা থানার চাঁদাই থেকে তুলিন আসতে বাঁধের পাড় দিয়ে যেতে যেতে মহেশ্বর মাহাত গেয়েছিল :

বান্ধ দেলে রাজা হো
মুল্লুকেকা ওড় ;
পিঁড়িয়া দেলা অজগর
মলকলে আওয়ে
ললকলে চলয়ে
যত পানিহর॥
শুন শুন অগলিয়ে
শুন শুন পাছুলিয়ে
শুন শুন মধ্যপানিহর
কন চুকা লেগবে
বাঁধেকের জল॥
কাহাকে সিনাওবে
পিয়াকে নাওহাবে মর, পিয়াকে...
হুলুকভুলুক কাহে করহিস
নাহগা পিন্ধিকে কাহে
অলগপুঁই রকম হে হিস
বাঁধেক মাহ দেয়রে ধরে দেতু॥

বাঙ্গরি ঝুমুর : বিয়ের সময় জল সওয়া'র গান।

[ওড় = পার ; পিঁড়িয়া = পাড় ; অজগর = অজগরের মতো ; মলকলে = চমক দিয়ে ; ললকলে = লাল ঝরাতে ঝরাতে ; পানিহর = পানি আহরণকারিণি ; অগোলিয়ে = অগ্রবর্তিনী ; পাছুলিয়ে= পশ্চাদ্‌বর্তিনী ; চুকা = ছোট ভাঁড় ; লেগবে = নিয়ে যাবে ; বাঁধেকের = বাঁধের ; সিনাওবে = স্নান করাবে ; হুলুকভুলুক = ফাঁক ফোকরে ; নাহগা = লুগা, লেংটি ; পিন্ধিকে = পরিধান করে ; অলগপুঁই = স্বর্ণলতা ; দেয়রে = দেবর গো।]

রথ থেকে দুর্গানবমী পর্যন্ত দাঁড়ঝুমুর। বিজয়াদশমীর দিন দাঁসাই। তারপর থেকে আবার রথ পর্যন্ত অন্য সব ঝুমুর। ঝুমুর শব্দটি গানেরই সমার্থক, ব্যাপকার্থে সব ধরনের গানকেই বোঝায়। ধানের চারা বেরোবার আগে পর্যন্ত উধোয়া উর্ধ্বগ্রামে গাওয়া হয় বলে। ধানের চারা বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই একগুচ্ছ নাচগান-জাওয়া, দাঁড়নাচ, ইঁদপূজা, ছাতাপরব, পার্শ্ব একাদশীর করম। ধান পোঁতার সময় কবিগীত :

শাম ছিল রথের চূড়া ল ;
কদ্যাল পাইড়ে শাম হইল বুড়হা ল॥

শ্রাবণ সংক্রান্তিতে মনসার গান, ঝুপান। আঘন সাঁকরাত থেকে পউষ সাঁকরাত পর্যন্ত টুসুগান। শেষ নেই এত। মুখে মুখে সৃষ্টি হচ্ছে প্রতি বছর। স্বচ্ছন্দে বিরাজ করছে সর্বত্র। এমনকি কয়লাখনিতেও :

চল টুসু চল দেখতে যাব

রানিগঞ্জের বড়তলা ;
অমনি পথে দেখাই আনব
কয়লাখাদের জলতুলা॥

কার্তিকে কালীপুজো ঘিরে বাঁদনা, ডহরুয়া, সাঁওতালদের সহরাই।

এখান, ঘেঘান, সাঁইসুই / তার উপারে আসবি তুই।

আর সাঁওতালি গানের সেই বিশ্বমানবীয় আবেদন:

বুরু বুরু পারমখন
গেলবার বুরু পারমখন
মারাংদাদাঞ নেওতা আকাদিএঞা॥

[পাহাড়ের পর পাহাড়, বারোটা পাহাড় পেরিয়ে বড়দাদা এসেছে নিমন্ত্রণ দিতে।]

কপিলামঙ্গলের গান ; আভীরদের দেশ অহিরা।

বর্ষশেষ। চৈতসংক্রান্তিতে আর একগুচ্ছ : গাজন, ভক্তাপরব, সঙ, কাপ মাছানি, চড়ক, বাণফোড়া, ছোনাচ, নাটুয়ানাচ—কী নয়? নাচগান, ঢোলডগর, নাটক—কালবৈশাখীতে শিবঠাকুরের তাণ্ডব মূর্তি।

বলেই ফেলি—ভয় করছে। সন্ধান পেলেই 'মরম না জানে ধরম রাখানে' লুঠেরারা হাতিয়ে নিয়ে যাবেন কিছু সংগ্রহ। তারপরই হাঁক পাড়বেন তাঁরাই প্রবক্তা, দূরদর্শনের পর্দাটা ধন্য তাঁদের দেখিয়েই। ঝালদার মহেশ্বর মাহাত, রাজনোয়াগড়ের মিহিরবরণ, বলরামপুরের জলধর কর্মকার, ভারডির অমূল্যরতন কুমার, বাগমুণ্ডির আকলু মাছোয়ার, চাণ্ডিলের প্রভাত ব্যানার্জি, গড়জয়পুরের পদ্মলোচন মাহাত, কনাপাড়ার সাহিসরা, কেঁদরির সিন্ধুবালা, আদরার কলেন্দ্র মাণ্ডি, মানবাজারের কিরীটি মাহাত, বালিগাড়ার ধনঞ্জয় মাহাত, পদলাড়ার শলাবৎ মাহাত... কোত্থেকে এল? কে চেনে এদের? চেনে ত শুধু উপাধিধারী নগরবাসীদের।

অল্প সন্তুষ্ট মানুষগুলোর কিন্তু এদিকে খেয়ালই নেই। পেটের খোরাক আর মনের খোরাক চলে একসঙ্গেই। গাছে তেঁতুল, নদীতে মাছ, বেনের দোকানে এক খামচ নুন, কুইরির কাছে একটু হলুদ, তাইতেই শুরু হয়ে গেল নাচগান :

পিড়িরে জজ, গাঢ়ারে হাকু,
বুলুং কড়া বানিয়া তাইএঃ,
কুইরি তাইএঃ সাসা॥

দলে দলে চালান হয় চাবাগানে, কলকাতার পাতাল রেলে রাস্তায় ফুটপাথে বছরের পর বছর কাটিয়ে দেয় ঠিকাদারের তাঁবুতে, গড়ে তোলে সাঁওতালডির তাপবিদ্যুৎ, অযোধ্যার জলবিদ্যুৎ বৃহৎশিল্প। লুণ্ঠেরানদের-পরে কম্যুনিটি এরিয়া ডেভেলপমেন্ট করপোরেশনের-তত্ত্বাবধানে পুঁজি করতে থাকে পোলট্রি, ডেয়ারি, পিগারি। পাহাড়ের গায়েও বোনে সর্ষে, গুঁদলি, মাড়ুয়া, মকাই। সূর্যমুখী ফুল থেকে, গুঞ্জা থেকে তৈরি করে তেল। এই নিয়েও গান :

এক মুঠা সুরগুঁজা
বুনল মর গটা গড়া
সুরগুঁজা ফুটে লালে লাল॥

চাষের জন্য হাতিয়ারপাতির নাম. বিভিন্ন প্রজাতির ধানের নাম, একচেটিয়া অধিকার অস্ট্রিকদের।

এবার ইতিহাসের পথ-অতীত থেকে বর্তমান। পর্যায়ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন নাম-রাঢ়, বজ্জভূমি, ঝারিখণ্ড, জঙ্গলমহল, মানভূম, পুরুলিয়া। ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী মৎসজীবী কৈবর্ত ও পাহাড় অঞ্চলের শবরদের সঙ্গে। ওই অঞ্চল তখন কলিঙ্গ নামে পরিচিত ছিল। তার উত্তরভাগ উৎকল বা উত্তর কলিঙ্গ। রাঢ়ের পূর্বে ছিল বঙ্গ, উত্তরে অঙ্গ। দামোদর নদের উৎপত্তি চতুর্থ হিমবাহ যুগে, ভাগীরথীর বহু পূর্বে। পুরুলিয়া জেলার মধ্যভাগ দিয়ে প্রবাহিত কাঁসাই পরিচিত ছিল কপিশা নামে। গ্রীক ইতিহাসকার টলেমি'র বর্ণনায় Cambyssos / দিগ্বিজয়ী রঘু কলিঙ্গ জয় করতে কেমন করে হস্তীযূথ সাজিয়ে কপিশানদী পার হয়েছিলেন তার বর্ণনা আছে কালিদাসের রঘুবংশ কাব্যে। আর্য অন-আর্যের সংঘর্ষ এই প্রথম। রামায়ণ-মহাভারত পেরিয়ে ইতিহাসের যুগে রক্তক্ষয়ী সঙঘাত কলিঙ্গ যুদ্ধে। সাক্ষ্য আছে দেবানামপিয় অশোকের শিলালিপিতে। প্রায় অক্ষুণ্ণ অবস্থায় পাওয়া গেছে উড়িষ্যার খলসিতে। ত্রয়োদশ শিলালিপির দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের ইংরেজি তর্জমা অনুসারে:

One hundred and fifty thousand in number were deported, one hundred thousand in number were those who were slain, and many times as many as those who died.

খ্রিস্টপূর্ব ২৬১ সালের ঘটনা। জের রয়ে গেছে: আজকের দিনের মিশ্র, মহান্তি, ষড়ঙ্গি, মহাপাত্র, সিং মহাপাত্র, পতি, সৎপথি, সেনাপতি, পাত্র, পাতর, পাণ্ডা প্রমুখ শিক্ষাদীক্ষায় প্রাগ্রসর বর্ধিষ্ণু পরিবারগুলির একাংশকে তাদেরই একাংশ বলে মনে করা যেতে পারে। বহুকাল একত্র বসবাস করতে করতে দ্রাবিড়ভাষী ও অস্ট্রিকভাষী জনগোষ্ঠীগুলির মিলেমিশে থাকতে কখনোই অসুবিধা হয়নি। তার প্রমাণ রয়েছে গ্রামনামগুলির উপান্ত শব্দে : অড়া, -ড়া, -কুড়, -কুড়া, -গড়া, -গুড়ি, -জুড়ি, -দা, -দহ, -শাল, -শোল, -শুলি, -পোখর, -পুখরি। উভয় ভাষাতেই তা সমানভাবে প্রযুক্ত।

বসতিগুলি কবে পত্তন হয়েছিল, কারা তা করেছিল, বর্তমানের হাল কীভাবে হয়েছিল— এইসব প্রশ্নের সঙ্গেই জড়িত রয়েছে জেলার ইতিহাস। নামগুলি রয়ে গেছে, যারা দিয়েছিল সেই নাম তারা কেউ নেই। এর মধ্যেও রয়ে গেছে ইতিহাস। প্রতিবেশী জেলা রাঁচিতে হিন্দির সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে কুরুখ, মুণ্ডারি, সাদারি বা সাদানি। এখানে সে ভাষায় কেউ আর কথা বলে না। টিকে আছে একমাত্র সাঁওতালি।

অথচ, কেউ তাদের উৎখাত করেনি, বৃহৎ শিল্প বা নগরায়ণের প্লাবনেও ভেসে যায়নি তারা। তা সত্ত্বেও ঘটনার সত্য এই : একদিকে তামিল, তেলেগু, মালায়ালাম, কন্নড়, তোড়া, কুই, কুরখু, অন্যদিকে কোল, গণ্ড, মালতো, অসুর, বিরহড়, সাঁওতালি, মাহালি, খেড়িয়া, শবর, ডোম, বাগুরি ভাষাভাষীর সংস্কৃতিতে পুষ্ট হয়েছে বলেই পুরুলিয়ার লোকসংস্কৃতি এত সমৃদ্ধ।

অশোকের কলিঙ্গবিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে এ নিবন্ধের সমাপ্তি। কেননা, তারপরই অন-আর্য মিলিয়ে শুরু হল হিন্দু সমাজের বিবর্তন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় হেথায় আর্য হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন... এক দেহে হল লীন। ইতিহাস নিঃশব্দে চলে। বড় বড় ঘটনা ঘটলে এবং তার তাৎপর্য অনুধাবন করিলে বোঝা যায় তার অভিমুখ কোন্ দিকে। অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে:

১। কালক্রমে উত্তর ভারতে একই গোষ্ঠীর কিন্তু দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক ভাষাভাষীরা ব্যতিক্রমসাপেক্ষে তাদের ভাষাগুলি হারাতে থাকে এবং আর্যভাষাভাষী হতে থাকে।

অপরপক্ষে, স্থানিক পরিবেশে লুপ্ত ভাষাগুলির শব্দভাণ্ডার, উচ্চারণবৈশিষ্ট্য, বাক্যগঠন প্রণালী এবং তদ্দ্বারা পরিবাহিত সংস্কৃতিচেতনা নবসৃষ্ট উপভাষাগুলিকে সমৃদ্ধ করে :

২। আর্যীকরণের বিভিন্ন স্রোত—প্রধানত ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে, যেমন জৈন, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য, বৈষ্ণব—গোড়ার দিকে হিংস্র প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়। যখন গৃহীত হয় তখন তা অন-আর্য তন্ত্রমন্ত্র, আচারবিচার দ্বারা প্রায় পর্যুদস্ত হয়ে গেছে;

৩। রাঢ়ের এই সীমান্তবর্তী অঞ্চলে মুসলমানী আমলে, কালাপাহাড়ী অত্যাচার তেমন কিছু হয়নি, যদিও তার উল্লেখ আছে লোকগীতিতে। পীরের গান, সত্যপীরের পাঁচালির মধ্যে সমন্বয় সাধনের দিকটাই প্রকট। নিম্নবর্ণ বলে যাদের অভিহিত করা হয় সেই বাউরি মালদের মধ্যে কলমা পড়া এবং মা-কালীর সিঁদুর পরে নিকা আর বিয়ে করার উভয় প্রথাই প্রচলিত;

৫। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে প্রাচীন এবং নবীনের একটা সমঝোতার মধ্যেই থাকতে হয়েছে এই জাতিগোষ্ঠীগুলিকে;

৬। চাকুরে এবং ব্যবসায়ীদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা বেশি থাকলেও শ্রমিকশক্তি জুগিয়েছে জনজাতির লোকেরা। শহরাঞ্চল ছাড়া গ্রামীণ সংস্কৃতির অসপত্ন অধিকার তাদেরই;

৭। কোম্পানির আমলে ব্রিটিশ শক্তির বিরোধিতা প্রথম করে তারাই। মিশনারিরা কখনও তাদের ব্রিটিশ রাজের অনুগত করতে পারেনি।

যতবার চেষ্টা করেছি পুরুলিয়ার লোকসংস্কৃতির উৎসে পৌঁছতে ততবারই অনুভব করেছি তা রয়ে গেছে দৃষ্টির বাইরে, সম্ভবত আর্কিয়ান যুগে। জীবসৃষ্টির আগেই। বনবাসী উপনিষদের ঋষিদেরও একই অনুভব। আধুনিক কালের জ্ঞানতপস্বীদের উপলব্ধিও এক। তাঁদের প্রেরণা জিজ্ঞাসা। পরে তাই পরিণত হয়েছে—গৌতম বুদ্ধের পরিভাষায়—করুণায়। প্রকৃতির বুকে যারা সারাজীবন কাটিয়েছে তারা না জেনেই ভালোবেসেছে। যা তারা জেনেছে, শিখেছে তা ভালোবাসারই কল্যাণে। ঘাসের মতোই তা অমর। পাথরকেও সবুজ করে রাখে—

অ ভালোবাসা
তখে লিয়ে যাব চাইবাসা
—হায় ভালোবাসা!

ঋণস্বীকার :

১। Grierson - Linguistic Survey of India (Vol. iv)

২। Ranchi District Gazetteer, 1970

৩। Rev. Hoeffman. : Encyclopaedia Mundarica

৪। Rev. Bodding : A Santal Dictionary

৫। Rev. Campbell : Santal Dictionary

৬। O. U. P. - A Dravidian Dictionary

৭। Penguin - A Dictionary of Geographical terms

৮। Sankarananda Mukhopadhyay - The Austrics of India

৯। S. K. Chatterjee - O. D. B. L.

১০। Office of the D. M. Purulia - A Brief Note on Mineral Resources - Purulia District.

১১। পশ্চিমবঙ্গ—বাঁকুড়া জেলা সংখ্যা
১২। পশ্চিমবঙ্গ—হুগলি জেলা সংখ্যা
১৩। পশ্চিমবঙ্গ—জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা
১৪। ছত্রাক—মানভূমি শব্দকোষ
১৫। নরনারায়ণ চ্যাটার্জি—নামের মালায় মানভূম
১৬। বঙ্কিম মাহাত—শিলালিপি : নবপর্যায় ৩য় সংখ্যা
১৭। জি এম. আবুবকর—কালো মানুষ সোনালি সংস্কৃতি
১৮। শক্তি সেনগুপ্ত—লোকায়ত মানভূম
১৯। শ্রমিক সেন—এক নজরে পুরুলিয়া (৩য় সংস্করণ)
২০। শক্তি সেনগুপ্ত—দামুন্দা কপিলা শিলাবতি
২১। মহাশ্বেতা দেবী (সম্পাদিত)—ভেরিয়ার এল্যুইনের নির্বাচিত রচনা
২২। নন্দদুলাল আচার্য (সম্পাদিত)—আসানসোলের ইতিবৃত্ত
২৩। ধীরেন্দ্রনাথ সাহা—ঝাড়খণ্ডী বাংলা উপভাষা
২৪। সুবোধ বসু রায়—মানভূমি কথ্য বাংলার কিছু উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য
(পঃ বঃ বাংলা আকাদেমি, ১ম খণ্ড)
২৫। অরুণ কুমার রায়—লোকায়নচর্চার ভূমিকা
২৬। সুকুমার সেন, সুভদ্র সেন—বাঙ্গালীর ভাষা
২৭। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়—বাঙ্গালীর সংস্কৃতি
২৮। ভূদেব চৌধুরী—বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত
২৯। সুবোধ বসুরায় (সম্পাদিত)—অযোধ্যা
৩০। ব্যক্তিগত সংগ্রহ

পুরুলিয়ার ঝুমুর গান ও ঝুমুর কবি

কিরীটি মাহাত

ভূমিকা : কাঁসাই, শিলাই, সুবর্ণরেখা, কুমারী, টটকো, দারকেশ্বর, ইজরি, হাড়াই, গুয়াই, অগুনতি ছোটবড় নদনদী, শাল, পলাশ, মহুয়া, কেঁদ ভুঁড়রু, পিয়াল, ধ, সিধার সবুজ বনভূমি, অযোধ্যা, মাঠাবুরু, কঁচবুরু, কাঁড়দা বুরু, বেঙ, বানসা, পাপারু, কপিলা, গহিরা, তিলাবনী সহ অসংখ্য পাহাড়, ডুংরি, টিলার ক্যানভাস, উঁচু-নীচু পাথর, কাঁকর লালমাটির ডাহি ডুংরির, ডহর ডাঙার ল্যান্ডস্কেপ-ছন্দময় ভূ-প্রকৃতি, কুড়মি, সাঁওতাল, ভূমিজ, মুণ্ডা, শবর, ওরাঁও বাগাল, খাসি, কামার, কুমার, মাল-মাহলি ও অসংখ্য বিচিত্র জনগোষ্ঠী ও জনপ্রবাহ, কুড়মালি, সাঁওতালি, কুড়ুক, মুণ্ডারিভাষা, ছো, ঝুমুর নাচনী, লাটুয়া, টুসু, ভাজ, বাহা করম, দাঁসাই, সহরাই ঘেরা মাছানীসহ নানান নৃত্যগীত, ঢোল, মাদল, ধামসা, তুরুধুতুর বর্ণময় সুরের সমাবেশে পুরুলিয়া অনন্য। রত্নগর্ভা। পদ্মশ্রী গম্ভীর সিংমুড়া, নেপাল মাহাত, সিন্ধুবালা, সলাবত মাহাত শুধু পুরুলিয়া নয়, শিল্প ও সংস্কৃতি জগতেরই উজ্জ্বল নক্ষত্র। তবুও পুরুলিয়ার অন্য পরিচয় খরাভূমি। এই খরায় মরা মানুষ মুলুক মাটি ও অরণ্য পর্বতের কঠিন বুকচিরে যে সুরের গঙ্গা প্রবাহিত হয়ে চলেছে হাজার বছর ধরে তা হল ঝুমুর। এক বর্ণময় জনপদীয় সংগীত ও সাহিত্য। পুরুলিয়ার মানুষের কাছে মাত্র এই তিনটি অক্ষরের ব্যঞ্জনা কতখানি তা এককথায় প্রকাশ করা কঠিন। ঝুমুর তাদের জীবন, রক্তস্রোত, হৃদয়ের হৃদস্পন্দন। সমাজ ও সাংস্কৃতি, আচার অনুষ্ঠান, অবসর বিনোদন, প্রেম-বিরহ, আশা নিরাশা, শিল্প ও সৃজন, কৃত ও কীর্তি, ভাব বিনিময়, সংগ্রাম ও প্রতিবাদে ঝুমুরেই তাদের উপায় অবলম্বন, হাতিয়ার ও লোক মাধ্যম। দেশজ ও লোকায়ত জীবন ধারার শ্রেষ্ঠ লোকযান। লোক জীবনের সর্বত্র ঝুমুরের উপস্থিতি ও জনপ্রিয়তা ঝুমুরকে তাই পুরুলিয়ার জাতীয় সংগীতে পরিণত করেছে। পুরুলিয়া হয়েছে ঝুমুর দেশের হৃদয়ভূমি।।

ঝুমুরের সংজ্ঞা ও পরিচয় : ঝুমুর কি? এককথায় এর উত্তর হিসেবে আমরা পুরুলিয়ার একটি বিশিষ্ট লোকসংগীত হিসেবে উল্লেখ করি। কিন্তু ঝুমুর কথার অর্থ বা সংজ্ঞা কী? এক কথায় এর উত্তর সম্ভব নয়। ছো-এর মধ্যেই যতটা আলোচিত ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, ঝুমুরের ক্ষেত্রে তা হয়নি। ব্রাত্য সংগীত হিসেবে সুধী সমাজের নজর এড়িয়ে গেছে এতদিন। তবু ড. আশুতোশ ভট্টাচার্য, ড. ধীরেন সাহা, ড. সুধীর করণ, ড. বঙ্কিম মাহাত, গিরীশ মহন্ত, ড. বীণাপাণি মাহাত, ড. পশুপতি প্রসাদ মাহাত, সুবোধ বসুরায় যা করেছেন তা কম নয়। সুখের কথা সাম্প্রতিক কালে ঝুমুরের উপর চর্চা বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষিত সমাজেও ঝুমুরের প্রতি ধারণার

পরিবর্তন ঘটছে। প্রচার মাধ্যমগুলি এগিয়ে আসছে এর প্রচারে। কিন্তু ঝুমুর এতই বিশাল ও বৈচিত্র্যময় যে তা যথেষ্ট নয়। এর সাহিত্যের দিকটি যতটা আলোচিত, সংগীতের দিকটি ততটা নয়। তবুও তাঁদের সকলের প্রতিই শ্রদ্ধা রেখেই বলতে হয়, এক কথায় ঝুমুর কাকে বলে বা ঝুমুরের সঠিক সংজ্ঞা কী এর উত্তর আজও মেলেনি। আজও কোনো রেডিমেড ডেফিনিশন আমাদের জানা নেই।

তবে এই প্রসঙ্গে আমরা পণ্ডিত, গবেষক, কবি ও শিল্পীদের ধারণা ও মতামতকে উপস্থাপন করতে পারি। সাহায্য নিতে পারি এই অঞ্চলে প্রচলিত ভাষা ও ভাষা কোষের।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই আমাদের প্রশ্ন এর সঠিক উচ্চারণ কী? বাংলা ভাষাভাষিরা বলেন 'ঝুমুর'। পুরুলিয়ার আঞ্চলিক উচ্চারণ ঝুমইরা, ঝালদা ও রাঁচি জেলায় তা হয়ে যায় 'ঝুমেইর'। উড়িয়া প্রভাবিত ঝুমুর ক্ষেত্রে বলা হয় 'ঝুমর'। আবার কুড়মালি প্রাচীন গীতে "ঝুমরি" শব্দের ব্যবহার রয়েছে। যেমন—

১। বেরিআহ ডুবি গেল কাঁধে মার্দা লেল
"ঝুমরি" বানারে পিয়া গেল গে দ্যুতি।
২। পহিল সাঁঝে গেরহ মাঁই গ ঝুমরি খেলাএ
অহিরা লাজে মাঁই গ রহলি ডাঁড়ায়ে।

আবার বাঘমুণ্ডি ও পাতকুম অঞ্চলের কোনো কোনো শিল্পী ঝুমুর ও ঝুমরিকে এক অর্থে নিতে রাজি নন। তাঁদের মতে জমিদারি ঠাটের যে গীত তা ঝুমুর। রং ও ভাদরিয়া চটুল সুরকে তারা বলেন ঝুমরি। যাই হোক, বিভিন্ন শব্দকোষ, প্রাচীন গ্রন্থাদি এই বিষয়ে কি মত পোষণ করেছে, তা দেখা যেতে পারে। কালিকা প্রসাদ ও রাজ বল্লভ সহায়কৃত "বৃহৎ হিন্দী কোষ" ঝুমর শব্দের অর্থ ব্যাখা করতে গিয়ে বলেছে, "হোলিমে নাচকে সাথ গায়া জানেবালা এক গীত।" দ্বিতীয় অর্থে লিখেছে, "মণ্ডলাকারমে ঘড়ে স্ত্রী-পুরুষ।" "ঝুমুক', ঝুমুড়' এবং 'ঝুমুর' শব্দের প্রায় এক অর্থ করেছেন। 'ঝুমরি' শব্দের অর্থ "শালক রাগকা এক ভেদ বলে উল্লেখ করেছেন। উড়িয়া পূর্ণচন্দ্রভাষা কোষে 'ঝুমুর' শব্দটি 'ঝুমরি' বলে পরিদৃষ্ট হয় এবং যার অর্থ রাগিনী বিশেষ। সুকুমার সেনের মতে, সংস্কৃতে ঝুমুরকে বলা হয়েছে জম্ভালিকা।

শ্রীখণ্ডের দামোদর মিশ্র "সঙ্গীত দামোদর" গ্রন্থে ঝুমুর সম্বন্ধে বলেছেন,

"প্রায় শৃঙ্গার বহুলা মাধবীক মধুরামৃদু।
একৈব ঝুমুরির্লোকে বর্ণাদিনিয়মোদ্ধিতা।।"

অর্থাৎ ঝুমুরি বা ঝুমুর গান প্রায়ই শৃঙ্গার বহুল হয়। মধুজাত সুরার মতো তা মধুর এবং মৃদু তাতে ছন্দের বিশেষ কোনো বাঁধা ধরা নিয়ম থাকে না।

এ ছাড়াও বর্তমান সময়ের বিভিন্ন পণ্ডিত ও ঝুমুর গবেষকগণের মতামত কি তা দেখা যাক। তাঁরা কেউ বলেন, তাঁরা কেউ বলেন ঝুমুর পশ্চিমবাংলার লোকগীত কেউ বলেন মানভূমের লোকসংগীত-বিরহগীত আবার.....ঝুমুর পশ্চিম বাংলার লোকগীতি কেউ বলেন, মানভূমের প্রেমসংগীত, বিরহগীত আবার কারও মতে নাচনীর পায়ের ঘুঁঙুরের ঝুমঝুম শব্দ থেকে ঝুমুর শব্দটির উৎপত্তি।

আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, "ছোটনাগপুর হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র মধ্য ভারত ব্যাপিয়া গুজরাটের সীমান্ত পর্যন্ত যে আদিবাসী বসতি সীমা অগ্রসর হইয়া গিয়াছে তাহার সর্বত্র যে আদিবাসী

সংগীত প্রচলিত আছে, তাহা সাধারণভাবে 'ঝুমুর' নামে পরিচিত।

ডঃ বিনয় মাহাত তাঁর লোকায়ত ঝাড়খণ্ড গ্রন্থে লিখেছেন, "ঝুমুর মূলতঃ দ্রাবিড় ভাষাভাষি গোষ্ঠীর প্রেম সংগীত এবং নৃত্য এই সংগীতের অনুসঙ্গ তাই বলা যেতে পারে ঝাড়খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত দ্রাবিড় ভাষীদের প্রেম সংগীতের নাম ঝুমুর।"

ডঃ সুধীর করণ বলেন, "ঝুমুর শব্দটি যেখান থেকেই, যেভাবেই আসুক না কেন সীমান্ত বাংলার ঝুমুরের যা বৈশিষ্ট্য তা এই অঞ্চলেরই নিজস্ব।...... আসলে ঝুমুর আদিরসাত্মক গানই শুধু নয় বিশেষ একটি রাগিনীও। সঙ্গীত দামোদরের ব্যাখ্যায় সুসংগীত।"

বিশিষ্ট গবেষক ডঃ বঙ্কিম মাহাত ঝুমুরের সংজ্ঞায় বলেছেন, "ঝুমুর ঝাড়খণ্ডের বিশিষ্ট প্রেম সংগীত। আগেই বলা হয়েছে করম নাচ, নাচনী নাচের গান ও ঝুমুর নামে পরিচিত। তবে সাধারণত দীর্ঘায়তনের প্রেম সংগীতগুলো যা নাচনী নাচে যেমন গীত হয় তেমনি এককভাবে গীত হয়, যা ঝুমুর নামে পরিচিত।" নর নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত ভিন্ন। তিনি বলেছেন, "প্রসঙ্গত ঝুমুর শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ নির্দেশে বলা যায় যে, জুম/ঝুম চাষ সংশ্লিষ্ট শ্রমগীতি থেকেই ঝুমুর/জুমুর শব্দটির উৎপত্তি।"

বিশিষ্ট কবি ও গায়ক সলাবত মাহাতকে বলতে শুনেছি, "ঝুমুর কথার অর্থ ঝুরে মরা। সুর ও সংগীতের অন্তরের নিবেদনই ঝুমুরের মূল তাৎপর্য।" কুড়মালি ভাষাবিদ লক্ষীকান্ত মতুরুআর ঝুমইর শব্দকে ব্যাখ্যা করেছেন ভাষাতত্ত্বের আধারে। তাঁর মতে ঝুমইর শব্দটি গঠিত হয়েছে, ঝুম শব্দের সঙ্গে 'অইর' প্রত্যয় যোগ করে। কুড়মালি ভাষায় ঝুম কথার অর্থ আবেগ আবেশ বা আপ্লুত হওয়া। আবার জুম বা ঝুম কথার মানে হয় সন্নিবদ্ধ বা সম্মিলীত রূপ (শ্রোতা ও বাদ্যযন্ত্র। বিশিষ্ট ঝুমুর কবি অনন্ত কেসরি আরও প্রায় এই মতকেই সমর্থন করেছেন।

উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ : ঝুমুরের সৃষ্টি বা উৎপত্তির সঠিক সময়কাল নিরূপন করা কঠিন। যে কোনো লোকসংগীতের মতোই ঝুমুরও শতশত বছর ধরে ক্রমবিকাশ ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান অবস্থায় এসেছে। লোক সংগীত কোন একক ব্যক্তির সৃষ্টি নয়। একটি জাতি বা জনগোষ্ঠীর লৌকিক জীবন ধারা, সময় সমাজ এবং ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। তাই আদি ঝুমুর ভনিতাহীন, ব্যক্তি নয় সামাজিক মালিকানা। সম্মিলিত অংশগ্রহণ। আদি বা ডাঁইড় ঝুমুর গানের বৈশিষ্ট্য, বক্তব্য, নৃত্য, বাদ্য ও অংশগ্রহণ তা প্রমাণ করে।

যাই হোক ঝুমুরের উৎপত্তি বা উদ্ভব সম্বন্ধে কিছু কথা রয়েছে প্রচলিত ঝুমুর গানে তা উল্লেখ করা যেতে পারে। গানটি আমি পেয়েছি উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ জেলার পলাশ বাধা গ্রামের পূর্ণচন্দ্র মহন্তর কাছে।

গানটি হল—

১। কাঁহা কাঁহা উপজল, রিঁঝাকেরিঅড়, মাঠাকেরিঅড়
কাঁহা কাঁহা উপজল সাঁউরিরে,
আঁঘড়াঁহি উপজল রিঁঝাকেরিঅড়, মাঠাকেরিঅড়
মাঁইএক কঁখে উপজল সাঁউরিরে।।

গানটি কুড়মালি ভাষায় রচিত। এর অর্থ হয় রিঁঝা ও মাঠার উৎপত্তি কোথায়, আবার কোথায় বা সাঁউরির সৃষ্টি। উত্তরে বলা হয়েছে গান ও নাচের যে মঞ্চ বা আখড়া সেখানেই উৎপত্তি

রিঁঝা ও মাঠার এবং মায়ের কোলে জন্ম সাঁউরির। রিঁঝা ও মাঠা দুটি পৃথক ঝুমুর রেগ বা রাগ। রিঁঝা অর্থে আনন্দ এবং মাঠা অর্থে ধীরগতি। সাঁউরি হলো যে মেয়েটি আখড়ায় নৃত্য করে। লক্ষ্য করার বিষয় রিঁঝাও মাঠার রাগরূপ যখন সৃষ্টি হয়েছে তখন তা গীত, নৃত্য ও বাদ্যের সমন্বয়ে পুরোপুরি সংগীত। যা করম, পাঁতা বা ডাঁইড় মালিয়া ঝুমুর। মূলত ভাদ্রমাসে অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য যা ভাদরিয়া নামেও পরিচিত। এগুলি আদি হলেও এর পূর্বের রূপ হল টাঁইড় বা কবি গীত, উধোয়া, বিরহ, করম চাঁচর প্রভৃতি। এগুলির কিছু ছিল যৌনতা বহুল বা আদিরসাত্মক এবং সমাজে নিষিদ্ধ। যা কেবল পাহাড়, জঙ্গল, মাঠে বা এককভাবে গাওয়া যেত। বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ছিল না। এগুলিকে গাওয়া নয় বলা হত 'হাঁকা'। কিন্তু করম গানে ছিল নৃত্য ও বাদ্যের প্রয়োগ। ছেলে ও মেয়েদের যৌথ সংগীত। এই দিক থেকে ডাঁইড় বা ভাদরিয়া ঝুমুরের উৎপত্তি করম গান থেকে তা অনেকটাই যুক্তি সঙ্গত। তবে টাঁইড়, উধোয়া, চৈতালি, বিরহ, চাঁচরের মতো বহু সুরের ধারা ছোট ছোট নদীর মতো ঝুমুরকে মহানদীতে পরিণত করেছে এই বিষয়ে আমরা একমত।

আজ আমরা যে ঝুমুর শুনছি তা হাজার বছরের বিবর্তনের ফল। আধুনিক নাচনীশালিয়া বা উচ্চাঙ্গ ঝুমুরের সঙ্গে আদি ঝুমুরের কোনো তুলনা চলে না। মাত্র দুপদ বা পঙতির আদি ঝুমুরের সঙ্গে বহুকলি বা পালা ঝুমুরের যেমন তফাৎ তেমনি বক্তব্য, বিষয়, সুর, তাল, বাদ্যের জটিলতা দুটি রূপকে পৃথক করেছে অনেকটা। যাই হোক ঝুমুরের এই বিবর্তনের কালকে প্রখ্যাত ঝুমুর গবেষক গিরীশ মহন্ত ভাগ করেছেন চারটি যুগে। যথা— ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বকাল আদিযুগ, ১৭৫০-১৮৫০ খ্রিস্টাব্দ মধ্যযুগ, ১৮৫০-১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ সময়কাল কাব্যযুগ। যে সময়কে ঝুমুরের স্বর্ণযুগ বলা হয়। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ পরবর্তী কাল আধুনিক বা সবুজ যুগ।

আদি ঝুমুরের সময়কাল একটা দীর্ঘ সময় ধরে চলেছিল বলে আমাদের অনুমান। ঝুমুর সংগীত ও সাহিত্যের ধারাটি চর্যাপদ থেকে বিদ্যাপতি, এবং বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের হয়ে প্রবাহিত তা ডঃ সুকুমার সেন, রাজেশ্বর মিত্র, সুবোধ বসুরায়, ডঃ পশুপতিপ্রসাদ মাহাত স্বীকার করেছেন। তবে লক্ষ করার বিষয়— বিষয় ও ভাগবত দিক থেকে সাহিত্যের ধারাটি প্রবাহিত হলেও ঝুমুরের মধ্য যুগের পূর্বে অর্থাৎ ১৭৫০-এর পূর্বে ঝুমুরে ভনিতার প্রচলন হয়নি। এই ক্ষেত্রে বরজুরাম দাস ঝুমুরে প্রথম ভনিতার প্রচলন করেন তা জানা যায়। এই প্রসঙ্গে একটি বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখ প্রয়োজন। শান্তিপুর ডুবুডুবু, নদে ভেসে যায় নয় সমগ্র বাংলা দেশে প্লাবন সৃষ্টি করে অবশেষে শ্রীশ্রী চৈতন্যদেবের পুরী থেকে মথুরা গমন ঝাড়খণ্ডের সমাজ ও সংস্কৃতিতেও ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। যার ফল এই অঞ্চলের রাজা, জমিদার, সামন্ত, ঘাটোয়াল, মানকী, মাহাতগণ ব্যাপকভাবে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন। ফলে এই অঞ্চলের লোক সংগীত ঝুমুরেও তার প্রভাব পড়ে। রামায়ন, মহাভারত, পুরান, বিশেষত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক ঝুমুর রচনা প্রাধান্য পায়। লৌকিক ও সামাজিক বিষয়গুলি হ্রাস পেতে থাকে। বরজুরাম তাঁতি বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করে বৃন্দাবন তীর্থ যাত্রা শেষে হেঁসলার রাজবাড়িতে এসে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক ঝুমুর রচনা ও রাধাকৃষ্ণ সেজে নৃত্য পরিবেশন করেন এমনই লোকশ্রুতি। সুর ও সাহিত্যে মহাজনপদের প্রভাব সুস্পষ্ট তা এই যুগের ঝুমুর শুনলেই বোঝা যায়। বহু কবি রাধাকৃষ্ণ বিষয় যেমন লেঠাপালা, মান, মাথুর, বংশীপালা, দধিসংবাদ, সুবল সংবাদ, বাঁশি চুরি পালা রচনা করেন। দুই বা চার পদ থেকে ঝুমুর আট, বার ষোলো এমনকি বহু পদের পালা ঝুমুর রচিত হয়। রস, ছন্দ, অলঙ্কারের প্রয়োগ ব্যাপকভাবে দেখা যায় ঝুমরের কাব্য বা স্বর্ণ যুগে। গিরীশ মহন্ত বলেছেন, "সংস্কৃত সাহিত্যে

যত রকম অলঙ্কারের উল্লেখ রয়েছে তার সবকটির প্রয়োগ হয়েছে এই যুগের ঝুমুর সাহিত্যে। ব্যাপক রাজন্য পৃষ্ঠপোষকতা লাভের ফলে, রাজদরবারের শাস্ত্রীয় সংগীত বিশারদ ও ওস্তাদগণ ব্যাপক পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করেন এর সুরের উপর। ফলে জটিল সুর ও রাগরাগিনীর অসামান্য প্রয়োগে ঝুমুরে ব্যাপক বৈচিত্র্য ঘটে এবং নাচনী শালিয়া দরবারী বা উচ্চাঙ্গ ঝুমুরের সৃষ্টি হয়, যা ঝুমুরকে বর্তমানে একটি অসামান্য ও স্বতন্ত্র সংগীত ধারায় পরিণত করেছে। টাঁইড় ঝুমুর থেকে ডাঁইড় বা ভাদরিয়া হয়ে উচ্চাঙ্গ ঝুমুরের বিবর্তনটি কেমন তা কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে এই প্রসঙ্গ শেষ করব।

উদাহরণ :— টাঁইড় গীত

১। তব মনে আমার মনে হে
লেখে দিব কালি কলমে হে।।

২। হাড়কা নদীর বান আল্য গো,
জাং ডুবে নাই মন ডুবে গেল গো।

৩। ডাঁড়হান সগেঁই যাব হে
এক খিলি পান দুজনে খাব হে।।

৪। হাঁকালে শ্যাম রা দিঅ হে
পরের অধীন না হতে দিও হে।

৫। বার বাজার গাড়িতে হে
শ্যাম চাপেছে মনের বিচ্ছেদে হে।

৬। আষাঢ় মাসের জোড় পুঁঠিহে
খাঁয়েলে শ্যাম থালের ভাত দুটি, হে।

৭। আসবি বাগাল রাত করে হে
মাছ পুড়া ভাত রাখব খাটতলে হে।

৮। হালায় হাল বাহে, বাস্যাম ভালে হে
হাল্যার বহুই আলধান কুটে হে।

৯। পলাশ বনের লালটিয়া রে,
কবে হবেক দুজনের বিহারে।।

উধোয়া :

১। সিমল ফুলে নাই হে মধু, দেখিতে সুন্দর,
লিগুনাদের গুণ নাই মা করিছে আদর

ডাঁইড় বা ভাদরিয়া :

১। ফিং ফিং জোস্‌ল জোস্‌না, আঁধার ঘরে শুসনা
তকেলো কাজলে সাজে, জলে ধুঁয়ে দিসনা।

২। বাইদে বহালে কাঁসি
বিটি ছেলায় বাজায় বাঁশি,
পাছে কাঁসি ফুল ফুটে যায়
বিটি ছেলার কুল রাখা দায়।।

৩। কনে দেলা আইড় পাইড়
কনে দেলা শাড়ি, সরমে মরি
কনে দেলা বাজু বান, কাপাড়ে টিকলি
মন হরখি গেলি।
শ্বশুর দেলা আইড় পাইড়
ভেঁসুর দেলা শাড়ি, সরমে মরি
সঁইযাঞ দেলা বাজুবান, কাপাড়ে টিকলি
মনঅ হরখি গেলি।
কেথিকেরা আইড় পাইড়
কেথিকেরা শাড়ি, সরমে মরি
কেথিকেরা বাজুবান, কেথিকে টিকলি
মন হরখি গেলি।
সূতাকেরি আইড় পাইড়
টসরেখা শাড়ি, সরমে মরি
রুপাকেরি বাজুবান, সনাকে টিকলি
মন হরখি গেলি।

নাচনী মালিয়া / দরবারী বা উচ্চাঙ্গ ঝুমুর :

১। কুসুম শয়ন পাতি, তুমি যারে চাহ নিতি
তারে বুঝি ধরেছে চন্দ্রায় গো
সে তো আসবে না গো, তোর কুঞ্জেতে
রং।। আজ নিশি করিবে সেথা ভোর গো
রাধে নাগর তোর।।

২। চাঁদের উদয় কালে, গ্রাসিল রাহু সবলে
তাইত বাসর রহিল আঁধার গো
কুঞ্জ আলো না হইলা গো চাঁদ অভাবে
আজকে বাসি হইল বাসর গো।।

৩। বৃথা তব প্রসাধন, বৃথা কুসুম চয়ন
বৃথা হল বাসর সাজন
কত জ্বালা যে দিল গো নিঠুর নাগর।।

৪। বিনা সে চিকন কালা, বৃথা হল গাঁথা মালা
মন জ্বালা বাড়িল দ্বিগুন গো
ধনি মিটল না গো মনের আশা
কেবল সার হল আঁখি ভরা লোর গো।।

৫। গৌরাঙ্গ প্রসাদের বাণী, কেঁদোনা রাই বিনোদিনী
নিশ্চয় হইবে নিশি ভোর গো
তখন থার্কবি বসে গো অভিমানে
আমি দেখব এসে করবে তোরে জোর গো।। (গৌরাঙ্গিয়া সিংহ)

ভৌগোলিক পরিসীমা : পূর্বেই বলেছি পুরুলিয়া ঝুমুর দেশের হৃদয়ভূমি। তবুও ঝুমুর দেশ বা ঝুমুর ক্ষেত্র এতই বিশাল যে তা না আলোচনা করলে ঝুমুর সম্বন্ধে ধারণার অসম্পূর্ণতা থেকে যায়। ডঃ বঙ্কিম মাহাত-র কথায় "আদিবাসী জনজাতি অধ্যুষিত অরণ্য পর্বতসঙ্কুল ছোটনাগপুর মালভূমির বিস্তৃত ভূখণ্ডই বৃহত্তর ঝুমুর পরিমণ্ডল।"

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য ঝুমুরের বিস্তৃতি দেখেছেন, "ছোটনাগপুর হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র মধ্যভারত ব্যাপিয়া গুজরাটের সীমান্ত পর্যন্ত।"

রাজ্যেশ্বর মিত্রের উক্তি, "ঝুমুর অত্যন্ত ব্যাপক পরিধির সঙ্গীত। এতখানি ভৌগোলিক সীমানা অধিকার করে আর কোনো লোক পর্যায়ের সঙ্গীত আছে বলে জানিনে।"

ঝুমুর গানেও রয়েছে এর প্রতিধ্বনী :

ঝুমুর/

১। হাঁইকেলে ঝুমইর নাগপুরে,
কুঁহরে মাদৈল কেঁওঝরে,
পুরুল্যা আর মেদনীপুরে সেও হদকে উঠে মন
রং।। সাধের ঝুমইরে কি জাদু আছে, নকি মধু আছে গো
মনকে মাতাল করে সতক্ষণ।।

২। শাল পিয়ালের বনের ধারে
পাহাড় কলের গাঁয়ে ঘরে
ডি, ডুংরি আর বিলে ক্ষেতে আমার ঝুমইরের জনম।। (ছত্রমোহন মাহাত)

অথবা—

১। ঝাড় গাঁয়ের বনে ঝাড়ে ভালোবাসা আছে
ময়ূরভঞ্জ আর সুন্দর গড়ে মনের ময়ূর নাচে

পুরুল্যার পিরিতে আমার মজে গেল মন
রং।। ধমসা মাদৈলে নাচে নাচনী যৌবন।।

এ ছাড়াও দেশত্যাগ আর বাস্তুত্যাগ এবং কুলিচালনের সুবাদে ঝুমুর পৌঁছে গেছে বাধাবন, দার্জিলিং, আসাম, কাছাড় এবং বাংলাদেশেও।

ঝুমুরের শ্রেণী বিভাগ : ঝুমুর যে এক বিশাল পরিধির সংগীত তা সকলেই স্বীকার করেছেন। এর ইতিহাস হাজার বছরের পুরোনো। স্বভাবতই এর সংগীত ও সাহিত্যের ভাণ্ডার এতই বিশাল ও বৈচিত্র্যময় যে শ্রেণী বিভাজনের ক্ষেত্রেও বহুমত থাকাই স্বাভাবিক। ঝুমুরের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তনের আলোচনায় এই বিষয়ে আমরা কিছুটা আলোকপাত করেছি। বিভিন্ন পণ্ডিতগণের মতামত কি তা দেখা যেতে পারে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ঝুমুরকে ভাগ করেছেন পাঁচভাগে—

১। কৃষ্ণলীলা ঝুমুর

২। রামলীলা ঝুমুর

৩। লৌকিক ঝুমুর

৪। সাঁওতালি ঝুমুর

৫। টপ্পা ঝুমুর।

ডঃ সুধীর করণের মতে ঝুমুর চার শ্রেণীর—

১। দাঁড় ঝুমুর।

২। টাঁইড় ঝুমুর

৩। কাঠি নাচের ঝুমুর।

৪। নাচনী নাচের ঝুমুর।

ডঃ বঙ্কিম মাহাত ভাগ করেন পাচভাগে—

১। লৌকিক প্রেম বিষয়ক

২। রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক

৩। পৌরানিক

৪। সামাজিক

৫। প্রহেলিকা মূলক

যাই হউক সুর, তাল, নৃত্য তথা সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ঝুমুরকে আমরা মূল দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি।

১। পাঁতা, ডাঁইড় বা ভাদরিয়া ঝুমুর

২। নাচনী শালিয়া বা দরবারী ঝুমুর (উচ্চাঙ্গ)

ডাঁইড় বা ভাদরিয়া
ঝিঙাফুল্যা
ডহরওয়া
খেমটা
উদাসিয়া
রসরসিয়া
রসপখিয়া
ঝুমকা
ঝুমটা
রিঁঝা
মাঠা
রিঁঝামাঠা
নাগপুরিয়া
পতর তুল্যা
পাটিয়া মেধা
নিকান
আড় খেমটা
চাল খেমটা
গাঢ়োয়া (গভীররাত্রে গাওয়া হয়)
ডবকা
ছোয়াড়ি
বুরুটাইড়
বুরুতামাড়িয়া
পাহাড় কল্যা

মুদালি
মাঝিয়ালি
গোলোয়ারী
তামাড়িয়া
শিখরিয়া
ডমকচ
মলহরিয়া
বরাভূইয়া
পাঁচপরগনিয়া
ঠহকওয়া
লুঝরি
ছুলকওয়া
উড়াখাড়িয়া
রঙ
ঠাড়ারিঙা
নাচনীমালিয়া
পয়ার
ত্রিপদী
বারমাস্যা
পালা
বিরহ
চৈতালি
উধওয়া

কয়েকটি উদাহরণ ঃ
ঝিঙাফুল্যা/ভাদরিয়া—

১। বাঘমুড়ির পাহাড়ে লাহের বড় চেটিরে
লাহের দৌলতে দাদার আগঠেঁগে ধুতিরে।

২। যখন উঠে ভুড়কা, কাড়া খুলে লুড়কা
মার গো তুঁই খুলেদিবি বাড়ী দিয়ের হুড়কা।

৩। ভাদর মাসে গাদর জনার, চুল্হায় দিলে ফুটেরে,
এমনি বঁধুয়ার মন কাঁদে কাঁদে উঠেরে।

৪। ছুটুমুটু নাচনীটি, পিঠ ভত্তি চুইল রে
হাঁথে শাঁখা কমর বাঁকা, উড়ে গেঁদা ফুলরে।

রিঁঝা—

১। কতিখনে ফুটয়ে হরদিনা ঝিঙাফুল
কতিখনে ফুটাই লাল সালুক ফুল।

ডবকা—

১। ছুটু মুটু টুভরি, পড়ল চাটান হো
হাই রাম গরি সাঁউরি ঘাঁটে ধান।

খেমটা—

১। আমড়া তলে ছামড়া করে,
রহব দিনা চাইর,
গাঁয়ের চৌকিদার
কনঠিনে বসাবি জমাদার।

ডহরোয়া—

১। পানি পাথরের পরব দেখবি কখন
বেলা গেল গ মাথা বাঁধবি কখন।

মুদ্যালি—

১। নদী ধারে গাছ পালা কাঁদে
দেখ লদি ডুবায়ে রাখিবে কত জলে।

উড়াখাড়িয়া—

১। ও দিদি চমকি উঠলি গো
পঁহচলাঞ গে দিদি শ্বশুরালি লক
দিদি চমকি উঠলিগে।।

ছুলকওয়া—

১। কনে কুড়াওলা আহার পখইর, মধুর মালতিগে
কনে কুড়াওলা চুঁয়াঘাট, মধুর মালতিগে।
সঁইয়াঞ কুড়াওলা, আহারা পখইর,
দেওরাঞ কুড়াওলা চুঁয়াঘাট, মধুর মালতিগে।।

নাচনী মালিয়া—বিরহ

১। ভাঙ্গিয়া গেলরে আমার সোনার বরণ দেহি
ঐ কানা খালভরার ঘরে রহি কিনা রহি।।
আমার ভাঙ্গে গেল দেহি।। রং
এই বিরহ জ্বালারে, আমি কতই রইব সহি
আমার অন্তরের কথা তারে দিহ কহি।। রং
গোবিন্দপুরের কৃত্তিবাসেরে, কানে কানে দিলকহি
এই যৌবনের জ্বালা যেমন শরাবনের বহি।। রং

(কৃত্তিবাস কর্মকার)

ত্রিপদী—

১। ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ছিল খাঁটি, কলিকালে হল্য মাটি
বৈশ্য শুদ্র কেউ না চিনিল,
নিজে নিজে দেখায় সম্মান, যেমন বাদশা মুসলমান
সারা বসুন্ধরা অরাজক হল্য।
তাঁতি বলে দিন চলে না তাঁতবুনি, এবার একহাল বলদ কিনি
তাঁত বিকে চাষেতে মন দিল
টিনের হাঁড়ি উঠল দেশে, কুমারের চাল রইল বৈসে
চাকের মুলে কুমার ভাবিতে লাগিল
রং।। সজনীরে, কি কইরে দিন কাটি বল।।

(নগেন সিং)

সুর, তাল ও গায়কী: ঝুমুর মূলত সঙ্গীত পরে সাহিত্য। এর সাহিত্যের বিভিন্ন দিকগুলি নিয়ে বহু পণ্ডিত গবেষক আলোচনা করলেও সুর, তাল, গায়কী বা সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে তেমন কেউ আলোকপাত করেননি। সঙ্গীত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত কোনো গবেষক এই কাজে এগিয়ে এলে কাজটি সহজ হতে পারে। আমি সঙ্গীত বিশারদ নই। এই বিষয়ে আমার অক্ষমতা প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া ভালো। সাহিত্যের মতোই ঝুমুরের সুর, তাল ও গায়কীর ক্রম বিবর্তনের ধারাটি কিরূপ তার কিছুটা আলোচনা করেছি পূর্ব অধ্যায়ে। ঝুমুরের সুর ও তালের উপরে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সিল্লীর রাজা উপেন্দ্রনাথ সিংদেও-এর "ছোটনাগপুর তালমঞ্জরী"। উপেন্দ্রনাথ নিজেই ছিলেন একজন উঁচুদরের সঙ্গীত বিশারদ, বাদক এবং ঝুমুর গায়ক। কিন্তু রাজা জমিদারদের কাল শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝুমুর চর্চায় ভাঁটা পড়ে গোটা ঝুমুর দেশেই। তারপর যতদূর জানি এই বিষয়টির উপর উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন ডঃ বীণাপানি মাহাত কিন্তু তা প্রকাশিত নয়।

ঝুমরে সুর বা রাগকে বলা হয় রেগ। ঝিঙাফুলিয়া, রিঝাঁমাঠা, গাঁড়োয়া, খেমটা [illegible] একটি ঝুমুর রেগ বা রাগ। এই রূপ বহু প্রকার রেগের সন্ধান পাওয়া যায় যা ঝুমুরের শ্রেণীবিভাগে উল্লেখ করা হয়েছে। অনুমান করা যায় এগুলি ঝুমুর দেশের নিজস্ব দেশজ রাগ যা হাজার বছর ধরেই বিদ্যমান। রূপ ও বৈশিষ্টেও সম্পূর্ণ এই মাটির নিজস্ব। ভাদরিয়া ঝুমুরে তাল বিভা[illegible] ৮, ১২, ১৬ বা ২৪ মাত্রার হয়ে থাকে। ভাদরিয়া রেগগুলি বেশির ভাগ দুই পদ বা পঙতিব কখনো চারপদ বিশিষ্ট। কথা সহজ হলেও কাব্যরসে টইটুম্বুর। ভাষা জটিলতাহীন। বক্তব্য জীবনমুখী। তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতার সৃষ্টি, জীবনের খণ্ড খণ্ড চিত্র। জাপানী হাইকু কবিতার সঙ্গেই এর তুলনা হতে পারে। সুরের গতি উজ্জ্বল এবং অধিকাংশই দ্রুত লয় যুক্ত। সুর অবরোহ ধর্মী। এ যেন পুরুলিয়ার তরঙ্গায়িত মাটির ভঙ্গিমা। রাজ্যেশ্বর মিত্র সেই কথায় বলেছেন. "ঝুমুরের form টাই অবরোহধর্মী এবং এর সবচেয়ে বড় Phchycological appeal হল এই ধীর অবরোহণের কৃতিত্বে। ঝুমুর সিদ্ধিলাভ করেছে বিরহের গীতিতে এবং এর যে অবরোহণের লীলায়িত style, সেটাই বিরহকে অত্যন্ত মূর্ত করে তুলেছে।" এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন পাঁতা বাড়াইড় বা ভাদরিয়া ঝুমুর গীত, নৃত্য ও বাদ্যের সমন্বয়ে একটি পরিপূর্ণ সঙ্গীত কিন্তু তারও আদিরূপটাইড়, উধোয়া, বিরহ বা চাঁচর গীতে কোনো নৃত্য বা যন্ত্রানুষঙ্গ ছিল না। অধিকাংশই ছিল যৌন আবেদন মূলক। তাই লোকালয়ে গাওয়া ছিল নিষিদ্ধ। বন, পাহাড়, মাঠে মুলত এগুলি গাওয়া হত। উদাত্ত কণ্ঠে গাওয়া হত। গানের কথা ছিল বক্তব্যধর্মী। গাওয়া নয় তাই রীতিকে বলা

হত ‘হাঁকা’। গানের মধ্য দিয়ে কথার আবেদন পৌঁছে দেওয়া হত বহু দূরে কোন প্রেমিক বা প্রেমিকার নিকট। এই রীতি আজও শেষ হয়ে যায়নি। কান পাতলেই আজও পুরুলিয়ার মাঠে ঘাটে তা শোনা যায়।

ভাদরিয়া ঝুমুরের সুর ও তালে একটি বিশেষ আবেদন রয়েছে যা সহজেই শ্রোতার মনকে আপ্লুত করে। আজও নাচনী বা ঝুমুরের আসর মাতাতে এই গানই ব্যবহার করা হয়। ঝুমুরে গান ধরার সঙ্গে সঙ্গে তাল ধরার রীতি নেই। রং গাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাল ধরা হয় এবং ক্রমশ দ্রুতলয়ের মধ্য দিয়ে গান চরমে পৌঁছে যায়। শেষে জামির বা তেহাই দিয়ে গান শেষ হয়। ভাদরিয়া ঝুমুরে উড়ান বাজনার তেমন সুযোগ নাই। একটি ভাদরিয়া ঝুমুর ও তার তাল—

ঝুমুর—ভাদর মাসে গাদর জনার কাওয়াকে খাওয়ালি লো
হাঁসে হাঁসে, অতুঁই দেওরকে ভুলালি লো।

তাল ৮ মাত্রা।

ঠেকা—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
গিদাক	ধাতুং	তাক	ধাতুং	তাক	ধাতুং	তেরেখেটে	তুদাং
+		২		৩		০	

৮ মাত্রার অন্য ঠেকা—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধাধাক	তুং	ধাতুং	—	তেবে খেটে	তুদাং	—	—
+		২		০		৩	

তাল ১২ মাত্রা

ঠেকা—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ঝাঁ	গেদা	গেদা	গেড়ে	ঝাঁ	—	ঝেঁদা	গেদা	গেড়ে	ঝাঁ	—	—
+				২		০		৩		০	

তেহাই—গেদা গেন দাঘে, গেন দাঘে গেন দাঘেন, উর্‌র্‌ গেদাগেন দাঘে ভাদরিয়া ঝুমুরে আড়াই চাপড়ের তাল শোনা যায়। তেমনই একটি ঝুমুর—

১। অ দিদি ঝালদার আম
ফাগুড় মারিতে পড়ে ঘাম।

নাচনী মালিয়া বা দরবারী ঝুমুর কথা সুর ও তালের দিক থেকে রীতিমতো জটিল ও উচ্চাঙ্গ সংগীতের পরিচয় বহন করে। মূলত নাচনী নাচের প্রয়োজনই এই ঝুমুরের সৃষ্টি। রাজদরবারে সৃষ্টি বলেই এর অন্য নাম দরবারীঝুমুর। হেঁসলা, সিল্লী, বাঘমুণ্ডি, ইচাগড়, কাশিপুর, জামতাড়া, জয়পুর সরাইকেলা, ময়ূরভঞ্জ রাজদরবার এই বিষয়ে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। সিল্লীর রাজা পশুপতি সিং, উপেন্দ্রনাথ সিদেও, ময়ূরভঞ্জের রাজা পূর্ণচন্দ্র ভঞ্জ ও প্রতাপ চন্দ্র ভঞ্জ, সরাই কেলার রাজা উদিত নারায়ণ সিংদেও, পঞ্চকোটরাজ জ্যোতিপ্রসাদ সিংদেও শুধু ঝুমুরের পৃষ্ঠপোষকতায় করেননি তাঁরা নিজেরাও ছিলেন কবি, গায়ক ও উঁচুদরের সংগীত বিশারদ। ঝুমুর ও নাচনী নাচের চর্চাও সুরারোপের জন্য কবি, গায়ক, রসিক, নাচনীদের জমি, ভূমি ও তাঁরা গ্রামদান করেছিলেন। অর্থ, সম্মান ও মাসোহারা দিয়ে শিল্পীদের সম্মান জানাতেন। ফলে বেনারস ও বিষ্ণুপুর ঘরানার

ধ্রুপদী সঙ্গীতের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে উচ্চাঙ্গ ঝুমুরে। ঝুমুড়ি বা নাচনী নাচে প্রভাব পড়ে বাঈজী নৃত্যের। যার পরিণতি দেশজ ভাদরিয়া রেগ, কীর্তণ ও শাস্ত্রীয় সংগীতের অপূর্ব ও অনায়াস ত্রিবেণী সঙ্গমে নাচনী শালিয়া বা দরবারী ঝুমুর এক অনন্য সুর সৃষ্টি হিসেবে আজ পরিগণিত।

যন্ত্রানুষঙ্গেও পুরাতন ঢোল, ধমসা, মহুরি, সিঙা তুরুধুতু, জুড়িনাগড়া, চেড়পেটির সঙ্গে সংযোজিত হল হারমোনিয়াম, তবলা, মাদল, করতাল, বাঁশি, কর্ণেট। মোটাতাল থেকে সরুতালে। উচ্চাঙ্গ সংগীতে সুরের নিয়মবদ্ধ বিকাশ ও পরিণতির জন্য যে কোনো গানকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা—স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ। ঝুমুরে এর ব্যতিক্রম রয়েছে। ঝুমুর শুরু হয় অন্তরা থেকে। গান শুরুর সঙ্গে ঝুমুরের তাল শুরু হবে এমন কোনো কথা নেই। তাল সাধারণত শুরু হয় ফাঁক থেকে। শুরুতেই জমির বা তেহাই দিয়ে তবে তাল বাজানো শুরু হয়। শেষ হয় মাতানে। ঝুমুরের রং, ধুয়া, বা মাহাদা বলতে স্থায়ীকে বোঝায় এবং অন্তরা হল কলি বা কড়ি। ভনিতাযুক্ত অংশটি একাধিকবার গাওয়ার রীতি। পুনঃকথনের মধ্য দিয়ে ঝুমুর দ্রুতলয়ের দিকে এগিয়ে যায় এবং নাচকেও চরম মুহূর্তে পৌঁছে দেয়। দরবারী বা নাচনী মালিয়া ঝুমুর সুর ও তালের দিক থেকে অত্যন্ত জটিল বলা যায়। স্বর বিস্তারে যেমন দেড় সপ্তক জুড়ে সুরের বিস্তৃতি তেমনি তালের ক্ষেত্রেও ৪০, ৫০ বা ৬০ মাত্রা পর্যন্ত তালের বিস্তৃতি ঘটে। উপেন্দ্র নাথ সিংদেও তাঁর "ছোটনাগপুর তালমঞ্জরী" গ্রন্থে জুড়ন, বুরুটাইড়, ছোয়াড়ী ফুলওয়ারী তালে ১৮, ২৪, ৩৬, ৪২, ৪৮ বিভিন্ন মাত্রার ব্যবহার দেখিয়েছেন। দীনা তাঁতির ঝুমুরে আমি চার কলিতে চার রকমের সুর ও তাল প্রয়োগ দেখেছি যা উচ্চাঙ্গ ঝুমুরের জটিলতা ও বৈচিত্র্যকে প্রমাণ করে।

"ঝুমুরে তাল নেই, মাত্রা অবলম্বন করেই গাওয়া হয়। এটি অনার্য-ধারার প্রাচীন পদ্ধতি। অবশ্য তাল বসানো যায়, অনেকে বসান। তাতে মাধুর্যের কিছুটা হানি হয়।" অধ্যাপক সুবোধ বসুরায় একথা কেন বলেছেন তা বোধগম্য হয় না।

ঝুমুর যেমন অনন্য তার সুর ও তাল বৈশিষ্ট্যে, তেমনি এর গায়কী একান্তই নিজস্ব এবং স্বতন্ত্র। ঝুমুর পরিবেশনে গায়কী বা গায়ন রীতির ভূমিকাকে কোনভাবেই উপেক্ষা করার নয়। ঝুমুর সম্পূর্ণতা পায় অনেকটা এর উপরই। বৈঠকী ঝুমুর পরিবেশনে ঝুমুরের গায়কী রীতি প্রয়োগের সুযোগ কমে যায়। কিন্তু তা লুপ্ত হলে ঝুমুরের অঙ্গহানি ঘটতে পারে। ঝুমুর অনন্য তার আদিরস ও মাদকতায়। কথায় আছে বরং মদের নেশা ছাড়া যায় তবু ঝুমুরের নেশা যায় না। এই রসের পূর্ণতা পায় ঝুমুরের অনন্য গায়কী রীতির জন্যই।

ঝুমুর সাহিত্য: ঝুমুর মূলত সংগীত হলেও, সাহিত্যের বিচারেও ঝুমুর এক বিশাল সাহিত্য ভাণ্ডার যা পুরুলিয়া ও তৎসংলগ্ন ঝুমুর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের জীবনাশ্রয়ী জনপদীয় সাহিত্য। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে ঝুমুরের উল্লেখ এবং চর্যাপদের সঙ্গে ঝুমুরের সাদৃশ্যের কথা বিবেচনা করলে, ঝুমুর যে চর্যাপদেরও আগেই সৃষ্টি হয়েছিল তা অনুমান করা যায়। অধ্যাপক সুবোধ বসুরায় বলেছেন, "চর্যাগীতি ও ঝুমুরের সদৃশ্য ঘনিষ্ঠ বলে মনে করি, গঠনরীতিও বিষয়বস্তু উভয়ত বিচারে। দেহতত্ত্বের ঝুমুর এখানে পরিচলিত সাধুগানেও (বাউলগানে) চর্যাগীতীর প্রভাব প্রত্যক্ষ। আক্ষরিক মিল রয়েছে। চর্যাগীতির ধ্রু (ধ্রুবপদ) এখানে ঝুমুরে সর্বত্র রক্ষিত। ডোম্বি, শবরী, উঁচা উঁচা পর্বত, মোরঙ্গী পীচ্ছ, গুঞ্জরী মালী, সাঙ্গ (সাঙঘা = দ্বিতীয় বিবাহ) সব এখানের। ভাষার মিলও রয়েছে।" তাই ঝুমুর সাহিত্যের প্রাচীনত্ব ও হাজার বছরের ইতিহাস পরিক্রমা এর সাহিত্য ভাণ্ডারের বিশালত্বকে বুঝতে সহযোগিতা করবে। ভনিতাহীন আদি ঝুমুরের মতো ভনিতাযুক্ত উচ্চাঙ্গ ঝুমুরও অলিখিত ও শ্রুতি হিসেবেই আজও থেকে গেছে মানুষের মুখে মুখে। অবলুপ্ত

হয়েছে কত হাজার হাজার গান তার কোনো হিসেব নেই। কত শত শত কবি এর সাহিত্য ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে গেছেন তার হিসেব দেওয়া বাতুলতা। ঝুমুরের কাব্য ও আধুনিক যুগেও ঝুমুর লিখে রেখেছেন ও বই প্রকাশ করেছেন এমন কবির সংখ্যা হাতে গোনা যাবে। প্রাচীন কবিদের মধ্যে বিনন্দ সিংহের "আদি ঝুমুরসঙ্গীত", ভবপ্রীতানন্দ ওঝার "বৃহৎ-ঝুমুর রসমঞ্জরী", উমানন্দ ওঝা কবি ভূষণ ও শিরোমণি ঝুমরাপাণ্ডা রচিত "বৃহৎ ঝুমুর শিরোমণি" উল্লেখযোগ্য ঝুমুর কাব্য গ্রন্থ।

ঝুমুর সাহিত্য পর্যালোচনা করলে আমরা দেখি ১৮৫০-১৯৫০ খ্রিঃ অর্থাৎ কাব্য যুগে ঝুমুর চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। গিরীশ মহন্ত তাই কাব্য যুগকে ঝুমুরের স্বর্ণযুগ বলেছেন। এই যুগে ঝুমুরে ভাব, ভাষা, ছন্দ, প্রকরণ আঙ্গিক, রস ও অলঙ্কারে ঝুমুর সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়ে উঠে। এমনকি সংস্কৃত সাহিত্যে যত রকম অলঙ্কার আছে তার সবকটির প্রয়োগ ঝুমুর সাহিত্যেও হয়েছিল এমনতর দাবী করেছেন গিরীশ মহন্ত। কিছু উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হল।

অনুপ্রাস অলঙ্কার: ছেকানুপ্রাস—ভাদরিয়া/কুড়মালি

ক) শামেক ধিয়ানে বাতুল গিয়ানে,
পানিয়া পিয়ইতে হিটকলরে নন্দসুভাই।
শয়নে ঝটকলি পঁইরিয়া চটকলি
ছিটকলি খিড়কিঞ, লটকলরে নন্দসুভাই।
সখি আঁখি মিটকল, বহিপাণি সটকল
চলে যেসন চিঙ্গড়ি, ছিটকলরে নন্দসুভাই।
ভীমে ধরায় অটকলি,সাতপুরুষ উটকলি
পটকলি ঘইলা, মটকল রে নন্দসুভাই।। (ভীম মাহাত)

খ) এভব বিভব কব কি তব, কাইতে আমার নাই জ্ঞান
সব অসম্ভব তোমাতে সম্ভব, মহান হইতে তুমি মহান। (উদয়)

গ) অঙ্গ বাঁকা ভঙ্গ বাঁকা
চুড়ার উপর ময়ুর পাঁখা
চলন বাঁকা, চরণ বাঁকা, বাঁকা দু নয়নগো
রং।। তার নয়নে নয়ন দিলে আর কি নয়ন ফিরে গো।। (রামকৃষ্ণ)

ঘ) গর গর ঘনওয়া
হর হর পবনওয়া
ঝর ঝর বারি বরষে শ্রাবণওয়া।। (দুর্যোধন)

ঙ) ঐ ঐ ঐ বাঁকা
যার নাচে আঁখি ভুরু বাঁকা
রং।। চুড়ার পাঁখা উড়ে ফুন ফুন ফুন ফুন ফুন ফুন ফুন।। (গঙ্গাধর)

বৃত্তানুপ্রাস: ক) বাঁকা লম্পট শঠ কপট কুটিল, কঠিন চপট কালিয়াহে।। (জগৎ)

২। যমক— ক) একি নীল জলধর সখি।। রং
যমুনা সলিল দেখ কত নীল, নীল কুঞ্জে গুঞ্জে নীল মধুকর।।
দেখ সবনীল দেখ সবনিল
কে নিল, কিনিল, কি করে যায় ঘর।। (জগৎকবিরাজ)

৩। ব্যাসকূট—ক) বিন্দু সমর্পিয়াদ্বারে, তিথি যোগ দিয়া তারে
হরিপক্ষে পৃষ্ঠে দিয়া বাণ।
হের সহচরি পরে, এই বলি শ্যাম আমারে
মধুপুরে করিল পয়াণ।
রং।। শ্যাম বিনে ব্যাকুল পরান, আমার পঞ্চস্বরে জ্বরে মর্মস্থান।। (রামকৃষ্ণ)

অথাৎ, বিন্দু = ০, দ্বার = ৯, বিন্দু সমর্পিয়া হয় = ৯০, তিথি, তিথি = ১৫, তিথি যোগ করে হয় = ৯০ + ১৫ = ১০৫। হরি = হরণ করে। পক্ষ = ২, পৃষ্ঠে তার = তার ডাইনে। বান = ৫ অর্থাৎ পক্ষ পৃষ্ঠে বান = ২৫, হরিয়া হয় = ১০৫ – ২৫ = ৮০ অর্থাৎ আসি বলে শ্যাম মধুপুরে চলে গেল।

৪। উপমা— ভাদরিয়া/কুড়মালি
জৈসন পূর্ণিমা চাঁদ করে ঝিকিমিকিগ
তৈসন ধনী শোভে মুতর গ।
জৈসন উজর কনক চাঁপা ফুল গ
তৈসন ধনী তর অঙ্গ গোর গ।। (ভবপ্রীত)

৫। রূপক— অলক্ত রঞ্জিতপদ, যেন দুই কোকনদ
ভবপ্রীতার হৃদি সরোবরে।।

৬। অপ্রস্তুতি অলংকার— ক) এক তরুবর তিনটি শাখা
পঞ্চবঙ্কে পত্র আছে অলেখা
তিনপুর ছায়া ব্যাপিয়া,
বিনাফুলে ফল, আছে দুই ফল
বিনা রসে রস ভরিয়া।
রং।। সাধুজন দেখ ভাবিয়া।। (দীনা)

খ) পাঁচমুণ্ড পনের পেট
তাহে রাধা কৃষ্ণ হেঁট
উরগ ছুটল উরপুরে
রং।। ভেটল মকে যদুবরে।। (বরজুরাম)

ঝুমুর সাহিত্য বাংলা, কুড়মালি, মুন্ডারি ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ঝুমুরের কোনো স্থান নেই। আজও বহু মানুষেরই ধারণা ঝুমুর মানেই অশ্লীল। ইতর ও ব্রাত্যজনের সংগীত। অবিলম্বে এই ধারণার সমাপ্তি ঘটা প্রয়োজন। প্রয়োজন সংগ্রহ ও সংরক্ষণের।

কবি ও শিল্পীসমাজ— পূর্বেই বলেছি ঝুমুর মূলত সংগীত হলেও এক বিশাল কাব্য সাহিত্যের ভান্ডার। হাজার বছর ধরে যে সাহিত্যের দীর্ঘ পরিক্রমা এবং যার ভৌগোলিক পরিসীমা ভারতের প্রায় অর্ধেক ভূ-ভাগ জুড়ে। তার কবি ও শিল্পী সমাজের পরিচয় তুলে ধরা এক কথায় অসম্ভব। তবে আমাদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু মূলত পুরুলিয়া হওয়ার কাজটি কিছুটা সহজ হয়ে পড়ে। তবু কত কবি, শিল্পী, নাচনী ও রসিক যে এই শিল্পধারাকে সমৃদ্ধ করে গেছেন তার ইতিহাস উদ্ধার করা একজনের কর্ম নয়। বিশেষত ঝুমুর সাহিত্যের বেশিরভাগই যেখানে অলিখিত, অপ্রকাশিত এবং শ্রুতি সাহিত্য হিসেবে থেকে গেছে সেখানে এই কাজ আরও দুরূহ। কালের বিচারে যারা

উত্তীর্ণ তারা কেউ কেউ জনমানসে আজও টিকে থাকলেও বেশির ভাগ কবি হারিয়ে গেছেন বিস্মৃতির অন্তরালে। আজও যারা জন মানসে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়, বরণীয়, যাদের গান আজও হারিয়ে যায়নি তাঁদেরই কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিয়ে এই অধ্যায়। সর্বশেষে ঝুমুরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে যে বিশাল নাচনী, রসিক, শিল্পী সমাজ জড়িত তাদের কিছু তালিকা সংযোজিত হল। ঝুমুর এক আশ্চর্য সংগীত যা মানুষকে পাগল করে, বিবাগী করে। ঝুমুরকে ভালবেসে কত রাজা জমিদার যে নিঃস্ব হয়েছেন, কত রসিক সংসার ছেড়েছেন, কত নাচনী কুল ও সমাজ ত্যাগ করেছেন তার হিসেব নেই। সে ইতিহাস রোমাঞ্চকর। অনন্য উপাখ্যান। মানুষের মুখে সে সকল কাহিনী আজও শোনা যায়। এই উপাখ্যানের নায়কদের নিয়েই গীত রচনা করেছেন কবি সন্তোষ মাহাত।

ঝুমুর

১। শুন সবে সভাজন, করি আমি নিবেদন
ঝুমুর গান করিব বর্ণন।
তাই ঝুমুরের কবি যত, সবকে করি প্রণিপাত
আশীর্বাদ দেহ সর্বজন।।
উদয় কর্মকার হতে, শুরু করি ঝুমুরেতে
টিমা, ফণী, মাধব, মদন।
অখু, অনন্ত, অমূল্য, সব কবি সমতুল্য
গঙ্গাধর আর গরুড় নারায়ণ।।
রং।। ঝুমুর গানের কবিগণে, বন্দি আমি মনে প্রাণে
আশীর্বাদ দেহ ত্বরা করি।
গীত ঝুমইর যে বর্ণিবারে পারি।।

২। অমৃতা, রামেশ্বর, আতুর, উমানন্দ, গদাধর
দ্বারিকা, নরেশ, দুর্যোধন।
পরেশ, পাগলি, পীতাম্বর, কোকিল, বিরিঞ্চি আর
নরোত্তম, নীলকণ্ঠ, নিবারণ।।
নিত্যানন্দ নিধিরাম, বনমালি বরজুরাম
ফলারিয়া, কিরীটি ভূষণ।
দ্বিজসাথী হরিপদ, কৃষ্ণ আর কৃষ্ণপদ
গণি গোবিন্দ, জাণকি তপন।। রং

৩। দ্বিজ হীরা, দীনা তাঁতি,নগেন, চণ্ডীদাস, ধনপতি
হরিপদ, সুচাঁদ, গোপাল, চৈতন্য।
তরণী আর তারাচাঁদ, ক্ষেপা, ভোলা, ক্ষেপাচাঁদ
উদয়, বংশী, কালিপ্রসন্ন।।
চামু, ছুটু, গৌরাঙ্গিয়া, জগৎ, জ্যোতি কালিয়া
জগন্নাথ, কুচিল, কৃত্তিবাস।

বামা, কিনন্দ, বাণেশ্বর, বিনয়, ভলু, ভিক্ষাম্বর
রাখালিয়া, রাধাচরণ দাস।।

৪। যাদু, যামিনী, শশিশেখর, মনু, মথুরা, মুক্তেশ্বর
রামকৃষ্ণ, ললিত কিশোর
সৃষ্টিধর আর লক্ষীকান্ত, শক্তি, শরৎ সলাবত
শ্রীপতি, সতীশ, সর্বেশ্বর।।
যদুনাথ আর রাঘব, বিপিন, বিষ্ণু, সহদেব
ভীম, রূপলাল, ভরত সিং, ভবানী।
সারদা, সাগর, সুন্দর, মহিষা, হনু, লুথর
শকুন্তলা, শ্রীদাম, শিরোমনী।। রং

৫। ভবপ্রীতা, ভগীরথ, সুরেন্দ্র, সুবোধ, শ্রীনাথ
সুনীল, হাজারী, হারাধন।
রায় হাড়িরাম, রবিকুমার হেমচন্দ্র ভরতকুমার
হেম, দুলাল, বিরিঞ্চি , দুঃশাসন।
মহেন্দ্র, মনোরঞ্জন, গৌরিনাথ কুমুদরঞ্জন
মিলন, বিরোচণ, সর্বজন।
সদানন্দ আর যত, জানা অজানা সেত
মাগে সন্তোষ সবার চরণ।। রং

ভবপ্রীতানন্দ ওঝা ঃ অলক্ত রঞ্জিতপদ, যেন দুই কোকনদ
ভবপ্রীতার হৃদি সরোবরে।

যার গান শুনে ঝুমুর দেশের মানুষের অন্তর আলোড়িত হয়, আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠে মন, তিনি ঝুমুর কবি সম্রাট ভবপ্রীতা। লোকমুখে তিনি ভবপীতা বা দ্বিজ ভবপ্রীতা নামেই পরিচিত। জনপ্রিয়তায়, নাম, যশ খ্যাতি, প্রতিপত্তিতে ভবপ্রীতার সমতুল্য কবি ঝুমুর দেশে কেহ নাই।

ভবপ্রীতার ঝুমুর না জানলে তাকে ঝুমুর শিল্পী বলা হয় না। যদিও ভবপ্রীতার জন্ম পুরুলিয়া বা মানভূমে নয় সুদূর সাঁওতাল পরগনার দেওঘর বৈদ্যনাথ ধামের সন্নিকটে কুণ্ডা গ্রামে ১৮৮৬ সালে। তাঁরা ছিলেন কাশিপুরের পঞ্চ কোট রাজ পরিবারের পাণ্ডা। সেই সূত্রেই মহারাজা জ্যোতি প্রসাদ সিংদেও এর আমলে কাশিপুর আগমন এবং সভাকবি হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত ও স্বভাবকবি। ঝুমুর গানে মুগ্ধ ও রাজ আদিষ্ট হয়ে বহু উচ্চাঙ্গের ঝুমুর গান রচনা করেন। তাঁর অমর সৃষ্টি "বৃহৎ ঝুমুর রসমঞ্জরী" (২২৭টি গানের সংকলন)। ১৯৭০ খ্রীঃ ১৫ই মার্চ ৮৪ বৎসর বয়সে মহাকবি ভবপ্রীতার মৃত্যু হয়। ডঃ সুধীর করণ মতে তিনি ঝুমুরের "অভিনব বিদ্যাপতি"।

ঝুমুর

যমুনা তটিনী তটে নিকুঞ্জ বিকশিত যথা প্রসূন পুঞ্জ
গুঞ্জরে অলি মাতিয়া
সেথায় মুরারী, বাজায় বাঁশরী
রাধা রাধা নাম ধরিয়া

রং।। চলে যায় গো রাধা
চলিল রাধা দামিনী গতি জিনিয়া।।
(চঞ্চল চিত অঞ্চলে পড়ে খসিয়া)
একেত ভাদর রাতি আঁধারি, দুজে একাকিনী রাজকুমারী
ক্ষণে পথ যায় ভুলিয়া
সঙ্গেতে মদন দেখায় তখন
বিজলি আলোক জ্বলিয়া।। রং
শুনিয়া সঘনে মুরলিতান, চমকে চমকে উঠয়ে প্রাণ
চরণ যাইছে টলিয়া
ভাবি শ্যামতনু, দহিছে অতনু
তনু যায় যেন জ্বলিয়া।। রং
রসে দুরু দুরু কাঁপিছে হৃদয়, পলক বিলম্ব প্রাণে নাহি সয়
মনে হয় যায় উড়িয়া
ভবপ্রীতা মতি, সচঞ্চল অতি
মাধব দরশন লাগিয়া।। রং

রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলী : ভবপ্রীতা যেমন কাশিপুর রাজদরবার আলোকিত করেছিলেন, তেমনি ইচাগড়, বাঘমুন্ডির রাজা মদনমোহনের রাজদরবার তথা বাঘমুণ্ডি ও পাতকুম যিনি মাতিয়ে দিয়েছিলেন তিনি রসের সাগর রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলী। যার কাব্য ও কর্ম নিয়ে প্রবাদ রচিত হয়েছিল,

যেমন মদের গড়া মাতকম
তেমনি কবির গড়া পাতকম।
যেমন জ্যৈষ্ঠ মাসে আম মিষ্ট।
তেমনি ভাব রসে রাম কিষ্ট।

অথবা

"কবির শ্রেষ্ঠ রামকিষ্ট।"

তিনি ছিলেন সেখ অজমত, সুচাঁদ মাহাত ভিক্ষাম্বর লায়ার সমতুল্য একজন উঁচু দরের রসিকও। শোনা যায় নয়টি মঞ্চ তৈরি করে তিনি নাচনী নাচ পরিবেশন করেছিলেন। তার নাচনীর নাম সুভদ্রা। ঝুমুর ও নাচনীর জন্য রামকৃষ্ণকে সামাজিক বয়কটের সম্মুখীন হতে হয়। তাঁর জীবন ছিল নানান ঘাত-প্রতিঘাত ঝড় ঝঞ্ঝা ও নাটকীয়তায় ভরা। জন্ম বাঘমুণ্ডি সংলগ্ন ইচাগড় থানার পাঁড়কিডি গ্রামে ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ১৭ মাঘ। মৃত্যু ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ। তাঁর বিখ্যাত ঝুমুর—

ঝুমুর

১। কাঁচমরকও নবনীজড়িত, সুকোমল তনু শ্যামল
শ্যামের ভুরু দুটি আঁকা, ঈষৎ বাঁকা
বাঁকা আঁখি দুটি ঢলঢল

রং।। দেখে যা সখি, ভরিয়ে আঁখি
শ্যামের রূপে বন করে আছে আলো।

২। ওগো কুঞ্চিত কেশ এলাইয়া শিরে,
কে মোহন চূড়া বাঁধিল
যতন করিয়া, রতনে জড়িত
তদুপরে শিখী পাঁখা দিল।। রং

৩। বিনোদ ফুলের, বিনোদ মালা
বিনোদ বিনোদে সাজে ভাল
এমন বিনোদ নাগরে নিরখি
কোন বিনোদিনী বাঁচে বল।। রং

৪। ছিঃ ছিঃ কি কুলের গৌরব সখী
বিনামূল্যে বিকাইব চল
সে যদি আশ্রয় দেয় তবে হয়
রামকৃষ্ণের জনম সফল।। রং

জগৎ কবিরাজ ঃ "যেমন হারমোনিয়ামের গৎ
তেমনি কবি জগৎ।"

উপমা, অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ প্রভৃতি অলঙ্কারের প্রয়োগ, কবি জগৎ কবিরাজের ঝুমুরের বৈশিষ্ট্য। কবির জন্ম মানবাজার থানার পলমি গ্রামে ১২৬৪ বঙ্গাব্দে। তাঁর পদবী ছিল সেনগুপ্ত, কিন্তু আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে দক্ষ চিকিৎসক হওয়ায় জগৎ কবিরাজ রূপেই খ্যাত হন। স্কুলের শিক্ষা অল্প হলেও তিনি ছিলেন স্বশিক্ষায় সুপণ্ডিত। ফলে অল্প বয়সেই বাঘমুন্ডি রাজার সভাকবি ও রাজবৈদ্যরূপে নিয়োজিত হন। কবি হিসেবে যেমন তিনি একজন সুকবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন তেমনি শোনা যায় রোগীর হাতের সুতো ছুঁয়েই রোগ নির্ণয় করে দিতে পারতেন এমনিই ছিলেন দক্ষ চিকিৎসক। মানবা... র রাজা তাঁর কাব্য প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে "কবিরত্ন" উপাধি দেন। সব সময় রাধা ভাবে বিভোর হয়ে থাকতেন। গাইতে গাইতে ভাবে দাঁড়িয়ে পড়তেন। শেষ বয়সে দু-এক কলি ঝুমুর শুনলেই অজ্ঞান হয়ে যেতেন। ১৩৪৯ বঙ্গাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

ঝুমুর

১। বাঁকা লম্পট শঠ, কপট কুটিল
কঠিন কঠোর কালিয়া হে
অবলা মানুষে পতঙ্গে পোড়ালে
বিরহ অনলে জ্বালিয়া হে।

২। অরুণ বরণ নয়ন নিরখি
এসেছ কি পথ ভুলিয়া হে
(তোমার) নিঃশ্বাস পবন না লাগে যেমন
কুঞ্জ হতে শ্যাম যাও চলিয়া হে।

৩। ঢুলু ঢুলু বঙ্কিম নয়ন
সারাটি যামিনী জাগিয়া হে

ওহে মরমেরি কথা, হৃদয়েরী ব্যথা
যাও যাও সেথা চলিয়া হে।
৪। ধিক হে কি কব, বাকি আব কি তব
আমি যতদিন রব বাঁচিয়া হে
এই জগতে জগৎ না ডাকিবে তব
শ্রী রাধা রমণ বলিয়া হে।।

বরজুরাম দাস ঃ

বরজুরাম ঝুমুরেই দিয়েছেন তাঁর পরিচয়।
"বরজুরাম দাস নয় জাতিতে হয় তাঁতি,
শ্রী গুরু চরণে যেন সদা থাকে মতি।"

বহু ঝুমুর গবেষকই বরজুরামকে ভনিতা যুগের আদিকবি হিসেবে মেনে নিয়েছেন। জন্ম ১১২৭ বঙ্গাব্দ, বাঘমুন্ডি থানার বুড়দা কালিমাটি অঞ্চলের সারজমহাতু গ্রামে। সারজন কথার অর্থ শাল গাছ এবং সাঁওতালি ও মুন্ডারী ভাষায় আতু বা হাতু কথার অর্থ গ্রাম। অর্থাৎ শালগাছের গ্রাম। বরজুরাম ছিলেন সম্পূর্ণ নিরক্ষর। প্রতিদিন একটি করে কাপড় বুনতেন এবং তা বিক্রি করে সংসার নির্বাহ করতেন। স্ত্রী ও এক সন্তানকে নিয়ে ছিল পরিবার। প্রতিদিন তাঁত বোনার পূর্বে মনে মনে দেবতার উদ্দেশ্যে মালা নিবেদন করতেন। একদিন তার ছেলে ব্যঙ্গ করে বলে, "বাবা আর একটু হাত উঠাও না হয় চুড়ায় লেগে যাবে।" বরজুরাম ব্যথিত হন এবং অভিশাপ দেন। সন্তানের অকাল মৃত্যু হয় এবং তাঁর বংশ লোপ পায়। মুখে মুখে ঝুমুর রচনা করতেন এবং স্মৃতিই ছিল তার খাতা। বৈষ্ণবধর্মে তিনি দীক্ষিত হন। বৈষ্ণব তত্ত্ব, সৃষ্টি তত্ত্ব, দেহতত্ত্বের ঝুমুর রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর বেশিরভাগ ঝুমুর চর্যাপদের ন্যায় সাংকেতিক এবং রচনারীতি চর্যাপদীয়।

ঝুমুর

১। উলটা বৃক্ষের গুণ, জানে ভোলা ত্রিলোচন
শুনিয়ে বাউল
নীচ দিকে তার ডালপাতা উপরে তার মূল
সাখি মূলে দুটি ফুটিয়াছে ফুল।। রং
২। কুড়িটি পুঁগুড়ি যার, সাতটি বাকল তার,
শুনিয়ে বাউল
মূলে যেন ফুটে ফুল রতনে আউল।। রং
৩। গিরি গোবর্ধন যার, পিঁপিড়া বহত ভার
শুনিয়ে বাউল
গঙ্গা, যমুনা নদী বহে সমতুল।। রং
৪। কহে বরজুরামদাসে, শ্রীগুরু চরণ আসে
শুনিয়ে বাউল
মুর্খে কি বুঝিবে তার পণ্ডিত আউল।। রং

অখু কর্মকার ঃ অখু কর্মকারের জন্ম ২৫ আষাঢ় ১২৬৪ বঙ্গাব্দ মানবাজার থানার জাঙ্গিদিরি গ্রামে। অখু জাতিতে ছিলেন কর্মকার বা কামার। লেখাপড়া তার ছিল না। সারা জীবন লোহার কাজেই করে গেছেন। কাজের মধ্যেই চলত ঝুমুর রচনা। তিনি ছিলেন খুব ঈশ্বর ভক্ত। স্বভাব কবি

এবং সার্থক লোক কবি। তাঁর স্ত্রীর নাম পদ্মিনী। কবি ছিলেন সুকণ্ঠেরও অধিকারী। সবসময় আনন্দেই থাকতেন। কেউ ঝুমুর শুনতে চাইলে সঙ্গে সঙ্গে গেয়ে শোনাতেন। ঝুমুর উৎসর্গীকৃত প্রাণ কবি একশত বৎসর বেঁচেছিলেন। ২৫ আষাঢ় ১৩৬৪ বঙ্গাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

ঝুমুর

১। একনলি তিন পাটা, কব্জা দিয়ে করলাম আঁটা
মুখাড় কাঠের খিলিন চমৎকার হে
বাজালির ঘর বাজে তালে তাল হে
দেখ কামার পাতেছে শাল।। রং

২। তাই ভগবতীর ছার, কাঁঠি পিটে করি নির্মাণ
দেখিতে অতি চমৎকার হে।। রং

৩। দুধারে দুটা খুঁটা গাড়া, মাঝে আছে চরখি গাড়া
রসি ধরে টানে তালে তাল।। রং

৪। সামনে আজে লেহাই গাড়া, বাঁ হাতে সাঁড়াশি ধরা
জল কয়লায় আগুন দিয়ে তাওয়াচ্ছেন ফাল।। রং

৫। হাল বাঁধানি তিন পায় ধাপ, অখায় বলে নিয়ে আন
অখার মায়াঞ বলে তুমার সালেই হল্য কাল হে।।

নরোত্তম সিংমানকী ঃ নরোত্তম, নরোত্তমা ও নরোত্তম দাস নামেই কবি সমধিক পরিচিত। নরোত্তমের জন্ম ঝালদা থানার তোড়াং গ্রামের বিখ্যাত মানকী জমিদার বংশে ১২৮১ সালের ফাল্গুন মাসের দোল পূর্ণিমায়। লেখাপড়া তার বেশি কিছু ছিল না। তবে বাল্যকাল থেকেই তিনি বৈষ্ণব ধর্ম ও কীর্তন গানের প্রতি গভীর ভাবে আকৃষ্ট হন। বাল্যাবস্থায় তিনি ভক্তি রসে আপ্লুত হয়ে বিভোর হয়ে নেচে নেচে গান করতেন। পায়ে সবসময় নূপুর বাঁধা থাকত। তার কণ্ঠে গান ও ঝুমুর শুনে সকলে মোহিত হত। ভাবাবেগে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গাইতেন ও ঝুমুর রচনা করতেন। কিছু কিছু লিখতেন আবার বহু গান থাকত তার স্মৃতিতেই। চলতে চলতে খেতে খেতে গান রচনা করতেন। তাঁর চলা ছিল ধীর এবং নিজস্ব ভঙ্গি। এ জন্য "নরোত্তমের চলন" বলে একটি প্রবাদ রয়েছে ঝালদা অঞ্চলে। ছো এবং নাটুয়া নাচেরও তিনি ছিলেন একজন স্রষ্টা ও শ্রেষ্ঠ শিল্পী। বাঘমুণ্ডি রাজদরবারেও তিনি সমাদৃত হন। হাজার হাজার ঝুমুর রচনা করেন। প্রকাশিত হয়েছে সামান্য। লিখিত রয়েছে বহু ঝুমুর। বেশির ভাগ ঝুমুর আজও মুখে মুখে প্রচারিত। নিমাই সন্ন্যাস, রাধা বিরহ, জল সংবাদ, মুজলতা, নিষ্ঠুর পালা, সতীপালা তাঁর বিখ্যাত পালা ঝুমুর।

ঝুমুর

১। মলিন হয়েছি দুখে, হেসে কথা বল মুখে
আমার দুঃখ কর সান্ত্বনা,
তোমারে না দেখি, ঝুরে দুটি আঁখি
আমার হৃদয় করে দাহনা।
রং।। অনেক দিনের পরে দেখা, ভালো আছ কিনা বল না।।

২। আগে তুমি বাসতে ভালো, এখন তোমায় জানা গেল
মনে উঠে কত ভাবনা,

দাগা দিয়ে কুলে, তুমি রইলে ভুলে
কিন্তু আমি তোমায় ভুলি না।। রং

৩। ছিল তোমার কোমল হৃদয়, এখন কেন হলে নিদয়,
তোমার বুঝতে নারি ছলনা
বুঝি এই আপনার, আমি হলাম তোমার
কিন্তু তুমি আমার হলে না।। রং

৪। করি প্রেম, আমায় করিলে উদাস,
আমার মনের আশ মিটিল না
নরোত্তমা ভনে এই দুখী জনে
কেন দেখা দিতে চাও না।। রং

সৃষ্টিধর সিংদেও কাটিয়ার ঃ ঝুমুর সাহিত্য চর্চায় বাংলার সঙ্গে কুড়মালি ভাষাতেও ঝুমুর রচনা সমান্তরাল ভাবে প্রবাহিত। কবি সৃষ্টিধর সিংদেও কাটিয়ার কুড়মালি ভাষার একজন অন্যতম কবি ও গায়ক। সৃষ্টিধরের জন্ম ১৩০৫ বঙ্গাব্দের ৫ই পৌষ রবিবার ঝালদা থানার হেঁটজারগো গ্রামে। তাঁর পিতার নাম নদু কাটিয়ার ও মায়ের নাম রূপনবালা দেবী। পিতা ছিলেন একজন সাধারণ কুড়মি কৃষক। স্কুলের লেখাপড়া তার বেশি ছিল না। কিন্তু তিনি রামায়ণ, মহাভারত, গীতা ও শাস্ত্র গ্রন্থে তিনি ছিলেন পারদর্শী। ছিলেন সুবক্তা, প্রত্যুৎপন্নমতি এবং বুদ্ধিদীপ্ত। কুড়মালি ভাষাতে তিনি শত শত গীত রচনা করে গেছেন। তাঁর কয়েকটি কাব্য গ্রন্থ হলো ক) ঝুমুর সঙ্গীত খ) ভাত ভগবান গ) মানভূমেক ধঁধৌরা ঘ) সাধন সঙ্গীত (দুই খণ্ড) ঙ) অধ্যাত্ম রামায়ণ (অপ্রকাশিত)।

ঝুমুর

১। মানভূম আহেইক বিহারে আর রহতেইক বিহারে হো
জড় সড় রহব কিনা আর হামরা ডরে হো।

২। হামরা আইহ এতে কলক
কাকর আহেইন এসন হক,
হামরাকে লেলে জাতা জোরে হো।।

৩। যখন রহেইন ব্রিটিশ রাইজ,
সেটা ভাভি দেখা আইজ,
নাম রাখলেক ছটনাগপুর হো।।

৪। মানভূমেক মাটিক রঁগে
মেশেইকনি আর দেশেক সঁগে,
তবে হামরা মেসব কিনা করে হো।।

৫। মানভূমেক গাছ গাছড়া,
আর জাতের গাড়হা, টঁড়হা
দেখলেই ত পারবে পরিফ করে হো।।

সলাবত মাহাত : বর্তমান সময়ে ঝুমুর জগতে অন্যতম জনপ্রিয় ও খ্যাতিমান কবি ও শিল্পী সলাবত মাহাত। কবির জন্ম বরাবাজার থানার লটপদা গ্রামে ১৯৪২ সালে। পিতার নাম সুদর্শন মাহাত। লেখাপড়া বরাবাজার উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। খুব কম বয়স থেকেই ঝুমুর

চর্চা শুরু করেন। কবির মুখেই শুনেছি মাত্র আট বৎসর বয়সে বাবার কাঁধে চেপে নাচনীর আসরে গিয়ে ঝুমুর গেয়ে সবাইকে অবাক করে দিয়েছিলেন। সেই শিল্পী দেশের মানুষের মন জয় করবেন এটাই স্বাভাবিক। শিল্পী ১৯৭৮ সালে জেলা ভিত্তিক ঝুমুর প্রতিযোগিতায় প্রথম হন। ১৯৯৭ সালে লাভ করেন রাজ্য স্তরের লালন পুরস্কার। ১৯৯৬ পান আব্বাস উদ্দীন পুরস্কার। পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড ও উড়িষ্যার বহু জায়গায় ঝুমুর পরিবেশন করে সুনাম কুড়িয়েছেন। সেই সঙ্গে রচনা করেছেন বহু জনপ্রিয় ঝুমুর গান।

ঝুমুর

১। যার তরে আমি ঝুরি দিবা যামি
সেতো পর প্রেমে মজিল
সেযে মজাইয়া কুল, ত্যজিল গোকুল
ই কূল উকূল দু-কূল গেল

রং।। বল বল সখি আমায় বল
কেন অবলার প্রাণে দাগা দিল।।

২। আসি বলে গেল, কেন না আইল
আসার আশায় আশা রহিল
কাল কাল বলে কাল গেল চলে
কাল কি গো কালার কাল হল্য।। রং

৩। এভরা যৌবন, পরম রতন
বঁধূয়া বিহনে বিফল হল্য
বায়সে অজাতে ডাকিয়া একত্রে
জ্বালায় জ্বালায় অঙ্গ জ্বলে গেল।। রং

৪। শুন সহচরি, মিলাও শ্রীহরি
নইলে কাঁর তরে প্রাণ রাখি বল
সলাবত ভনে, ঐ রাঙা চরণে
মতি রহে যেন চিরকাল।। রং

কৃত্তিবাস কর্মকার : কবি জানে কবির বেদন, কেন হতে দিব ছেদন
অমৃতা তো অমৃতে না মিশে
অধম কৃত্তিবাসে বলে আমি এলাম সবার শেষে হে।।

কবি কৃত্তিবাস কর্মকারের জন্ম পুরুলিয়ার সন্নিকটে মানাড়া অঞ্চলের গোবিন্দপুর গ্রামে ১৩৪৯ সালে এক দরিদ্র কামার পবিবারে। লেখাপড়া গ্রামের স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত। ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে প্রবল আর্থিক সংকট ও দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করে চললেও ঝুমুরেই তার জীবন, ঝুমুরেই তার দিবারাত্রি। ঝুমুর রচনা, ঝুমুর পরিবেশনেই তার রোজগারের একমাত্র উপায়। জীবিতাবস্থায় বাংলা, ঝাড়খণ্ড ও উড়িষ্যার ঝুমুর ক্ষেত্রে এতখানি প্রবাদতুল্য জনপ্রিয়তা আর কোনো কবির ভাগ্যে জোটেনি। নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ কবিকে একটু দেখার জন্য ছুটে যান ঝুমুরের আসরে। মানুষের মনের কথা, প্রাণের ব্যথাকে এমনভাবে ঝুমুরে বাকরূপ দিতে পারেননি কোনো কবি এইটাই কৃত্তিবাসের জনপ্রিয়তার মূল চাবি কাঠি। রাধাকৃষ্ণ ও শাস্ত্রীয় ঝুমুরের ঐতিহ্যকে অনুসরণ না করে বর্তমান সময় ও জীবনের কথায় তার মূল উপজীব্য। শব্দ ও ছন্দের

ব্যাঞ্জনার পথে না গিয়ে, সহজ কথায় মানুষের আবেগকে রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন তাঁর ঝুমুরে। বর্তমান সময়ে এমন নাচনী নাই যিনি আসরে কৃত্তিবাসের ঝুমুর পরিবেশন করেন না।

কৃত্তিবাসের ভাঙা ঘর, টালি খাপরার বড় দর
গরীবটাকে কর না সহায়হে
ঘরের কুনে দিয়ে মটকা ছাঁহে দিব ওহে ছটকা
যেমন পিঁদাড় দিয়ে থাকে ঘরের চালি হে।।

এছাড়াও পুরুলিয়ার ঝুমুর জগতে যাঁদের খ্যাতি রয়েছে এমন আরও কয়েকজন কবি—

	নাম	গ্রাম	পোঃ	থানা
১।	উদয় কর্মকার	ভাংড়া	ভাংড়া	পুরুলিয়া
২।	পরেশ কর্মকার	হুড়া	হুড়া	হুড়া
৩।	পিতাম্বর দাস	নলকুঁড়ি	নলকুঁড়ি	বরাবাজার
৪।	দ্বীজটিমা	ঘোঁঙ্গা	ঘোঁঙ্গা	পুরুলিয়া
৫।	গৌরাঙ্গিয়া মালহার	যাযাবর		
৬।	ললিত কিশোর মাহাত	সুপুডি	সুপুডি	বান্দোয়ান
৭।	গোষ্ঠ মালহার	যাযাবর		
৮।	মকর কর্মকার	গুঁসাইডি	বরাভূম	বরাবাজার
৯।	মূঢ় রামেশ্বর	সিংবস্তি	সাঁওতালডি	পাড়া
১০।	সুনীল মাহাত	কালুহার	কালুহার	পাড়া
১১।	হাজারীপ্রসাদ রাজোয়াড়	দুমদুমি	দুমদুমি	পুরুলিয়া
১২।	দ্বীজ গদাধর	পলমা	দরডি	কেঁদা
১৩।	সুদন মাহাত	চিটিডি	আড়ষা	আড়ষা
১৪।	ভরত কুমার	মিশিরডি	ঝুঁঝকা	আড়ষা
১৫।	দেবীদাস	ভাঙ্গড়া	ভাঙ্গড়া	পুরুলিয়া
১৬।	মিলন মাহাত	দুমদুমি	দুমদুমি	পুরুলিয়া
১৭।	দুঃশাসন মাহাত	সোনাই জুড়ি	সোনাই জুড়ি	পুরুলিয়া
১৮।	উপেন্দ্রনাথ মাহাত	খৈরিবহাল	খৈরিবহাল	পুরুলিয়া
১৯।	চৈতু মাহাত	গোলকুন্ডা	মামুড়জোড়	পুরুলিয়া
২০।	অনন্ত কেশরিআর	বাংলাটাঁড়	তুলিন	ঝালদা
২১।	হারাধন মাহাত	কুলাবহাল	কুলাবহাল	হুড়া
২২।	চৈতন মাহাত	হেরবনা	গোবিন্দপুর	বরাবাজার
২৩।	সন্তোষ মাহাত	পাথরডি		আড়ষা
২৪।	সুবল রাজোয়াড	বাঘুডি	লাগদা	পুরুলিয়া
২৫।	বিরোচন মাহাত	সোনাইজুড়ি	সোনাইজড়ি	পুরুলিয়া
২৬।	মনোরঞ্জন পান্ডে	ঘাঘরজুড়ি	ঘাঘরজুড়ি	পুরুলিয়া
২৭।	মধুসূদন কুইরি	নোয়াডি	সুইসা	বাঘমুন্ডি
২৮।	কুমুদরঞ্জন মাহাত	কাহান	বনবহাল	জয়পুর
২৯।	কুচিল মুখার্জী	ভাটবাঁধ	পুরুলিয়া	পুরুলিয়া

	নাম	গ্রাম	পোঃ	থানা
৩০।	গুরুচরণ মাহাত	রুচাপ	কুড়ানি	বলরামপুর
৩১।	সৈকত রক্ষিত	পুরুলিয়া	পুরুলিয়া	পুরুলিয়া
৩২।	সূর্যকান্ত মাহাত	বাঁশবেড়া	রোলডি	বরাবাজার
৩৩।	রামচরণ দাস	হেঁসলা	হেঁসলা	আড়ষা
৩৪।	গোবিন্দলাল মাহাত	তহদ্দিরি	রিগিদ	ঝালদা
৩৫।	গোবিন্দ লালসাহেব	চাকলতোড়	চাকলতোড়	পুরুলিয়া
৩৬।	সহদেব মাহাত	মুটরুডি	কেতিকা	পুরুলিয়া
৩৭।	মণীন্দ্র নাথ মাহাত	বালিভাসা		জয়পুর
৩৮।	রামদাস বাবাজী	তুড়রাডি	ভাঁওরিডি	পাড়া
৩৯।	দ্বীজরঙ্গ	ভুরসু	ভুরসু	বাঘমুণ্ডি
৪০।	চন্দনা কুমার	ভুবসু	ভুরসু	বাঘমুণ্ডি
৪১।	তরণী মাহাত	জামবাদ	জামবাদ	পুরুলিয়া
৪২।	নিরঞ্জন মাহাত	রামকৃষ্ণপুর	কালুহার	পাড়া
৪৩।	শ্রীরাম মাহাত	গোবিন্দডি		বাঘমুন্ডি
৪৪।	ক্ষেত্রমোহন দেওঘরিয়া	নড়রা	বাতিকরা	পুরুলিয়া
৪৫।	হরিপদ দেওঘরিয়া	লিপানিয়া	লিপানিয়া	পাড়া
৪৬।	বংশীধর কুমার	ভারডি	জয়পুর	জয়পুর
৪৭।	চন্দ্রকান্ত সহিস	বড়গ্রাম	বড়গ্রাম	হুড়া
৪৮।	রহন বাউরী	ডুমরঘোল		পুরুলিয়া
৪৯।	লালমোহন মাহাত	রঘুনাথ	রঘুনাথপুব	বরাবাজার
৫০।	মুক্তিপদ মাহাত	রাইডি বেড়াদা		বলরামপুর
৫১।	লালজি মাহাত	টিমাংদা	টিমাংদা	ঝালদা
৫২।	অমূল্য কুমার	ভাটডি		জয়পুর

ঝুমুর শিল্পী : ঝুমুর কবিরা প্রায় প্রত্যেকেই শিল্পী। এই তালিকায় তাদের পুনঃ সংযোজন প্রয়োজন নেই। যাঁরা কেবল ঝুমুর গান গেয়ে খ্যাত হয়েছেন তাঁদেরই কিছু নিম্নে দেওয়া হল।

	নাম	গ্রাম	পোঃ	থানা
১।	মিহিবলাল সিংদেও	নোয়াগড়	নোয়াগড়	কেঁদা
২।	সদানন্দ মাহাত	রুদড়া	রুদড়া	জয়পুর
৩।	নগেন পুনুরিয়ার	টিমাংদা	টিমাংদা	ঝালদা
৪।	কর্মবীর মাহাত	জামবাদ	জামবাদ	পুঞ্চা
৫।	হংসেশ্বর মাহাত	মলিয়ান	বারি	মানবাজার
৬।	বিপদতারণ কর্মকার	ভান্ডারপুয়াড়া	ভান্ডারপুয়াড়া	কেঁদা
৭।	আনন্দ কুইরী	পুইড়ারা	পুইড়ারা	বরাবাজার
৮।	সুধীর চন্দ্র মাহাত	বেলগাড়া	বেলগাড়া	পুরুলিয়া
৯।	বিহারী লাল মাহাত	বেলগাড়া	বেলগাড়া	পুরুলিয়া
১০।	দিগাম্বর মাহাত	চাকদা	চাকদা	পুরুলিয়া

	নাম	গ্রাম	পোঃ	থানা
১১।	ভোলানাথ মাহাত	হেঁটজাড়ি	উপরজাড়ি	আড়ষা
১২।	অজমত মাহাত	বামু	রাউতোড়া	বরাবাজার
১৩।	জগদীশ মাহাত	কড়াডি	শুকলাড়া	পুরুলিয়া
১৪।	গান্ধীরাম মাহাত	বলরামপুর মিশন	রাঙাডি	বলরামপুর
১৫।	কিরীটি মাহাত	রামকৃষ্ণপুর	কালুহার	পাড়া
১৬।	আকুল মাছোয়ার	বাঘমুণ্ডি	বাঘমুণ্ডি	বাঘমুণ্ডি

সহায়ক গ্রন্থ ঃ

১। লোকায়ত মানভূম—সম্পাদনা—শক্তি সেনগুপ্ত, শ্রমিক সেন
২। ঝুমুর—নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
৩। ঝুমুরঃ সঙ্গীত ও সাহিত্য—কিরীটি মাহাত
৪। সিন্ধুবালা, ঝুমুব ও নাচনী—তৃপ্তি বিশ্বাস
৫। পুরুলিয়া লোক সংস্কৃতিব গুণীজন গ্রন্থমালা—কৃত্তিবাস কর্মকার
৬। প্রসঙ্গঃ লোক মাধ্যম—সঞ্জীব সরকার
৭। ঝাড়খণ্ডের লোক সাহিত্য—ডঃ বঙ্কিম মাহাত
৮। লোকায়ত ঝাড়খণ্ড—ডঃ বিনয় মাহাত
৯। পত্র-পত্রিকা—ছত্রাক, শিলালিপি, অড়, জাহলি, সারহুল, অনৃজু
১০। লোকায়ত সংস্কৃতি—সম্পাদনা—সঞ্জীব সরকার, অরুণ রায়
১১। Performing Arts of Jharkhend—Dr. Pasupati Prasad Mahato
১২। ভাবতের নৃত্যকলা—গায়িত্রী চট্টোপাধ্যায়
১৩। ঝুমুর ও তার নানা দিক—সম্পাদনা সুভাষ রায়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ রজনী মাহাত (ভুরসু), কিরীটিভূষণ মাহাত (হুচুকপাড়া) বীরবল মাহাত (বাঁশবেড়া) শ্রমিক সেন, বদন কালিন্দী (চাঁদড়া) বিজয় পাণ্ডা, অনন্ত কেশারিয়াব, ডঃ বীণাপাণি মাহাত।

মানভূমের ভাদুগান

স্বপন দাস

মানভূম লোকসংস্কৃতির পীঠস্থান। এই পীঠস্থানের প্রতিটি ধূলিকণায় জড়িয়ে আছে লোকউৎসবের মাদকতা। আর গান ছাড়া উৎসবের আনন্দটাই যেন মাটি হয়ে যায়। তাই ঝুমুর থেকে শুরু করে বাউলগান, গাজনগান, জাঁতগান, জাওয়াগান, টুসুগান, ভাদুগান, অহিরাগান, সহরায়গান, বাহাগান গাইতে গাইতে, শুনতে শুনতে মানভূমের আপামর জনসাধারণ গানের ভেলায় চড়ে ভাসতে থাকেন সুরের বিভিন্ন স্রোতধারায়। মানভূম হয়ে উঠেছে গানভূম।

মানভূমের লোকউৎসবগুলির অনেকাংশই পালিত হয় স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের দ্বারা। আবার, অনেক উৎসব আছে পুরুষরাই তার অংশীদার, মেয়েদের কোনো স্থান নেই। তেমনি কিছু উৎসব শুধুমাত্র মেয়েদেরই নিজস্ব হয়ে গড়ে উঠেছে। টুসু, করম-জাওয়া প্রভৃতিতে নারীদের প্রাধান্য বেশি। ভাদু উৎসবে পুরুষদের অংশগ্রহণ সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ। তাই এইসব গানগুলিতে সামাজিক, রাজনৈতিক, পৌরাণিক বা সাময়িক ঘটনার যেমন স্ফুরণ ঘটেছে। তার চেয়ে অনেকাংশে নারীজীবনের আশা-আনন্দ, হাতশা-বেদনা, প্রেম-বিরহ, মিলন-বিচ্ছেদ...এর অনুরণন ঘটেছে।

রাঢ় বাংলার লোকসাহিত্য তথা লোকসমাজে ভাদুকে ঘিরে অনেক কাহিনি ও কিংবদন্তি গড়ে উঠেছে। সে সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা না করলে এ প্রসঙ্গ অনেকখানি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর 'বাংলাব লোকসাহিত্য' গ্রন্থে বলেছেন, "পশ্চিমে ছোটনাগপুরের অরণ্যভূমি যখন আদিবাসীর বর্ষা উৎসবের 'করম' সঙ্গীতে মুখরিত হইয়া উঠে, তখন পশ্চিমবাংলার সীমান্তবর্তী অঞ্চলের অধিবাসিনী কুমারীদিগের কণ্ঠনিঃসৃত ভাদু গানের ভিতর দিয়া তাহারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। পূর্ব-দক্ষিণ মানভূম, পশ্চিম বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান ও দক্ষিণ বীরভূম এই অঞ্চল ব্যাপিয়া কুমারীদিগের মধ্যে ভাদ্রমাসে যে গীতোৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হিন্দু প্রভাব বশত বর্তমানে একটি পূজার আকার ধারণ কবিয়াছে—তাহা 'ভাদু' পূজা নামে পরিচিত।.....বর্ষা বা ভরা ভাদ্রে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া ইহার নাম ভাদু উৎসব; ইহার গান ভাদু গান।"

প্রকৃতপক্ষে 'করম' উৎসব ও 'ভাদু' উৎসবের প্রকৃতি এক নয়। দুটি উৎসবের রীতির মধ্যে কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। 'করম' উৎসব মূলত 'কৃষি উৎসব' বা 'শস্য-উৎসব'। এই উৎসবের আচারগত পদ্ধতি এবং তার গানের মধ্যেই সে প্রমাণ পাওয়া যায়; কিন্তু ভাদু উৎসবে শষ্য বা কৃষি উৎসবের কোনো আচার আচরণ পালিত হয় না-এই উৎসবের গানের প্রকৃতিও সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের।

বলা হয়, শেরগড় পরগনাতে (বর্তমান রানিগঞ্জ এলাকা) উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে প্রচুর কয়লা খনি খোলা হয়েছিল। সেই সময় এই অঞ্চলের প্রধান অধিবাসী বাউরি ও বাগ্‌দি সম্প্রদায়ের মানুষেরা রাণিগঞ্জ এলাকা ছেড়ে দামোদরের দক্ষিণাঞ্চলে এসে বসবাস শুরু করতে থাকেন। সেই সময় এইসব অঞ্চল পঞ্চকোট রাজার অধীনস্থ ছিল। এইসব অঞ্চল অরণ্য অঞ্চল ছিল বলে সেই সব অধিবাসীরা উপযুক্ত আবাদি জমির অভাবে টাঁড় ও বাঈদ জমিতে আউশ ধানের চাষ শুরু করেন। এই ধান ভাদ্র মাসে পাকে। তাই একে ভাদোই ধানও বলা হয়। এই ভাদোই ধানের নবান্ন উৎসবই নাকি ভাদু, এবং এই উৎসবের গানগুলি ভাদু গান নামে পরিচিত। ভাদোই ধান থেকে ভাদু এসেছে এযুক্তি সম্পূর্ণ অবাস্তব বলেই মনে হয়। ভাদু উৎসবকে কোনো ভাবেই কৃষি উৎসব বা বর্ষা উৎসবের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। ভাদু গানের মধ্যে কৃষি কিংবা শস্যভিত্তিক কোনো গানের প্রচলন নেই। তাছাড়া মানভূমে ভাদোই ধানের নবান্ন উৎসব করার মতো পর্যাপ্ত পরিমাণে ধান উৎপন্ন হয় না। নবান্ন উৎসব অঘ্রাণ মাসেই পালিত হয়।

আগে ভাদ্র মাসের শেষ শুক্লা সপ্তমীতে ললিতা সপ্তমীর ব্রত পালন করার প্রচলন ছিল মেয়েদের মধ্যে। ললিতা সপ্তমীর ব্রত কথাই ভাদু গানের উৎস বলে অনেকে অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁদের মতে, বিভিন্ন পরিবর্তন ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ললিতা দেবী বর্তমানের ভাদুতে রূপান্তরিত হয়েছেন।

এই অভিমত সঠিক বলে মনে হয় না। কারণ, বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পূজা বা উৎসব প্রচলন হয় এমন দৃষ্টান্ত খুব একটা চোখে পড়ে না। এই নিয়ম কার্যকরী হলে সুপ্রাচীন কাল থেকে দেবদেবীরা একই ভাবে আমাদের কাছে চিহ্নিত হয়ে থাকতেন না। এই সুদীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে ঘটে যেত অনেক পরিবর্তন। হয়তো অনেক দেব দেবীই আজকে বিলুপ্তও হতেন। অবশ্য, এককালের জৈন দেব দেবীরা বর্তমানে হিন্দুদের দেব দেবীতে রূপান্তরিত হয়েছেন, কিন্তু তার পিছনে আছে অন্য এক ইতিহাস। সেটাকে বিবর্তনবাদের আওতায় আনা ঠিক হবে না।

অরণ্য অঞ্চলে সারা ভাদ্র মাস জুড়েই করম জাওয়া, ঈদ, ছাতা, সাঁওতালদের হাড়িয়ার সিম, বিশ্বকর্মা জিতাষ্টমী ও মাথান ষষ্ঠীর ব্রত ইত্যাদি নানা উৎসবের প্রচলন ছিল। এই সব উৎসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল নবান্ন উৎসব ভাদু। পরবর্তীকালে ভাদু উৎসবকে কেন্দ্র করে কয়েকটি কাহিনি ও কিংবদন্তি গড়ে উঠে।

প্রথম কিংবদন্তি অনুসারে কাশীপুর রাজ নীলমণি সিংহের কন্যার নাম ছিল ভদ্রেশ্বরী বা ভদ্রাবতী। এই কন্যার দেহে নাকি দেবীসুলভ লক্ষণ ছিল। এই দেবী লক্ষণ আর অসাধারণ রূপসম্ভারই তার জীবনে নিয়ে আসে চরম বিপর্যয়। এমন মেয়েকে উপযুক্ত পাত্রের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব হয় নি। এই কুমারী কন্যার জীবনবৃত্তান্ত শেষ হয় অকাল মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। তার স্মৃতি রক্ষার জন্য রাজ্যের প্রজারা একমাস ধরে শোক উৎসব পালন করার জন্য ভাদু পূজার প্রচলন করেন।

প্রকৃতপক্ষে নীলমণি সিংহের কোনো কন্যা সন্তান ছিল-এ রকম কোন প্রমাণ মেলে নি। আর কন্যা থাকলেও ভদ্রাবতী বা ভদ্রেশ্বরী বলে কেউ ছিল কি না জানা যায় নি। শুধু তাঁর তেরোটি পুত্রের কথায় জানা যায়।

দ্বিতীয় কাহিনি হ'ল বিজয় উৎসবের কিংবদন্তি। পঞ্চকোট রাজার সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছিল ছাতনার রাজার। যুদ্ধের সময়টা ছিল ভাদ্র মাস। এই যুদ্ধে পঞ্চকোট রাজ জয়লাভ করেছিলেন। এই

জয়ের আনন্দে যে বিজয় উৎসব তাকে চিরস্মরণীয় করে রাখবার জন্যই প্রতিবৎসর ভাদ্রমাসের সংক্রান্তিতে উৎসবের প্রচলন শুরু হয় বলে অনেকে মনে করেন।

কাহিনিটি বিতর্কিত। কারণ পঞ্চকোটে রাজার সংখ্যা অনেক। তাঁদের মধ্যে কোন রাজার সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছিল তার হদিশ নেই। সাল তারিখের উল্লেখও পাওয়া যায় না। তাছাড়া ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে ভাদুর উৎসব বলতে যা বোঝায় সেটা হয় না ; ভাদুর বিসর্জন হয়। বিজয় উৎসবের সঙ্গে ভাদু উৎসবের প্রকৃত যোগসূত্র থাকলে আনন্দের দিনে বিসর্জনের বিষণ্নতা কেন?

তৃতীয় কিংবদন্তি অনুসারে ; ভাদু পূজা রাজকুমারী ভদ্রাবতীর শোক উৎসব নয় ; এই উৎসব তাঁর সতীত্বের অমর স্মৃতিকে স্মরণ করার প্রচেষ্টা। বলা হয়, রাজকুমারী ভদ্রাবতীকে বিয়ে করতে আসার সময় রাস্তার মাঝে ডাকাতদের অতর্কিত আক্রমণে তার ভাবী স্বামী মারা যান। ভদ্রাবতী নির্বাচিত স্বামীর পরিবর্তে অন্য কারোও গলায় বরমাল্য দিতে অস্বীকার করে সহমরণে গমন করে।

এই কাহিনিও জনমানসে কোন রকম প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। কারণ, রাজবাড়ির বুকে এতবড় একটা ঘটনা ঘটে গেল অথচ তার কোনো প্রমাণ থাকল না-এটা মেনে নেওয়া যায় না। তাছাড়া সেই মৃত ব্যক্তির কী নাম, কী তার পরিচয়- এ সবেরও কোন হদিশ নেই।

চতুর্থ কিংবদন্তিতে কাহিনির মোড় একটু ঘুরে গেল। সেখানে বলা হল, ভাদুরানী বা ভদ্রাবতী হল পঞ্চকোট রাজ গরুড় নারায়ণের ভগিনী। এই ভদ্রাবতী ছিল কৃষ্ণ-অনুরাগিনী। পঞ্চ কোট পাহাড়ের উপরে শ্যাম-রঘুবরের মন্দিরে সে 'বাল গোপাল' মূর্তি কোলে নিয়ে সদা সর্বদা সাধন ভজনে রত থাকত। রাজ কর্মচারীরা তার এই নিঃসঙ্গ বসবাস ভালো চোখে দেখলেন না। তাঁরা ভদ্রাবতীর চরিত্র নিয়ে সন্দেহ করতে শুরু করেন এবং একদিন তাঁদেরই চক্রান্তে নিহত হয় সাধিকা ভদ্রাবতী। অনেকের অনুমান এই ভদ্রাবতী নাকি আত্মহত্যা করেছিল। এই কাহিনি অনুসারে কৃষ্ণ কোলে ভাদুর উৎপত্তি হয়েছে।

ভাদুকে এই কিংবদন্তিতে শত্রুঘ্ন শেখর গরুড়নারায়ণের ভগিনী বলে মনে করা হয়েছে। এই কাহিনি নিয়ে যথেষ্ট মত পার্থক্য বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। কারণ, কাহিনির প্রভাব জনমানসে পড়লের সেটা তেমন ভাবে বিস্তারিত নয়। 'কৃষ্ণ কোলে' ভাদু মূর্তি পূজার প্রচলন যদি এই কিংবদন্তি অনুসারে হয়েই থাকে. তাহলে অনেক স্থানে দেখা যায় ভাদু'র বদলে রাধা-কৃষ্ণের মূর্তি পূজা হয় এবং সেখানে প্রচলিত ভাদু গানগুলিই গাওয়া হয়। কিন্তু বাস্তবে রাধা বা কৃষ্ণের সঙ্গে ভাদুর কোনো সম্পর্ক নেই।

পঞ্চম কিংবদন্তি অনুসারে গড়ে উঠেছে রাজবাড়ির পুরোহিতকে কেন্দ্র করে একটি কাহিনি। কাহিনিটি হল—পঞ্চকোটের কোন এক রাজা একদিন জঙ্গলে শিকার করতে গিয়ে সারাদিন শিকারের সন্ধান পাননি। অবশেষে অপরাহ্ণ বেলায় বিষণ্ন মনে রাজবাড়িতে ফিরে আসতে গিয়ে হঠাৎ একটি মেয়ের কান্না শুনে থমকে গেলেন। খুঁজতে খুঁজতে সেই ক্রন্দনরতা মেয়েটিকে দেখতে পেলেন। রাজা তার কাছে জানতে চাইলেন সমস্ত পরিচয়। মেয়েটি নিজেকে সহায় সম্বলহীনা অনাথা বলে পরিচয় দিলে রাজার তার প্রতি করুণা জন্মে। তিনি মেয়েটিকে সঙ্গে করেই রাজবাড়িতে ফিরলেন। সেখানেই আশ্রয় দিলেন মেয়েটিকে। .....ঠিক সেই সময় নাকি দেবী দুর্গা মর্ত্যধামে পরিভ্রমণ করতে এসে দীর্ঘদিন কৈলাশে ফেরেন নি। স্বভাবতই খোঁজ খোঁজ রব। মহর্ষি নারদ এলেন দেবীর খোঁজে মর্ত্য ধামে। খুঁজতে খুঁজতে এসে পড়লেন পঞ্চকোট

রাজবাড়িতে। সেই কুড়িয়ে পাওয়া মেয়েটিকে দেখেই চিনতে পারলেন—ইনিই দেবী দুর্গা। নারদ দেবীকে স্মরণ করিয়ে দিলেন তাঁর আসল পরিচয়। দেবীর সম্বিৎ ফিরল। তিনি রাজার কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে নারদের সঙ্গে বিদায় নিলেন। বলে গেলেন, "ভাদ্রমাসে আমার মূর্তি গড়ে পূজা করবে; আবার আমি ভাদ্র মাসে ফিরে আসব।" .... সেই থেকেই নাকি একমাস ধরে ভাদু পূজার প্রচলন হয়েছে। রাজা যেদিন দেবীকে রাজবাড়িতে নিয়ে আসেন সেদিন ছিল ভাদ্র মাসের প্রথম দিন। যেদিন দেবী বিদায় নিলেন সেদিন ছিল ভাদ্র মাসের শেষ দিন। ভাদ্র মাসে তাঁকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন বলে রাজা মেয়েটির নাম রেখেছিলেন ভাদুমণি।

এই কাহিনি রাজপুরোহিতের নিছক কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। বাস্তবে এই কাহিনি যেমন ভিত্তিহীন, তেমনি যুক্তিহীনও বলা চলে। যদিও কাহিনির সঙ্গে জড়িত রাজার নাম পাওয়া যায় না, তবুও একথা স্পষ্ট ভাবেই প্রমাণিত হয় যে, এই কল্পিত কাহিনির মধ্যে আছে গালভরা রাজস্তুতি বা রাজ মহিমা প্রচারের সুক্ষ্ম কৌশল, রাজার প্রতি পুরোহিত সম্প্রদায়ের তোষামোদ। দেব দেবীরা স্বর্গের অধিবাসী হলেও মর্ত্য ধামে তাঁদের আগমন ও ক্রিয়াকলাপের বহু বিবরণ জানতে পারা যায়। কিন্তু পঞ্চকোটে নারদের আগমন হয়েছিল-এরকম কোনো প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায় না। এই ঘটনার পিছনে সত্যতা থাকলে আমরা হয়তো নতুন আরেকটা ধর্মগ্রন্থের সন্ধান পেতাম। যাইহোক রাজ পুরোহিতেরা শুধু এই কাহিনি প্রচার করেই ক্ষান্ত হলেন না। তাঁরা কাহিনিকে সর্বসমক্ষে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ভাদু পূজাতেও আগমনী ও বিজয়া নিয়ে গান রচনা করলেন—

"এলে গো এলে গো আমার ভাদু জননী,
আমি সন্ধ্যার পর দেখলাম রাতুল চরণ দুখানি।
বল বল কেমন আছে কার্তিক গণেশ বল,
কেমন আছে বল আমার সুরধনী জননী॥"

এতসব করার পরেও পুরোহিত সম্প্রদায় নিজেদের অভিমত প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হননি। জনমানসে কোনো প্রভাবও প্রতিফলিত হয় নি।

ষষ্ঠ কিংবদন্তি হিসেবে আরোও একটি কিংবদন্তির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সেখানে বলা হয়েছে, ভাদু বা ভদ্রাবতী হল রাজা বিশ্বম্ভর শেখরের কন্যা। ইনি সম্ভবত ১২২২ থেকে ১২৫৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। পিতা হরিশচন্দ্র শেখর। অনুমান করা হয়, এই হরিশচন্দ্র শেখরই বরাকর মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি ১১৮০ থেকে ১২২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পঞ্চকোট রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। কথিত আছে, রাজা বিশ্বম্ভর শেখর যুদ্ধে গিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের দীর্ঘ ব্যবধানে রাজধানীতে ফিরে আসেন নি। এই দীর্ঘ অনুপস্থিতির কারণে রাজকর্মচারীর কিছু অংশ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে থাকে এবং এই ষড়যন্ত্রকারী রাজকর্মচারীগণ প্রচার করতে থাকে যে, রাজা যুদ্ধে নিহত হয়েছেন। আকস্মিক এই দুর্ঘটনার কথা শুনে বাবার শোকে রাজকুমারী ভদ্রাবতী আত্মহত্যা করে। রাজকুমারীর সঙ্গে সাধারণ প্রজাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। উচ্চনীচ ভেদাভেদ না করে সকলের সঙ্গে প্রাণ খুলে মেলামেশা করত বলে, সাধারণ মানুষ তাকে অতি আপনজন বলে ভাবতে পারত। স্বভাবতই এই অকাল মৃত্যুতে সাধারণ মানুষের মনে শোকের ছায়া নেমে আসে। রাজার আদেশে একমাস ধরে শোক উৎসব পালন করে তারা ভদ্রাবতীর স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ভাদু পূজার প্রচলন করে।

ভাদুকে কেন্দ্র করে এমনি অনেক কাহিনি ও কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। অহেতুক যুক্তি তর্কের বোঝা না বাড়িয়ে স্পষ্ট ভাবে বলা যায় ভাদু কোনো দেবকন্যা নয়; ভাদু রাজকন্যা। এ সম্পর্কে যে সব গান প্রচলিত আছে সেখানেই তার উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন-

"ভাদু ভদ্রেশ্বরী,
লোকে বলে ভাদ্র মাসে জন্ম গো
শিখর রাজার কুমারী।
যৌবনে অনুরাগ কেন গো
বুঝতে না পারি—
রাস দোল দুর্গাপূজা গো
তা সকলি পরিহরি
ভাদু তোমার গানে মত্ত হয়ে
নাচে গো পুরুষ নারী।"

অন্য একটি গানে পাই—

কাশী পুরের রাজার বিটি বাগ্‌দী ঘরে কি কর।
হাতের জালি লয়ে কাঁখে সুখ সায়রে মাছ ধর॥
মাছ ধরনে গেলে ভাদু ধানের গুছি ভেঙো না,
একটি গুছি ভাঙলে পরে পাঁচ সিকা জরিমানা॥

রিজ্‌লে সাহেব তাঁর The Tribes and castes of Bengal, (Vol-1, P.41) গ্রন্থে অভিমত প্রকাশ করেছেন-"ভাদ্র মাসের শেষ দিনে মানভূম ও বাঁকড়া জেলা বাগ্‌দি ও বাউরিরা ভাদু নামে এক দেবীর মূর্তি নিয়ে নাচ গান সহ শোভাযাত্রা করেন। মূর্তিটি প্রাক্তন পঞ্চকোট রাজের প্রিয় কন্যা বলে কথিত। কুমারী অবস্থায় তিনি নাকি মারা গিয়েছিলেন।"

আবার 'বাঁকুড়ার মন্দির' প্রণেতা অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, "পুরাকালে পাঁচেত রাজ্যে এক রাজা ছিলেন। তাঁর মেয়ে ভাদু। কন্যার বিবাহের ঘর বর পেতে পাঁচেত রাজারা নাকি বরাবরই ঘোর অসুবিধা ভোগ করতেন। বহুকাল অবিবাহিত থেকে ভাদু আত্মহত্যা করে।" —এই মন্তব্য দুটির মধ্যেই রয়েছে ভাদু পঞ্চকোট রাজার কন্যা এবং এই কন্যার কুমারী অবস্থায় অকাল মৃত্যুর কথা। রাজার নাম বা সঠিক সময়কাল থেকে গেছে তমসাচ্ছন্ন। তবে ইতিহাস যাইহোক, কিংবদন্তি যাই থাকুক, পুরুলিয়া গেজেটিয়ার মানভূম গেজেটিয়ার ইত্যাদিতে ভাদুকে রাজা নীলমণি সিংহের কন্যা বলেই বর্ণনা করা হয়েছে। তাছাড়া পুরুলিয়া তথা মানভূমের আপামর জনসাধারণও ভাদুকে নীলমণি সিংহের কন্যা বলেই সাদরে বরণ করে নিয়েছেন-সেখানে কোনো যুক্তি-তর্কের অবকাশ নেই। সেই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই অতীতের মতো বর্তমানেও ভাদু উৎসব পালিত হয়ে আসছে।

প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন, ভাদ উৎসব সম্পূর্ণ রূপে মেয়েদের উৎসব। এই উৎসবে পুরুষদের অংশগ্রহণ সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ। সম্ভবত সেই কারণে মেয়েদের উপর ঈর্ষান্বিত হয়েই পুরুষরা মেয়েদের ভাদুর অনুকরণে 'ভাদা' পূজার প্রচলন করেছিলেন। এখনও পুরুলিয়া জেলার কিছু কিছু জায়গাতে এই ভাদা পূজার প্রচলন রয়েছে। মেয়েদের গাওয়া গানগুলিকে বিকৃত ও অপভ্রংশ করে পুরুষরা গেয়ে থাকেন। এই পূজা সঠিক কোন সংস্কৃতির পর্যায়ে পড়ে না, বরং

অপসংস্কৃতিরই নামান্তর বলা যেতে পারে। তবে বর্তমানে এই পূজার প্রচলন অনেক কমে এসেছে। হয়তো অচিরেই লুপ্তও হয়ে যাবে। যাওয়াটাই বাঞ্ছনীয়।

ভাদু পূজা পুরুলিয়া বা মানভূমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। পশ্চিম বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, দক্ষিণ বীরভূম ও মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। মানভূমের বাউরি ও বাগ্‌দি সমাজের মধ্যে ভাদু পূজার রেওয়াজ চালু আছে বলে কেউ কেউ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এই অভিমত সঠিক নয়। বাউরি বাগ্‌দি ছাড়াও ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহাত, সরাক প্রভৃতি সব সম্প্রদায়ের মধ্যেই মানভূমে ভাদু উৎসব পালিত হয়ে আসছে। বাঁকুড়া জেলার সীমলাপাল অঞ্চলে উৎকল ব্রাহ্মণ সমাজে এখনও ভাদু পূজার ব্যাপক প্রচলন আছে। বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলার অনেক পরগণা পঞ্চকোট রাজার অধীনস্থ ছিল সেই কারণে এই জেলার উৎসবের প্রচলন শুরু হয় ওই সব পরগনা জুড়ে। যার প্রভাব এখনও বিদ্যমান। বীরভূম জেলাতেও বাউরি সম্প্রদায়ের অনেক মানুষ বাস করেন। তাঁদের মতো সেখানকার নিম্ন সম্প্রদায়েবাও ভাদু পূজা করে থাকেন। কিন্তু পুরুলিয়া বা মানভূমে ভাদু পূজার মধ্যে কোনো সম্প্রদায়গত সীমারেখা নেই, উল্লেখ করা যেতে পারে, পঞ্চকোট রাজের লেঠেল বাহিনী গড়ে উঠেছিল বাউরি সম্প্রদায়ের লোক নিয়ে। তাদের পারিবারিক ও সামাজিকতার সূত্র ধরেই বীরভূম পর্যন্ত ভাদু পূজাব বিস্তৃতি।

আমাদের আলোচনার বিষয় মানভূমের ভাদু উৎসব ও তার গান নিয়ে। তাই সেই প্রসঙ্গেই আলোচনা সীমাবদ্ধ থাক। ভাদু উৎসব ভাদ্র মাসের প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত দীর্ঘ একমাস ধরে পালন করা হয়। এই পূজার বিশেষ কোনো পদ্ধতি নেই ; নেই কোনো বিধি নিয়ম। এতে কোনো মন্ত্রতন্ত্রেরও বালাই নেই। গানই হল এই পূজার মন্ত্র ; উপাচার ও আরাধনার একমাত্র উপকরণ। ভাদ্র মাসের প্রথম রাত্রে নির্বাচিত একটি ঘরে কুমারী ও সধবা মেয়েরা মিলিত হয়ে ভাদুর আবাহন করে থাকে।

প্রথমে সন্ধ্যারতি ও বন্দনাগীত গাওয়া হয়। প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রথমেই গাওয়া হয়-

"সাম দিলাম সলিতা দিলাম স্বর্গে দিলাম বাতি গো,
সব ঠাকুররা সন্ধ্যা লাও মা লক্ষ্মী সরস্বতী গো।
সব সঙ্গতি পরামন গতি সন্ধ্যা দাও ভাদুর কাছে,
শঙ্খ বাজাও ঘণ্টা বাজাও ঘরে ভাদু ধন আছে॥"

এরপর বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে গান গাওয়া হয়। এই একই পদ্ধতি চলতে থাকে সংক্রান্তির আগের রাত্রি পর্যন্ত। ভাদ্র সংক্রান্তির দু-তিন দিন আগেই ভাদুর মূর্তি ঘরে আনা হয়। মেয়েরা মূর্তি মাথায় নিয়ে গান গাইতে গাইতে তাদের প্রাণের ভাদুধনকে ঘরে নিয়ে আসে। ভাদু ঘরে আসার পর মেয়েদের তৎপরতা বেড়ে যায়। সংক্রান্তির আগের রাত্রে সারারাত ধরে গান চলে। মিঠাই, জিলিপি, খাজা, বাতাসা প্রভৃতি ভাদুকে নিবেদন করা হয়। সেদিন দেখা যায় মিষ্টির দোকানদারেরও ফুরসৎ নেই। জিলিপি, মিঠাই, খাজাগুলি সেদিন তৈরি হয় অনেক বড় আকারের। সুতো বেঁধে দোকানে ঝুলিয়ে রাখা হয় ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। জিলিপি খাজার উপর বোধ হয়, ভাদুমণির আকর্ষণ বেশি। একটি গানেও পাওয়া যায়—

"কাশীপুরের মহারাজ
সে করে ভাদুর পূজা
হাতেতে মা জিলিপি খাজা
পায়েতে ফুল বাতাসা।"

সেরাত্রে মেয়েদের চোখে ঘুম থাকে না। এই রাতকে বলা হয় ভাদু জাগরণের রাত। সারারাত গান গেয়েই তারা কাটিয়ে দেয়। সকাল হতেই বিসর্জনের ধূম। বেজে ওঠে বিদায়ের বাঁশী কোন্ অলক্ষ থেকে। কিছুতেই যেতে দিতে মন চায় না ; তবুও উপায় নেই। প্রাণের ভাদুধনকে জানাতে হয় শেষ বিদায়। চোখের কোণের অশ্রুবিন্দু মনের গহ্বনে আগামী বছরে ভাদুর আগমনের প্রত্যাশা নিয়ে ঝরে পড়ে নিজেরই অজান্তে। কুমারী মন গেয়ে ওঠে—

"প্রাণে হায় কি হল ?
হলের ভাদু জলে যাতে সাজিল।
প্রাণে হায় কি হল ?
সারা মাস রাখলাম মাকে
কুচি কপাট মারে গো
আর রাখতে লা পারলাম মাকে
ছাতা হ'ল বাদি গে।
প্রাণে হায় কি হ'ল?.....
যা'ছ যা'ছ যা'ছ ভাদু দাঁড়াও একবার কুলিতে
সম্বচ্ছরের ক'থা আছে ব'লব তোমার সাক্ষাতে।
প্রাণে হায় কি হ'ল ?......

কাশীপুর রাজঘরাণার নিজস্ব একটি গান তুলে ধরা যাক। বাইরে এর প্রচলন নেই। গানটি ভৈরবী রাগে দাদরা তালে নিবদ্ধ। কথা ও সুরকার ঁপ্রকৃতিশ্বর সিংদেও। ইনি বহু গানের রচয়িতা ও সুরস্রষ্টা।

গানটি হল—

"অঝোরে ঝরে সখি নয়নের লোর গো
ভাদু চলে যেতে চায় গো।
এত ভালবাসা এত মেলামেশা
সকলই বিফলে যায় গো॥

যাহার হাসিতে কেটেছে ভাদর
করিনি যাহারে কোন অনাদর,
ভাবিনি তাহারে এত নিঠুর গো,
ভাদু চলে যেতে চায় গো॥

কাশীপুর রাজমহলে ভাদু গানের এক নিজস্ব ঘরাণায় সৃষ্টি হয়। সম্পূর্ণ এক নতুন রীতি ও অভিনব গায়ন শৈলী নিয়ে সৃষ্ট এই ঘরাণা কাশীপুর রাজঘরাণা নামে পরিচিত। এখনও পর্যন্ত সাধারণ স্তরে এই গায়ন শৈলী প্রায় অজ্ঞাতই থেকে গেছে। এই ঘরাণার সঙ্গে প্রচলিত ভাদুগানের আকাশ-পাতাল প্রভেদ। এর পিছনে যথেষ্ট কারণ আছে।

রাজা ও জমিদারেরা মার্গ সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। কাশীপুর রাজ নীলমণি সিংহও ছিলেন ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক। তিনি সঙ্গীত চর্চায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। বিষ্ণুপুর ঘরাণার প্রসিদ্ধ সেতার বাদক মধুসূদন ভট্টাচার্যের কাছে তিনি তালিম নিয়েছিলেন।

এছাড়া প্রসিদ্ধ পাখোয়াজ বাদক জগৎচন্দ্র গোস্বামীর কাছেও সঙ্গীত শিক্ষা গ্রহণ করেন। সে সময় বেশ কয়েকজন উচ্চমানের সঙ্গীত শিল্পী কাশীপুর রাজদরবার অলঙ্কৃত করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে মৃদঙ্গবাদক হারাধন গোস্বামী, বংশীবাদক পূরণ সিংহ্ চৌতাল, ফরিদ বক্স ও কালিকানন্দ ব্রহ্মচারীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও বেনারস, পাটনা, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থান থেকে বাঈজি এনে রাজবাড়িতে মহফিল বসত। ঠুংরী-গজলের ললিত সুর ঝংকার আর ছন্দময় পদসঞ্চারে নূপুরের রুনুঝুনু সুরেলা আওয়াজে মুখরিত হয়ে উঠত মহফিল। রাজবাড়ির এই সঙ্গীত ধারায় যে জোয়ার তখন বয়েছিল সেই জোয়ারের ধাক্কা এসে লেগেছিল ভাদু গানের উপরে। শুরু হয় নতুন আঙ্গিকে উচ্চাঙ্গ রীতিতে ভাদু গানের চর্চা। রাজবাড়িতে কয়েকজন গীতিকারও ছিলেন। রাজা নীলমণি সিং নিজেও ভাদু গান গাইতেন বলে জানা যায়। নতুন করে ভাদু গানের উপরে ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী ও রাগপ্রধান গানের প্রচলন শুরু হল। একটি খেয়াল গানের অংশ তুলে ধরা যাক। গীতিকার অজ্ঞাত। গানটি বৃন্দাবনী সারং রাগে ত্রিতালে নিবদ্ধ।

"দেখ ভাদুকি সুরত ক্যায়সে ভঙ্গ।....রে....।
অঙ্গে অঙ্গে উঠে ছয় কি তরঙ্গ
দেখ মোহে কোটি অনঙ্গ,
ক্যায়সে মুখর সে ক্যায়সে বেণী বাঁধে,
পিঠে ঝুলে বেণী ভূজঙ্গ।.....রে.....।"

রাগপ্রধান একটি গান। গানটি দেশ রাগে সুরারোপিত ত্রিতালে গাওয়া হয়। ৺প্রকৃতিশ্বর সিংদেও-এর কথা ও সুরে।

(স্থায়ী)

আমার আয়রে ময়ূর নেচে নেচে
তালে তালে বাদলি হাওয়ায়'
ভাদুর কাছে নাচবি যদি
সোনার নুপূর দিব পায়।। তালে তালে......

(অন্তরা)

হাওয়ার সুরে বাঁশী বাজে
লোকের কত ভুল
সুর সোহাগের ঢেউ খেলেছে
ভাদুর কানের দুল
মনের মাদোল আপনি বাজে
খুশির সীমানায়।। তালে তালে......

৺প্রকৃতিশ্বর সিংদেও এর একটি বন্দনা গান। তাল-তেওড়া।

(স্থায়ী) বন্দি তোমারে প্রিয় হে
শারদ সন্ধ্যা রমণীয়।
অর্ধস্ফুটিত কুমুদিনীর
সাদর সম্ভাষ নিও হে।। শারদ সন্ধ্যা......

(অন্তরা) শরত শেফালি চামেলি সঙ্গে

হাসিয়া ফুটেছে আপন রঙ্গে

তুষিতে ভাদুরে মোদের অধরে

সরস হাসিটি নিওহে॥ শারদ সন্ধ্যা.....

রাজ ঘরাণার গানগুলির একটি বৈশিষ্ট্য হল, এখানে ভাদুর রূপবর্ণনার চমৎকারিত্ব। অধিকাংশ গানই রূপবর্ণনায় অতুলনীয় হয়ে উঠেছে। ধ্রুবেশ্বর লাল সিংদেও এর রচনা একটি দাদরা তালের গান উল্লেখ করা হল।

"যুঁই ঘেরা তোর খোঁপা ভাদু

এক ভোমরা কে যা ভয়;

আজ দেখি যা রঙিন অধর

কালকে কিছু নয়।।

করে চুড়ি ইন্দ্র ধনু বালা বিজলীময়

মেঘ ডম্বুর পরলে শাড়ি

বর্ষা পরাজয়।।"

প্রকৃতিশ্বর সিংদেও এর একটি গানে পাই—

"ওগো বড় সাধের মাথা বেঁধে ভাদু এসেছে,

আমার আঙিনাতে তাই বসে চাঁদ হাসিছে।

নিরখিতে মুখ শশী ছুটে আসে প্রতিবেশী,

আমার পানের খিলি সেজে সেজে হাত ধরেছে।।"

ওই গীতিকারের স্ব-সুরারোপিত তিলোককামোদ রাগে, খেমটা তালে নিবদ্ধ একটি বিসর্জন গীতি—

"ডাকে পাখিটি আখিঁটি মুদিয়া ডালে

যেও না ওগো ভাদুধন।

রহিব একাকি কি করে ঘরে

কি দিয়ে বুঝাই মন॥ যেতনা.....

এ হেন ভাদর নিশায়

এমন হাসিটি ভোলা কি যায়,

তুমি যে মোদের প্রাণ রতন ॥" যেও না......

অন্য একটি গান। গানটির কথা ও সুরকার অজ্ঞাত। রাগ মিশ্র পিলু। তাল দাদরা।

"কত সোহাগের সোহাগিনী রে

ভাদু মনিরে যেতে দেব না;

নানা ফুলের হার গাঁথিয়ে

পরাব সব ললনা॥

গাইব দিবা শবর্বরী / নিরখিয়া ভদ্রেশ্বরী,

গাইব সবে ঘুরি ঘুরি / আনন্দে হয়ে মগনা॥"

কাশীপুর ঘরাণার এই ভাদুগান ঘোঙা গ্রামের কিছু সঙ্গীত শিল্পীর মধ্যে পাওয়া যায়। রাজবাড়ির

দরবারে একসময় ঘোড়া গ্রামের কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত শিল্পী সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। কাশীপুর রাজারা এই সব সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিদের জমি দান করে ঘোড়া গ্রামে বসবাসের সুযোগ করে দেন। এখানে ধ্রুপদ গ্রান ছিল বিখ্যাত। তবে শুধু গান নয়, বাদ্য এবং নৃত্যের ক্ষেত্রেও তাঁরা বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। আশুতোষ রায় ও শিবু কথকের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্যেরা হলেন কালু কথক; টিমু কথক ইত্যাদি।

ভাদু উৎসবে গানই হল মূল উপকরণ, তাই এর পরিধি অনেক বিস্তৃত। তাছাড়া, দীর্ঘ একমাস ধরে ভাদু গান গাওয়া হয় বলে গানের প্রসঙ্গও অনেক। পাঁচালি জাতীয় বহু ভাদু গান আছে, যেগুলো দীর্ঘ সময় ধরে গাওয়া চলে। এখানে সমবেতভাবে গাওয়ার পদ্ধতি আছে। পৌরাণিক ও সামাজিক প্রসঙ্গ নিয়েই গানগুলি গাওয়া হয়। এছাড়া, মহাভারত, রামায়ণ প্রসঙ্গে বহু গান গড়ে উঠেছে। সামাজিক প্রসঙ্গ যেমন আছে, তেমনি সাময়িক প্রসঙ্গ নিয়েও তৈরি হয়েছে ভাদু গান। ভাদু গানের মধ্যে রঙ্গ-তামাশা আছে, একদলের সঙ্গে আর একদলের আক্রমণ প্রতি আক্রমণ এর কৌশলটিও অদ্ভুতভাবে সন্নিবেশিত। এখানে ছড়া জাতীয় গানেরও ছড়াছড়ি। এত যে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য তবুও ভাদু গানে প্রেমমূলক গান প্রায় নেই বললেই চলে; বরং বিরহের সুর শোনা যায় অনেক অংশ জুড়ে। রাজনীতির প্রসঙ্গ সম্পূর্ণভাবে বর্জিত; তার জায়গায় এসেছে রাজস্তুতি ও রাজবাড়ির কথা। এখন এইসব গানের কিছু কিছু অংশ নমুনা হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

রামায়ণ প্রসঙ্গ ঃ—রামায়ণের কাহিনি অবলম্বনে বহু ভাদু গান প্রচলিত আছে। ছড়া জাতীয় গান ছাড়াও পাঁচালি গানগুলোর মধ্য দিয়ে এক একটি ঘটনার কথা প্রকাশ করার সুন্দর প্রচেষ্টা আছে এখানে।

রামচন্দ্র রাজা হতে গিয়েও হতে পারলেন না। বিমাতার চক্রান্তের শিকার হয়ে তাঁকে যেতে হল দীর্ঘ চৌদ্দ বছরের জন্য বনবাস। এই মর্মান্তিক ঘটনায় মায়ের মনে যে নিদারুণ যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে পুত্রের জন্য; খুব সহজ-সরল ভাবে যে যন্ত্রণার প্রকাশ পেয়েছে ভাদু গানে—

"হা রাম, হা পুত্র, ওরে আমার নীলরতন,
তোমা অদর্শনে রাম বাঁচেনা আমার জীবন।
আর কি পাইব আমি নব দূর্বাদল শ্যাম,
আর কি চন্দ্রবদনে মা বলি ডাকিবে রাম?"

ভরত তখন মামার বাড়িতে। মন্ত্রী সুমন্ত্র তাকে অযোধ্যায় আনতে গেছেন। ফিরে আসার পথে অমঙ্গল চিহ্ন চোখে পড়ছে বারবার, তাই তিনি সুমন্ত্রকে বলছেন—

"কি আছে ভাগ্যেতে মোর পাব কিনা দূর্বাদল,
আসিতে আসিতে দেখি পথে কত অমঙ্গল।
অযোধ্যার বাদ্য ভাণ্ড কিছু মাত্র না দেখি,
কি এমন কারণ মন্ত্রী আমারে বল দেখি।
অযোধ্যা নীরব কেন এ উৎসবে নিরুৎসব
ডাহকা ডাহুকী আদি করে নাই কলরব।
সুমন্ত্র বলেন ভরত, তোমারে করি নিবেদন,
কৈকেয়ী রাণী কাল সাপিণী রামে দিল নির্বাসন॥"

'গয়া পালা' বা 'বালির পিণ্ডদান' পালাতে দেখি রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণকে নিয়ে বহু বন উপবন পেরিয়ে গয়াতে উপস্থিত হয়েছেন। সেখানে গিয়ে তিনি পিতার উদ্দেশ্যে পিণ্ড প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সীতা দেবীকে একটি গাছের নীচে বসিয়ে লক্ষ্মণসহ ফল সংগ্রহের জন্য চলে গেলেন। ঠিক সেই সময়—

"হেথা রাজা দশরথ রথে করি আরোহণ
সীতা সন্নিধানে রাজা ত্বরা করেন গমন,
বৃক্ষ মূলে বসে আছেন একাকিনী শ্রীজানকী
দশরথ বলে মাগো কি কর জনকের ঝি?
আমি রাজা দশরথ শুন মা গো পরিচয়,
এতদিন ভ্রমি হেথা স্বর্গ মোর নাহি হয়।
দেখা সীতা দেখা পিণ্ড ব্রহ্মা শাপে মুক্তি পাই
ব্রহ্ম শাপে মুক্তি হলে তবে আমি স্বর্গে যাই।।"

সীতা দেবী কিছুক্ষণের জন্য রাজা দশরথকে অপেক্ষা করতে বললেন। কিন্তু তিনি শুনলেন না। বাধ্য হয়ে শ্বশুরের হাতে তুলে দিলেন বালির তৈরি পিণ্ড। এই পিণ্ডদান কালে তিনি সাক্ষী রাখতেও ভুল করলেন না।

"সাক্ষী থাক ফাল্গু নদী সাক্ষী থাক তুলসী,
রামকে আমার বলবে তোমরা পিণ্ড দিতে দেখেছি।
সাক্ষী থাক শিমূল বৃক্ষ ওহে বট তরুবর
সত্য কথা বলবে তোমরা জিজ্ঞাসিলে রঘুবর।
দশরথে পিণ্ড দিলাম দেখলে তোমরা নয়নে
কেউ করো না প্রতারণা শ্রীরামের বিদ্যমানে॥"

মহাভারতের কাহিনি প্রসঙ্গ :—মহাভারতের কাহিনি নিয়েও বহু ভাদুগান প্রচলিত আছে। 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ পালা' থেকে কিছু অংশের উদ্ধৃতি দেওয়া হল।—

"দুঃশাসন বড় দুষ্ট গেল রাণী আনিতে
দুঃশাসনে দেখে রাণী সামাইল মহলেতে।'
কুন্তী দেবী হস্ত ধরে 'শুন্‌রে বাছা দুঃশাসন
যে মা সীতা সেই দ্রোপদী তাই তোমা করি বারণ।"

কিন্তু দুষ্টমতি দুঃশাসন কুন্তী দেবীর কথা কর্ণপাত করল না। তাঁকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে পথ পরিষ্কার করে নিল। অন্দরমহলে প্রবেশ করে—

"দুঃশাসন বড় দুষ্ট ধরিল রাণীর হাতে।
কেশে ধরি পাখির মতো আনিল রাজসভাতে।"

কর্ণ আদেশ করল। দ্রৌপদীকে বিবস্ত্র করতে। লজ্জা, অপমানে রাঙা হয়ে উঠল তাঁর মুখ। নিরুপায় হয়ে সখা শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ নিলেন। দ্রৌপদীর বস্ত্রের অপর্যাপ্ত যোগান দিলেন তিনি। দুঃশাসন হার মানল। ভীষ্ম আদেশ দিলেন দ্রৌপদীকে মহলে যেতে। বললেন, আলুলায়িত কুন্তলে পঞ্চ ঝুঁটি বেঁধে সিংহাসনে বসতে। দ্রৌপদী পদাহতা ক্রুদ্ধা ফনিলীর মতো গর্জে উঠে—

"বাঁধব নাতো পঞ্চ ঝুঁটি

বসব নাতো সিংহাসনে।

খুলা চুল থাকবে আমার

দুঃশাসন রক্ত বিনে॥"

সামাজিক প্রসঙ্গ :—সমাজ জীবনের বিভিন্ন বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে ভাদু গান বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে। নারী তার ব্যক্তি জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা সমস্ত অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছে গানের মধ্য দিয়ে। স্বল্প পরিসরের মধ্যে সমস্ত বিষয়ে আলোকপাত করা সম্ভব নয় ; তাই সামান্য কয়েকটি বিষয়ের কথা উপস্থাপন করছি।

মেয়েদের শ্বশুর বাড়ির সমস্যা একটি চিরন্তন সমস্যা (অবশ্য সব মেয়ের ক্ষেত্রে নয়)। অভাব-অভিযোগ, কলহ-বিবাদ প্রভৃতির মধ্য দিয়েই তাকে স্বামীর ঘর করতে হয়। শুধু গানের মধ্যেই নয়, সাহিত্যের মধ্যেও তার প্রতিফলন ঘটেছে বারে বারে। আমরা স্মরণ করতে পারি ভারতচন্দ্রের ফুল্লরার কথা। ছদ্মবেশী দেবী চণ্ডীকে সামান্য একটি কথায় তার নিষ্ঠুরতম দারিদ্র্যের কথা বলেছে—

"দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান

আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান।।"

একটি জাওয়া গানের মধ্যে পাই—

"একদিন কার হল্যুদ বাঁটা

তিনদিনকার বাসী লো।

মাঞ-বাপকে ব'লে দিবি

বড় সুখে আছিলো।।"

ঠিক একই বেদনার সুর অনুরনিত হয়েছে টুসুগানের ছোট্ট দুটি লাইনের মধ্যে—

"ভাঙ্গা ঢেঁকি খালভরার ঘরে।

ছেল্যা কাঁ'দছে লো পিঠার লাগ্যে।।"

যে মেয়েটি এতদিন বাবা-মায়ের কাছে সযত্নে লালিত হয়েছে। শ্বশুর বাড়িতে এসে ঘটে যাচ্ছে তার ব্যতিক্রমা অভাব আর দারিদ্র্যের ঘেরা টোপে বন্দিনী সেই বধূটির জীবন যখন বিষময় হয়ে ওঠেঃ তখনই তার মুখ থেকে শুনতে পাই হতাশার বাণী। ভাদু গানে তার প্রকাশ ঘটেছে—

"আমরা যখন ছুটু ছিলম।

টুপায় খা'তম গুড়মুড়ি।

শ্বশুর ঘরের ই কি ধারা,

বাসী ভাতে নাই মুড়ি।"

শুধু অভাব অভিযোগই নয়, তার উপরে আছে লাঞ্ছনা গঞ্জনা, অত্যাচার। শ্বশুর, শাশুড়ি, দেওর, ননদ সবাই যখন অত্যাচারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, তখন নির্যাতিতা বধূটি একুট শান্তি পাবার আশায় বাপের বাড়ি চলে আসে। মায়ের কাছে বলে—

"শ্বশুর ঘরে যাব নাই মা,

ধ'রে মারে শাশুড়ি।

শাশুড়িতে ধ'রে মারে,

শ্বশুর কিছু বলে না।

শুনের দেওর গাল দেয় গো

জানে পাড়া পরগণা।"

দেওরের এই রূপটি যে সবক্ষেত্রেই প্রকাশিত, তা নয়। এর ব্যতিক্রমীও আছে। সেখানে দেখা যায় দেওরটি স্নেহ বৎসল। শৌখিন এবং ভ্রাতৃবধূর প্রতি তার অগাধ ভালোবাসা। বধূটিও দেওর অন্তঃপ্রাণ। দেওরের প্রতি তার স্নেহ ও প্রশ্রয় কতখানি তা একটি গানের মধ্যে পাওয়া যায়।

"বাড়ির নীচে নীল বুঁনেছি

নীলের শুঁটি ধরে না।

ঘরে আছে লক্ষ্মণ দেওর,

নীল কাপড় বই পরে না।"

কিন্তু সব দেওর তো এমনি হয় না। যদি হত তাহলে সেই দারিদ্র্য ক্লিষ্টা নির্যাতিতা বধূটি প্রাণ জুড়াবার একটা আশ্রয় পেত। কিন্তু সেটা আর হয়ে ওঠে না। তার উপরে যদি থাকে 'রাই বাঘিনী ননদিনী', আর দজ্জাল শাশুড়ির মেলবন্ধন, তাহলে তো জ্বলন্ত আগুনে ঘি ঢেলে দেওয়ার মতো অবস্থা। তারা তো বউয়ের ভালো খাওয়া, ভালো পরা দেখলেই হিংসায় বুক ফেটে মরে। মেয়েটি তার মাকে সে কথা জানিয়ে বলে—

"মাগো আমি কাপড় পরি,

ধারে ধারে ধাধ্‌কি ফুল।

শ্বশুর ঘরের লোকে বলে

গেল বৌয়ের জাতিকুল।।"

শাশুড়ি যে মাথায় দেবার তেলটাও দিতে চায় না সেটাও আর গোপন থাকে না।

"এক পিঠ চুল আমার

পিঠের পরে রহে না।

শাশুড়িতে তেল দেয় না,

চুলের যতন জানে না।"

ঘরের বৌকে তো বেশিদিন বাপের বাড়িতে ফেলে রাখা যায় না। সংসারের কাজ আটকে যায়, তাছাড়া লোকনিন্দাও আছে। তাই যখন শ্বশুরবাড়ির লোক এসেছে তাকে নিয়ে যেতে, তার মনে ভয় হয়েছে যদি তার বলা কথাগুলো মা জানিয়ে দেয় কিংবা খারাপ কিছু বলে বসে তাহলে পরিণাম হবে ভয়ংকর। তাই মাকে অনুরোধ করে বলে—

"শ্বশুর ঘরের লোক এসেছে

হেই মা কিছু বলো না;

শাশুড়িতে জানতে পেলে

আমায় দিবে গঞ্জনা।"

সতীন সমস্যা নারীদের একটি চিরন্তন সমস্যা। ননদের বিষবাক্য যদিও বা সওয়া যায়, সতীনের ছায়া গায়ে লাগলেই গায়ে আগুন জ্বলে উঠে। মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে কী করে সতীনকে ঘরছাড়া করা যায় বা মেরে ফেলা যায়। মেরে ফেলার একটা কৌশল সুন্দরভাবে ভাদু গানের মধ্যে পরিস্ফুট হয়েছে।

"মুড়ি ভাঁজলম্ শিকায় তু'ললম্
· খালো সতীন বাসী ভাত'
ভিজা ঘরে শুঁয়াই রা'খব,
ডা'কে আ'নব সন্নিপাত॥"

কৌশলটির তারিফ করতে হয়। মুড়ি ভাজা হল, কিন্তু সে মুড়ি শিকেয় তুলে রাখা হল। সতীনকে মুড়ি খেতে দেব না, তার বদলে বাসী ভাত অর্থাৎ ভিজে ভাত খাওয়াবে এবং ভিজা স্যাঁতস্যাঁতে ঘরে শুতে দেবে। যাতে করে সতীনকে সন্নিপাতে ধরে এবং তার থেকে মরণের দিকে সে যেন এগিয়ে যায়।

সতীনকে মারবার কথা সরাসরি ভাবে ঘোষিত হয়েছে একটি গানে।

"সতীন মা'রব, সতীন মা'রব,
মা'রব লো পথে ঘাটে।
সতীনের নামে নালিশ ক'রব
পুরুল্যার হাইকোর্টে।"

সতীনের প্রতি শুধু তারই যে এত আক্রোশ তা নয়। ভাদুকেও সতীন সম্পর্কে সচেতন করে দেওয়া হয়েছে।

"যা'ছ যা'ছ যা'ছ ভাদু দুদিকে আর ভাইল না।
দুদিকে দু-সতীন আছে পান দিলে পান খাইয় না॥"

অন্য আরেকটি গানে বলা হয়েছে—

"এই আঁধার রা'তে,
(আমার) ভাদুর মানা আছে লো,
উকুলি যা'তে।
উকুলি যাইয়ো না ভাদু লো,
যোগিনীদের পাড়াতে
উকুলিতে সতীন আছে
লা'রবে তুমি দাঁড়া'তে,
এই আঁধার রা'তে।"

সাময়িক প্রসঙ্গ :—সাময়িক প্রসঙ্গ নিয়ে যে গানগুলি প্রচলিত আছে, তাতে দেখা যায় বিষয় বস্তুর কোনো বাঁধা ধরা নিয়ম নেই। যে কোনো বিষয় নিয়েই হোক তাৎক্ষণিকভাবে বেশ কিছু গান ভাদুগানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সবগুলিই যে স্থায়িত্ব লাভ করেছে এমন কোনো কথা নেই। তবে ভাদুকে কেন্দ্র করেও বেশ কিছু গান প্রচলিত আছে এই প্রসঙ্গে। কিছু নমুনা :—

"কাশীপুরে দে'খে আইলম
সোনার ভাদু যায় চ'লে।
হায়রে টাকা নাইরে হাতে
ভাদু লিতম দর ক'রে।"

ঠিক এই ধরনের আরেকটি গানে পাই—

"কাশীপুরে দে'খে আইলম

ডালায় ডালায় দুধ বালা।
ভাদুর কোলে নাই মা ছেল্যা
কাকে দিবে দুধবালা।"

একসময় দাঁতে মিশি লাগাবার রেওয়াজ চালু হয়েছিল মেয়েদের মধ্যে। অনেকেই এটাকে আভিজাত্যের একটা অঙ্গ বলে মনে করতেন। এই মিশির ব্যবহার নিয়ে একটি গান—

"তিনটা ভাদু জলকে গেল
কোন ভাদুটা আমাদের?
দাঁতে মিশি, চোখে কাজল
সেই ভাদুটাই আমাদের।"

এক সময় কাপড়ের খুব অভাব হয়েছিল। বাজারে গিয়ে কাপড় কিনতে পাওয়া যেত না। কিছু ব্যবসাদার চড়া দামে সে সময় কাপড় বিক্রি করত খুব গোপনে। সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে ছিল সেটা। লজ্জা ঢাকাতে বিছানার খোল, চাদর, কম্বল এমনকী শোনা যায় চট পর্যন্ত পরতে হয়েছে। এমনি প্রসঙ্গও চলে এসেছে ভাদু গানে।

"কাপড়ের কষ্ট সইতে নারি,
কাপড় পাব কোথায় গেলে।
শুন কন্ট্রোল অফিসার
পরি বিছানার খোল খুলে।"

দেশে হঠাৎ আইন চালু হল, মেয়েরাও বাবার বিষয় সম্পত্তির অংশ পাবে ছেলেদের মতোই। অনেক অভিজাত বংশের মেয়েরাই বিষয় সম্পত্তির বাঁটোয়ারা চেয়ে বসল। কোনো ভাই স্বেচ্ছায় দিল, অনেকেই দিল না। সেই না পাওয়া বোনেরা আদালতের শরণাপন্ন হল। ভাই বোনের সম্পর্কে ফাটল ধরল। সাধারণ গ্রাম্য পরিবারের মেয়েরা সেই সব সম্পত্তি লোভী মেয়েদের নিন্দায় মুখরিত হল। এই প্রতিবাদের সুর ধ্বনিত হল ভাদু গানের মধ্যেও।

" এ কি কলি কালে,
রঙ্গ দেখে অঙ্গ জ্বলে
ছিঃ ছিঃ কলি কালে।
দেশে হ'ল লতুন আইন,
লতুন লতুন কথা বলে।
ভাইয়ের টাক বোনে পায় লো,
আদালতে মামলা চলে।
ছিঃ ছিঃ কলি কালে।"

শহরাঞ্চলের মতো গ্রামের মধ্যেও শিক্ষিতা স্বেচ্ছাচারী আধুনিকা বৌদের আগমন শুরু। শাশুড়িরা ভাবছেন বৌ-মা এলে তার হাতে সংসারের দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত হবেন। কিন্তু বৌমা এসে সব আশাতেই ছাই তুলে দিচ্ছে। সে এসে সংসারের কুটোটিও নাড়ছে না, তার সব কাজ শাশুড়িকেই করতে হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে একটি গান—

"একি কলিকালে
রঙ্গ দেখে অঙ্গ জ্বলে

ছিঃ ছিঃ কলিকালে।
শাশুড়ি সিনাই আইলেন গো
সামাইলেন রান্না শালে।
বৌ-মা এলেন স্নান করিয়ে
হিমানী মাখেন গালে।
ছিঃ ছিঃ কলি কালে।"

ছড়া জাতীয় গান :—ছড়া জাতীয় গানগুলিও তৈরি হয়েছে বিভিন্ন বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে। ছোট আকারের এই গানগুলির মধ্যেও ব্যঞ্জনাধর্মী গুণ বর্তমান। আবার এক ধরনের ছড়া গান আছে সেগুলির গঠনরীতি সম্পূর্ণ আলাদা। সেখানে দেখা যায় গানের প্রথম অংশের সঙ্গে দ্বিতীয় অংশের কোনো সামঞ্জস্য বা মেল-বন্ধন নেই। এই ধরনের কিছু নমুনা :—

"রামের মা-য়ে রামকে মারে
রাম কাঁদে ধুলায় প'ড়ে।
কাশীপুরের রাজা আইসে
ধুলা ঝা'ড়ে লেয় কোলে॥"

এখানে মায়ের মার খেয়ে যে রাম ধুলায় পড়ে কাঁদছে, সে কোন রাম? সে কি কোনো সাধারণ পরিবারের ছেলে না কি অযোধ্যার রামচন্দ্র? যদি অযোধ্যার রামের কথা বলা হয়েছে, তাহলে কাশীপুরের রাজার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক থাকার কথা নয়।

অন্য একটি গান— কাশীপুরে দে'খে আইলম,
একটি বোঁটায় তিনটি বেল
মা-বিটিতে পান চিবা'ছে
মাথায় নিয়ে ফুলন তেল।"

মা-বিটিতে মাথায় ফুলন তেল লাগিয়ে একসঙ্গে বসে পান চিবানো খুব একটা অবাস্তব ব্যাপার নয়। কিন্তু একটি বোঁটায় কখনো তিনটি বেল ধরেছে এমনটা দেখা তো দূরের কথা কখনও শোনাও যায় না। .... এই জাতীয় অনেক গানের প্রচলন আছে। আব বিস্তৃত না করে ছড়া গান (যেগুলি ব্যঞ্জনাধর্মী) এর কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যাক।

শাশুড়ি ননদিনীর জ্বালায় বৌ-দের ভালো খাওয়া পরা বা ভালোভাবে নিজের পরিচর্যা করা বিষম দায় হয়ে ওঠে। এরকম একটি গান ঃ—

"হলুদ বনের ভাদু তুমি,
হলুদ কেন মাখ না।
শাশুড়ি ননদের ঘরে
হলুদ মাখা সাজে না॥"

মেয়েদের কাছে তাদের ভাদু ধন সন্তানের আসন লাভ করে বসে কখনও কখনও। তখন আর ভাদু শুধু একটা মাটির প্রতিমা নয় ; সে হয়ে ওঠে বালিকা কন্যা। এই ছবিটি ফুটে উঠেছে একটি ছড়াগানের মধ্যে।

"আদাড়ে বাদাড়ে ঝিঙা,
ও ঝিঙা তুই বাড়িস্ না।

আমার ভাদু শিশু ছেল্যা
ঝিঙা রাঁধতে জানে না।।"

রামায়নের কাহিনি নিয়ে একটি ছড়া গান।

"অশোক বনে পাতের কুঁড়্যা গো
সীতায় পাশা খেলেছে।
যোগীর বেশে রাবণ এসে
সীতায় হরে নিয়েছে।"

এই ধরনের গানের সংখ্যাই বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় ভাদু গানে। গানগুলি আকারে ছোট, তাই ছড়া গান বলেই এই গানগুলি প্রচলিত।

এইসব গান ছাড়াও আরো এক জাতীয় গানের প্রচলন আছে। সেগুলি গাওয়া হয় দলবদ্ধভাবে। রঙ্গরসিকতার মাধ্যমে একদল অন্য দলকে আক্রমণ করে। আক্রান্ত দলও প্রতি আক্রমণ করতে ছাড়ে না।

"এই সন্ধ্যাকালে।
আয় লো তোরা পালে পালে,
সন্ধ্যা কালে......
ভাদু ব'লতে আলি তোরা লো,
ব'সলো তোরা ঢেঁকশালে।
ভাদু বল আর পাটরা কুঁড়া
খা লো তোরা সকলে।
সন্ধ্যাকালে........।

এখানে আগত দলটিকে গরুর সঙ্গে তুলনা করে আক্রমণ করা হয়েছে। কারণ মানুষ কুঁড়া খায় না ; পালে পালে মানুষ আসার কথাও বলা হয় না ; বলা হয় দলে দলে। তারা এই অপমানের প্রতিশোধ নেয়, জবাব দিয়ে।

"ওলো প্রাণ সজনী
এমন কথা বললি কেনে না জানি,
ওলো প্রাণ সজনী.....
ভাদু ব'লতে আলি আমরা লো,
বড় ঘরের রমণী
ঘণ্টায় ঘণ্টায় পানের খিলি ;
হাতে সোনার বিউনি।
ওলো প্রাণ সজনী.......

এইভাবে উত্তর প্রত্যুত্তরের মধ্য দিয়ে ভাদুগানের আসর মেতে ওঠে।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, একই গান টুসু ও ভাদু-র মধ্যে গাওয়া হয়। সম্পূর্ণ কথাটাই থাকে ; শুধু টুসুর স্থানে ভাদু, আবার ভাদুর স্থানে টুসু বলে গাওয়া হয়। তার কারণ হিসেবে বলা যায়, এই সব প্রচলিত গানগুলির লিখিত রূপ নেই। যেটুকু লিপিবদ্ধ হয়েছে সবই শোনার পরেই হয়েছে। তাই শ্রেণী বিভাজন এর কোনো নিয়মরীতিও নেই। এইসব গান বেশির ভাগই

শ্রুতি নির্ভর। আবার একই ব্যক্তির দ্বারা যখন দুটি গান গাওয়া হচ্ছে তখন ভাদু গানের আসরে গাইতে বসে টুসর গান মনে পড়াটাও অস্বাভাবিক নয়। টুসুর ক্ষেত্রেও সেই অবস্থাই ঘটে থাকে। তাই মনে হয় গানগুলির এই পরিবর্তন নিয়ে সমালোচনা করার কোনো যুক্তি নেই।

পরিশেষে বলা যায়, ভাদুগান 'বর্ষা সঙ্গীত' নয়। এই উৎসব কোনো কৃষি উৎসব নয়, তাই কৃষি ভিত্তিক কোনো গান ভাদু গানের আসরে গাওয়া হয় না। শস্য কেন্দ্রিক কোনো গান যেমন এখানে অতীত দিনে ছিল না, তেমনি বর্তমানেও সংযোজিত হয় নি। ভাদু কোন দেবকন্যাও নয়, সে প্রকৃতই মানবী ; এক চঞ্চলা বালিকার মূর্ত প্রতিচ্ছবি। এই রাঢ় বাংলার মাটির সঙ্গে তার নিবিড় যোগসূত্র। এই মাটিতে লালিত মেয়েদের কাছে তাই তো সে এত প্রিয় ; এত কাছের হতে পেরেছে। ভাদু তাদের কাছে এতটাই আপন যে, তাকে ছেড়ে যেন প্রাণে বাঁচাও দায়। তাই ভাদুর প্রতি সব মেয়েদেরই কামনা-

"ও ভাদু মা, ও ভাদু মা,
আমি তোমার মা হব।
আঁচল ভ'রে মুড়ি দিব
বদন ভ'রে চুম খাব।।"

* * *

ঋণ স্বীকার ঃ—

সাহায্যকারী গ্রন্থাবলী ঃ—

(১) বাংলার লোকসাহিত্য ঃ- শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য

(২) পুরুলিয়া ঃ- তরুণদেব ভট্টাচার্য

(৩) ভাদুগতির ইতিকথা ঃ- যুধিষ্ঠির মাজি

(৪) পঞ্চকোট ইতিহাস ঃ- রাজপুরোহিত রাখালচন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত (সম্পাদনা-দিলীপ কুমার গোস্বামী)

(৫) বাংলার লোকসঙ্গীতে নারী ভাবনা ঃ- ডক্টর জয়শ্রী ভট্টাচার্য

প্রত্যক্ষ সহযোগী ঃ

(১) আমার শিক্ষক মশায় শ্রীযুক্ত বিজয় পাণ্ডা ঃ-

(২) বন্ধুবর শ্রী সুভাষ রায় ঃ-

(৩) শ্রী মিহির লাল সিংদেও।
(কাশীপুর রাজ ঘরাণার নিজস্ব গানগুলি এঁর কাছ থেকে প্রাপ্ত।)

প্রসঙ্গঃ বাউল-সাধনা ও পুরুলিয়ার বাউলগান

ড. শান্তি সিংহ

॥ এক ॥

তৎসম শব্দ 'বাতুল' থেকে 'বাউল' কথাটি এসেছে। বাউলদের সাধনধারা গুহ্য এবং ব্রাহ্মণ্য-শাস্ত্রবিরোধী। তাই বুঝি বেদ-ব্রাহ্মণ অনুশাসন-বিরোধী মত ব্রাহ্মণ্য দৃষ্টিতে উন্মাদবৎ, অর্থাৎ 'বাতুল'। 'জ্যান্তে মরা' বাউল সম্প্রদায়ও বুঝি তাঁদের স্বতন্ত্র সাধন ধারা অব্যাহত রাখতে 'বাউল' কথাটি সহজভাবেই মেনে নিয়েছেন।

'বাউল' শব্দের প্রায়-সমোচ্চারিত ও প্রায় সমার্থবোধক শব্দ বুঝি 'আউল।' যা 'আকুল' শব্দজাত। লক্ষণীয়, মুসলমান সাধককে 'আউল' বা 'আউলিয়া' বলা হয়। আরবী শব্দ 'ওয়ালি'। তার অর্থ—কাছে, সন্নিকটে। 'ওয়ালি' শব্দের বহুবচনে 'ওয়ালিয়া'। সুফি-দর্শনের প্রভাব পড়েছে মুসলমান বাউলদের ওপর। সাধনপথে অগ্রসর, তত্ত্বজ্ঞানী অথচ সামাজিক অনুশাসনের বাইরে আপনভোলা মানুষদের 'আউলিয়া' বলা হয়।

বাংলায় পাল-রাজগণ বৌদ্ধধর্মের সমর্থক ছিলেন। পাল রাজবংশের পর সেন-রাজারা ছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রবল সমর্থক। পাল-সেন রাজাদের আগে বাংলায় ছিল জৈনধর্মের তরঙ্গ। লক্ষণীয়, নবম-দশম শতাব্দীতে বৌদ্ধতান্ত্রিক ধর্মমত বাংলায় মাথা তোলে। তার বিশ্বস্ত প্রমাণ বাংলা-সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ। চর্যাপদের বেদবিরোধী সাধক পদকর্তারা সমাজজীবন তথা সামাজিক অনুশাসনের পরিপন্থী থাকায় নগর বা গ্রামজীবনের বাইরে অবস্থান করতেন। তাই কাহ্নুপাদ সন্ধ্যাভাষায় তাঁর সাধন পক্রিয়ার মাঝে সমাজজীবনের ইঙ্গিত দিয়েছেন—'নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ। ছোট ছোট জাহ সো বাহ্মণ নাড়িআ॥' অথবা ঢেণ্ঢনপাদের—'টালত মোর ঘর নাহি পড়িবেষী।'

বৌদ্ধধর্মের মূলতত্ত্ব—'সর্বং অনিত্যম্, সর্বং অনাত্মম্, নির্বাণং শান্তিম্।' তা থেকেই শূন্যতাবাদের উৎপত্তি। সহজিয়া বৌদ্ধদের নির্বাণ তিন রকম—(১) শূন্য (২) করুণা (৩) মহাসুখ। সবরকম দ্বৈততাবর্জিত অদ্বয় মহাসুখ সহজিয়া বৌদ্ধদেব উদ্দেশ্য। তাই তাঁরা আনন্দ > পরমানন্দ > বিরামানন্দ > সহজানন্দ স্তরগুলির ক্রমিক পর্যায় বুঝাতে শূন্য > অতিশূন্য > মহাশূন্য > সর্বশূন্য পারিভাষিক শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন। তাঁরা বিশ্বাস করেছেন, মনুষ্যদেহের নাভিতে নির্মাণচক্র, হৃদয়ে ধর্মচক্র, কণ্ঠে সম্ভোগচক্র এবং মস্তকের সর্বোচ্চ দেশে সহজচক্র বা মহাসুখচক্র। বিশিষ্ট বাউল-বিশেষজ্ঞ যথার্থভাবেই মন্তব্য করেছেন, 'বাউল মতবাদ

ভারতীয় উপ-মহাদেশের, বিশেষত পূর্ব ভারতের প্রাচীনতম লোকায়ত মতবাদের সঙ্গে তন্ত্র, বৌদ্ধ শূন্যবাদ, সাংখ্যযোগ, বৈষ্ণব সহজিয়া মত এবং সুফিবাদী ধ্যানধারণার সংমিশ্রণে বিকশিত। এজন্য একে কোন নতুন ধর্ম না-বলে নতুন মতবাদ রূপ চিহ্নিত করাই সঙ্গত। বাউল মতবাদের আদি উদ্ভব বাঙলার বৌদ্ধ জনসমাজে। বজ্রযানী বৌদ্ধ সহজিয়ারাই বাঙলার আদি বাউল। পরবর্তীকালে এই মতবাদ— শাক্তমত ও ইসলামী সুফি ভাবধারার আড়ালে আত্মগোপন করে প্রবাহিত হতে থাকে এবং এরই একটি শাখা সপ্তদশ শতকে বীরভদ্রের দ্বারা বৈষ্ণব সহজিয়া জনসমাজে প্রোথিত হয়। অষ্টাদশ শতকে লালন শাহ্ বৌদ্ধ সহজিয়া বাউল সাধনার মূল ধারাটি সোহ্‌রাওয়ার্দীয়া তরিকার 'সদা সোহাগিনী' গোরোর ফকির সিরাজ শাহের নিকট থেকে লাভ করেন।'[১]

বৈষ্ণব সমাজের মহাগ্রন্থ 'শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃত'-এর অন্ত্যলীলায় কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'বাউল' এবং 'আউল' কথাদুটি ব্যবহার করেছেন। জগদানন্দের মারফত অদ্বৈতাচার্য একটি প্রহেলিকাভরা সংবাদ পাঠিয়েছিলেন মহাপ্রভুকে—

বাউলকে কহিও লোক হইল আউল।
বাউলকে কহিও হাটে না-বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল॥

লক্ষণীয়, অদ্বৈতাচার্য নিজেকে এবং মহাপ্রভুকে 'বাউল' অভিধায় চিহ্নিত করেছেন। বলা বাহুল্য, তা সদর্থক অর্থেই।

এতৎসত্ত্বেও, চৈতন্য-তিরোধানের পর শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণব সমাজে নাগরীভাবেব সাধনবিকৃতি দেখা দিয়েছিল। পদকর্তা নরহরি সরকার এবং তাঁর ভাবশিষ্য লোচন দাস গৌর নাগরভাবের বেশ কিছু আদি রসাত্মক পদে চৈতন্যদেবকে শৃঙ্গার রসের নায়করূপে চিত্রিত করেন। যথা—

দুটি আঁখি ছলছলায়ে এক নাগরী বলে।
গৌরদেহের কিবা জানি, রসে অঙ্গ ঢলে॥
অনেক দিনের সাধ ছিল মোর অধররস পিতে।
মনের দুখে ভাবনা করে শুয়েছিলেম রেতে॥
যখন আমি মাঝ নিশিতে ঘুমে হয়েছি ভোরা।
তখন আমি দেখছি যেন বুকের ওপর গোরা॥

(গৌরপদতরঙ্গিণী ৭৩নং পদ)

চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব ধর্ম সাধনার বিকৃতি প্রসঙ্গে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সুচিন্তিত মন্তব্য করেছেন—"চৈতন্যদেব সমস্ত সংসারকে ভক্তির রসে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া জাতিসংস্কারের বাহ্য বন্ধন অনেকটা শিথিল হইয়া গিয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র আসিয়া বৈষ্ণব সমাজে যে প্রবল পরিবর্তন আনিলেন, তাহার ফলে বৈষ্ণব ধর্মমত কোথাও রূপান্তরিত হইল, ভাঙিয়া পড়িল, কোথাও-বা যৌনাচারী রহস্যবাদী উপধর্মের সৃষ্টি করিল।"[২]

সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ স্পষ্ট ভাষায় বীরভদ্র-প্রবর্তিত-নেড়া-নেড়ী সম্প্রদায়ের সাধন পদ্ধতি

সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন—'বীরভাব ভাল না। নেড়া-নেড়ীদের, ভৈরব-ভৈরবীদের বীরভাব। অর্থাৎ প্রকৃতিকে স্ত্রীরূপে দেখা আর রমণের দ্বারা প্রসন্ন করা, এভাবে প্রায়ই পতন আছে।'[৩]

বাউল-মতে গুরু বা মুর্শিদ কাণ্ডারী। কায়া-সাধনায় নারী সহায়িকা। গুরু-নির্দেশে পূরক-কুম্ভকে ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। বাউল-তত্ত্বে জীবস্রষ্টা 'বস্তু'-রূপে (অর্থাৎ বীর্যরূপে) মানবদেহে অধিষ্ঠিত। তাই এই সাধনায় 'বস্তু—-ধারণ সর্বাগ্রে প্রয়োজন। 'বস্তুবাদী' বাউল বিশ্বাস করেন—যা আছে ভাণ্ডে (দেহভাণ্ডে), তা আছে ব্রহ্মাণ্ডে। লালন ফকিরের গানে আছে—

বস্তু ছাড়া নাহি আর আল্লা কিংবা হরি
এহি মত দেখ সবে নরবস্তু ধরি।
রজঃ-বীর্য এই দুই তত্ত্ব যেবা চেনে।
লালন সাঁইজীকে সেই জন জানে॥

বাউল-সাধনায় নারীদেহ কামনা ভোগের উপাদান নয়, নিষ্কামচেতনায় দেহসাধনের জন্যই নারী-পুরুষের মিলন। এখানে প্রেমই লক্ষ্য ; দেহসঙ্গমে থাকবে কামহীনতা। তাই সহজিয়া চন্ডীদাসের সেই বিখ্যাতপদ মনে জাগে—

গোপন পিরীতি গোপনে রাখিবি
সাধিবি মনের কাজ।
ভেকের মুখেতে সাপেরে নাচাবি
তবে তো রসিকরাজ।।

বাউল-গবেষণায় সুখ্যাত ক্ষেত্রসমীক্ষক শক্তিনাথ ঝা বলেছেন, "দেহমিলনের পূর্বে সাধক-সাধিকা ১০৮ বার গুরু-প্রদত্ত মন্ত্র জপ করবে। নারীর জন্মস্থান থেকে রস গিয়ে তিলক পরবে দুজনে। বাম নাকের নিশ্বাসে দেহমিলন করতে হবে। 'দক্ষিণ দেশ' বা ডান নাকে সূর্যনাড়ি, তখন দেহ গরম থাকে। তাই ডান দিকের নিশ্বাসে, প্রবর্ত বা সাধক স্তরে দেহমিলন নিষিদ্ধ। দেহমিলনে পুরুষ ধীর এবং শান্তভাবে নারীদেহে অনুপ্রবেশ করবে।"[৪]

বাউলরা প্রকৃতির (নারীর) রজঃপ্রবৃত্তির কালকে 'অমাবস্যা' বলেন। তা ঘোর অন্ধকারপূর্ণ কামের সময়। বাউলের 'সহজ মানুষ', 'অধর মানুষ' প্রেমস্বরূপ। সেই 'সহজ মানুষ' প্রকৃতির সহস্রার থেকে রজেঃ জাগরিত হন। তাই তাকে বলে—'অমাবস্যায় পূর্ণচন্দ্রের উদয়'।

বাউল, নারীকে সাধনসঙ্গিনী-সেবাদাসী হিসাবে দেখেন। দেহসাধনায় মিলন হবে, অথচ কোনও সন্তান জন্মাবে না। যদি সন্তান জন্মায়, তবে সেই বাউল ভ্রষ্ট সাধক। লালনও তাঁর এক শিষ্যকে (পাঞ্জু শাহ্) সন্তানের পিতা-হওয়ার-'অপরাধে' শিষ্যমণ্ডলী থেকে বহিষ্কার করেন। লালনের গানেও 'অটল পদার্থ' সাঁইয়ের বন্দনা আছে—"সাঁই আমার অটল পদার্থ/নাহিরে তাঁর জন্ম-মৃত্যু/যদি জন্ম-মৃত্যু হয়/অটল চাঁদ কেন রয়/লালন বলে তা আর/কয় জনে বোঝে।" বাউলতত্ত্বে 'স্বরূপ-দ্বার' প্রসঙ্গে লালন 'মূলাধার-পথে' কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ এবং ষট্চক্রভেদের ইঙ্গিত দিয়েছেন—"মহারস মুদিত কমলে', তাই 'প্রেম-শৃঙ্গারে' নাও গে খুলে/কিন্তু আত্মসাবধান সে রণকালে/কয় ফকির লালন।"

গুরুবাদে অবিচল বিশ্বাস বাউলপন্থী একনিষ্ঠ চিত্তে গুরুবাক্য সাধন পথে মান্য করেন—

'সিংহের দুগ্ধ রয় না জেনো স্বর্ণপাত্র বিহনে।' গুরুবাক্য হল—'সিংহের দুধ'। শিষ্যের প্রশ্নশূন্য গুরুবাদী অন্তর হল—'স্বর্ণপাত্র'। তাই গুরুকে তুষ্ট করতে হয় সবরকমভাবে ; এমনকি বাউল তাঁর সাধনসঙ্গিনী নারীকেও 'গুরুপ্রসাদী' হিসাবে সানন্দে গ্রহণ করতে পারেন। তার একটি সরস চিত্রময়ীরূপ পাওয়া যায় বিশিষ্ট গবেষক তথা বাউল-ক্ষেত্রসমীক্ষকের কলমে 'তুমি কি জান না রাধারানি, শিষ্য যা কিছু পাবে, তার সমস্তই গুরুর প্রসাদী। গুরু আগে ভোগ করবেন।..... তিনি অনুরাধার সামনে দাঁড়িয়ে তাকে দুহাতে জাপটে ধরে বুকে টানলেন। গভীর আলিঙ্গ নে অনুরাধার মুখের উপর নামালেন চুল-দাড়ির নিচের অতি প্রবীণ বয়স্ক মুখখানি। দাঁত শূন্য দুই মাড়ির ঠোঁট নামালেন অনুরাধার দুই ঠোঁটের নিচের চিবুকে। একটা শান্ত দীর্ঘ চুম্বনের পর অনুরাধাকে ছেড়ে দিলেন গুরুগোঁসাই। নিজের আসনে সরে এসে তিনি বললেন, "এই আসরে উপস্থিত মানুষরতনদের সামনে তোমরা দুজনে (শিষ্য-শিষ্যা) আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে পরস্পরের মুখচুম্বন কর।" তিনি হেসে তাকালেন পরেশের দিকে, "বাবা পরমানন্দ, এ বৈষ্ণবী তোমার। এ তোমার নারীরত্ন। মনে রেখো, গুরুপ্রসাদে একে তুমি পেয়েছ। আমার এই রাধারানি আজ থেকে তোমার সাধনসঙ্গিনী হল, বাবা। সে তোমার সাধন পথের গুরু। তাকে সেইভাবে দেখবে। সেইভাবে ভালোবাসবে। এখন বুঝবে বাবা, সর্ব জীবে প্রেম কী করে হয়, কাকে বলে।' তারপরে গুরুর আদেশে পরেশ আর অনুরাধা একটি যেন মিথুন-মূর্তি। সকলের উঁকিঝুঁকির মধ্যে পরেশ অনুরাধাকে গভীর চুম্বন করল।'[৫]

যৌনাচারযুক্ত বাউল বা নদীয়ার ঘোষপাড়ার বিশেষ সম্প্রদায়ের সাধন প্রক্রিয়াকে সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ কী চোখে দেখেছেন, সে-সম্পর্কে পুনরপি একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি—(ভক্তদের প্রতি) 'আজ ঘোষপাড়া ফোষপাড়া কী সব কথা হল। গোবিন্দ, গোবিন্দ, গোবিন্দ! এখন হরিনাম একটু বল। কড়ার ডাল-টড়ার ডালের পর পায়েস-মুন্ডি হয়ে যাক।'[৬]

স্বদেশীযুগে বাংলার জনগণের কাছে একটি বাউলগান খুবই জনপ্রিয় ছিল—'একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি/আমি হাসি-হাসি পরব ফাঁসি/দেখবে জগৎবাসী...' গানটির রচয়িতা বাঁকুড়া জেলার সোনামুখীর পীতাম্বর দাস বাউল। একুশ শতকেও এ গানটি লোকশিল্পীদের মুখে শোনা যায়।

একদা বাঁকুড়ায় বাউল-সংক্রান্ত একটি অভিনব ছড়া শুনেছি—'এটাসিং পেটাসিং ঝুলিটেপা উদাসীন/মাগমরা ধামাপোরা—এই 'হয় ছয়।' বাউলদের কাছে তার ব্যাখ্যা পেয়েছি। (১) 'এটা সিং' মানে যৌনাচারী, কামুক। (২) পেটাসিং অর্থে ঔদরিক বা পেটুক। (৩) 'ঝুলিটেপা' অর্থে যেসব বাউল ঝুলি-কাঁধে, গ্রামে-নগরে বাউল গান গেয়ে, ঝুলিতে-পাওয়া ভিক্ষালব্ধ চাল-আলু ইত্যাদি, তাঁরা মাঝে মাঝে ঝুলি-টিপে দেখেন। যার উদ্দেশ্য ঝুলি কতখানি ভরে উঠল। সেই ঝুলি-টেপা মূলত বিষয়ীচিত্ত মানুষ। (৪) 'উদাসীন' অর্থে যারা উদাসীনতার ভান করে, লোকদেখানোর জন্য। (৫) 'মাগমরা' অর্থে স্ত্রীবিয়োগের পর মর্কটবৈরাগ্য বাউল (৬) 'ধামাপোরা' অর্থে যেসব বাউল নানা ফিকিরে আশ্রম-চালানোর নামে ধামা-ধামা চাল এবং আনুষঙ্গিক আনাজপাতি জোগাড় করে। পাটোয়ারি, সঞ্চয়ী ভাবনা বাউল সাধনার পরিপন্থী। লক্ষণীয়, এই ষড়বিধ লক্ষণযুক্ত তথাকথিত 'বৈরাগী' মানুষ ভারতের সব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কমবেশি দেখা যায়।

॥ দুই ॥

বাউল-সাধনার গুহ্য আচার-পদ্ধতিতে কামকে ছাড়িয়ে প্রেমতীর্থে উত্তরণের পথে অনেকেই ভ্রষ্ট হন ঠিকই, তবু কোনও কোনও ভাগ্যবান সাধনায় সিদ্ধ হন। লালন শাহ্ সেই সিদ্ধ বাউলের অন্যতম। তিনি সহজভাবে বলেছেন—'ভক্তের দ্বারে বাঁধা আছেন সাঁই।/ হিন্দু কি যবন ব'লে তার কাছে/জাতির বিচার নাই।' তিনি আরও বলেন, 'যবন-কাফের ঘরে ঘরে/ শুনে আমার নয়ন ঝরে।/ লালন বলে— মারিস কারে/চিনলি রে, মনের ধোঁকায়।' তাই ক্ষুব্ধ চিত্তে ও সরসভাবে তিনিই বলতে পারেন—'লালন বলে হাতে পেলে/'জাত' পোড়াতাম আগুন দিয়ে।' তাঁর গানে আছে সাংকেতিক অতীন্দ্রিয় চেতনা। যথা—'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি/কেম্‌নে আসে যায়/ধরতে পারলে মনে-বেড়ি/দিতাম তাহার পায়॥' অথবা 'আমার বাড়ির কাছে আরশি নগর/সেথায় এক পড়শি বসত করে/আমি একদিনও না-দেখিলাম তারে'... এসব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াতীতবোধ কবি রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে উদ্দীপিত করেছিল। লক্ষণীয়, 'গোরা' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি' গানটি ব্যবহার করেছেন। মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের 'হারামণি' ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ অকপটে স্বীকার করেছেন, 'শিলাইদহে যখন ছিলাম, বাউলদলের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হত। আমাব অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি। এবং অনেক গানে অন্য রাগরাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল সুরের মিল ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যাবে, বাউলের সুর ও বাণী কোন একসময়ে আমাব মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে। আমার নবীন বয়স,—শিলাইদহ-অঞ্চলেরই এক বাউল কলকাতায় একতারা বাজিয়ে গেয়েছিল—

'কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে!
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে
দেশ-বিদেশ বেড়াই ঘুরে।'[৭]

আমরা জানি, শিলাইদহ পোস্ট অফিসের ডাকহরকরা গগনচন্দ্র দাম—তাঁকে ডাকহরকরা-সূত্রে বলা হয়েছে গগন হরকবা। তাঁরই লেখা এই সুপ্রসিদ্ধ বাউলগান। 'চিঠি বিলি করবার জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রায় প্রত্যহই এঁকে যেতে হত, সেখানে চলত রসালাপ—গানের পর গান — সুরতরঙ্গ। অনেকদিন সন্ধ্যায় পর নির্জন বোটের ছাদে বসে রবীন্দ্রনাথ এঁর গীতসুধা পান করতেন।'[৮]

জমিদারি-তদারকি কাজে শিলাইদহে থাকার সময় লালনের ছেঁউড়িয়া-আখড়া থেকে রবীন্দ্রনাথ লালনেরই লেখা দুটি গানের খাতা সংগ্রহ করেন। তা বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনে আছে। ১৩২২ সালের আশ্বিন থেকে মাঘ অবধি 'প্রবাসী'-পত্রিকায় রবীন্দ্র-সংগৃহীত কুড়িটি গান প্রকাশিত হয়।

ব্রাহ্মণ্য-ধর্মশাসিত শাস্ত্রের কঠিন নিগড় অমান্য করেই বাউলরা তাঁদের 'মনের মানুষ' খুঁজে বেড়ান অনুভূতির 'গভীর নির্জন পথে'। সেই অতীন্দ্রিয়বাদী সাধনধারাকে রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে শ্রদ্ধা করে 'পত্রপুট' কাব্যের ১৫নং কবিতায় লিখেছেন---

'ওরা অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্রবর্জিত।

দেবালয়ের মন্দির-দ্বারে
পূজা-ব্যবসায়ী ওদের ঠেকিয়ে রাখে।

কতদিন দেখেছি ওদের সাধককে
একলা প্রভাতের রৌদ্রে সেই পদ্মানদীর ধারে,
যে-নদীর নেই কোনো দ্বিধা
পাকা দেউলের পুরাতন ভিত ভেঙে ফেলতে।
দেখেছি একতারা হাতে চলেছে গানের ধারা বেয়ে
মনের মানুষকে সন্ধান করবার
গভীর নির্জন পথে।

কবি আমি ওদের দলে—
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
দেবতার বন্দীশালায়
আমার নৈবদ্য পৌঁছাল না।[২১]

রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি তাঁর 'মানুষের ধর্ম' রচনা। অতীন্দ্রিয়বাদী বাউল-তত্ত্ব কতখানি মহীয়ান, তা তিনি নিজস্ব দর্শনের আলোয় মরমীচিত্তে ব্যাখ্যা করেছেন। কিছু উদ্ধৃতি :

(১) 'মানুষের যতকিছু দুর্গতি আছে সেই আপন মনের মানুষকে হারিয়ে, তাকে বাইরের উপকরণে খুঁজতে গিয়ে, অর্থাৎ আপনাকেই পর করে দিয়ে। আপনাকে তখন টাকায় দেখি, খ্যাতিতে দেখি, ভোগের আয়োজনে দেখি। এই নিয়েই তো মানুষের যত বিবাদ, যত কান্না। সেই বাইরে-বিক্ষিপ্ত আপনহারা মানুষের বিলাপগান একদিন শুনেছিলেম পথিক ভিখারির মুখে—

'আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে
দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে।'

সেই নিরক্ষর গাঁয়ের লোকের মুখেই শুনেছিলেম—
'তোরই ভিতর অতল সাগর।'

সেই পাগলই গেয়েছিল—

মনের মধ্যে মনের মানুষ করো অন্বেষণ। সেই অন্বেষণেরই প্রার্থনা বেদে আছে, আবিরাবীর্ম এধি—পরম মানবের বিরাটরূপে যাঁর স্বতঃপ্রকাশ, আমারই মধ্যে তাঁর প্রকাশ সার্থক হোক।'

(২) 'আমাদের বাংলাদেশের বাউল বলেছে—

মনের মানুষ মনের মাঝে করো অন্বেষণ।

একবার দিব্যচক্ষু খুলে গেলে দেখতে পাবি সর্ব ঠাঁই। সেই মনের মানুষ সকল মনের মানুষ, আপন মনের মধ্যে তাঁকে দেখতে পেলে সকলের মধ্যেই তাঁকে পাওয়া হয়। এই কথাই উপনিষদ বলেছেন, 'যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি। বলেছেন, তাং বেদ্যং পুরুষং বেদ— যিনি বেদনীয়, সেই পূর্ণ মানুষকে জানো ; অন্তরে আপনার বেদনায় যাঁকে জানা যায়, তাঁকে সেই বেদনায় জানো, জ্ঞানে নয়, বাইরে নয়।'

(৩) 'বিশ্বদেবতা আছেন, তাঁর আসন লোকে-লোকে, গ্রহচন্দ্রতারায়। জীবনদেবতা বিশেষভাবে জীবনের আসনে, হৃদয়ে-হৃদয়ে তাঁর পীঠস্থান—সকল অনুভূতি, সকল অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে। বাউল তাঁকেই বলেছে মনের মানুষ। এই মনের মানুষ, এই সর্বমানুষের জীবনদেবতার কথা বলবার চেষ্টা করেছি 'Religion of Man' বক্তৃতাগুলিতে।'[২১০]

॥ তিন ॥

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে আসেন শিক্ষাভাবনার সাংগঠনিক রূপবিন্যাসে। ব্রহ্মচর্য-বিদ্যালয় স্থাপন, বিশ্বভারতীর ক্রমিক রূপদান লালমাটির দেশে বীরভূমেই তিনি রূপায়িত করেছেন। তাঁর সৃষ্টিশীল সাহিত্য কর্মাদি, সমাজমনস্ক স্বাদেশিক ভাবনার ধারা তখনও যথারীতি চলেছে। বীরভূমেও তিনি শুনেছেন বাউল গান, তবে তা তথাকথিত পুব বাংলার বাউল গান থেকে স্বতন্ত্রতর। তা ছাড়া রাঢ় অঞ্চলের বাউলদের জীবনচর্যা, সাধনপদ্ধতি পুব বাংলার বাউলদের থেকে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। তার কারণ, চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্মকে নিজেদের জীবনধারায় আশ্চর্য সমীকরণ করেছেন বীরভূম-বাঁকুড়া-বর্ধমান-পুরুলিয়া অঞ্চলের বাউলগণ।

বীরভূমের বাউলসাধক এবং গায়ক নবনী দাস। তাঁর ছেলে পূর্ণ দাস। বাউল-গায়ক হিসাবে দেশেবিদেশে সুপরিচিত। তাঁর সহোদর ভাই লক্ষ্মণ দাস। তিনিও বাউলগান কবেন। তিনি নিজের মুখে স্বীকার করেন—আমার বাবার মধ্যে যেটা ছিল. সেটা আমরা পাই নাই। তিনি (বাবা) ছিলেন বড় সাধক, ভাবুক মানুষ।

বাউল লক্ষ্মণ দাসের সান্ধ্য উপাসনায় বৈষ্ণবীয় আচার। তা এরকম ঃ 'ভেতরের ঘরের মধ্যে একটা উঁচু বেদিতে রাধাকৃষ্ণ মূর্তি। আমাকে সম্পূর্ণ বিস্মিত করে গমগম করে বেজে উঠল শঙ্খ-ঘন্টা-কাঁসর এবং এমন কী একজন বাজাতে লাগল শ্রীখোল। ধূপ-ধুনো জ্বলছে। একেবারে সাত্ত্বিক পরিবেশ। বাড়ির স্ত্রী-পুরুষ সকলেই কৃতাঞ্জলি করে আছেন। হরিধ্বনি, হরিকীর্তনে সকলে সমস্বর। এতো একেবারে বহুবার দেখা বৈষ্ণবীয় সন্ধ্যাচার।'[২১১]

আমরা জানি, বাংলার সংস্কৃতি বিভেদের মাঝে মিলনের সংস্কৃতি। তাই ও-পার বাংলার বাউল দুদ্দু শাহ্ যদিও বলেন 'বাউল-বৈষ্ণব ধর্ম এক নহে তো ভাই/বাউল ধর্মের সাথে বৈষ্ণবের যোগ নাই', তবু চৈতন্যপ্রচারিত বৈষ্ণব প্রেমধর্মের প্লাবনে বাউল-বৈষ্ণব ধারা অন্তত রাঢ় অঞ্চলে মিলে মিশে একাকার! ক্ষিতিমোহন সেন তাই এই মিলনকে 'আধা বৈষ্ণব আধা বাউল' বলেছেন।

শান্তিনিকেতনের পৌষমেলার বাউলগানের আসরে, জয়দেবের কেঁদুলিমেলার বাউলদের আখড়ার আবহমান কালব্যাপী নানা ধরনের বাউল হাজির হন। তাঁদের অনেকেই নকল, আর কেউ কেউ সঠিক পথের বাউল-বৈরাগী।

বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর সোনামুখী, খয়েরবনি, মাকুড়গ্রাম, পাত্রসায়ের প্রভৃতি অঞ্চলে এখন বাউল সম্প্রদায়ের মানুষ খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁরা বৈষ্ণব চেতনার অনুসারী বাউল। অনুরূপভাবে মানভূম-পুরুলিয়াতেও বৈষ্ণবীয় রসে স্নিগ্ধ বাউলদের আজও দেখা যায়! তাঁদের হাতে একতাবা, পরনে গেরুয়া আলখাল্লা, মাথায় লম্বা চুল। কারও কারও মাথায় গেরুয়া পাগড়ি। তবে পোশাকের ভড়ং বা জেল্লা নেই। নদিয়া, মুর্শিদাবাদ বা পাশের রাষ্ট্র বাংলাদেশে এখনও বাউলদের নারীবাদী গুহ্য ক্রিয়াকরণের যে দাপট বা উল্লাসের বিকৃতি তা বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার বাউলদের জীবনচর্যায় নেই। এঁরা যেন বৈষ্ণবীয় ঘরানার অনুবর্তী হয়েই 'মনের মানুষ'-এর অন্বেষণে ব্যাকুল। সাধিকা বাউল-সঙ্গিনী নিয়ে কেউ কেউ যেন হাফ-গেরস্থ। তার কারণ, বৈষ্ণব আচার্য শ্রীনিবাস-নরোত্তম প্রমুখ একদা বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর এবং পার্শ্ববর্তী রাঢ় অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্মের প্রসার ঘটান। পুরুলিয়ার কাশীপুর, চেলিয়ামা, বাগমুণ্ডি, চাকলতোড় প্রভৃতি এলাকায় এখনও রাধাকৃষ্ণের মন্দির বা টেরাকোটা অলংকরণযুক্ত বৈষ্ণবীয় ভাবধারার মন্দিরস্থাপত্য বিদ্যমান। শুধু কী তাই? পুরুলিয়ার প্রাণসম্পদ ঝুমুর গান বা ছো-নাচের গানে এখনও বৈষ্ণবীয় চেতনাব শিল্পিত প্রকাশ। তাই পুরুলিয়ার বিশিষ্ট ঝুমুরসংগীতশিল্পী শলাবত মাহাত—যিনি তাঁর সাংগীতিক প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি সম্মানিত এবং পশ্চিমবঙ্গ লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র থেকে রাজ্য সরকার প্রদত্ত ১৯৯৭ সালের লালন-পুরস্কার পেয়েছেন ঝুমুর সংগীতশিল্পী হিসাবে, তিনি এমন কিছু গান রচনা করেছেন, যে-গুলি দেহতত্ত্বমূলক বাউলগান হিসাবে সমাদৃত। উদাহরণ হিসেবে একটি উদ্ধৃত করছি—

চুরাশি লক্ষ যোনি করিয়া ভ্রমণ
পেয়েছ সাধের মানব-জীবন
একবার বদন ভবে হরি বললি না।
গেল দিনের দিন তনু হৈল ক্ষীণ
কেন বিষয়-বাসনা ত্যজলি না॥
দিন গেল গোলেমালে রে একবার গুরু ভজলি না।

জন্মিলে মরণ মরিলে জনম
মিছে অহংকার মিছে এ যৌবন।
সেটা বারেকের তরে ভাবলি না॥
আড়াই দিনের তরে এসেছ সংসারে
যাবার উপায় কিছু করলি না॥

ভাই বন্ধু যত আত্মীয় স্বজন
পুত্রকন্যাদারা কেহ নয় আপন
মন রে আপনজনার সন্ধান নিলি না।
অসঙ্গে-কুসঙ্গে দিন কাটালি রঙ্গে
সৎসঙ্গে কেন মজিলি না॥

কিবা নিয়ে আলি এই ভবের মাঝার
কিবা নিয়ে যাবি এ-সংসার ত্যজে
কিছু হরিণাম সম্বল বাঁধলি না।
শলাবত বলে পড়েছি গোলমালে
ভব পারে যাতে পারলি না॥

উপরের গানটিকে কেউ কেউ আবার ঝুমুর গান হিসাবেও মান্য করেন। অনুরূপভাবে বর্জুরাম, গৌরাঙ্গিয়া, নরোত্তম, দ্বিজ গদাধর প্রমুখ ঝুমুর-কবি। অথচ তাঁদের কলমে দেহতত্ত্বমূলক বাউলগানও দুর্নিরীক্ষ্য নয়। তার কারণ, রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা ছাপিয়ে অকৈতব আধ্যাত্মিক আকুতি তাঁদের কবিত্বকে অভিনব পদ রচনায় প্রেরণা জুগিয়েছিল।

বিশিষ্ট লোকসংগীত সমীক্ষক-গবেষক সুধীর চক্রবর্তী 'বাউল ফকির কথা' গ্রন্থের জন্য আনন্দবাজার পত্রিকা-প্রতিষ্ঠান থেকে সাম্প্রতিককালে 'আনন্দ-পুরস্কার-ধন্য' হয়েছেন। তিনি কৃষ্ণনগরের মানুষ। তাই নদীয়া, মুর্শিদাবাদ এবং হাতের কাছে বাংলাদেশ রাষ্ট্রেরও কিছু অঞ্চলে ব্যাপকগভীর সমীক্ষা করছেন। অথচ বীরভূম-বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় কোনওভাবে তাঁর 'বিহঙ্গ দৃষ্টিতে' তথ্য সংগ্রহ! আর পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তিক জেলা পুরুলিয়া-সম্পর্কে তাঁর ধারণা শুধুমাত্র ভাসা-ভাসা নয়, সত্যের বিপ্রতীপেও। তাই প্রাগুক্ত গবেষণাগ্রন্থে দুঃখজনকভাবে মন্তব্য করেছেন. 'পশ্চিম সীমান্ত রাঢ়ের অন্তর্গত পুরুলিয়া জেলায় বাউল সংগীতের প্রচলন খুবই কম। যা ইতস্তত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে তাও প্রতিবেশী জেলা থেকে আমদানী করা।' (পৃষ্ঠা ২৯২) এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। পুরুলিয়ার বহুগ্রামে এখনও বিস্তর বাউলগান শোনা যায়— যা এখানেরই বাউল-পদকর্তাদের রচিত। তা ছাড়া মানভূম-পুরুলিয়ার বহু-লোককবি স্বতঃস্ফূর্ত ভালোবাসায় রচনা করেছেন অনেক উৎকৃষ্ট বাউলগান। পুরুলিয়ার লোকসংগীত টুসু-ঝুমুর-করম-ভাদু প্রভৃতির মতনই বাউলগান এ জেলারই প্রাণের সম্পদ—যা প্রতিবেশী জেলা থেকে আমদানি করা নয়, এ মাটিরই সাংস্কৃতিক ফসল।

পুরুলিয়ার বিখ্যাত সাধক মনোহর খ্যাপা। সোনাথলিতে তাঁর আশ্রম। সেখান বাউল গায়কদের যাতায়াত এখনও আছে। মানভূম-পুরুলিয়ার বহু বাউল উক্ত আখড়ায় ডেরা করেছেন, গেয়েছেন মনের আনন্দে বাউল গান।

ঝালদার হেটজার্গো গ্রামের সাধক সৃষ্টিধর সিংহদেব কাটিয়ার। তাঁর লেখা বাউলগান একদা মানভূম-সিংভূম-হাজারিবাগ-মেদিনীপুর-বীরভূম জেলার বাউলরাও গাইতেন। তিনি নিজেও বাউল গায়ক ছিলেন এবং জয়দেবের কেঁদুলি মেলায় বাউল গান পরিবেশন করেছেন। তাঁর রচিত শতাধিক বাউলগান ক্ষেত্রসমীক্ষায় সংগ্রহ করার সুযোগ হয়েছে। তার থেকে কয়েকটি

গান রসিকজনের কাছে নিবেদন করছি—

এক ॥

ভক্ত ভক্ত মানুষ ভগবান তারে ভজিলে পাবে পরিত্রাণ
মানুষ ভজে সংসার ত্যজে
অকৈতব প্রেম পান॥

মানুষ গেলে মানুষ আসে মানুষ মানুষে মিশে
ধরবি যদি সেই মানুষে
সদ্‌গুরুর কাছে শেখ আত্মজ্ঞান॥

সে মানুষের অতুল শক্তি দিতে পারে গতিমুক্তি
সাধিলে বিশ্বপ্রকৃতি
অষ্টসিদ্ধি হাতে পান

সে মানুষের কী আশ্চর্য দিতে পারে ষড়ৈশ্বর্য
ঐ যে মধুর-মাধুর্য
পরমাত্মা তারে যান॥

ভব মাঝে সর্ব জীবোপরি আনন্দে বিহার করেন অটলবিহারী
সৃষ্টিধর কপটাচারী
মতিগতির নাই ঠিকান।।

দুই ॥

সিংহের দুগ্ধ যে আনিতে পারে মাটির বাসন লিবে না
উত্তম বাসন তৈয়ার করিবে দিয়ে লোহা কি সোনা॥
বোবা বোকা বলছি আমি আমার দোষ ধর না
সৃষ্টিধর বলে আমার কপালে ত্রিবেণী মিলন হল না॥

তিন ॥

সুনির্মল প্রেমধন জানে কেবল রসতত্ত্ব রসিকজন
মণিপুরে রূপ রাখি স্বাধিষ্ঠানে দিয়ে সাক্ষী
সুষুম্নাতে যোগ করে
ঊর্ধ্বে কর আকর্ষণ॥

শৃঙ্গারে করি আশ্রয়   রসিকা নাগরী কয়
বাম মার্গে গিয়ে কর আচরণ।
নয়ে পর কিয়া ধন   ত্যজি পুত্র পরিজন
সৃষ্টি বলে, শুন গুহি এই রাগেরই কারণ॥

পুরুলিয়া মানবাজারের কাছে সিজাড়ি গ্রামে যজ্ঞেশ্বর মাহাত জন্মগ্রহণ করেন। সাধনভজনযোগে তিনি উত্তর জীবনে হন মহন্ত। ক্ষেত্র সমীক্ষায় সংগৃহীত তাঁর লেখা বেশ কিছু বাউল গানেব একটি মাত্র উদ্ধৃত করছি—

বাঁকা নদীর তীরে বসে   মাছ ধরাটি সহজ নয়
শুধু নদীর ঘাটে   রইল বসে
তাই মৎস্যপ্রাপ্তি হয়।

সেই দহের জল বরন কাল
উপরে শেওলাদল
ভাটি যোগ পেলে জল লোহিত হয়।
আছে তার নীচে মণি   শ্বেত বরণী
সেথা মৎস্য আছে জ্যোতির্ময়।

ষোল হাতের বঁড়শি-কাঠি
ছ'হাত রশি বাঁধ আঁটি
তাই রূপ-কেঁচা দিয়ে বাঁধতে হয়।
দহে জল ছাড়া করি,   তার উপরি
টোপে খইল পেতে মাছ ধরতে হয়।

সেই দহের মাছ ধরবে যবে
দশ দণ্ড রাত বাদ করিবে
তাতে ভক্তি চার দিয়ে নীরব হয়।
ভনে যজ্ঞেশ্বর   সাধলে পরে
মৎস্য পেতে পার সুনিশ্চয়॥

মানবাজারের মলিয়ানের রামকানাই মাহাত, যজ্ঞেশ্বর মহন্তের কাছে আধ্যাত্মিক শিক্ষণ-উপদেশ নিয়ে বেশ কিছু বাউল গান রচনা করেছেন। যথা—

মন, তুমি প্রেমের কী জান?
গুরুকৃপা হলে হয়   প্রেমের উদয়
ভুলে পরনিন্দা কর কেন॥

আমি অতি-জানা জগতে কেহ না
গৌরব কেন কর মন।
নিজ অহঙ্কার কেবল অসার
পাপেরে কেন ডেকে আন॥
আগে কর ভাব যদি হয় লাভ
পরেতে ঐ প্রেমধন।
ও তোর কামে অঙ্গভরা হয়ে আত্মহাবা
গুরুবস্তুধনে না-চিন॥

পুঁথিশাস্ত্র ধুয়া শুনে অবাক হওয়া
মিছে মনে ধাঁধা আন।
ভজ মূলাধারে পাবে সহস্রারে
রামকানাই তার কী জানে।

পুরুলিয়ার মলিয়ান গ্রামের দিল্লেশ্বর মাহাত সহজিয়া ভাবনায় অনেক বাউল গান রচনা করেছেন। প্রবন্ধের পরিসর বৃদ্ধির আশঙ্কায় এখানেও একটিমাত্র নিবেদিত হল—

দয়াল গুরু ভক্ত রে ওরে সোনার চাঁদ
গুরু কর সার।
গুরু বিনে ভবসাগর কে করিবে পার।।
হৃদপদ্ম শতদলে আছেন রসরাজ
কনক আসন আছে তাতে — কিবা চমৎকার।
গুরুচক্র, আজ্ঞাচক্র — সর্ব মূলাধার
মূলচক্র হয় হংস — যোগের আধার॥
বিন্দুরূপ পরমাত্মা আছেন সহস্রার
দিল্লেশ্বর কয় সাধনসিদ্ধ — সেই ত সাধ্যের সার॥

সাঁওতালডিহির প্রেমসিড্ডি হেমদাস আনন্দাশ্রমের স্বামী উত্তমানন্দ পরমহংসদেবের পূর্বাশ্রমের নাম রামেশ্বর সিংহ। তাঁর 'ভাব-লহরী' শীর্ষক অনেক বাউলগান ভক্তজনের মুখে-মুখে শোনা যায়। ক্ষেত্র সমীক্ষায় তাঁর একগুচ্ছ বাউলগান সংগৃহীত। তার একটি ঃ

পঞ্চ মাসে এক জন্মেছে যুবতী তার গর্ভে তিন পুত্রের উৎপত্তি
তারা তিনপুরে বাস করে।
সৃজন পালন সৃষ্টি-সংহারণ
চারিযুগে তারা করে হে॥

শুন সাধুজন, ধর এই জ্ঞান তরিতে ভব-সাগরে॥
ছয়পুত্র তার হইল অবশেষে সাধুভাবে তারা নিজঘর নাশে
রূপ রেখ নহি করে॥
তিনপদ ধরি চলে ধীরি ধীরি
অদৃষ্টেতে জীব মরে হে।
জীবের প্রহরী আছে দশজনা আপন পিতারে কখন মানে না
একপদে তারা বিহারে।
আপন ইচ্ছায় কার্যে রত হয়
নয়নে না-হেরি কারে হে॥
শাস্ত্রহীন কথা ঘর কর্তাহীন মাথাহীন দেহ দেখ নাড়িহীন
কোথাও না শোভা করে।
পাঠ ব্যাখ্যাহীন না-হয় শোভন
স্বরজ্ঞানেহীন নর হে॥
নেত্রবাণ রস দিকে যেবা জানে রামের বনবাস বাণে-বাণে গুণে
সাগরদ্বীপ ঘরে।
মূঢ় রামেশ্বর জুড়ি দুই কর
প্রণাম করি তাহারে হে॥

পুরুলিয়ার বাউলগানেও আছে গুরুভক্তিকথা, দেহতত্ত্ব, বৈরাগ্যভাবনা, আত্মদেহে ব্রহ্মাণ্ড দর্শন, বিবিধ সাধন প্রক্রিয়ার রূপক। পুরুলিয়ার আনাই-জামবাদ, ভাংড়া-কড়চা, কাশীপুর, বেগুনকোদর, ঝালদা, পাড়া, হুড়া, মানবাজার, বান্দোয়ান প্রভৃতি নানা অঞ্চলে এখনও বাউলগান-রচয়িতা বা বাউলগায়ক অথবা বাউলসাধক আছেন। তাঁরা বৈষ্ণবপন্থী বাউল বা ভাবুক। তথাকথিত নারীকেন্দ্রিক গুহ্য যৌনাচার— যা বাউল-সাধনের নামে মুর্শিদাবাদ, নদীয়া প্রভৃতি জেলায় অথবা বাংলাদেশের নানা বাউল সম্প্রদায়ের ভেতর এখনও রহস্যময়তায় বিদ্যমান— তার বিকৃতি বাঁকুড়া-পুরুলিয়ায় উগ্রভাবে নেই। এখানের বাউল অধ্যাত্মপ্রিয়, সংসারবিরাগী, ভাবুক হয়েও সমাজ জীবনের প্রিয়জন।

উৎস-সূত্র

১। ড. এস. এম. লুৎফর রহমান, লালন শাহ জীবন ও গান, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা কার্তিক ১৩৯০। পৃষ্ঠা ৮৯-৯০।

২। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ২য় খণ্ড, চৈতন্যযুগ, মডার্ন বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৬২। পৃষ্ঠা ৪০-৪১।

৩। শ্রীম-অনুলিখিত, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৩য় ভাগ, শ্রীম'-এর ঠাকুরবাটী, ১৩৮৯। পৃষ্ঠা ১১২।

৪। ড. শক্তিনাথ ঝা, বস্তুবাদী বাউল, উদ্ভব সমাজ-সংস্কৃতি ও দর্শন, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জানুয়ারি ১৯৯। পৃষ্ঠা ২৭৯।

৫। ড. সুধীর চক্রবর্তী, বাউল ফকির কথা, তদেব, মার্চ ২০০১। পৃষ্ঠা ১৩৭-১৩৮।

৬। শ্রীম-অনুলিখিত, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ২য় ভাগ, তদেব, ১৩৮৯। পৃষ্ঠা ১৪৫।

৭। মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন ঃ 'হারামণি' (২য় খণ্ড), 'আশীর্বাদ' ঃ রবীন্দ্রনাথ। বাংলা একাডেমী, ঢাকা পৌষ ১৩৭৮। পৃষ্ঠা-৩।

৮। শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ (১৩৮০), পৃষ্ঠা ১১৯।

৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পত্রপুট' ১৫নং কবিতা, রবীন্দ্র-রচনাবলী (১৩৯০) পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃষ্ঠা ৩৭২।

১০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মানুষের ধর্ম, রবীন্দ্র-রচনাবলী (১৩৯৮) পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃষ্ঠা ১০২২, ১০৩৪, ১০৪৯।

১১। ড. সুধীর চক্রবর্তী, তদেব, পৃষ্ঠা ১১৭-১১৮।

প্রেম-ডুরিয়া শাড়ি

সৈকত রক্ষিত

শত নারী বাজার ভারি
আমি এই বাজারের ভুল বেপারি
ওরে মন, অরূপ রতন কোথায় পাবি
চল না খুঁজে সেই বাজারে দর করি
ভবে কি বাজারের আকাল
আমার বাজার ঘুরে কেটেছে কাল...

বাউল-অঙ্গের এই গানটি, কোনো একদিন, হঠাৎ করে আমার ভেতরে গুঞ্জন তোলে এবং ছোট্ট একটি ছেঁড়া কাগজে আমি তৎক্ষণাৎ তা লিখে ফেলি। লেখার আগে পর্যন্ত এমন কোনো ভাবনা আমার মনকে সামান্যতমও আচ্ছন্ন করেনি। অথচ লেখার পরে মনে হল, গানটির ভাবময়তা কি অদ্ভুতভাবেই না আমার বৈরাগ্যপ্রবণ, প্রায়-পরিব্রাজক, জীবনের অভিব্যক্তি হয়ে উঠেছে! পরন্তু, অধিকতর সত্য হয়ে উঠেছে এর দ্বিতীয় কলির দ্বিতীয় পংক্তিটি—আমার বাজার ঘুরে কেটেছে কাল...

পুরুলিয়ার হাটের কথা লিখতে গিয়ে এই গানটির সূত্রে বাজারের প্রসঙ্গ এসে গেল। গ্রামে গ্রামে সাপ্তাহিক হাটগুলিই হল সেখানকার বাজার। সেখানকার অর্থনৈতিক জীবনের খণ্ডিত চলচ্ছবি। কত বছর ধরে, কতদিন কতভাবে যে এই হাট আমি দেখে আসছি! বিশ-তিরিশ-চল্লিশ কিলোমিটার সাইকেলে যেতে যেতে, যখন যে-গ্রামে হাট পড়েছে, গাছের গায়ে সাইকেল ঠেসিয়ে একটা চক্কর মেরে চলে গেছি। শুধু চক্কর মারা নয়, হাটুরেদের সঙ্গে কথা বলেছি, তাদের পণ্য হাতে নিয়ে রীতিমতো ক্রেতা সেজে দরাদরি করেছি। আবার পছন্দমতো কোনো গ্রামবাসীকে পেয়ে গেলে তার সঙ্গেই চলে গেছি তার গ্রামে। এভাবেই পাল্টে পাল্টে গেছে আমার যাত্রার অভিমুখও।

যে-কোনো সৃজনশীল মানুষের এই অভিমুখ বদলানোটা জরুরি। পরিবর্তিত পরিস্থিতি থেকে আবার নতুন করে সৃষ্টির উদ্ভব হয়। আমার গল্প ও উপন্যাসগুলিতে, এমনিভাবে, পাঠকদের আমি অভাবিত অপ্রত্যাশিত অভিমুখে নিয়ে যেতে প্রয়াসী হই। তাই হাটের মধ্যে ঢুকেও, কখনো কখনো, 'হট্টগোল' থেকে সরে গিয়ে সমান্তরালভাবে ঘটে চলা ভিন্ন কোনো বিষয়ের ওপরে আলোকপাত করতে চেষ্টা করেছি। দেখাতে চেয়েছি, গ্রামের এইসব হাটগুলো কেবল পণ্যক্ষেত্রই নয়, আপাত-বাণিজ্যের অন্তরালে তা কীভাবে জীবনের সংযোগসূত্র রচনা করে।

জেলাওয়ারি হিসেব থেকে দেখা যায়, শুধু পুরুলিয়া জেলাতেই গ্রামের সংখ্যা সহস্রাধিক। সব গ্রামে তো আর হাট বসে না। তাই এক একটি হাট তার পারিপার্শ্বিক বহু গ্রামের মানুষজনদের মিলনপীঠ হয়ে দাঁড়ায়। এই সব হাটে যেমন আমদানি হয় বিচিত্র সব পণ্য, তেমনি বিচিত্রধারার গ্রামবাসীরও অভাব থাকে না এখানে। ঝুমৈরা, নাচনি, গাঁজাড়ি, জুয়াড়ি, ছিঁচকে চোর থেকে শুরু করে কত ধড়িবাজ পাইকার আর আলাভোলা সরল বিক্রেতা। আবার কোথাও কোথাও দেখা যায়, হাট যখন বেশ জমে উঠেছে, তখন মাথায় ময়ূর পালক গুঁজে, ফেট্টি জড়িয়ে একটা দল হাটের দুপাশাড়ি দোকানের মাঝে জায়গা করে এগিয়ে যাচ্ছে। তাদের কারও হাতে লম্বা মাদল, কারো হাতে পিতলের ঢাউস করতাল। ঝম্ ঝম্! ঝম্ ঝম্! উ-র্-র্-র্-রাহ্! তালে তালে নাচতে নাচতে তারা ধীরগতিতে এগিয়ে চলেছে। দলের কেউ একজন দোকানে দোকানে মাঙন চাইছে— চপ, জিলিপি, পকড়ি, লাড্ডু অথবা আনাজপাতি, পয়সা। এ-দৃশ্য সব হাটে দেখা যায় না। পুজোর ঠিক আগে আগে, কোনো কোনো হাটে, সাঁওতালরা এভাবে একপ্রস্থ 'ভুয়াং' নাচ দেখিয়ে কিছু পার্বনী তুলে নিয়ে যায়। তবে সাঁওতাল গ্রামের কাছাকাছি কোথাও পরব উপলক্ষে মেলা বসলে সেখানেও তারা এভাবে তাদের নাচ আর বাদ্যবাজনা দিয়ে কেনাবেচার ক্ষেত্রটিতে চকিতে মাতন এনে দেয়। তারা যথেচ্ছ হাড়িয়া খেয়ে থাকলেও সংঘবদ্ধ নাচের তালে ভুল হয় না। কেউ কেউ গাছের ডাল কিংবা বাঁশঝাড়ের মাথায় জ্যান্ত ইঁদুর বেঁধে, দড়িতে টান মেরে, সুই সুই করে নাচায়। তাই দেখে হাটুরে মানুষজনের মনে লঘু উচ্ছ্বাস ফুটে ওঠে। এও এক মজা!

তবে হাটে ঘোরার মধ্যে সত্যিকারের মজা পাওয়া যায় তখনি, যখন হাট তার ক্রেতা-বিক্রেতায় পরিপূর্ণ থাকে। এটাই তার সজীবতা। গ্রামের হাটগুলোতে এই সজীবতা সারাবছর দেখতে পাওয়া যায় না। বিশেষ করে পুরুলিয়ার হাটে। এই জেলায় হাজার হাজার একর অকর্ষণযোগ্য পাথুরে-কাঁকুরে 'টাঁড়' জমি পড়ে রয়েছে। এক সময় যা ছিল দিগন্তবিস্তৃত ঘন জঙ্গল, এখন জঙ্গলের সেই ভীতি জাগানো ঘনত্ব নেই। বরং কোথাও কোথাও তা একেবারেই উড়ান হয়ে গেছে। গ্রামবাসীদের তাই মূলত ভরসা করতে হয় বর্ষায় রোয়া ধানের ওপরে। এখন যদিও কোথাও কোথাও অল্পসল্প বোরো ধানের চাষ হচ্ছে এবং যারা ব্যক্তিগত উদ্যোগে সেচের ব্যবস্থা করতে পারে তারা লিরনের দিনেও কিছু সবজি তোলার চেষ্টা করে। সেই সবজি গ্রামের সাপ্তাহিক হাটগুলোতে নিয়ে গিয়ে বসে। তবে আগের তুলনায় বাস-যোগাযোগ ভালো হওয়ায়, ছোট ছোট চাষীরাও আনাজপাতি- সবজি বাসের মাথায় চাপিয়ে আরেকটু সদরের বাজারে পৌঁছে দিতে চেষ্টা করে। তাতে দামে পড়তা হয় ভালো। এমনকি, বাস না পেলে সাইকেল ঠেলেই তারা সদরের অপেক্ষাকৃত জমজমাট বাজারের দিকে এগিয়ে যায়।

বস্তুত, পুরুলিয়ার ভূ-প্রকৃতি, জঙ্গল-নিধন, সারা জেলাতেই গাছপালার স্বল্পতা, বৃষ্টিপাতের অপ্রাচুর্য, কর্ষণযোগ্য ভূমির অভাব তথা চাষীদের একফসলী নির্ভরশীলতা, জলসেচের অব্যবস্থা ইত্যাদি নানাবিধ কারণে এই জেলা খরাপ্রবণ। এর কৃষিজ অর্থনীতি দুর্বল। তাই চাষবাসের ওপর নির্ভরশীল মানুষগুলির জীবনযাপন অত্যন্ত আটপৌরে। বংশানুক্রমিকভাবে এত আকাল, এত দারিদ্র তারা বহন করে আসছে যে, নাগবিক জীবনের বিলাসিতা, এমনকি স্বচ্ছলতা তাদের কল্পনাতীত। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ভাবনাও বাহুল্য মনে হয়। অস্তিত্ব রক্ষার্থে দুবেলা খাদ্যের সংস্থান করতে পারাটাই

তাদের দিনভর খাটাখাটুনির একমাত্র লক্ষ্য। তাই কঠোর বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে তাদের পক্ষে স্বপ্ন দেখাও সম্ভব হয়ে ওঠে না। এই কারণেও এই জেলার মানুষ সময় সম্পর্কে অচেতন, উদ্যোগহীন, ধীরগতি সম্পন্ন এবং কুঁড়েও। খাদ্যাভাব, অনটন, অস্বাচ্ছন্দ্য থেকে শুরু করে যেকোনো রোগ-জ্বালাযন্ত্রণা এবং যাবতীয় প্রতিকূলতাকে তারা গৃহপালিত করে নিয়েছে। পুরুলিয়ার গ্রামে গ্রামে সাপ্তাহিক হাটগুলিতে ঘুরলে এই মানুষগুলির অসম্পন্ন জীবনের করুণ ও বেদনাময় চিত্রটির, কখনো কখনো, আভাস পাওয়া যায়।

চৈত্র থেকে জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত, মোটামুটিভাবে লিরনের এই তিনটি মাস হাটগুলিতে তেমন জাঁক থাকে না। তখন শস্য-সবজির আমদানি থাকে কম, দামও থাকে বেশি। তবে এই সময় হাটে আনাজপাতি বাদে অন্য জিনিসের আমদানি লক্ষ করা যায়। জ্যৈষ্ঠ পড়তে না পড়তে গ্রামবাসীদের চাষের তোড়জোড় লেগে যায়। হাটগুলোতে তাই চাষের সামগ্রীর প্রাধান্য চোখে পড়ে। জায়গায় জায়গায় দরাদরি চলে হাল-কোদাল, বীজ-চারা, হালের ফলা, কীটনাশকের। অন্যদিকে প্রবল উদ্যম নিয়ে কেনাবেচা চলে হাল বা গোরুকাড়া, জোয়াল, গরুর গাড়ির চাকা ইত্যাদি। চাষের সঙ্গে সঙ্গে বর্ষারও সূচনা হয় বলে বাঁশের ছাতা, ঘঙের ছাতা, ঝুড়ি-ঝাঁটা আর চাল ছাওয়ার লরা ও বাঁশবাতা কেনার লোকের ভিড় হাটগুলোতে উপচে পড়ে। যেমন মনসা পূজার সময় সারা হাট জুড়ে মানুষের হইচই-এর মধ্যেও ছাপিয়ে যায় হাঁসের প্যাঁকপেঁকানি আর পাঁঠার ডাক। মরা হাটগুলি যেন বৃষ্টির জল পেয়ে চনমনিয়ে উঠেছে। মানুষের ঠেলাগুঁতায় তা টের পাওয়া যায়।

আসলে, ভিড়ই হল হাটের প্রাণ। হাটের সজীবতা। ভিড়ওলা বড়সড় কোনো হাটে ঢুকলে, কানে আসে শতসহস্র মৌমাছির গুনগুনানির মতো চতুর্দিক থেকে অদ্ভুত একটা লোকধ্বনি, যা এই বাণিজ্যিক পরিমণ্ডল জুড়ে যেন সাংগীতিক মূর্ছনা এনে দেয়। রকমারি কম্পাঙ্কে কয়েকশত মানুষের কথোপকথনে, তাদের হাবে-ভাবে-আচরণে, কোথাও মন্থর আবার কোথাও-বা দ্রুতলয়ে হাটুরে গ্রামবাসীদের হাঁটাচলা, ঠেলাঠেলি, হাঁকডাক, দরাদরি, হাসিঠাট্টা, তারই মধ্যে অদৃশ্য ভিড় থেকে তরঙ্গায়িত হয়ে আসা আড়বাঁশি, কেঁন্দ্রি অথবা ধামসা-মাদলের তালে তালে হাঁইড়া-মহুলা খেয়ে ধুতি লুটিয়ে যাওয়া মদ্যপের আলুথালু নাচ, দর্শনার্থীর উল্লাসমুখর কুলকুলি, গবাদির ডাক, মেঘের গুড়গুড়ানি আর কাগজের ফুল বিক্রেতার হাতে রঙবেরঙের কাগজফুলের ঘূর্ণন—এই সবের উপস্থিতিতে আশ্চর্য একটা ইন্দ্রিয়ানুভূতি হয়। মনে হয় পুরো হাটটি নিজেই ত্রিতালে 'তিলক-কামোদ' রাগে মুখর হয়ে উঠেছে। কৃষিনির্ভর দরিদ্র চাষীদের মনে ফূর্তি আনতে আবাহন করছে নববর্ষাকে—

আয়েরি বরষণ আয়ে
উমগু ঘুমগু চহুঁদেশ মেহ্ ছায়ে
গরজে গরজে ঘন বুঁদন বরষে
অ্যায়সে সমেমে অদারঙ্গ পিয়া নেহি আয়ে...

এ ছবি বর্ষার হাটের। হঠাৎ করে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামলে সে-দৃশ্যও দেখার মতো। মুহূর্তের মধ্যে বগলের ছাতাগুলি মাথার ওপরে ফুটে যায়। মাথা অদৃশ্য হয়ে ছাতাগুলিই চলমান থাকে।

যদিও বৃষ্টি থেকে তারা রেহাই পায় না। ছাতা মাথায় হাটুরেরা পরস্পরকে বৃষ্টির জলে ভিজিয়ে দেয়। কেউ কেউ ছুটে গিয়ে গাছতলে দাঁড়ায়। কেনাবেচা কিন্তু থেমে থাকে না। ভিড়ও থাকে তেমনি। তবে চাষের কাজে নেমে পড়লে হাটগুলোতে গ্রামবাসীদের সেই ভিড় আর দেখা যায় না। তখন তাদের হাতে পয়সাও থাকে না। সংসারেও অভাব।

ঝিমিয়ে পড়া এই হাট ফের জমতে শুরু করে পরব-তিহার উপলক্ষে। পুজোর আগে আগে। তখন পাড়া-দুবড়া-আনাড়া-উদয়পুর থেকে শুরু করে লালপুর-কাশীপুর-পুঞ্চা-মানবাজার-চল্লা-চাকৈলতোড়-তালতল এমনি সব ছোটখাটো হাটও গমগম করতে থাকে। এই সময় মূলত বিক্রি থাকে কালীপুজোর মাটির পুতুল, প্রদীপ, তুলো, পাটকাঠি, কচড়া ও কুসুম তেল আর পিঠে বানানোর মাটির সরার। ক্ষেতের ধান খামারে তুলে এনে ঝাড়াঝাড়ির কাজও এসময় শেষ। গাঁয়ে গাঁয়ে চাষীরা এখন রাস্তায় এমুড়ো-ওমুড়ো 'বড়' পাকায়। মরাই বাঁধে। ঘরে ঘরে এখন তাদের খাবার অভাব থাকে না। কাঁচা পয়সাও থাকে হাতে। বাঁধনা পরবের খুশিতে মন তাদের ফুর্তিতে ডগমগ করতে থাকে। হাটগুলোতেও সেই খুশির প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যায়। হাসি-ঠাট্টা আর ঝলমলে রসিকতায়। এবং হাটের একপাশে জমে ওঠা মোরগ লড়াইয়ে গ্রামবাসীদের মেতে ওঠার মধ্যেও আদারঙ্গের সুরে তখনো কি মনে পড়ে না— অ্যায়সে সমেমে পিয়া নেহি আয়ে?

বাস্তবিক, পিয়া বা প্রেমাস্পদ এমনই এক অনিবার্য আকর্ষণ যে, প্রেমিকমন এখানেও তাকে না ভেবে থাকতে পারে না। তাই খরার সময় চৈতালি ঝুমৈরে যেমন তাকে মনে পড়ে, তেমনি বর্ষার বাদল মেঘেও মনে পড়ে তাকে কাছে পাওয়ার কথা। তাকে যেমন পাহাড়-ডুংরি-জঙ্গল-জনপদে মনে পড়ে, বাটে মনে পড়ে, তেমনি এরকম ভিড়ে ঠেলাঠেলি হাটেও মনে পড়ে যায়। গ্রামের এই হাটগুলিতে তাই কত যে যুগল দেখা যায়, আপাত উদাসীনতায় কত যে প্রেমের লীলাখেলা চলে, কত প্রেমিক হাটের ভিড়-গাদাল থেকে সরে এসে, কাঠের বেঞ্চিতে বসিয়ে তার নোলক-বিঁধা লাজুক প্রেমিকাকে খাওয়ায় লাল টুকটুকে গরম জিলিপি। আর বতর বুঝে বিহায়ও ধরে বিহানের হাত। তাই নিয়ে রচিত হয়ে ঝুমৈরও—

ঝাঁড় গাঁয়ের হাট যাতে
বিহায় ধরিল হাতে
বিহায় ছাড় হাত ছাড় হাত
ঝুড়িঝাঁটা বিকে পেটের ভাত...

শুধু ঝুমৈর গানই নয়, বিভিন্ন ধরনের আঞ্চলিক লোকগানগুলিরও কখনো কখনো উৎস বা প্রেরণা হয়ে দাঁড়ায় এই হাট। কেননা, হাট তো আর কেবল বিকিকিনির ক্ষেত্র নয়। গ্রামীণ মেলাগুলোর মতো, এইসব হাটেও, মুদ্রার বিনিময়ে পণ্য ক্রয়ের পাশাপাশি, আড়ালে-আবডালে, প্রচ্ছন্নভাবে, চোখঠারাঠারি করা, ইশারায় নির্জনে ডাকা, হাতের ওপরে হাত রাখাও চলতে যাকে। চলতে থাকে মনের মানুষের আপাত উদাসীন খোঁজ এবং হৃদয়ের বিনিময়ে হৃদয় দেওয়া-নেওয়া। সমর্পণ। তাই প্রেমিকদের কাছে সাপ্তাহিক হাটগুলো এককেটি যেন পিরিতিনগরও। বড় প্রাণের জিনিস। এই হাট নিয়ে তাদের কত-না প্রেমের পরিকল্পনা, কত মিষ্টি-মধুর রসের ভাবনা—

ছুটু আমের কুহু ভারি
আনা আনা একেক কুড়ি
বড় আম বড় মিঠা লাগে
দিদিলো, ঝালদা বাজারে হাট লাগিল...

কিম্বা মনে পড়ছে প্রচলিত সেই টুসুগীতটি, যাতে হাটে গিয়ে তার ভালোবাসার মানুষটিকে কিনে আনার কথা বলা হয়েছে। তবে হাটের আর পাঁচটা 'সওদা' কেনার মতো, এ জিনিস তো আর নগদ মুদ্রা দিয়ে কিনতে হয় না। যারা মুদ্রা দিয়ে হাল-কোদাল, চারা, কিংবা তিল-তিসি-লাক্ষা, সাবই দড়ি, বাখর ইত্যাদি যা কিনছে কিনুক, প্রেমিকের কাছে তার ভালোবাসার মানুষটিকে কেনার ধাতব মুদ্রা হলো তার প্রগাঢ় প্রেম। আরো অকপট বলেতে গেলে, তা হলো, দেহজ প্রেম। যুবতীর শরীরই হলো তার স্বর্ণমুদ্রা। যা সশব্দে গড়িয়ে না পড়লেও পুরুষের হৃদয় 'টং' করে ওঠে। এই মুদ্রা দিয়েই নিবৃত্তি ঘটে তার আদিম কামনা-বাসনার। সময়-সুযোগে হাটই হলো সেই কাজের নিরাপদ ক্ষেত্র—

চললো সঙতি সবাই—
খেলাই চণ্ডীর হাটে যাব
গায়ের গহনা বিকে দিঁয়ে
প্রেম-ডুরিয়া শাড়ি লিব ...

আহা কি মধুর বচন! প্রেম-ডুরিয়া শাড়ি! কিন্তু আমি কি শুধু অন্যের কথাই বলে যাব? হাটে হাটে আমার ভ্রাম্যমাণ জীবনকে নিয়ে, একটিও কি আমার ব্যক্তিগত শব্দ উচ্চারণ করব না? কখনো ঝালদা, তুলিন, ব্রজপুর, বাঙ্গুলহর, আড়ষা, সিরকবাদ, মাঠারি, আবার কখনো কাটিন, বিষকুদরা, সিন্দরী, বলরামপুর, বরাবাজার, বান্দোয়ান, দুয়ারসিনি, ক্যুচা, সেখান থেকে পাহাড়-জঙ্গল সাইকেল ঠেলে ঠেলে, বৈশাখের প্রবল তাপপ্রবাহ নিয়ে লুকাপানি, ফুলঝের, কাঁশিডাঙা, চঁহ্রা, মহুলবনি, গোলকাটা-ভুররুডাঙ্গা হয়ে, পুরুলিয়া জেলার সীমান্তে ঝাড়খণ্ডের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি কতবার। পৌঁছে গেছি যুগিডি-রাজগ্রামের হাটেও। পুরুলিয়ার অন্যান্য প্রান্তের অন্যান্য হাটগুলোর কথা না হয় আপাতত বাদই দিলাম। এই এত হাটে ঘুরে আমি কি নিছক বিকিকিনিই দেখছি? দেখছি জায়গায় জায়গায় ডাঁই করা কাঁচা তরকারি, ভেলা পাতা, ক্যাঁন্দ পাকা, বস্তা বিছিয়ে ঢেলে চুড়ো করে রাখা পিয়াল-কুসুম আদি তৈলবীজ, দড়ির খাটে সাজিয়ে রাখা 'খয়ের ঢেলা' আর জিলিপি মিঠাই, হাটের গাছতলগুলিতে দাঁড়িয়ে থাকা নিরীহ জোলার কাঁধে পাটখোলা গামছা কিংবা কোনো শবর বা বীরহোড়ের হাতে শন দিয়ে বোনা গবাদির পাখা? কখনো মনের সুপ্ত বাসনা নিয়ে, আমিও কি লাজুক ও অপ্রকট ক্রেতা হয়ে বেচতে চাইনি আমারো কোনো 'প্রেম-ডুরিয়া শাড়ি'? কি জানি, হয়তো-বা এই তাড়না নিয়েই এই পঞ্চাশ বছরেও আমার ভবের হাটে পরিব্রাজনের বিরতি নেই, অবসানও নেই। আর কি আশ্চর্য যে আমার প্রাণশক্তি! দুদণ্ড জিরোতেও চাইনি কখনো। এই নিরবচ্ছিন্ন উদ্যমেরও কারণ বুঝি ওই 'প্রেম-ডুরিয়া-শাড়ি'। তাই কোনো কোনো হাটে, দীনপণ্য নিয়ে বসা বিক্রেতা মেয়েটির পণ্যের দিকে না তাকিয়ে আমি

বিস্ফোরিত নয়নে তার পানেই চেয়ে থেকেছি, নিষ্পলক। এই তো, কিছুদিন আগেও, ভমরাগড়া গ্রামে অবস্থানকালে আমি যখন ক্যুচার হাটে আসি, তখন সেই হাটে সারি সারি 'বাখর' বেচতে বসা আদিবাসী মেয়েগুলির মধ্যে কেন একটি মেয়ের ঝলমলে মুখশ্রী আমি আজও ভুলতে পারছি না? যে আমাকে বলেছিল... থাক। যদি কখনো সহ্‌রাইয়ে কালীপুজোর সময় তার ঘরে যাই, তাহলে তাদের 'টুংগুল! টুংগুল!' বাজনার তালে তালে, তার নাচের মুদ্রা শিখে তারই কোমর জড়িয়ে আমি ধীরলয়ে নাচবো— 'জাটাং জুটুং। জাটাং জুটুং!'

না, ক্যুচার হাটই শেষ কথা নয়। তারপরও আমাকে যেতে হবে আরো অনেক হাটে। এখনো যে আরো কত হাট আমার ঘুরতে বাকি। এই ভাবনা নিয়ে যখন আমি নির্জন জঙ্গলেব ভেতর দিয়ে, নির্বান্ধব সাইকেল চালিয়ে যাই, তখন আমার ভেতর থেকে কেউ যেন উঁকি মেরে প্রশ্ন করে আমাকে—

ও মন, কোন হাটে তুই যাবি
তোর বিহান গেল সন্ধে হলো
শেষ হলো না পাড়ি
হাট ঘুরে তোর মেটল না সাধ
কন হাটে তুই বিকবি পাগল
তোর প্রেম-ডুরিয়া শাড়ি....

অযোধ্যা পাহাড়ে সাঁওতালদের শিকার মেলা

সিরাজুল হক

ঠা-ঠা রোদ্দুর। ঝাঁ-ঝাঁ ঝলা বাতাস। জানান দিচ্ছে যে বৈশাখ এসেছে। ডাঙা-ডিহি-ডহর-ডুংরী বৈশাখের খরা-রোদে জ্বলে-পুড়ে একাকার। উঁচালিনীচালী মাঠ খেত বাদের উপর এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা গাছ-গাছালির সবুজ পোশাক পুড়ছে তো পুড়ছেই।

ধূপ-ধূনো জ্বেলে, শাঁখ বাজিয়ে স্বাগত জানানো হয় নব-বর্ষাকে...এসো হে রুদ্র বৈশাখ.. ।

প্রতিটি বাঙালি গৃহস্থে, যথা সম্ভব এই নিয়ম পালন করা হয়। কিন্তু যতদূর মনে হয়, সাঁওতাল সমাজে এ রকম কিছু নিয়ম চালু নেই। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে পাতা-ঝরার পর যখন শাল গাছে ফুল হয়, শুরু হয় বসন্তের ফুরফুরে হাওয়া, তখন তাদের শুরু হয় 'বাহা' পরব। তারপর এই বৈশাখ। এই মাসের পূর্ণিমাতে হয় বিখ্যাত 'অযোধ্যা পাহাড়ের শিকার মেলা'।

বৈশাখী-পূর্ণিমার দিন এক ঐতিহাসিক শিকার মেলা অনুষ্ঠিত হয় পুরুলিয়ার অযোধ্য পাহাড়ে। কখন থেকে কীভাবে এই মেলা শুরু হয়েছে তার কোনো পাথুরে প্রমাণ আমার জানা নেই। তবে এখনো সঠিক তথ্যের অনুসন্ধান প্রয়োজন। এই মেলাকে 'মেলা' বলা হলেও, মহিলাদের প্রবেশ নিষেধ। এক নারী-বিহীন মেলা যা আমাদের অবাক করে দেয়। এটা শিকারিদের মেলা—তাই শিকারীরাই যেতে পারেন—কোন মহিলা নয়।

এখানে আরও একটা কথা আছে। এই মেলাকে "দিসুম সেন্দ্রার মেলা" বা "যৌবন-মেলাও" বলা হয়। এই মেলায় ছেলেরা সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয় এবং তাদের মধ্যে কিছু আদিরসের চেতনা জাগাবার ব্যবস্থা থাকে। অনেকের মত এই দিনটি আদিবাসী যুবক বা কিশোরদের যৌবন দীক্ষার দিন জীবনের আদিমতম বর্ণপরিচয়। তাই এই মেলায় মহিলাদের যাওয়া নিষেধ।

পুরুলিয়া শহর থেকে অযোধ্যা পাহাড়ে যাবার জন্য মিনিবাসও পাওয়া যায়। আবার চক্রধরপুর রেলপথে উরমা রেল স্টেশন থেকেও যাওয়া যায়। তাছাড়া সিরকাবাদ দিয়েও যাওয়া যায়।

"...মাদল বাজে বুকের মাঝে
সুরগুঞ্জা ফুটে লালে লাল..."

আখ-বাদা, সুরগুঞ্জা আর মোরগ-ঝুঁটির ক্ষেত পেরিয়ে ছোট নদী-বান্দু। চলতি ভাষায় জোড়। তারপর 'আটিলকোচা' অর্থাৎ বনের কোণ। একটু উপরে উঠলেই—রাণী লপাং মানে পাথরের গুহা। প্রকৃতির সৃষ্টি একটি পাথরের সেতু। তারপর বেবাগ পলাশ—জঙ্গল—মাঠাবুরু। এই অঞ্চলটাকে 'পলাশের রাজধানী' বলা হয়। পলাশের মাসে মনে হয়—জঙ্গলের মাথায় যেন আগুন লেগেছে—একেবারে লাল। শোনা যায়, এখানে নাকি আগে 'নরবলি' হত—এখন পায়রা বলি হয়।

এইসব বন-বাদাড় পার হলে, কপাল যদি সায় দেয়, হয়ত দেখা পেতেও পারেন কিছু "অরণ্য কন্যার"। হয়ত বৈশাখের মরা নদীতে বা জোড়ে চুনো-মাছ ধরছে। অথবা জঙ্গলে পাতা তুলছে কিংবা দাতন ভাঙছে—যা 'হপ্তার হাটে' বিক্রি করবে। পলিথিন মসৃণতা, আবলুস্-শরীর—খাঁজে খাঁজে, ভাঁজে-ভাঁজে চলনে-বলনে মাদকের ছন্দ! দু-চার কলি গান বাতাসে উড়ে আসে। দূর থেকে আড়-বাঁশির সুর নাকাল করে ছাড়ে। এই দেড় ফুটের আড় বাঁশির টিটকিরি মনকে পাগল করে ছাড়ে। সহজ-সরল সাদা-মাঠা আটপৌরে অরণ্যচারী মানুষ—যাদের নাচ-গান অনায়াসে সবাইকে আকৃষ্ট করে—এ যেন এক উপরি পাওনা।

"...মাদল বাজে—বাজে বুকের মাঝে লো
মন লাগেনা কাজে—আর মন লাগেনা কাজে..."

ডিম-ডিম্ করে সাঁওতাল পল্লীতে মাদল বেজে উঠলেই—"মন সে আমার কেমন কেমন করে"—সত্যিই আর কোনো কাজে মন লাগে না। মন উদাস হয়ে বুকের ভেতর উথাল-পাথাল শুরু হয়। বছর ঘুরে নির্দিষ্ট দিনটি এসে গেল যে—বৈশাখী-পূর্ণিমা!

কয়েকদিন আগে থেকেই সাজসাজ রব পড়ে যায়। শিকারে যাবার জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়। মর্চে পড়া অস্ত্র-শস্ত্র, বল্লম, টাঙ্গি, ভালা, তীর-ধনুক শান দেওয়া শুরু হয়। ভুট্টা-যব-গম ইত্যাদির ছাতু তৈরি করে দেয় মা-বোনেরা। রাস্তার জল খাবার। রান্নার জন্য চাল-ডাল গামছায় বেঁধে দেয়। তখন বুকের ভাষাটা গান হয়ে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে—

"...কৈলাস বজা কুনামীরে অসেদিয়া সেঁদ্রা
রসিক কনে সেঁদ্রা হরি আনায় মানাঞ্চা কাহু
চোড়য় রা লেখান বহ সিঁদূর, আবুর মেঃ
কইলী চেঁড়স রাঃ লেখান্ কয় হরিএঃ মেঃ .."

(কৈলাস পূর্ণিমাতে অযোধ্যা পাহাড়ে শিকার। হে স্ত্রী, শিকারে, যেতে আমায় বাধা দিও না। কাক ডাকলে মাথার সিঁদুর মুছে ফেলবে আর কোকিল ডাকলে আমার জন্য অপেক্ষা করবে)

বৈশাখী-পূর্ণিমার আগের দিন দলেদলে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষেরা এসে পাহাড়ের পাদদেশে এসে জমা হয়। এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম ও খাওয়ার পাট চুকিয়ে, বিকেলের দিকে পাহাড়ের উপরে ওঠা শুরু হয়। উপরে উঠবার পর—কোন একটা বিশেষ জায়গায় 'আড্ডা'। এক-এক গোষ্ঠী বা দলের এক-একটা আখড়া থাকে। পুরুলিয়া ছাড়াও বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, রাঁচি, হাজারিবাগ, সিংভূম, এবং ছোটনাগপুর অঞ্চলের প্রচুর শিকারী আসেন। লোকে থৈ থৈ-জনঅরণ্য!

...টা-টা-টা...টাঙ্গিন্ টা...

প্রস্তুতি বাজনা বেজে ওঠে। সবাই শিকারে বেরুবার জন্য প্রস্তুত হয়। এখন যেন সবাই রণ-সজ্জায় সজ্জিত!

...গড়দু গাদুং---গাড়দু গাদুং...

লাগড়া-ধামসা বাঁশি মরিন্দার শব্দে পাহাড় কাঁপতে থাকে। উত্তাল করে তোলে নিস্তব্ধ---চিরমৌন পাহাড়কে। পশু-পাখী ভয়ে দিক-বিদিক ছুটা-ছুটি আরম্ভ করে দেয়। শিকারীরা ক্রমশ এগিয়ে যায়। শিকার চলতে থাকে পুরোদমে।

শিকারচলাকালীন কোন শিকারি ভয়ে পিছু পা হতে পারবে না বা প্রাণভয়ে পালিয়ে আসতে পারবে না—এটা নিয়ম। ভয়ে পালিয়ে এলে মর্যাদা থাকল কোথায়? বীরের মতো লড়ে যেতে

হবে। বিপুল উদ্দম আর অফুরন্ত প্রেরণায় মনোবল বেড়ে যায়। কেউ পিছু-পা হয় না এবং জয়ীও হন।

কেবলমাত্র অরণ্য-আদিম-উন্মত্ততা নয়। এতে আছে এক অফুরন্ত আনন্দ। আর জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাস থেকে খেত-খামারে চাষের কাজে নামবার আগে, শরীরের আলসেমি কাটিয়ে তরতাজা করবার এক বিশেষ পদ্ধতি। সেই দুর্বার আকর্ষণে দাঁতাল বন ও শুয়োরের সাথে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পাঞ্জা লড়ে। এটা কি এমনি এমনি? কিছু একটা আছে।

বয়স্ক অথচ মনে-প্রাণে তরুণ কিছু অভিজ্ঞ মানুষেরা শিকারের নানাপ্রকার কৌশল শিখিয়ে দেন। বুঝিয়ে দেন যৌবনের মাদকতা, দীক্ষা ও আদিমতা। এই শিকার উৎসবে জয়ী হয়ে না ফিরলে কেউ তাকে পাত্তা দেবে না। সবাই কাপুরুষ বলবে। আর জয়ী হয়ে ফিরলে সকলের কাছ থেকে এক বিশেষ সম্মান পাবে।

দিনভোর শিকার চলে। হরিণ-খরগোস-বনশুয়োর, পশু-পাখি যা সামনে পায় শিকার করে। সন্ধ্যের মুখে শিকার শেষ করে। সবাই নিজ-নিজ আড্ডায় ফিরে আসে। তারপর রান্নার পালা শুরু হয়—রাত্রের খাবার। ঘর থেকে নিয়ে আসা চাল-ডাল সেই সঙ্গে শিকারের মাংস রান্না করা হয়। সুগন্ধে ম-ম করে সারা পাহাড়। মাংস আর হাঁড়িয়ার সংস্পর্শে এসে সকলে তখন যেন এক ভিন্ন জগতের বাসিন্দা হয়ে যায়। চিরমৌন পাহাড়— নিশ্চুপ বনস্থলী যেন ফিরে পায় অরণ্য—অধিকার। শয়ে-শয়ে মশাল জ্বলে ওঠে—মশালের আলোয় পাহাড় তখন লালে-লাল। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ! হাসছে হা-হা! জ্যোৎস্নার গুঁড়ো মেখে জঙ্গল-পাহাড়-মানুষ সবাই যেন বুঁদ।

এখানে একটা 'পাথর-চাটান' আছে নাম 'সীতা-চাটান'। এখানে পায়ের ছাপের মতো দেখা যায় বলে সীতা দেবীর পায়ের ছাপ। আদি যুগে এখানে রাম-লক্ষণ ও সীতা দেবী নাকি এসেছিলেন—এটাই সেই 'সীতাদেবীর পায়ের ছাপ। এখানে একটি কুয়ো আছে—কে কখন খনন করেছিলেন জানা নেই। নাম—সীতাকুণ্ড। তাছাড়াও 'বামনী' ও 'টুর্গা' নামের দুটি ঝরণা আছে। চলতি কথায়—'ভুড়ভুড়ি' বা 'দাঁড়ি' অর্থাৎ মাটি থেকে আপনা-আপনি ভুরভুর করে জল বার হয়। এই জল থেকেই হাজার হাজার মানুষের জলের চাহিদা মিটানো হয়।

ভাবতে অবাক লাগে, সমগ্র পুরুলিয়া জেলা বৈশাখের খরায় যখন জ্বলতে থাকে, সেখানে পাহাড়ের ওপর স্বাভাবিক ভাবে সহজলভ্য জলের প্রাচুর্য কি করে হয়?

এখানের গাছের ডালে এক প্রকার চুলের মতো দেখতে পাওয়া যায়—অনেকে বলেন—ও সীতাদেবীর চুল।

সীতাচাটানের কাছাকাছি প্রত্যেক দলের আখড়া বসে। নিজ নিজ আখড়ায় নাচ-গান-নাটক ইত্যাদি হয়। এইসবের প্রতিযোগিতাও হয় এবং সেইখানেই যোগ্যতা বিচার হয়।

সামাজিক আচার-বিচার, সমাজ উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়েও আলোচনা হয় এবং অনেকে নিজ নিজ বক্তব্য রাখেন।

এই উপলক্ষে যে সমস্ত গান গাওয়া হয় তার অধিকাংশই প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন-বিরহ-বিচ্ছেদ ও সুখ-দঃখের ব্যথা-বেদনায় ভরা। যেমন—

"...গাতিএঞ্চ আলোদিয়া সেঁদর রাতেয়—
চয়লাও অকান—
সেঁদয়ারেয় শিকার অচয়েন
গাতিএঞ জলাও একান—

লিলগে ধুঁয়া আটাংঅ—
গাতিঞ মিনায় গেয়ারে...”

(হে প্রিয়বর! তুমি অযোধ্যায় শিকারে গিয়াছ। যেখানে গিয়ে নিজেই শিকার হয়ে গেল। তোমার শব-দাহের নীল ধোঁয়া আকাশে উড়ছে। তবুও আমার বিশ্বাস তুমি রয়েছে। নিশ্চই ফিরে আসবে—মিলন আমাদের হবেই)

এখানে মোরগ্ বলিদান দিয়ে পুজো করা হয়। উদ্দেশ্য বনদেবীকে সন্তুষ্ট করা। শিকারের সময় যেন কোন বাধা-বিঘ্ন-বিপদ বা অঘটন না ঘটে। পুজোর পুরোহিতের উপাধি—'দিহরী'।

পূর্ণিমার থৈ-থৈ জ্যোৎস্নায় রাতভোর নাচ-গান-বাজনার পর সকালের দিকে ঘরে ফেরার পালা শুরু হয়। পাহাড়ের ওপর থেকে সব শিকারীরা নীচে নামতে থাকে। সঙ্গে থাকে শিকার করা কিছু মাংস, ভালো ভালো গাছের ডাল এবং চাঁপা ফুল। প্রায় সবাই চাঁপা ফুল নেয়।

এদিকে প্রত্যেক শিকারিদের ঘরে মা-বোন-স্ত্রী দিন গুনতে থাকে। পুরুষ মানুষেরা শিকারে যাওয়ার দিন থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত তারা জামা-কাপড় কাচে না, মাথায় চিরুনী দেয় না এবং সিদুঁর পর্যন্ত পরে না। এই কয়েকদিন বেশ নিয়মের মধ্যে থাকে। অনিয়ম করলে কোনো বিপদ ঘটতে পারে—এই আশঙ্কা থাকে।

বাড়িতে আসা মাত্র ঘরের সকলে শিকারিকে স্বাগত জানায়। ঘটি করে জল নিয়ে থালার উপর পা-ধোয়ায়। আঁচল পেতে চাঁপাফুল গ্রহণ করে এবং গোয়াল ঘরে অথবা কোনো পবিত্র স্থানে সযত্নে রেখে দেয়।

ঘরে এসে সংবাদ আদান প্রদানের পর শিকারিরা স্থান সেরে এসে, দেবতাদের উদ্দেশ্যে রাখা 'হাঁড়িয়া', দেবতাকে 'চড়ায়' (সম্প্রদান) করে। তারপর আহারাদি গ্রহণ করে।

মায়েরা ফিরে পায় হারানো মাণিক—স্ত্রী ফিরে পায় হাতের নোওয়া—মাথার সিদুঁর। দুচোখে বইতে থাকে আনন্দধারা—বুকের ভেতর ঝড়—শরীরময় শিরশির করা এক অজানা সুখের প্লাবন।

সরকারি আইন অনুসারে পশু শিকার করা নিষেধ। তাছাড়া, এই বৈশাখী-পূর্ণিমার দিনে বিশ্ববন্দিত অহিংস ধর্মের প্রচারক বুদ্ধদেবের জন্মদিন। কাজেই ওইদিন প্রাণীহত্যা নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। কিন্তু সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া বন্ধ হওয়া সম্ভব নয়।

আজকাল 'জেলা কল্যাণ' বিভাগের পক্ষ থেকেও উন্নয়নমূলক বহু বার্তা সেখানে প্রচার করা হয়। হঠাৎ কোনো অঘটন যেন না ঘটে। সেজন্য পুলিশি ব্যবস্থাও থাকে।

সাঁওতাল সমাজে একটা প্রথা আছে, পুরুষ মানুষদের কমপক্ষে একবার এই শিকার উৎসবে অংশগ্রহণ করতে হবেই। এবং মেয়েদের একবার চাকলতোড়ের ছাতা-মেলায়, যেতে হবেই। তাই প্রায় সকলেই কমপক্ষে একবার যায়। কিন্তু আমার মনে হয়, কোন নিয়ম না থাকলেও, শহুরে কৃত্রিমতার পাঁচিল টপ্‌কে আমাদেরও একবার যাওয়া উচিত। ধামসা মাদল-নাগড়ার বুকের ভাষা শোনা দরকার। প্রকৃতির সন্তানদের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে একটা অকৃত্রিম সত্তার সঙ্গে পরিচয় করলে ক্ষতি কী?

পুরুলিয়ার গ্রাম-সমাজে ডাইনি

শ্যামল কুমার মণ্ডল

এক হাতে সদ্যকাটা এক মহিলার মুন্ড। আর এক হাতে রক্তাক্ত অস্ত্র কাটারি। হাতে ধরা কাটা মুন্ড থেকে টপ্ টপ্ করে রক্ত ঝরছে আর হন্ হন্ করে থানার দিকে এগিয়ে চলেছে ঘাতক দুর্গাচরণ মান্ডি। ঘটনাটি পুরুলিয়া জেলার বলরামপুর থানার ছোলাগোড়া গ্রামের ৩ জুন ২০০৩ সকালের।[১]

ছোলাগোড়া গ্রামের চল্লিশ বছর বয়সি দুর্গাচরণ মান্ডির চার ছেলেমেয়ে বেশ কিছুদিন ধরে অসুখে ভুগছিল। ডাইনি আতঙ্কে ভীত সমাজের সাধারণ মানুষ হিসেবে দুর্গাচরণ ছেলেমেয়েদের অসুখের কারণ খুঁজেছে ডাইনি ও তার অশুভ নজরের মধ্যে। তাই অসুখ থেকে সন্তানদের বাঁচার উপায় জানতে 'সখা'-র শরণাপন্ন হয়েছে। 'সখা'—যিনি এলাকায় সখা-মা নামে পরিচিত সেই পানু গোপ অসুখের কারণ হিসেবে ডাইনিকে চিহ্নিত করেছেন। এই ডাইনি চিহ্নিত হলেন দুর্গাচরণের সম্পর্কে কাকিমা ৫৫ বছর বয়সি পানমণি মান্ডি। সন্তানদের সুস্থ করা ও অসুখের কারণ নির্মূল করার জন্য দুর্গাচরণ ডাইনি সন্দেহে কাকিমা পানমণির মুন্ড দেহ থেকে ছিন্ন করল। ডাইনি সন্দেহে হত্যার আবার এক ভয়ংকর মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল পুরুলিয়ায়।

সাঁওতাল সমাজের মধ্যে ডাইনি বিশ্বাস অত্যধিক প্রবল। পুরুলিয়ার অন্য জাতি অধ্যুষিত গ্রামেও ডাইনি সম্পর্কে বিশ্বাস পরিলক্ষিত হয়। ডাইনি বিশ্বাস পুরুলিয়ার গ্রাম-সমাজের সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তবে এর মাত্রা কোথাও বেশি কোথাও কম।

ডাইনি আতঙ্ক, ওঝা-সখা-জানগুরু বা গুণীদের (গুণিন) বিধানে অকুণ্ঠ বিশ্বাসের ফলে ডাইনি সন্দেহে হত্যা গ্রাম-সমাজের একটি জ্বলন্ত সমস্যা। ডাইনি ও গুণী সমস্যা গ্রাম সমাজের সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কোথাও ডাইনি সন্দেহে খুন করা হচ্ছে, কোথাও ডাইনি আখ্যা নিয়ে ভয়ংকর অমানবিক-সামাজিক সংকটের মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে বহু পরিবারকে।

ডাইনি শব্দটি সংস্কৃত ডাকিনী শব্দ থেকে এসেছে। (সং. ডাকিনি > ডাইনি) ডান কথ্যভাষা। ডাক শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ ডাকিনী। ডাইনির আভিধানিক অর্থ হল, যে স্ত্রীলোক যাদু বিদ্যাবলে দৃষ্টিমাত্র শিশুর অনিষ্ট করে (Witch)।[২] ডাকিনী, ডাইনি, ডাইন, ডান হল সমার্থক শব্দ। এদের বক্সা-বক্সীও বলা হয়।

তান্ত্রিকগ্রন্থে ডাকিনী, লাকিনী, কাকিনী, শাকিনী, হাকিনী, যোগিনী প্রভৃতির উল্লেখ আছে। এরা সবাই তান্ত্রিক দেবীর অনুচর। এরা শক্তিদেহ থেকে উৎপন্ন। অনেকে বলেন ডাকিনী, শাকিনী প্রভৃতিরা তিব্বত থেকে আমদানি হয়েছে।

ডাকিনিকে সংহার শক্তির অংশ বলেও কল্পনা করা হয়। ডাকিনি বা ডাইনি হল শক্তিরূপিণী মহাদেবীর গণ বিশেষ। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রশাস্ত্রে ডাকিনী শক্তিদেবীর এক বিশিষ্ট যোগিনী সহচরী। ডাকিনীর বর্ণনায় আছে—

"ডাকিনি সর্পবদনা বিত্তজা জ্বলনপ্রভা।

কমণ্ডলুং কর্তৃকাঞ্চ ধারয়ন্তী বরপ্রদা ।।" কুলার্ণবতন্ত্র ১০/১৩৮

ডাকিনী সর্পবদনা ধনসম্পদ থেকে জাতা, অগ্নিপ্রভাবিশিষ্টা কমন্ডলু এবং কর্তৃকা (কাটারি) ধারিণী বরদাত্রী।[৩] ডাকিনি শক্তিকে মানুষের ভয় অতি প্রাচীন।

গুপ্তযুগের গঙ্গাধার শিলালেখতে মাতৃকা মন্দির প্রসঙ্গে বলা হয়েছে— "......... গতমিদং ডাকিনী সম্প্রকীর্ণাং বেশ্মত্যুগ্রং নৃপতি সচিবোহকারয়ৎ পুণ্যহেতো ঃ "

—মন্দির ডাকিনী পরিপূর্ণ ছিল, যারা আনন্দে উচ্চ ও ভয়ংকর কলরব করত।[৪]

চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে উল্লেখ আছে —

"ডাকিনী শাকিনী হৈতে শঙ্কা উপজিল চিতে

ডরে নাম থুইল নিমাই।"

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ব্যবহার করেছেন—

"...ডাইনের হাতে ছেলে সঁপা।"

অনেকের বিশ্বাস ডাইনিরা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী এবং তারা নানা ভাবে সমাজের অমঙ্গ ল করে থাকে।

ডাইনি প্রথা কী ভাবে সৃষ্টি হল-এ সম্পর্কে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। সাঁওতাল সমাজের একটি প্রচলিত গল্প হল :

স্বামী-স্ত্রী ও দুই ছেলে-মেয়ে নিয়ে একটি ছোট সাঁওতাল পরিবার। বাড়ির কর্তা তাদের আরাধ্যদেবতা আব্গে বোঙ্গার পুজো দেবার জন্য একটি মোরগ রেখেছিল। আব্গে বোঙ্গার প্রসাদ নারীদের খাওয়া নিষিদ্ধ। এদিকে পোষা মোরগটির প্রতি মেয়েটির খুব লোভ ছিল। এক রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়েছে তখন বাড়ির কর্তা তার ছেলেকে ঘুম থেকে তুলে দু-জনে মিলে আব্গে বোঙ্গার পুজো করতে গেল। পুজোয় সেই মোরগটিকে বলি দেওয়া হল এবং তার মাংস রান্না করে দু-জনে খেল, কিন্তু সব মাংস শেষ করতে পাবল না। তখন অবশিষ্ট মাংস উনুনের মধ্যে ঢুকিয়ে উনুন ভেঙ্গে মাটি চাপা দিয়ে দিল। সকালে তার বাবা কাজ করতে চলে গেছে। মেয়েটি ঘুম থেকে উঠে মোরগের খোঁজ করতে লাগল, তখন তার ভাই তাকে সব কথা খুলে বলল এবং প্রমাণ দেবার জন্যে সেই উনুন খুঁড়ে অবশিষ্ট মোরগের মাংস দেখাল। মোরগের মাংস দেখে মেয়েটি লোভ সামলাতে না পেরে ঐ মাংসই খেয়ে নিল।

আব্গে বোঙ্গার পুজোর নিষিদ্ধ মাংস খাওয়াতে মেয়েটির প্রতি বোঙার খুব রাগ হল এবং মেয়েটির উপর ভর করল। মেয়েটি তখন মোরগ মাংসের জন্য বাড়ির সবাইকে অতিষ্ঠ করে তুলল। সারা দিনরাত মেয়ের চিৎকারে অতিষ্ঠ হয়ে তার মা মাঝ রাতে আত্মহত্যা করার জন্য বাড়ির বাইরে চলে গেল। পথে বোঙ্গা তাকে জিজ্ঞাসা করল —'এত রাতে তুমি কোথায় যাচ্ছ?

তার মা বলল—আত্মহত্যা করতে। তার মা বোঙ্গাকে সব কথা বিস্তারিত ভাবে বলল। সব কথা শুনে বোঙ্গা বলল মেয়েকে মাংস রান্না করে দাও, মেয়েকে মাংস দিলেই মোরগের মাংস মনে করে খাবে।

তার মা বলল—এত রাতে মাংস পাব কোথায় ?

বোঙ্গা বলল —তোমার ঘুমন্ত স্বামীর নিতম্ব থেকে মাংস কেটে রান্না করে মেয়েকে খাওয়াও, তোমার স্বামী তাতে মারাও যাবে না, জানতেও পারবে না। কাটা জায়গা আবার এমনভাবে জুড়ে যাবে যে কিছু বুঝতেই পারবে না। বোঙ্গা আরো বলল "আমাকে যখনই স্মরণ করবে আমি তখন হাজির হব"।

মেয়ের মা বাড়ি ফিরে বোঙ্গার নির্দেশমত ঘুমন্ত স্বামীর মাংস কেটে রান্না করে মেয়েকে খাওয়াল। মেয়ে তারিয়ে তারিয়ে মাংস খেল। কিছুই জানতে পারল না তার বাবা। তখন থেকে মা আর মেয়ে মিলে অনেকের মাংস খেতে লাগল—এইভাবে সৃষ্টি হল ডাইনির।[৫]

প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী ডাইনির কাছে শিক্ষা নিয়ে নতুন ডাইনি সৃষ্টি হতে পারে। ডাইনি বিদ্যা শিখলে তাকে কিছু নিয়মকানুন পালন করতে হয়। বিশেষত অমাবস্যা, শনিবার, রবিবার বা বিশেষ বিশেষ ক্ষণে রাত্রিতে ডাইনিরা একসঙ্গে মিলিত হয়। এদের মিলিত হবার জায়গা হল শ্মশান, চৌ-রাস্তার মোড়, পাহাড়, মাঠ বা গাছের তলা। এরা প্রদীপ নিয়ে বাড়ির বাইরে যায়। উলঙ্গ হয়ে নাচে। ডাইনিদের আরাধানায় অপদেবতা জেগে ওঠে। অপদেবতাকে বশ করে ডাইনিরা সমাজের অমঙ্গল করে, আর তাদের ডাইনি বিদ্যায় সিদ্ধিলাভ হয়।

ডাইনিরা মাঝে মাঝে মিলিত হয়ে ঠিক করে এবার কাকে মারা হবে। শিক্ষানবিশ ডাইনিরা মানুষ, জীবজন্তু বা গাছ মেরে শক্তি পরীক্ষা করে। পরীক্ষায় সফল হলে তারা দক্ষ ডাইনিতে পরিণত হয়।

ডাইনিরা রাতে বাড়ির বাইরে গেলেও বাড়ির লোক টের পায় না। কারণ ডাইনিরা বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় তার বিছানায় একটি মুড়ো ঝাঁটা রেখে দেয় যা ডাইনির অবর্তমানে তার রূপ ধারণ করে শুয়ে থাকে।

ডাইনিরা নানা ভাবে মানুষের ক্ষতি করতে পারে। বিড়ালের রূপ ধরে তারা বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ায়। অনেকের বিশ্বাস ডাইনিদের কু-প্রভাবে জ্বর, পাতলা পায়খানা, নানান অসুখ-বিসুখ, স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া, শাশুড়ি-বৌয়ের ঝগড়া, গাছ মরে যাওয়া, গৃহপালিত পশু-পাখির মৃত্যু, ফসল হানি ইত্যাদি হতে পারে।

অনেক 'গুণী' বা জানগুরুরা বলেন শুধু মেয়েরাই ডাইনি হয়। আবার অনেকে বলেন পুরুষরাও ডাইন হতে পারে। তবে পুরুষের তুলনায় মহিলারা অনেক বেশি সংখ্যায় ডাইনি সাব্যস্ত হয়েছে।

১ জুন ২০০৩ পুরুলিয়ার খন্নাডি গ্রামের ত্রিলোচন বাউরির অসুস্থতার কারণ জানার জন্য পাড়া থেকে ওঝা মাগারাম বাউরিকে আনা হয়। ওঝা মাগারাম বাউরি এর বিধান দেন ডাইন রবি বাউরিকে গয়ায় নিয়ে গিয়ে মুন্ডন করাতে হবে। এর জন্য ওঝা মাগারাম বাউরি দক্ষিণা বাবদ ৭,০০০ (সাত হাজার) টাকা পেন। রবি বাউরির পুত্র আদিত্য গ্রামের কয়েকজন লোকসহ গয়ায় গিয়ে পিতার মস্তক মুন্ডন করিয়ে আনতে বাধ্য হয়।[৬]

ডাইনি সন্দেহে সতীদাহের মত নারীনিধন আজও অব্যাহত। কেন ডাইনিকে শাস্তি দেওয়া বা হত্যা করা হয়—এর উত্তরে ওঝারা বলেন—অনেক সময় কোন অপদেবতা কোন মানুষের উপর ভর করে ক্ষতি করে। আবার কখনো কোন ডাইনি কোন মানুষের উপর ভর করে ক্ষতি করতে পারে। অপদেবতা কাউকে মাধ্যম করে তার কুমতলব চরিতার্থ করে। এই মাধ্যমকে অপবিত্র করতে পারলে অপদেবতা বা ডাইনি তাকে ছেড়ে চলে যায়। এইজন্য ডাইনি ভর করা ব্যক্তিকে শুয়োরের বিষ্ঠা নাকে শোঁকানো হয়, খাওয়ানও হয়। ঘর বন্ধ করে লঙ্কা পোড়ার ধোঁয়া দেওয়া হয়, চামড়ার জুতো শোঁকানো হয়। লোকের বিশ্বাস এইসব করে মাধ্যমকে অপবিত্র করলে

ডাইনি বা অপদেবতার প্রভাব কাটানো যায়। অনেক সময় ডাইনি ভর করা ব্যক্তিকে জুতো, ঝাঁটা, মাদাল ডাল দিয়ে চাবকানো হয় এবং গালাগালিও দেওয়া হয়।

আবার অনেক ওঝার মত হল, ডাইনি যতদিন বেঁচে থাকে, তার বিদ্যাও ততদিন থাকে, এই বিশ্বাসই ডাইনি হত্যার ইন্ধন জোগায়। মন্ত্র জোরে বা তুকতাক্ করে ডাইনি তাড়াতে না পারলে সন্দিগ্ধ ডাইনিকে হত্যা করা বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে প্রযুক্ত হয়।

ডাইনি বিশ্বাসী সমাজে ওঝা

গ্রামীণ সমাজব্যবস্থায় যেমন ডাইনি বিশ্বাস আছে, তেমনি আছে ওঝা-সখা-জানগুরুর প্রতি বিশ্বাস। ওঝা-সখা-জানগুরুদের আবার 'গুণী'ও বলা হয়। ডাইনি সম্পর্কে যাদের যতটা বিশ্বাস, গুণীদের সম্পর্কে তাদের ততটাই বিশ্বাস থাকে। গুনীদের কাজ হল—ডাইনি ছাড়ানো, ভূত তাড়ানো, গা-বাঁধা, গা-ঝাড়া, নুনপড়া, জল-পড়া, খড়ি দেখা, তেলপাত দেখা ইত্যাদি। ডাইনি বিশ্বাসী সমাজে এরা দেবতুল্য সম্মান পেয়ে থাকেন।

ওঝা—এদের অবস্থান গ্রাম-সমাজেই। সমাজের সাধারণ মানুষের মতো ওঝাও একজন। তবে তিনি কী করে ওঝা বনে যান বলা শক্ত। একজন চালাক ব্যক্তি ইচ্ছা করলে ওঝা হতে পারে। আবার ওঝার বিদ্যা তার ছেলেমেয়ে বা অন্য কেউ আয়ত্ত করে ওঝা হতে পারে। একটু তুক-তাক মন্ত্র-টন্ত্র জানলেই ওঝা হওয়া যায়।

সখা ও জানগুরু—ওঝার উপরের স্তর সখা এবং সখার উপরের স্তর জানগুরু বলে অনেকে বলেন। ওঝার চেয়ে সখা-জানগুরুর চার্জ বেশি।

এরা সমাজেরই সাধারণ মানুষ। এদের শিক্ষাগুরু থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। একজন সাধারণ লোক কিছু অলৌকিক গালগল্প বলে গুণী বনে যেতে পারেন। তবে তাকে সাধারণ জ্ঞান সম্পন্ন এবং চালাক হতে হবে। গুণীরা সাধারণত বয়স্ক ব্যক্তি হন। তাঁর বয়সের ভারও জ্ঞানের পরিমণ্ডল তৈরি করে।

গুণীরা যত বেশি লোকের সমস্যার সমাধান বা আশা পূরণ করতে পারে তত বেশি খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। যার লোক টানার ক্ষমতা যত বেশি তার অর্থও তত বেশি। গুণীদের সাফল্যের প্রথম শর্ত হল মানুষের হৃদয় জয় করা। গুণীরা অনায়াসে মানুষের সকল সমস্যার কারণ বাতলে দিতে পারেন যদি তার উপযুক্ত স্থান ও পাত্র জোটে। প্রত্যেক সমস্যার সমাধানের জন্য গুরুত্ব অনুযায়ী অর্থ ধার্য করেন। সখা এবং জানগুরুরা একজনকে ডাইনি চিহ্নিত করে ৭,০০০ - ৮,০০০ (সাত হাজার-আট হাজার) টাকা দাবি করেন এবং পানও।

গুণীরা নানা পদ্ধতি ও মন্ত্রের সাহায্যে তাঁদের কাজ করে থাকেন।

আমার দাদু রঘুনাথপুর থানার নিলডি নিবাসী স্বর্গীয় পরাণ মন্ডল ওঝার মন্ত্র-টন্ত্র জানতেন। পাড়া-পড়শিদের কারো অসুখ-বিসুখ কিছু হলে নুন পড়া, জল পড়া দিতেন। তবে তার জন্য কোন টাকা-পয়সা নিতেন না। পাড়ার বয়োজ্যেষ্ঠ হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। আমি ছোটবেলায় দাদুর কাছে ডাইনিদের হাত থেকে রক্ষা পাবার একটি গা-বাঁধার মন্ত্র শিখেছিলাম। সেই গা-বাঁধার মন্ত্রটি হল—

অড়তলা বড়তলা
ষোল'শ ডাহিনের খেলা

কি ভাল্‌ছিস আমাকে
আমাকে লোহার বেড়
লোহার বেড়ে করে ঘা
খ'সে যাক, তার হাত পা
কার দহাই—
কাউর কামিখ্যা চন্ডিমার দহাই।

গা-বাঁধা—যাতে ডাইনিরা আক্রমণ করতে না পারে তার জন্য মন্ত্র দিয়ে গা-বাঁধতে হয়।

গা-ঝাড়া—যদি কাউকে ডাইনে ভর করে বা কু-নজর দেয় তার শরীর থেকে মন্ত্রের সাহায্যে ডাইনি-প্রভাব কাটানোই হল গা-ঝাড়া।

গা-ঝাড়ার বা কুনজর ঝাড়বার, একটি মুসলমানী মন্ত্র হল—

মুসলমান কাটে সূতা
উপরে উঠে খি
তার তলে বসে
পেঁচুয়া করুস কি
আনরে ঝাঁটার গাছি
পৃষ্ঠে করি পার
ছাড় বেটা চোরা পাঁচু
হুকুম আল্লার
খোদার দহাই তোকে
ছাড় এই বার।

কোন শিশুর বা বয়স্ক ব্যক্তির 'নজর লাগলে' বা ডাইনির কু-দৃষ্টি পড়লে 'নুন পড়া' বা 'জল-পড়া' দেওয়া হয়। নুনপড়া হল—বাড়িতে ব্যবহৃত সাধারণ নুন, তাতে ওঝা মন্ত্রপূত করে দেন। একই ভাবে জল-পড়াও দেওয়া হয়। 'নুন-পড়া'-র মন্ত্রটি হল—

নুন নুন
ই নুন কে পড়ে
গুরুর আজ্ঞায় আমি পড়ি
কার দহাই—
রাঙাহাড়ি বিষাইচন্ডি
কাউর কামিখ্যা চন্ডিমার দহাই।

জল পড়ার মন্ত্রও অনুরূপ। তবে সব ওঝার মন্ত্র এক নয়। কোন ওঝা জোরে জোরে মন্ত্র পড়েন কোন ওঝা অস্পষ্ট ভাবে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়েন। তাঁরা যে বিড়বিড় করে কী বলেন বোধগম্য হয় না।

মন্ত্রগুলো অর্থহীন প্রলাপ বলে মনে হবে। আবার কোনোটি কবিতার ছন্দে বাঁধা বলে মনে হয়। রক্ষণশীলতা মন্ত্রের একটি বৈশিষ্ট্য। মন্ত্রগুলোর গোপনীয়তা একটি প্রধান ধর্ম। মন্ত্রগুলোতে পৌরাণিক দেব-দেবীর উল্লেখ লক্ষণীয়। সাধারণত শিব, মনসা, কামরূপ-কামাখ্যা, সীতা-রাম- লক্ষ্মণ প্রভৃতি দেবতার দোহাই দেওয়া হয়। মন্ত্রশক্তির উপর অনেকের অগাধ আস্থা আছে।

অনেক সখা এবং জানগুরু বলেন তাঁরা অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অধিকারী, তবে তাদের গণনার

সাফল্য রহস্যময় আত্মা বা পরীদের উপর নির্ভরশীল। এই অশরীরী, গুরুর আদেশমত সংবাদ সংগ্রহ করে আনে। সে-ই বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে দেয়। এই আত্মা বা পরী সহজে বশ মানে না। এরা হল অপঘাতে মৃত কোনো কুমারী মেয়ের আত্মা। মৃত কুমারী মেয়ের আত্মাকে বশ করে সিদ্ধি লাভ হয়। এই আত্মা বা পরীই গুরুর শক্তি।

বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্যে গুণীরা দর্শনার্থীদের দুঃখের কারণ নির্ণয় করে থাকেন।

তেলপাত দেখা : তেলপাত দেখার জন্য শালপাতা ও তেল নেয়। তারপর দুটি শালপাতাতে তেল মাখিয়ে ঘসতে থাকে এবং ঘসতে ঘসতে মন্ত্র বলে—

তেল তেল রায় তেল
মাঘ তেল কুসুম তেল
....
কি উঠো
ডাইন উঠো ভূত উঠো
বুলিন উঠো বিষ উঠো
কে পড়ছে
গুরুর আজ্ঞা মাত্র পড়ছে।[৭]

ওঝা মাটির মেঝেতে খড়ি দিয়ে দাগ কেটে ঘর করে প্রত্যেক ঘর ডাইন, দেবতা, ভূত, বুলাইনা, বিষ প্রভৃতির জন্য নির্দিষ্ট করে। তারপর তেলপাতে ওঠা ঘরের সঙ্গে ঐ খড়ির ঘর মিলিয়ে ওঝা রোগের কারণ নির্ণয় করেন। তেলপাত ঘসার হিজিবিজি দাগ একমাত্র ওঝা ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারে না।

খড়ি দেখাও ঐরকম, মেঝেতে খড়ি দিয়ে ঘর কেটে গণনা করে বলে দেন। গুণীরা কারণ নির্ণয় করতে আরো নানান পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকেন।

'ডাইনি'—একটি ভ্রান্ত ধারণা

ডাইনি বলে কিছু নেই। এর অস্তিত্ব প্রমাণ করে দেখানো যায় না। ডাইনি হল কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তির ভয়জনিত ভ্রান্ত ধারণা মাত্র। বাবা-মা বা বাড়ির বড়রা অবাধ্য শিশুদের ভয় দেখিয়ে বশে রাখার জন্য ডাইনি-ভূত-পেত্নির মিথ্যে গল্প বলেন। শিশুমনে সেই ধারণা গভীরভাবে মনের মধ্যে দাগ কাটে। অনেকের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ভ্রান্ত ধারণার বৃদ্ধি ঘটে। ডাইন লাগা এবং ওঝার কেরামতি গ্রামের এ সব বাস্তব চিত্র ডাইনি-ধারণার শ্রীবৃদ্ধি ঘটায়।

আমার দিদিমা ছোটবেলায় আমাকে 'দুলুক - দুপনী' বলে একটা ভূতের ভয় দেখাতেন। দিদিমা এখন আমাকে বলেন, 'দুলুক-দুপনী'র মিথ্যা গল্পটা কেন বলতেন। আমার মনে আছে আমি কিন্তু 'দুলুক-দুপনী'কে তখন (এখন থেকে প্রায় ২৫ বছর আগে) ভয় পেতাম। 'দুলুক-দুপনী' হল দিদিমার দেওয়া একটা কাল্পনিক ভূতের নাম।

ডাইনিকে বিশ্বাসের বড় কারণ হল রোগের আসল কারণ না জানা। মানুষের জ্ঞানের আলো যতদূর পর্যন্ত পৌঁছায়, যতটা নিজে স্বচ্ছভাবে বুঝতে পারে, ততদূর পর্যন্ত ডাইনি-ভূতের কল্পনা করে না। কিন্তু যে ঘটনাকে যখন তার জ্ঞান দিয়ে বিশ্লেষণ করতে পারছে না সেইখান থেকে ডাইনি বা অলৌকিক শক্তির কল্পনা করে সহজ সমাধান করে।

১৯৭৯ সালে একটি অল্পবয়স্কা বিবাহিতা মেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। একদিন দুপুরে ঘুম থেকে উঠে মেয়েটি বিড়বিড় করে বলছিল যে তাকে পাঁচজন অপদেবতা জোর করে ধরে বোঙ্গার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে। তারপর চিৎকার করে বলতে লাগল তার বোঙ্গা স্বামী তার কাছে চলে এসেছে। বাড়ির লোক দেখেশুনে ঘাবড়ে গেল। ওখানে একজন হোমিওপ্যাথি ডাক্তার থাকতেন। ডাক পেয়ে তিনি এসে পরীক্ষা করে ওষুধ দিলেন। দীর্ঘ চিকিৎসার পর মেয়েটি সেরে উঠল। মেয়েটির বিকারের কারণ ছিল ঋতুর চূড়ান্ত অনিয়ম, যার ফলে তার অস্থায়ী মানসিক ভ্রম হয়েছিল।[৮]

আরো একজন মেয়ে বলেছিল, সে এক জোয়ান ছেলেকে খেয়েছে। ক্ষতি করেছে গ্রামের এক যুবতীর এবং আরো অনেকের দফারফা করবে।

এই দু'জনের কথা যদি গ্রামবাসীরা শুনত এবং আগে যদি তারা ডাইনি সন্দেহের তালিকায় জায়গা পেয়ে থাকত তবে তাদেরই দফারফা হয়ে যেত। ডাক্তাররা বলেন ভ্রমজনিত মানসিক অবস্থা গরিব বা দরিদ্র শ্রেণির মহিলাদের মধ্যেই বেশি দেখা যায়। এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল অপুষ্টি।

অনেকে ইচ্ছে করেও ডাইনি ভর করার অভিনয় করে থাকতে পারেন। গ্রামে ডাইনি ভর করা মেয়েদের সম্পর্কে আমি এরকম কথা শুনেছি।

ডাইনি সংস্কার কীভাবে শিশুর জীবন বিপন্ন করে তোলে তার একটি ঘটনার কথা বলি।

গত ২৩.৫.২০০৩ তারিখ সকাল বেলা কাশিপুর থানার সোনাইজুড়ি গ্রাম থেকে কলাবনীতে (হুড়া থানা) ফোনে খবর এল মিলন মন্ডলের ছেলের (পবিত্র মন্ডল) শরীর অসুস্থ। মিলনের শ্বশুরবাড়ি সোনাইজুড়িতে। ছেলের বয়স মাত্র একমাস। একমাত্র নাতির শরীর খারাপের খবর পেয়ে আমার কাকিমা তখনই সোনাইজুড়ি পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমাকে বলল। আমি, মিলনের দাদা ফকির মণ্ডল ও কাকিমা সোনাইজুড়ি গেলাম।

সোনাইজুড়ি পৌঁছে শুনলাম ছেলে সারারাত কেঁদেছে। তার মা ও দিদিমা সারারাত বাচ্চা সামলেছে। আমরা পৌঁছানো মাত্র তার দিদিমা বলল, বাচ্চাটাকে ডাইনে নজর দিয়েছে। সারাদিন ঠিকই ছিল, রাত্রে বাচ্চাকে শোয়ানোর পর একটা বিড়াল ঝাঁপ দিল, আর তারপর থেকেই বাচ্চার কান্না শুরু হল। 'ডাইন মাগীরা বিড়াল সেজে এসে বাচ্চাটাকে এই রকম করল।' বলল-ভোগ্যের জোরে বাচ্চাটাকে টিকিয়ে রেখেছি, না হলে নাতি শেষ হয়ে যেত। আমি দু-তিন ঘন্টা কানে ফুঁ দিয়ে বাচ্চাটাকে টিকিয়ে রেখেছি। একনাগাড়ে কেঁদেছে কিন্তু আমি ছাড়িনি, কানে ফুঁ দিয়ে গেছি। তাই সকাল পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছ, না হলে কী যে হত!' ওদের দৃঢ় বিশ্বাস, ডাক্তারে কিছু করতে পারবে না, ওঝার জলপড়া পেলেই ঠিক হয়ে যাবে।

গ্রামের একজন ডাক্তার এসে বললেন, একে এখনই হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে, পেটে গ্যাস জমেছে। বাচ্চাকে ওখান থেকে রঘুনাথপুরে এনে এক শিশু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে দেখানো হল। তিনি পরীক্ষা করে বললেন, বাচ্চার তেমন কিছুই হয়নি, কানে ব্যথা আছে তাই কাঁদছে। ডাক্তারবাবু কান ব্যথার ঔষধ লিখে দিলেন। ওই ঔষধে বাচ্চা সুস্থ হয়ে গেল।

কেন কান ব্যথা, এক মাসের বাচ্চা, তার ডাইনের প্রভাব কাটানোর জন্য দু-তিন ঘন্টা ধরে কান টেনে ধরে ফুঁ দেওয়া হয়েছে, তার জন্য নয় কি?

ডাইনি আতঙ্কে অনেক সময় আত্মীয়রাই নিজের লোকের ক্ষতি করে বসে। এখানে যদি ওঝা ডাকা হত, তবে একটা সামান্য ঘটনা, ওঝার শিকার হয়ে যেত।

ওঝার ভাঁওতা

যখন ডাইনি বলেই কিছুই নেই, তখন ডাইনির প্রভাবের উপর ওঝাগিরি, অর্থ উপার্জনের জন্য ভাঁওতাবাজি ছাড়া আর কিছু নয়।

ওঝা-সখা-জান গুরুর মন্ত্র কোনো দেবতার দোহাই দিয়ে রচিত কয়েকটি পদ মাত্র। ডাইনি -বিশ্বাসী সমাজ ওঝা-জানগুরুদের দেবতুল্য বলে মনে করে। তবে জানগুরুর বিধান গ্রামের মানুষ মেনে নিলেই, তার মূল্য থাকে, বিধান না মানলে জানগুরুরই কোন মূল্য থাকে না।

জানগুরু কখনো কখনো পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজের দেওয়া বিধান পরিবর্তন করে নতুন বিধান দেন।

পুরুলিয়ার জামতোড়িয়ার কাছে লেওয়াগাড়া গ্রামের বাবুরাম হেম্ব্রমের একটি মোষ মারা যায়। বাবুরাম সখার কাছে গেলে ৭০ (সত্তর) টাকা ফি নিয়ে সখা গ্রামের এক মহিলাকে ডাইনি চিহ্নিত করেন। গ্রামবাসীরা ঐ মহিলার জরিমানা বাবদ ৩৪০ (তিন শত চল্লিশ) টাকা আদায় করেন। মহিলাটি সখার সিদ্ধান্ত মানতে না পেরে গ্রামের লোক নিয়ে আবার ঐ সখার কাছে যান। এবার সখা ১০৫০ (এক হাজার পঞ্চাশ) টাকা নিয়ে মহিলাটিকে নির্দোষ ঘোষণা করেন। গ্রামবাসীরা মহিলাটির কাছ থেকে পথখরচা বাবদ আরো ১০৫০ (এক হাজার পঞ্চাশ) টাকা আদায় করে। বাবুরামের কাছ থেকে ২১০০ (একুশ শত) টাকা আদায় করা হয় এক মহিলাকে মিথ্যা ডাইনি বলার জন্য।[৯]

ওঝারা শুধু রোগ বা রোগের কারণ নির্ণয়ই করেন না, প্রতিকারের জন্য মাদুলি-বকচও দিয়ে থাকেন। এই মাদুলি বা কবচে বিভিন্ন দ্রব্য ব্যবহারের কথা বলে থাকেন। আবার বিভিন্ন ওঝা বিভিন্ন দ্রব্যের কথা বলেন। যেমন ডাইনি ভূত-পেত্নিদের হাত থেকে রক্ষা পেতে যা ব্যবহার করতে হবে—

(১) যে নৌকা ডুবে গেছে তার পেরেক আহরণ করে সেই পেরেকের মালা ধারণ করতে হবে।

(২) (ক) হাতি বা ঘোড়া যে খুঁটিতে বাঁধা হয় তার অংশ,

(খ) বাঘের গোঁফ,

(গ) ব্যাঘ্রাহত ঘোড়ার খুরের অংশ,

(ঘ) যে দড়ি দিয়ে কোনো ব্যক্তি আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু কারো হস্তক্ষেপের ফলে তা ব্যর্থ হয়েছে, সেই দড়ির অংশ ইত্যাদি মাদুলিতে ভরে ধারণ করতে হবে।

এর সাদৃশ্যমূলক কল্পনা অন্য ওঝার কাছে পাওয়া যায়—

(৩) (ক) রাজপংখী (এক ধরনের পরগাছা)

(খ) লাগ্ লাগনি (সাপের আকৃতিবিশিষ্ট এক ধরনের পরগাছা)

(গ) কার চন্ডী (গাছের মূল)

(ঘ) কপিলা গাইয়ের লেজের চুল

(ঙ) ভালুকের লোম। ইত্যাদি ভরে মাদুলি ব্যবহার করতে হবে।

মানুষের দ্রব্যগুণের প্রতি বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে ভাঁওতাবাজ ওঝা অর্থ উপার্জন করে। দ্রব্যগুলোর আর কোনো গুণ না থাক অন্তত সহজলভ্য নয়। ফলে ওঝা তার কাছ থেকেই মাদুলি

কিনতে বাধ্য করেন। ওঝা-বিশ্বাসী মানুষের মানসিক তৃপ্তি ছাড়া এর অন্য কোন উপকারিতা আছে বলে মনে হয় না।

ডাইনি বিশ্বাস হটাতে হবে

মধ্যযুগীয় সতীদাহের মতো ডাইনি সন্দেহে নারী নিধন একবিংশ শতাব্দির লজ্জা। তবে আশার কথা গ্রাম-সমাজের মধ্যেই কিছু শিক্ষিত যুবক এবং প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা ডাইনি যে ভুয়ো, ওঝার তুক্‌তাক্ যে ভাঁওতা, তা বুঝতে পেরেছে। প্রগতিশীল ব্যক্তিরা ওঝার ফতোয়া এবং ডাইনি বিচারের তান্ডবলীলার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছে।

পুরুলিয়ার ডাইনি বিরোধী আন্দোলনের পুরোধাপুরুষ ছিলেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও কবি সারদাপ্রসাদ কিস্কু। সারদাবাবু তার অনুগামীদের সঙ্গে নিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে ঘুরে ডাইনি প্রথার বিরুদ্ধে জনমত গঠন করেছেন। অবশ্য ডাইনি প্রথার বিরোধী লোকের সংখ্যা কম।

ডাইনি ধরা একটি লাভজনক ব্যবস্থা। ওঝা গ্রামের মানুষের মনের মতো কাউকে ডাইনি সাব্যস্ত করতে পারলে সে ইচ্ছামত সাত-আট হাজার টাকা উপার্জন করতে পারে। ওঝাই হল ডাইনি প্রথার প্রধান সমর্থক। আর গ্রামের মানুষের একটা বিনোদনের ক্ষেত্র হল ডাইনির বিচার। কারণ তার জরিমানা করে সেই টাকায় ফূর্তি করা যায়।

গ্রামসমাজে ডাইনি প্রথা বন্ধ করতে হলে সকলের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে রোগ অসুখ হলে সহজেই ডাক্তারের সাহায্য পাওয়া যায়—ওঝার কাছে যেতে না হয়। ওঝা-গুণীদের ভাঁওতার বিরুদ্ধে জনমত গঠন করতে হবে। যাতে ওঝারা কাউকে ঠকাতে না পারে, 'ডাইনি' বলে কারো নামে পরোক্ষভাবে মৃত্যু পরোয়ানা লিখে দিতে না পারে। ডাইনিপ্রথার বিরোধী আন্দোলনে প্রগতিশীল ব্যক্তিদের সঙ্গে প্রশাসনকেও সমান ভাবে এগিয়ে আসতে হবে। ডাইনিপ্রথা অপসারণে জেলা প্রশাসনের ভূমিকা লক্ষণীয়।

পুঞ্চা থানার কাপাসগোড়া গ্রামের সতীশ মুর্মুর স্ত্রী চুনকী মুর্মুকে ডাইনি সাব্যস্ত করেন ঝাড়খন্ডের ধানবাদ জেলার মহুদার এক জানগুরু। তাঁর বিধান অনুযায়ী গয়ায় গিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে ভোজ খাওয়াতে বাধ্য হয় অভিযুক্ত পরিবার। কিন্তু তাতেও সন্তুষ্ট না হওয়ায় গ্রামের বিচারসভা সতীশ মুর্মুর কাছে ৮,০০০ (আট হাজার) টাকা জরিমানা আদায় করে। সতীশ মুর্মু এই টাকা জমি সম্পত্তি বিক্রি করে জোগাড় করতে বাধ্য হয়।

এই ঘটনা প্রশাসনের কর্ণগোচর হলে, জেলাশাসক মাননীয় দেবপ্রসাদ জানা মহাশয়ের হস্তক্ষেপে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার মূল বিষয় সমাজের মধ্য থেকে কু-সংস্কারের শিকড় তুলে ফেলা। সভাতেই সতীশ মুর্মু ও চুনকী মুর্মুকে সবপ্রকার দায় থেকে মুক্ত করে তার জরিমানার টাকা ফেরত দেবার ব্যবস্থা করা হয়। ৬ জুলাই ২০০২ পুঞ্চা থানায় একটি দলিল তৈরি করে সতীশ মুর্মুর হাতে তুলে দেওয়া হয়।[১০]

আবার গত ৩ আগস্ট ২০০২ পুঞ্চা থানার বড়গড়ায় জেলা-শাসকের প্রচেষ্টায় আর একটি অনুসন্ধান করে সামাজিক বিচারে দণ্ডিত শ্রাবণ মান্ডিকে তার জরিমানা বাবদ প্রদেয় টাকা ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এখানে শ্রাবণ মান্ডির স্ত্রী আহ্লাদীকে ডাইনি সাব্যস্ত করে ছিলেন এক জানগুরু। জানগুরু ও গ্রামের বিচারসভার ফতোয়ায় শ্রাবণ মান্ডিকে সামাজিক ভাবে 'এক ঘরে' (বয়কট) করে রাখা

হয়েছিল।

জানগুরু এবং গ্রামের সুযোগ-সন্ধানীদের উপর প্রশাসন বড় রকমের আঘাত হেনেছে বলা যেতে পারে। তবে এই কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করতে হলে প্রশাসনিক প্রচেষ্টার সঙ্গে সামাজিক আন্দোলন অত্যন্ত জরুরি।

তথ্যসূত্র

(১) আনন্দবাজার পত্রিকা, ৪ জুন ২০০৩ - 'কাটারির কোপে কাকিমাকে খুন'।

(২) বঙ্গীয় শব্দকোষ (প্রথম খন্ড) - হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ঃ ৯৯৬ 'ডাইন'।

(৩) হিন্দুদের দেবদেবী-হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, পৃঃ ৩৪২, (কলিকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৮৬)।

(৪) ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস - নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, পৃঃ ২৯২, (কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৩৮৪ সাল)।

(৫) 'সাঁওতাল সমাজ ডাইনি ও বর্তমান সংকট-' অসিত বরণ চৌধুরী পৃঃ ১৫৩,

(৬) পুরুলিয়া দর্পণ - ১৬ই জুন ২০০৩ 'ওঝার ফতোয়ায় ডাইন আখ্যা।'

(৭) পুরুলিয়ার ডাইনি বিরোধী আন্দোলন - লক্ষ্মীন্দ্র কুমার সরকার পৃঃ ৩৫, (কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯১)।

(৮) সাঁওতাল সমাজ ডাইনি ও বর্তমান সংকট - পৃঃ ১৫৫।

(৯) পুরুলিয়ার ডাইনি বিরোধী আন্দোলন - পৃঃ ৬৫।

(১০) জেলাশাসকের চিঠি Memo No- 785/C Purulia 4th July 2002.

জেলাশাসকের চিঠি--

To
Shri S. Barma, IAS
Principal Secretary to the
Govt. of West Bengal
Backward Class Welfare Department
Writers' Buildings,
Kolkata - 700 001

Sub :- Incident of 'Dain'(Witch) in village-Kapasgora, Block-Puncha, Dist. Purulia and the intervention of the administration therein.

Sir,

In recent past an incident of 'Dain' occured in the remote village of Puncha Block of the district. The village is situated in a far off area surrounded by jungle, about 10 to 12 Kms. inside the village. It is fully inhabited by Santhals, leaving 5 or 6 Sabar families.

It was the 3rd week of March, 2002, when an inhabitant of the said village visited Puncha town and in course of gossips, told about a 'feast'

from Dain family. One ETV Correspondent was incidentally present. The news was flashed in the ETV news on 17.03.02.

The district administration, then intervened, through SDO and BDO.

It was learnt that one Sri Parameswar Murmu of the village fell ill. The villagers discussed the issue in their village meeting and took him to the **Janguru** who identified Smt. Chunki Murmu, wife of Sri Satish Murmu, a relative of Parameswar Murmu as the 'Dain' (Witch) and gave a ruling of some rituals. Sri Satish Murmu had to sell properties, treat the villages in a feast and had to proceed to Gaya for an "exculpation". But even all these were not enough to remove the alleged evil soul in her so identified. The villagers further decided to impose a fine of Rs. 8,000/- which also had to be paid.

The administrative machinery was pressed into action. Several meetings were held with the villagers in the area in presence of civil administration, police and the panchayat. They were made convinced that 'Dain' identification, the fine and other related actions were acts of offence and a slur on the civil society. The money realised by the villagers as 'fine' was recovered from the respective villagers with a view to rehabilitate the victims socially in their own village and to integrate in the society. A public meeting was arranged by the administration wherein myself, Purulia Sadar SDO, BDO, Puncha, Police and Panchayat were Present. The meeting was impressive. About 2000 tribal people from the area including adjoining areas attended. The entire fine money of Rs. 8,000/- was handed back to Smt. Chunki Murmu and her husband Satish Murmu.

All the deeds of transfer of property of the victim farmily were traced and arrangement has been made to restore the lands in favour of the victim again by way of registered deeds on 6.7.02 at Puncha P.S.

The electronic media (ETV & Alpha Bangla) covered the entire matter scrupulously with importance and telecast it on 1.7.02 and 2 7.02.

With this intervention our fight towards eradication of social evils borne out of superstition could attain a new dimension thwarting future probability of such occurrence.

Yours faithfully,
Sd/- 4.7.02
(D.P. Jana)
District Magistrate,
Purulia.

গ্রন্থ সহায়ক

১. বাংলা বিশ্বকোষ (সপ্তম খণ্ড)—শ্রী নগেন্দ্রনাথ বসু

২. ভারতকোষ (তৃতীয় খণ্ড)—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

৩. সাঁওতাল সমাজ ডাইনি ও বর্তমান সংকট—অসিতবরণ চৌধুরী

৪. পুরুলিয়ার ডাইনি বিরোধী আন্দোলন—লক্ষ্মীন্দ্র কুমার সরকার

৫. ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য—ড. বঙ্কিম মাহাত
৬. লোকায়ত ঝাড়খণ্ড—ড. বিনয় মাহাত
৭. ছত্রাক—শারদীয় সংখ্যা ১৩৮৪
৮. পশ্চিমবঙ্গ-বাঁকুড়া জেলা সংখ্যা
৯. বঙ্গীয় শব্দকোষ (প্রথম খণ্ড)—শ্রী হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
১০. পুরুলিয়া—তরুণদেব ভট্টাচার্য
১১. ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস—নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই প্রবন্ধ রচনায় যাঁদের আন্তরিক সাহায্য পেয়েছি তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য হলেন পুরুলিয়ার জেলাশাসক মাননীয় দেবপ্রসাদ জানা মহাশয়। তিনি ' সাঁওতাল সমাজ ডাইনি ও বর্তমান সংকট' গ্রন্থ এবং অন্যান্য তথ্য ও নথিপত্র দিয়ে লেখার জন্য উৎসাহিত করে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

এই প্রবন্ধ রচনায় আরো যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁরা হলেন—
নিলয় মুখার্জি, সম্পাদক, হরিপদ সাহিত্য মন্দির; এবং ড. সুশান্ত দত্ত, শিক্ষক, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিযা।

মানভূমি সংস্কার বিচিত্রা

মহাবীর নন্দী

খাটের উপর পা তুলে বসেছিল ওরা চারজন। নীরি, বিমলী, লখি আর ঠান্ডি। এমন সময় সেই অঘটনটা ঘটে গেল। ওদের মধ্যে নীরি হাঁচল। একবার নয়, দুবার নয় বারকয়েক। হাঁচির শব্দ শুনে রান্নাঘর থেকে খুন্তি হাতে বেরিয়ে এলেন ক্ষেন্তি পিসি। খাটে ওদের চার সখির এই বেপরোয়া বিশ্রম্ভালাপের দৃশ্য দেখে একেবারে তেলেবেগুনে।

'কতবার বলেছি পা তুলে চারজনে একটা খাটে বসবিস্ নাই—এখন দোষ লাগলেক ন? সুগুম বসে থাক। কেউ ভুঁয়ে পা নামাস না।' বলে দোষ ক্ষালনের ব্যবস্থা করলেন রান্নাঘর থেকে এক ঘটি জল নিয়ে এলেন ক্ষেন্তি পিসি। তারপর সেই জল ডাল হাতে অঞ্জলিতে নিয়ে খাটের চারটে খুরায় অল্প করে ছুঁইয়ে দিলেন। খাটে উপবিষ্টা চার সখির মাথাতেও জল ঠেকালেন অল্প করে। সবশেষে নির্দেশ জারী করলেন, 'লে এবেরে একজনা ভুঁয়ে পা ঠেকাঁয় বস'। দোষ কাটিয়ে, পিসি প্রস্থান করলেন। মানুভূমে 'দোষ' অমঙ্গলসূচক অর্থে ব্যবহার করা হয়।

মানভূমের সমাজজীবনে বাসা বাঁধা অজস্র সংস্কারের মধ্যে এটি একটি। অর্থাৎ দড়ির খাটে চারজনে পা তুলে বসতে নেই। এ অবস্থায় কেউ হেঁচে ফেললে দোষ লাগে। দোষ কাটানোর ব্যবস্থা পিসি যা করলেন অ-ই। আদিকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত যে সব সংস্কার মানুষের মনে ঠাঁই করে বসেছে, তার কোনো কোনোটি যুক্তিপূর্ণ জ্ঞানভিত্তিক, কোনোটি বা নেহাৎ তার দুর্বলতাজনিত। কোথাও কোথাও চরম অজ্ঞতার দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

হাঁচির কথায় যখন আসা গেল তখন জ্যোতির্বিদ বিদুষী খনা দেবীকে স্মরণ করি। খনার বচন মানভূমের গাঁ ঘরেও সমাদৃত। বচনে আছে

হাঁচি জেঠি পড়ে যবে, অষ্টগুণ লভ্য হবে।

অর্থাৎ যাত্রাকালে হাঁচি বা গায়ে টিকটিকি পড়লে আটগুণ লাভ হয়। তার মানে যাত্রাকালে হাঁচি বাধা নয়, সুলক্ষণ। কিন্তু মানভূমের মাটিতে (অন্যত্রও) বচনটির বিপরীত অর্থ গড়ে উঠেছে। যাত্রাকালে কেউ হাঁচলে যাত্রীর বুক 'ছ্যাঁৎ' করে উঠে অঘটন আশঙ্কায়। যিনি যাত্রাকালে হেঁচে তার যাত্রাভঙ্গ করলেন, তাঁর মুণ্ডপাত করতেও কসুর হয় না। বাড়ির শুভাকাঙ্ক্ষীরা বলে, 'একটুকু বসে যাত্রাটা বদলে যা'। এখানে ভাত খেতে বসে কেউ হাঁচলে বলা হয় দোষের। দোষ দূরীকরণের বিধান হল পড়ে থাকা একটি ভুঁয়ের ভাত কুড়িয়ে খেয়ে জল পান করে একটুক্ষণের জন্য উঠে দাঁড়ানো। পরে আবার খাওয়া শুরু করতে হয়। কারোর গায়ে হেঁচে ফেলা মানে তার গায়ে যত রোগ সব সংক্রামিত করে ফেলা। এক্ষেত্রেও দোষ ক্ষালনের উপায় আছে। যিনি হাঁচলেন তিনি,

যার গায়ে হাঁচলেন তাঁর গায়ে একটি চিমটি কাটবেন। ব্যস, তাহলেই সব দোষ কেটে গিয়ে আর রোগ সংক্রামণ ঘটবে না।

হাঁচি নিয়ে আর এক সংস্কারে হাঁচি সত্যতার সাক্ষী। কথোপকথন কালে শব্দ শুনে বক্তাকে প্রায়ই বলতে শোনা যায়, সত্যি হাঁচি পড়ল দেখলি? যা বললাম তার সব সত্যি। শ্রোতাও এ হেন অকাট্য প্রমাণে প্রত্যয় না মেনে পারে না।

যে খাটে বসে হাঁচার এত দোষ, সেই খাটকে নিয়েও মানুভূমে কম সংস্কার গড়ে ওঠে নি। নিদ্রিতাবস্থায় খাট ভেঙে মাটিতে পড়ে গেলে নিকট ভবিষ্যতে পাতকের মৃত্যু নিশ্চিত।

বাচ্চা ছেলেমেয়েদের অনেকেই রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় খাট থেকে মাটিতে পড়ে যায়। এটা দোষের। এই দোষ ক্ষালনের জন্য ছেলে বা মেয়েকে পরদিন অবশ্যই স্নান করতে হয়।

খাটের ল্যাজার দিকে মাথা রেখে শুতে নেই। খাট চিৎ করে রাখতে নেই বা তাতে শুতে নেই। এর সব কিছুতেই দোষ লাগে অমঙ্গল স্পর্শ করে।

খবরদার আপনার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে রাত্রিতে খাটের ল্যাজার দড়ি টান করতে দেবেন না। দিয়েছেন কি আপনার স্ত্রী আপনাকে সেবারে অবাশ্যই কন্যারত্ন উপহার দেবেন। অবশ্য আপনার প্রয়োজন কন্যা সন্তান হলে কথা আলাদা।

মানভূমে পল্লী অঞ্চলে প্রসূতির জন্য একটি খাট অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই খাটের মাথার দিকের দড়িতে নানা আকারের পুঁটুলিতে নানা দেবদেবীর ফুল, সরষে পড়া (মন্ত্রপুত সরষে) কড়ি, ভেলা বিচি, কাজললতা প্রভৃতি ঝুলতে দেখা যায়। একটি কাস্তেও গুঁজে রাখা হয় খাটের দড়িতে এগুলির কোনোটি ভূত, কোনোটি অপদেবতা, কোনোটি ডাইনির কুদৃষ্টি থেকে নবজাতককে রক্ষার নিমিত্ত আর কোনোটিও বা শিশুকে সুস্থ রাখার জন্য।

ডাইন-বকসের দেশ এই মানভূম। ছেলেমেয়েরা তো বটেই আপনার আমার মতো বড় মানুষকেও ওরা ছাড়ে না—নজর (কুদৃষ্টি) দেয়। পরিণামে শরীর খারাপ হয়, ভুল বকে, পেট দুখায় (ব্যথা করে), অঙ্গের কোথাও কোথাও কালসিটে পড়ে স্থানটি কালো হয়ে যায়।

আপনার আমার কথা যাক। বাচ্চারা এইসব ডাইন-বকসদের কু-নজরে পড়লে ভোগান্তির একশেষ। ডাইন-বকসরা মায়ের দুধ শুকিয়ে দিতে পারে, শিশুর রক্ত শুষে নিতে পারে, আরো কত কী পারে ওরা। ওদের চিনবারও জো নেই। সবারই মানুষ আকার পোশাক টোশাকও অভিন্ন তবে?

উপায় আছে বইকি। ডাইন-বকসদের কবল থেকে বাচ্চাদের রক্ষা করতে তার মা পারেন। শিশু জন্মাবার পর তার প্রথম মলটি সযত্নে কাজললতার একদিকে রেখে দেওয়া হয়। জননী প্রত্যহ শিশুর কপালে ফোঁটা পরিয়ে দেন। এটি ডাইন-বকসের কুদৃষ্টির প্রতিষেধক। প্রতিষেধক আরো আছে। শিশুর বাঁ হাতে কড়ি আঙুলটি স্বল্প কামড়ে সেই আঙুল তার কপালে ঠেকিয়ে অদৃশ্য ফোঁটা এঁকে দেন মা। আর এক উপায় আছে। যদি সন্দেহ হয় মেয়েটি ডাইন বা লোকটি বকস তাহলে আপনার শিশুটিকে তার নজর থেকে রক্ষা করতে সন্দেহজনক মানুষটির কানে যায় এমন ভাবে যত রাজ্যের বাহ্যে পেচ্ছাপ জাতীয় আবর্জনার নাম উচ্চারণ করলেই, ব্যস তাহলেই তাদের নজর লাগানোর সব মন্ত্র বিফল হবে। এছাড়া কোমরে, গলায়, বাহুতে নানা জাতীয় তাবিজ, মাদুলি, কড়ি, ঝিনুক, বাঘনখ ইত্যাদি ঝুলিয়েও ওই সব কুনজর থেকে শিশুকে রক্ষা করা চলে।

কয়েকটি বিশেষ অবস্থায় ডাইন বকসের নজর দেয়া সহজ হয়ে পড়ে। তার একটি হল স্নানের আগে তৈলমর্দিত উদোম গা যদি দেখে ফেলে। এ অবস্থায় ওরা নাকি বুকের ভেতরকার কলজেটা

পর্যন্ত দেখতে পায়। তাই সাবধান, মানভূমের ডিহি ডহরে তেল মেখে খালি গায়ে চলাফেরা করবেন না। অবশ্য তেল মাখার পর বুকে একটু জল নিয়ে বেরুলে আর ক্ষতি নেই। ডাইন বকসের দৃষ্টির শিকার তখন আর হতে হবে না আপনাকে।

এখানকার মায়েরা তার সন্তানকে কেউ 'বেশ ছেলেটি' বলে প্রশংসা করলে মনে মনে চটে যান। কেউ কেউ ঝঙ্কার দিয়ে বলে ওঠেন, 'খুঁড়িস না বাপু, আমার বাচ্চাকে।' এরকম খুঁড়ার ফলে কাকতলীয় যোগাযোগে যদি সন্তানের অসুখ-বিসুখ করে তবে সেই অনুপস্থিত প্রশংসকের চৌদ্দো পুরুষের বাপান্ত করেন মা। মায়েদের বিশ্বাস এরকম খোঁড়ার ফলেই কোলের ছেলে বালসায় (শরীর খারাপ হয়)।

শাড়ির অঞ্চল বা আঁচলের আঞ্চলিক প্রতিশব্দ 'টেপ'। এই টেপের হাওয়া লাগা বাচ্চাদের পক্ষে বড়ই খারাপ। আর এই টেপ যদি ছেলেপিলের গায়ে ঠেকে, তাহলে অধিকারিণী তার আঁচলটি ভুঁয়ে ঠেকালেই দোষ কেটে যায়।

অনুরূপভাবে কারুর কোলে চেপে থাকা শিশুর ঝুলন্ত পা যদি নিকটে দণ্ডায়মান কোন ছেলেমেয়ের মাথায় ঠেকে, তাহলে উপবিষ্ট শিশুটিকে কোল থেকে অল্পক্ষণের জন্য মাটিতে নামানো বিধি।

সন্তানের অসুখ-বিসুখ সারানোর দায়দায়িত্ব অনেকটা তার জননীর উপর বর্তায়। জ্বরজ্বালা হলে অরোগ্যার্থে সন্ধ্যাবেলা বাড়ির কোন দুয়ারের কাছে মা ছেলেকে কোলে বসিয়ে তাঁর এলোচুল সন্তানের আপাদমস্তকে তিনবার ঝুলিয়ে দেন।

মানভূমের সমাজ জীবনে প্রসূতি ও নবজাতককে ঘিরে বেশ কয়েকটি সংস্কার চলিত। প্রসূতির জন্য আঁতুড়ে খড়ের শয্যা তৈরি হয়। প্রসূতিকে চিঁড়ে ভাজা ও ভাল ঘি আহার্যরূপে দেওয়া হয়। তাছাড়া তাকে চাঙ্গা করে তুলতে প্রসবের চতুর্থ দিবস থেকে 'ঝাল' নামক উপাদেয় বস্তুকে প্রত্যহ পাক করে খাওয়ানো হয়, সেটি নিঃসন্তান কোনো রমণীর দ্বারা স্পর্শ নিষেধ। জন্মানোর কয়েকদিন পর থেকে নবজাত শিশুকে খাওয়ানো হয় 'অলোই'। মাতৃদুগ্ধে বচ, জায়ফল, হরিণের শিং প্রভৃতি বিশ-পঁচিশ রকমের বস্তু ঘষে 'আলোই' তৈরি হয়। 'ঝাল' এবং 'আলোই' যথাক্রমে মা ও শিশুর টনিক। তৈরির জন্য মালমশলাগুলি সব বেনে দোকানে মেলে। এছাড়া 'গিলা বিচ' ও 'হাড়জড়া' ভেজানো সরষের তেল নিয়মিত শিশুকে মাখানো হয়। গ্রাম্যজীবনে নবজাতক (জাতকের নাভিতেও) ও প্রসূতিকে সেঁক দেয়া একটি অনিবার্য সংস্কার। এসব সম্পাদন করেন ধাই মা।

জন্মের কয়েকদিন পর জাতকের নাভিটি শুকিয়ে খসে পড়লে জননী সেটি সযত্নে রেখে দেন।

ষষ্ঠী বা 'সেটার' পুজোর পুতুলমূর্তি তৈরি হয় আঁতুড় ঘরের দেওয়ালে। তৈরি করেন ধাই মা। উপকরণ গোবর ও কড়ি। ব্রাহ্মণ পুরোহিত ষষ্ঠী পুজো করেন। পূজান্তে প্রসূতি ও ধাই মা কড়ি খেলেন এবং পরে প্রসূতি ধাই মায়ের কাছে বসে মা ষষ্ঠীর উপাখ্যান শোনেন। উপাখ্যানের বিষয়ের বস্তু এই -

এক রমণীর মা ষষ্ঠীর প্রতি ভক্তি না থাকায় তিনি ছলনা করে প্রতিবারই প্রসবের পর তাঁর বাহন বিড়ালকে পাঠিয়ে শিশুগুলি চুরি করিয়ে আনতেন। এইভাবে রমণী জব্দ হল। মা ষষ্ঠীর প্রতি তার ভক্তি জন্মালো ও পূজাআর্চা করে সব হৃত সন্তানগুলি মা ষষ্ঠীর কাছ থেকে ফিরে পেল।

ষষ্ঠী পূজার দিনে শিশুর হাতে একটি লোহার বালা পরিয়ে দেওয়া হয়। এটির নাম 'দুধবালা'। দুধবালাটি গড়িয়ে আনেন ধাই মা।

প্রসবের নবম দিনে শিশু গৃহে এবং প্রসূতি পুকুরে স্নান করেন। একবিংশতি দিবসেও এই ব্যবস্থা। এই দুইদিন নাপিত বৌ এসে প্রসূতি জননীকে ক্ষৌরকর্ম করে আলতা পরিয়ে দেন। শিশুর জন্মের পর ন দিন অশৌচ পালন করেন মা বাবা সহ সমগ্র পরিবার এবং ভায়াদরাও। নবম ও একুশ দিনের সংস্কার দুটির নাম যথাক্রমে লত্তা এবং একুশা। একুশায় শিশুকে প্রথম ঘরের বাইরে বের করা হয়। ষষ্ঠীতলায় গিয়ে মা ষষ্ঠীর পুজো দেয়া হয়।

নবম দিবসে মা বাবা এবং আর সবাই ক্ষৌরকর্ম সেরে স্নান করেন। অশৌচের অন্ত হয় মা বাবা ছাড়া আর সকলের। এদিন প্রসূতি ও নবজাতক উন্নীত হয় খড়ের ভূমিশয্যা ছেড়ে দড়ির খাটে মা বাবা শুদ্ধ হন মাসান্তে। জননী তখন হেঁসেলে প্রবেশের পুনরাধিকার পান।

মা ষষ্ঠীর বাহন বিড়ালের স্থান, মানভূমে সমাজজীবনে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। বিড়াল হত্যার প্রায়শ্চিত্ত ব্রাহ্মণকে সোনার বিড়াল গড়িয়ে দান করা।

বিড়ালের সন্তান প্রসব দেখা কারুর ভাগ্যে জোটে না। বলা হয়ে থাকে, যে বিড়ালের ফুল পায় সে রাজা হয়। সৌভাগ্যবান কেউ যদি এটি পেয়ে যায় তবে সেটি শুকিয়ে সযত্নে রেখে দেয়। কোন বাঁজা (বন্ধ্যা, নিঃসন্তান) মেয়েকে এই ফুলের যৎসামান্য খাইয়ে দিলে (খাওয়ানোর নিয়ম কৌশলে পক্ক কদলীর ভেতর সেই যৎসামান্য অংশটি পুরে তার অজান্তে) সে সন্তানবতী হয়।

মা ষষ্ঠীর কৃপা লাভ না হলে সন্তান লাভ হয না। তাই শিশুর সব কাজে কর্মে মা ষষ্ঠীর পরে ভরসা করা হয়। কোল থেকে ঘুমন্ত শিশুকে বিছানায় শোয়ানোর সময় বলা হয় 'যাটের কোলে' অর্থাৎ বাছাকে আমার মা ষষ্ঠীর কোলে শোয়ালাম। শিশু আপন মনে হাসলে বলা হয় 'মা ষষ্ঠীর সাথে খেলছে।' শিশুর যখন বিষম লাগে, তখন বলা হয়, 'ষাট ষাট', আর শিশু যখন হাঁচে তখন বলা হয় 'জীইও মা ষষ্ঠির পাদ যাইও।'

যে শিশুর জন্ম ঘোষণা করা হয় কাঁসার থালা বাজিয়ে এবং কপাটের শিকলে ঝনৎকার তুলে , যে শিশুর জন্মের খবর পেয়ে স্থানীয় ডোমরা মাঙ্গলিকীর পসরা ঢাকঢোল সানাই নিয়ে পৌছে যায় গৃহস্থের দুয়ারে, যে শিশুকে সর্বক্ষণ ভরসায় রাখা হয় মা ষষ্ঠীর, সেই শিশু যখন পাঁচইটা, ষেটার আটকলাইয়া, লরাত বা লত্তা, একুশার সংস্কার পার হয়ে বড় হতে থাকে তখনও তাকে ঘিরে সংস্কারের অন্ত নেই।

শিশুটিকে গর্ভে নিয়েও জননীকে বহু সংস্কারের ভেতর দিয়ে দশ মাস পার করতে হয়। এ অবস্থায় গর্ভবতীকে নদী-নালা -জোড় পেরুতে নেই। সবচেয়ে বেশি সাবধান হতে হয় গ্রহণকালে — তা সে সূর্যগ্রহণই হোক আর চন্দ্রগ্রহণই হোক। গ্রহণসময়ে পোয়াতি ফল ফুলুরি বাঁটিতে কাটলে জাতক হবে 'গন্নাকাটা' অর্থাৎ সে ঠোঁট-নাক কাটশা অবস্থায় জন্মাবে। খড় বা ন্যাকড়ায় আঁইড়া কোলের ছেলের গু নিকিয়ে ফেললে জাতকের পায়ের পাতাও অনুরূপ কুন্ডলী-পাকানো হবে এবং গ্রহণকালে সিঁদুরের টিপ পরলে শিশুও কপালে টিপ নিয়ে জন্মাবে।

জাতকশিশুর গায়ের (বিশেষ করে পাছার) দাগ নিয়ে এখানকার সমাজজীবনে যে কিংবদন্তি তা এই —

জাতক নররূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হতে ঘোরতর আপত্তি জানিয়ে সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে। সৃষ্টিকর্তা তখন উত্তপ্ত লৌহখন্ড দ্বারা জাতকের দেহে (পাছায়) ছ্যাঁকা দেন।

রোরুকদ্যমান জাতক তখন ধরাধামে অবতীর্ণ না হয়ে পারে না। অন্নপ্রাশনকালে জাতকের রোদন তার পূর্বজন্মে উচ্চতর কোনো জাতির পরিচায়ক।

কচিশিশুর হেঁচকি (হিক্কা) উঠলে কাছে উপস্থিত বড় কেউ একটুকরো সুতো তার মাথায় রেখে বলেন, 'মা ষষ্ঠীর বোঝা বও'। বড় শিশুর ক্ষেত্রে হেঁচকি বন্ধ করতে তাকে ভয় পাইয়ে শুধোন হয়, 'কি চুরি করে খেয়েছিস? মা ষষ্ঠীর লাড়ু? শিশু বিষম খেলে 'ষাট ষাট' বলে তার মাথায় ফুঁ দেওয়া রীতি। বড়দের ক্ষেত্রে এরেকমটি হলে অর্থাৎ বিষম খেলে এখানকার মানুষের ধারণা দূরের কেউ তার নাম নিচ্ছে। শিশু আছাড় খেলে বা খাট থেকে মাটিতে পড়ে গেলে তার আঘাত লাগে না তার কারণ মা ষষ্ঠী তাকে 'লুফে' নেন। কচিশিশুর হাতের মুঠোয় মা ষষ্ঠির নাড়ু রাখা থাকে। ক্ষুধার্ত শিশু সেই নাড়ু খায়। এমন কি ঘুমন্ত অবস্থাতেও।

অপ্রাসঙ্গিক হলেও জানাই, এখানে কচিশিশুকে মাঝে মাঝ বিশেষ করে তেল মাখানোর সময় তার কোমল হাত দুটি নিয়ে ছড়া কাটা হয়, 'আটুভাঙ্গো, পাটুভাঙ্গো, মা ষষ্ঠীর বোঝা তুলো' বলে শিশুর হাত দুটি এপাশ ওপাশ করে তার মাথায় তোলা হয়। শিশু এই কসরতে বেশ মজা পায়।

আপনি যদি কোনসূত্রে মানভূমী হন এবং আপনার শৈশবকাল মন থেকে না মুছে গিয়ে থাকে, তবে সেই মুহূর্তটি স্মরণ করুন, যখন আছাড় খেয়ে আপনার হাঁটু বা থুতনি কেটে রক্ত ঝরছে আর বড়রা কেউ এ দৃশ্য দেখে ফেলেছে। অমনি কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনার রোরুদ্যমান মুখগহ্বরে আপনি অনুভব করছেন মধুমিশ্রিত ঘিয়ের স্বাদ। মধুর অভাবে চিনি বা গুড় চলতে পারে তবে ঘৃতের অভাবে বনস্পতি নৈব নৈব চ।

ঘরের চাল থেকে বা কোঠাবাড়ির ছাদ থেকে যে জায়গাটিতে বর্ষার জল ঝরে পড়ে - সেই বিশেষ জায়গাটির নাম ছাঁচ্‌তল। বাড়ির ছেলেমেয়েদের এ স্থানে আছাড় খাওয়ার অপরাধে বাড়ি ঢুকতে দেওয়া হয় না। কর্তা-স্থানীয় কেউ একটি পাত্রে জল এনে অপরাধীকে ছাঁচতলে দাঁড় করিয়ে পাত্রস্থ জল অঞ্জলিতে নিয়ে উপরদিকে ছুঁড়ে দেন। সেই জল এসে পড়ে অপরাধীর মস্তকে, সে তখন স্খলিত অপরাধ হয়ে বাড়িতে পুনপ্রবেশের অধিকার পায়।

দস্যি ছেলেমেয়েরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি করে—একে অপরকে খামচায়, আঁচড়ায়। কামড়ায়। সবক্ষেত্রে অর্থ একটিই। দংশক দংশিতের দেহ থেকে যাবতীয় রোগ হরণ করে।

ছেলেমেয়েদের সবার চোখের সামনে খেতে দিতে নেই। কারুর কারুর নজর বড় খারাপ। খেয়েটেয়ে নেবার পর যদি আপনার ছেলেমেয়েদের পেট দুখায় (ব্যথা করে) তো নির্ঘাৎ জানবেন এ ওই দশজনের চোখের সামনে খাবার ফল। ওদের কেউ না কেউ খাবারে নজর লাগানোর ফলে এই বিপত্তি। এরকম একটি অসুখ 'নুন-পড়া' (মন্ত্রপুতঃ নুন) খেলে সেরে যায়। গাঁ-ঘরের বহু প্রবীন-বৃদ্ধের ও বিদ্যে জানা আছে। অঙ্গুষ্ঠ তর্জনী ও মধ্যমা এই তিনটি আঙুলের সাহায্যে যতটা পরিমাণ নুন ওঠে, ততটা নুন রুগীকে দিয় তুলিয়ে গুণী বৃদ্ধকে দিলে তিনি তা মন্ত্রপুত করে দেন। এই নুনের জলযোগ করলেই রুগীর পেটব্যথা সেরে যায়। বড়রাও এই সংস্কারটি থেকে মুক্ত নন। তাঁরা এই পেট দুখানোর প্রিভেনসন আগেভাগেই নিয়ে নেন। অর্থাৎ যদি দেখেন খাবার সময় কেউ তার দিকে তাকিয়ে আছে, অমনি তিনি খাদ্যবস্তুর একটি ক্ষুদ্র অংশ ঐ লোকটির নামে মাটিতে উৎসর্গ করেন। ল্যাটা চুকে যায়।

গুণীবৃদ্ধেরা নুন ছাড়াও জল সরসে, হলুদ প্রভৃতিও পড়তে পারেন (মন্ত্রপুতঃ করা)। বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন গুণ। কোনটি অসুখ সাবাতে, কোনটি ভূত তাড়াতে আবার কোনটি পোয়াতির

সুখপ্রসবের সহায়ক (অসুখ-বিসুখের জন্য ঝাড়ন মন্ত্রও এই সব বৃদ্ধের জানা থাকে। এঁরা ভুতুড়ে হাওয়া বাতাসের জন্য, বাতাসের কবল থেকে রক্ষা হেতু মানুষের গা বেঁধে দিতে পারেন।

আপনার আমার মত বয়স্ক মানুষ গুরুভোজনের পর বাম করতল উদরে বুলিয়ে নিতে পারি। এতে পরিপাকক্রিয়া খুব সহজে হয়ে যায়। আর জলপড়া বা নুনপড়ার ঝামেলা করতে হয় না।

ছোট ছেলেমেয়েদের কখনও মাথায় টালাবেন না (চাটি মারবেন না)। তাহলে ওরা রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় বিছানায় 'হিসি' করে ফেলে। অবশ্য রাগের মাথায় এরকম দুষ্কর্ম আমার আপনার দ্বারা সংঘটিত হয়ে যায়। তবে তার প্রতিকার অবশ্যই আছে। প্রহৃতের মাথায় ফুঁ দিলেই সব দোষ কেটে যাবে।

বাঁ হাত দিয়ে কাউকে মারলে সে রোগা হয়ে যায়। প্রতিকার? বাঁ হাতটি মাটিতে ঠুকবেন। কনুয়ের আঘাত লাগলে প্রহৃতকে দিয়ে কনুস শুঁকিয়ে নেবেন। মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি হলে— দ্বিতীয়বার ঠোকাঠুকি না করিয়ে নিলে মাথায় শিং বেরোয়।

বাঁশের কাঠি দিয়ে মারলেও প্রহৃত কাঠির মত রোগা হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে প্রহৃতকে কাঠিটি প্রথমে কামড়ে তারপর শুঁকতে হয়।

ঘর ঝাঁট দেবার সময় দৈবাৎ কারুর অঙ্গে ঝাঁটার ছোঁয়া লেগে গেলে একটি কাঠি ভেঙ্গে তাতে থুথু দিয়ে বাইরে ফেলে দেয়া হয়।

ছেলেমেয়েদের গায়ে কুলোর বাতাস লাগলেও অনুরূপ একটা কিছু হয়। আপনার আর কি, কিন্তু ভয় আপনার কমবয়সী ছেলেমেয়েদের নিয়ে। সাবধান, ওরা যেন জাঁতা বা বাটনাবাটার শিলের উপর না বসে। তা হলে ওই জাঁতা বা শিল ক্ষয়ে শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওদের বিয়ে হবে না। ছেলেমেয়েদের 'পা মেলে' (ছড়িয়ে) বসে খেতেও দেবেন না কখনো—নইলে ওদের শ্বশুরবাড়ি হবে তিন দিন তিন রাত্তিরের পথ। অনেক অনেক দূরে বেয়াড়া কোন অজ পাড়া গাঁয়ে। নারদের বাহন বলেই কিনা কে জানে—ঢেঁকিতে বসাও মানা। নখ্ বাজালে ঝগড়া বাধে একথা সবাই জানেন। বিবদমান দুই ঝগড়াটের মাঝখানে 'নারদ-নারদ' বলে নখ বাজিয়ে কোঁদলটা জমিয়ে তুলতে অনেককেই দেখা যায়— যেটি বৃহত্তর বঙ্গেরই সংস্কার ভুক্ত। এখানে দুটি কাঠি বাজালেও ওই একই ফল। তাই বাড়ীর ছেলেমেয়েরা অজান্তে কাঠি বাজানোর দায়ে দায়ে অভিভাবকের ধমকানী খায়।

সন্ধ্যের মুখে ছেলেমেয়েদের আকাশের দিকে চেয়ে প্রায়ই এই ছড়াটি কাটতে শোনা যায়

একতারা লারাপারা
দু তারা কাপাসতারা
তিন তারায় কোষে কোষ
চার তারায় নাহি দোষ

অর্থাৎ সন্ধ্যের পর আকাশে যখন তারা ফুটতে শুরু করে তখন একটি, দুটি বা তিনটি তারা দর্শন করে বাড়ি ঢুকতে নেই। চারটি তারা ফুটে ওঠা অবধি বাইরে অপেক্ষা করতে হয়।

বাড়িতে কোন শিশু ঝাঁটা হাতে ভূমি সম্মার্জনা করলে বলা হয় বাড়িতে কুটুম আসবে সেদিন। বাড়িতে কুটুম্ব আগমনের আর দুটি পূর্বাভাসের একটি হল কারুর হাত থেকে ঘটি বাটি জাতীয় কোনো পাত্র স্খলিত হওয়া। অপরটি বাড়ির সংলগ্ন কোন অংশে দুটি কাকের আহার বন্টন বা 'খুপা'। একের মুখ থেকে অপর কাকের খবার গ্রহণ করার নাম স্থানীয় ভাষায় 'খুপা'।

নৈমিত্তিক জীবনযাত্রার সঙ্গে জড়িত বহু সংস্কারে বৈচিত্র্য আপনি লক্ষ করলেই দেখতে

পাবেন বাড়ির কোন কোন বধূ তার বৈকালিক প্রসাধনের সময় সিঁথিতে সিঁদুর দেয়ার পরও বাড়তি আর একটি ফোঁটা দিচ্ছে ও হাতের নোয়ায় সিঁদুর ছোঁয়াচ্ছে, এ দুটিই তার পরলোকগতা সতীনের উদ্দেশ্যে। আবার দেখবেন চুলগুলি কুন্ডলী পাকিয়ে তাতে থুতু দিয়ে বাইরে ফেলে দিচ্ছে। হয়তো কখনো আপনার চোখে পড়ে যাবে, একসন্তানের বিধবা জননী খেতে বসে বাঁশীর ধ্বনি শুনে খাবার ফেলে উঠে গেলেন। সেদিন আর তাঁর খাওয়া হল না। এমনি কত বৈচিত্র্য। বাড়ির চৌকাঠে পা ঠেকে গেলে প্রণামে করা (ঠাকুর থাকেন) ভুট্টা খেয়ে তার 'ভুতি' টা দু টুকরো করে শুঁকে ফেলে দেয়া (পরিপাকার্থে)—এরকম সংস্কারমানা দৃশ্যতো হামেশাই চোখে পড়ে।

অঙ্গ নাবার ফল হিসাবে খনার দীর্ঘ সূত্রগুলি এ অঞ্চলে সংক্ষিপ্ত করে নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ স্ত্রীলোকের বামঅঙ্গ পুরুষের ডানঅঙ্গ নাচা শুভ।

পায়ের তলা চুলকালে যা হয় তা একটি তিনচরণের ছড়ায় বলা হয়েছে। ছড়াটি এই—আগে চলে/মাঝে গলে/গাছে ফলে। তার মানে সামনের দিক চুলকালে। তার ফল ভ্রমন, মাঝের অংশ চুলকানোর ফল গলা (রোগভোগ) এবং পিছনের অংশ চুলকানোর ফল প্রাপ্তিযোগ।

কাউকে ধরে উঠলে বা বসলে সে অলস প্রকৃতির হয়ে পড়ে। কারুর গায়ে আড়ামোড়া ভাঙ্গা দুর্জন-প্রকৃতির মানুষের কর্ম। এমনি করে সে তার সব রোগ অন্যের দেহে সমর্পণ করে দেয়। কারুর গায়ে হাঁচলেও রোগের দেহান্তর ঘটে। কারুর হাত গলিয়ে বা দুপায়ের ফাঁক গলিয়ে পেরুলে মাথায় ঘা হয়। বাচ্ছারা নিজের ছায়া দেখলে। বড়রা ধমক দেয়, 'ছায়া' দেখিস না, রাত্রে ভয় পাবি। কারুর মাথায় টিকটিকি পড়লে সে রাজা হয়।

সংস্কার মেনে চলার একটা বড় অংশের দায়ই হচ্ছে গ্রাম্য জীবনের। সেখানে ভাসুরের সাথে ভাদ্রবধূর বা মামাশ্বশুরের সাথে ভাগিনেয় বধূর সম্পর্ক ভয়াবহ। এইসব ক্ষেত্রে বধূর মুখ দর্শন দূরে থাক ভাসুর বা মামাশ্বশুর বধূমাতার থেকে অনেকটা ব্যবধান রেখে চলাফেরা করেন। অবগুণ্ঠিতা বধূরা ভাসুর ও মামাশ্বশুরকে গড় করে প্রণাম করে হাত কয়েক তফাৎ থেকে। অসাবধানে কখনো কেউ কাউকে ছুঁয়ে ফেললে উভয়েরই স্নান করে শুচিতা রক্ষা করা বিধি।

মানভূমের সমাজ জীবনে ধোপা নাপিত ও ডোমের বিশেষ স্থান। জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ এবং ধর্মীয় অনেক অনুষ্ঠানে এই তিন বর্ণের উপস্থিতি অনিবার্য। গৃহস্থের কাছ থেকে এরা অর্থ ছাড়া আর যা আদায় না করে ছাড়ে না, তার নাম 'লেগ'। ' লেগে'র উপকরণ চাল, ডাল, তেল, কাঁচা সব্জি, বস্ত্র, কড়ি, তামার পয়সা প্রভৃতি।

ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত স্বর্ণকার (পোদ্দার) দের মধ্যে একটি বিচিত্র সংস্কার আছে। পিঠে পরব মানভূমের এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান। পিঠে তৈরির দিনটির নাম(মকর সংক্রান্তির পূর্বদিন) বাঁউড়ি। ক্ষীর, নারকেল প্রভৃতি নানা উপকরণ দিয়ে নানা আকৃতির পিঠে তৈরি হয় এদিন পোদ্দার গৃহস্থের বাড়িতে প্রথম পিঠেটি তৈরি হয় গরু আকৃতির এবং তাতে পুর থাকে নতুন গুড়ের। পিঠেটি তৈরি হয়ে গেলে সেটি কেটে অভ্যন্তরস্থ গুড়ের ফোঁটা পরেন পরিবারের সবাই। তারপর যথানিয়মে পিঠে তৈরি হতে থাকে।

এই বাঁউড়ি রাতের আর একটি সংস্কার হল ঘুমোবার আগে পায়ের তলায় তেল মেখে শোয়া। বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়লে গৃহকর্ত্রী এদের সবার পায়ের তলায় তেল মাখিয়ে দেন। তা নইলে নাকি প্রেতাত্মারা এসে পা চাটেন। এ দিন পুরো রাতটাই সাবধানে থাকার নিয়ম। একবার ডাক শুনেই হট করে উঠে পড়ে দরজা খুলে বসবেন না। অপেক্ষা করবেন তিনবার ডাক শোনার। তা নইলে ওই প্রেতাত্মার পাল্লায় পড়ে যাবেন। কোন কোন পরিবারে বাঁউড়ির পিঠে বাইরে না বের করাটাও

সংস্কার। পিঠে হোক, বাঁউড়ি, মকর, এখ্যান - পর পর এই তিন দিন পিঠের হাঁড়ি উনুনে চড়বে। ওতে থাকে দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত প্রথম তৈরি নটি ছোটো আকারের পিঠে। পরে একদিন এই পিঠেগুলি পুকুর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। পিঠে পরবের পিঠের নাম 'গড়গড়া'। এটি গোটাপিঠে। বাড়িতে কালাশৌচ চললে এই পিঠে তৈরি হয় না। সে ক্ষেত্রে অন্য যে কোনো রকম পিঠে তৈরি হয় না। সে ক্ষেত্রে অন্য যে কোনো রকম পিঠে তৈরি হতে পারে। কোনো কোনো পরিবারে শ্রীপঞ্চমীর পর আর গোটাপিঠে খাওয়া নিষিদ্ধ। মকর সংক্রান্তিতে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে-সূর্যদেবকে দেখতে দেখতে ডুব দিয়ে অহগাহনে অশেষ পুণ্য। 'চকর দেখে মকর স্নান' এরই নাম। এ সবই পিঠে পরব সংক্রান্ত মানভূমী সংস্কার।

বরদা চতুর্থীর দিন গণেশ পূজা মোদকদের, বৈশাখী পূর্ণিমার দিন গন্ধেশ্বরী পূজা গন্ধবণিকদের, বিশ্বকর্মা পূজা কর্মকার, সূত্রধর ও স্বর্ণকারদের কুলদেবতার পূজা। এই সব বর্ণের পরিবারে তাদের কুলদেবতার প্রতীকরূপে তাদের ব্যবসায়ে ব্যবহৃত যন্ত্রাদি ও বাটখারাগুলি পূজা হয়। গণেশ পূজান্তে নতুন গুড়ের ফোঁটা নেয়াও বিধি।

দীপাবলীর রাত্রে ছেলেমেয়েদের পাটখাড়ির আগুন নিয়ে ছড়াকেটে ইজঁয়-পিঁজয়, খেলা এবং সেই পাটখাড়ির আগুনে হাত-পা ও অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সেঁকে নেয়া অপর একটি সংস্কার। এই সেঁকে নেয়াটা চালু মরশুমের জন্য খোসপাঁচড়ার প্রতিষেধক।

এতদঞ্চলে প্রচলিত বিভিন্ন ষষ্ঠী পূজার (অরণ্য, লোটন মাথনি প্রভৃতি) সঙ্গে নানারকম সংস্কার জড়িয়ে আছে। পূজান্তে ছেলেমেয়েদের বুকে হলুদবাসাল লাগিয়ে দেয়া,হাতে সুতো বেঁধে দেয়া, ষষ্ঠীস্থানে থেকে জাগ্রত দীপ বাড়ি নিয়ে আসা ও সেই দীপের শিখায় কাজল পেড়ে ছেলেমেয়েদের পরিয়ে দেয়া-এ সবই তার মধ্যে। উল্লেখনীয় বাটনা বাঁটার শিল মা ষষ্ঠীর, উনান ব্রহ্মার এবং সিজ পাতা মা মনসার প্রতীক। ধান, পয়সা, কড়ি অন্যত্রের মত এখানেও মা লক্ষ্মীর প্রতীক।

বিশেষ বিশেষ দিনে বিশেষ কিছু একটা খাওয়ার সংস্কারের মধ্যে মুখ্য হল তেরই জ্যৈষ্ঠ রোহিনীর দিনে একটুকরো আষাঢ়ী ফল মুখে দেওয়া। এটি নাকি সর্পবিষের প্রতিষেধক। মাঘ মাসে ভীম একাদশীর পরের দিন অনেক পরিবারে কুলের সাথে বেথাশাকের তরকারি খাবার প্রথা আছে। সেই সঙ্গে আখের সাথে মুগ ডালও। দুটি অরন্ধনে গোটা মাষকলাই ও সজনে শাক খাবার নিয়মে মানভূম বৃহৎ বঙ্গেরই দলভুক্ত হয়ে গেছে। তবে মানভূমে শ্রাবণ বা ভাদ্রের অরন্ধনে বাসিভাত গোটা কলাই-সজনে শাক সহ নৈবেদ্য পান মা মনসা অর্থাৎ উনুনের ভিতরে রক্ষিত সিজ বা মনসাপাতা এবং মাঘের অরন্ধনে অনুরূপ নৈবেদ্য পান মা ষষ্ঠি অর্থাৎ বাটনা বাটার শিল। বছরের এই দুটি দিনে যথাক্রমে বাড়ির উনুন ও শিল-নোড়া বিশ্রাম পায়। অরন্ধনের ক্ষেত্রেও পরিবারে কালা অশৌচ চললে বাসিভাত-কলাই-সজনে শাকের পরিবর্তে মা মানসা ও মা ষষ্ঠীকে দুধ-চিঁড়ের প্রসাদ দেওয়া হয়।

আবার বিশেষ সময়ে বিশেষ কিছু না খাওয়ার সংস্কারের তালিকায় পড়ে কার্তিক মাসে ওল এবং মাঘ মাসে মূলা। অনেকে রাত্রিতে তেতো ও শাক্ খান না। বাড়িতে অশৌচ চলাকালে এবং মায়ের দয়া হলে (বসন্ত হলে) আ-হলদে আসাঁতলা খাওয়ার নিয়ম। এ সময়টায় পেঁয়াজ-রসুন-মাছ-মাংস-ডিম সব বাদ। জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী, জিতাষ্টমী প্রভৃতি কয়েকটি দিনে বহু পরিবারে ভাত অন্ন খেতে নেই।

পরিবারে কারুর বসন্ত হলে মা শীতলা এবং বাড়িতে সাপ বেরুলে মা মনসা বিশেষভাবে পূজা পান।

এদিককার গ্রামাঞ্চলে একশ্রেণীর কালী-সাধিকা মেলে। এঁদের নাম সখাইন। এঁরা নিজ গৃহে বারমাস প্রতিষ্ঠা করে নিয়মিত পূজা অর্চনাদি করেন। এঁদের মাথা ভরা দীর্ঘ জটাজুট। অনুরুদ্ধ হয়ে এঁরা 'মুদা' ধরেন। অর্থাৎ প্রকান্ড ধুনুচির ধোঁয়ায় নিজেকে আচ্ছন্ন করে মা কালীকে আহ্বান করে মুহূর্ত কয়েকের মধ্যেই মাকে নিজ দেহে নিয়ে আসেন। তাঁর উপর মা কালীর ভর হলে প্রশ্নকর্তা বা কর্ত্রী একের পর এক প্রশ্ন করে যান এবং সখাইন তাৎক্ষণিক ছড়া কেটে সব প্রশ্নের উত্তর ও সমস্যার সমাধান করে যান। 'মুদা' ধরানোর ব্যাপারে পুরুষের চেয়ে নারীর উৎসাহ এবং আনাগোনাই বেশি। তাদের প্রশ্নের কাঠামোগুলো এই ধরনের - (১) স্বামী অন্য নারীতে আসক্ত কি না! (২) স্বামীকে কেউ কিছু খাইয়ে বশ করেছে কি না! (৩) করলে কে সেই দজ্জাল মাগী। (৪) ঘরে কুন্দরা লেগেছে কি না। (৫) আঁইরা ছেলেটা দিন দিন অমন শুকিয়ে যাচ্ছে কেন? (৬) অমুকের ছেলেমেয়ে হবে কি না ইত্যাদি। ইদানীংকালে ছেলে-ছোকরারা পরীক্ষা পাশ, চাকরীবাকরি, কোন পার্টি বা ফুটবল দল জিতবে, প্রভৃতি আধুনিক প্রশ্নও সখাইনের সামনে তুলে ধরে। মুদা ধরানোর জন্য সখাইনকে আগে থেকে জানিয়ে দিতে হয়। পরে নির্দিষ্ট দিনে পূজার উপচার সহ প্রাতে সখাইনের বাড়ি যেতে হয়।

সখাইনের মুখে ছড়ার ধাঁচটা কতটা কতকটা এইরকম -

'সিঁড়ির গড়ায় দাঁড়ায় দঁড়ায়
সকল কথা শুনেছিলি
তর কপাল ভাঙতে আসে মা'গী
সেই কথা মা বলে দিলি।'

অর্থাৎ পরিবারে কোন অবাঞ্ছিত রমণীর নিত্য আগমনে সন্দিগ্ধহৃদয়া কোন গৃহকর্ত্রীর প্রশ্নের জবাবে সখাইনের এই উত্তর।

পালপার্বনের বিশেষ বিশেষ দিনগুলিতে ঘরের দুয়ার জুড়ে গোবর লেপন ও অঞ্চলের সংস্কার। কিন্তু হরিমন্দিরে, দুর্গামেলায়, ষষ্ঠীতলায় এবং নিজগৃহের দুয়ারে ও তুলসীতলায় প্রতি প্রভাতে ছড়া-মাড়ুলি (গোবরলাঞ্ছিত গোল আকৃতি অংকন) প্রতি গৃহীর নিত্যকর্ম পদ্ধতি। কাজটি সাধারণতঃ বাড়ির রমণীরা করেন। রজঃস্বলা এসব করতে পারেন না। এমন কি তিনদিন পর্যন্ত তিনি অশুচি থেকে হেঁসেলে প্রবেশেরও অধিকার পান না।

সমাজ জীবনে গরু সর্বত্রই পূজিত। মানভূমে গরুর স্থান দেবদেবীর তুল্যই। ষাঁড় এখানে শিব, গাভী ভগবতী। রাধাষ্টমীতে গোয়ালপূজা প্রচলিত বিধি। গরুখুঁটায় গরুর গায়ে চিত্র বিচিত্র রঙিন ছোপ পড়ে। এখানকার সমাজজীবনে গোহত্যার পাপ অপরিসীম। গলায় পাঘা (দড়ি) বাঁধা অবস্থায় যদি গরুর মৃত্যু হয় তাহলেও সেটি গোহত্যারই সমতুল। প্রায়শ্চিত্ত এই,—হত্যাকারীকে গলায় 'পাঘা' জড়িয়ে দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে 'হাম্বা'রব করে অর্থ ভিক্ষে করতে হয়। সংগৃহিত অর্থে ব্রাহ্মণভোজনসহ নিয়মমাফিক প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।

বিড়াল এবং টিকটিকি হত্যা করলে সোনার বিড়াল ও টিকটিকি গড়িয়ে ব্রাহ্মণকে দান করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা বিধি। সোনা হারিয়ে গেলে বা সোনার জিনিস কুড়িয়ে পেলেও ব্রাহ্মণকে স্বর্ণদান বিধি।

বিকৃতি অঙ্গ নিয়ে মানভূমে জন্মানো বুঝি বা পূর্বজন্মের পাপের ফল। তা নইলে মানভূমের সংস্কারের এরকম ছড়ার সৃষ্টি কি করে!

কানা খঁড়া পিয়াদা এক মুড় জিয়াদা
স সূয়া লাখ কানা এক ইঁচা তানা
ইঁচ তানা কহে জুড়ি বিরাল আঁখিকে পরিহরি
বিরাল আঁখি কহে হাসি গর্দন কোরতা সবসে বেশি।

ছড়াটিতে কানা, খোঁড়া, ট্যারা, বিড়ালচোখা খাটো-গর্দান প্রভৃতি বিকৃতাঙ্গ মানুষ সম্বন্ধে সাবধান করা হয়েছে।

গাভীর সম্বন্ধেও বলা হয়েছে -

ধল চাঁওরা কপালে চিৎ না করে সে গলার (মনিব) হিত
গরু চিন বা না চিন খুঁচি শিংগা ধলা দেখে কিনা।

যম জামাই ভাগনা/তিন নয় আপনা'র মত এখানকার সংস্কার 'এঁড়্যা নেড়া খরগোস/তিন না মানে পোষ।'

যাত্রার মুখে ধোপা বা কলুর মুখদর্শন অযাত্রা। মাকুন্দে, কঞ্জুস বা আঁটকুড়া (নিঃসন্তান) দর্শনও সংস্কারবাদী মনের পক্ষে আতঙ্কের।

ছড়ানো ছিটানো অসংখ্য বিচিত্র সব সংস্কারের কতটুকুই বা বলা হল? কে না জানে যে ম্যাটির তলায় আমেরিকা। কিন্তু সেখানে বারো বছর পর পর একবার করে সিংহ ডাকে এবং যে শোনে সে কালা হয়ে যায় এসব তথ্য কি সবাই জানে?

মামার বিয়েতে ভাগ্নের সিঁদুর দান দেখা নিষিদ্ধ। বিয়ের দানের সিঁদুরও খুব সাবধানে রাখা উচিৎ। ডাইন, ভূতপ্রেতের নজর পড়লেই অঘটন ঘটা বিচিত্র নয়।

ছারপোকা নাকি শূলব্যথার ওষুধ। ঘেন্নাপিত্তির তাড়না এড়াতে পাকাকলার পূরে রুগীকে খাওয়ানো বিধি।

গরু বিয়োনের পর ফুল খেয়ে ফেললে সে গরুর দুধ শুকিয়ে যায়. কিন্তু ফুল পড়ার আগে জলপূর্ণ যে বস্তুটি পড়ে, সেটি তাকে খেতে দেওয়া উচিত।

সাপ নিয়ে প্রচলিত বেশ কয়েকটি সংস্কারের একটি হল, বাস্তুভিটের সাপ মারা পাপ।

অন্য একটি সংস্কারের বলে গর্ভাবস্থায় নারী স্বপ্নে সাপ দেখলে তার পুত্র-সন্তান লাভ হয়।

দুই সাপের মিলনকালে একটি বস্ত্রখন্ড কায়দামাফিক ছুঁড়ে দিলে যদি সেটি সর্পদ্বয়ের ছোঁয়া লাগে তবে সে কাপড়টি পয়মন্ত হয়। শিশুর 'ভুজান'ব (অন্নপ্রাশন) পট্টবস্ত্রখন্ডটিও দারুণ পয়মন্ত। অর্থাৎ পরীক্ষার হলে ইন্টারভিউয়ে, মামলা মোকদ্দমার ব্যাপারে, পাত্রী দেখতে, ভ্রমণে, সর্বত্র এরকম একটি বস্ত্রখন্ড সঙ্গে থাকলে আপনার মঙ্গল। কাপড়চোপড় দৈবাৎ তৈলসিক্ত হয়ে যাওয়া শুভ। আবার দৈবাৎ পৌষমাসে কাপড়ে আগুন ধরে যাওয়া গৃহস্থের পক্ষে অশুভ। প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ এ ক্ষেত্রে দগ্ধ কাপড়টি প্রতিবেশীর কাছে বন্ধক রাখা নিয়ম। সাঁঝের দীপের 'গর্ভ' পোড়াও ভাল নয়। তাই প্রদীপের তেল ফুরিয়ে সলতেটি পুড়ে ছাই হওয়ার আগেই ফুঁ দিয়ে নয় অন্যভাবে প্রদীপ নিভিয়ে দিন।

এ অঞ্চলে 'খুড়খুড়্যা' ছাতুর জন্ম কথা বিচিত্র। রামায়ণ বর্ণিত রাজা রাবণ যখন সীতা হরণ করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, জানকী সারাপথ কাঁদতে কাঁদতে গেছলেন। তাঁর অশ্রুর বিন্দুগুলি সারা পথে পড়েছে তখন। সেই অশ্রুর বিন্দুগুলিই রূপ নিয়েছে খুড়খুড়্যা ছাতুর। খুড়খুড়্যা ছাতু আমিষশ্রেণীভুক্ত।

শিয়ালপাদা আখ আর কুকুপদা আমের কথা নিশ্চয়ই শুনেছেন। শৃগালের অপকর্মজনিত

আঁখটির গোড়ার দিক লালচে হয় বিস্বাদ হয়; কিন্তু কুহুর বায়ু নিঃস্বরন আমটিকে কাঁচা অবস্থাতেই মধুর করে তোলে। গ্রামের ছেলেরা এইরকম কুহুপাদা আমের সন্ধানে এগাছ্‌ ওগাছ্‌ হয়ে ফেরে।

স্বপ্নসম্পর্কিত সাধারণ সংস্কারগুলি হল, ভোরের স্বপ্ন সত্য হয়। ছেলেরা ডানপাশ ও মেয়েরা বাঁপাশ ফিরে স্বপ্ন দেখলে স্বপ্ন সত্যি হয়, স্বপ্নে কারুর মৃত্যু দেখলে তার পরমায়ু বাড়ে, দুঃস্বপ্নের পর ঘুমিয়ে পড়া বিধি, সুস্বপ্ন দেখে উঠে ফের ঘুমিয়ে পড়লে তা নিষ্ফল হয়, স্বপ্নের কথা প্রকাশ করে ফেললেও স্বপ্ন নিষ্ফল হয় ইত্যাদি।

বিবিধ বিষয়ে বিচিত্র সংস্কার আরো আছে। যথা—পদ্মফুল ডিঙোলে গায় পদ্মকাঁটা বেরোয়, উকুন ডিঙোলে মাথায় উকুন হয়, জল বা কালি দিয়ে মেঝেতে দাগ কাটলে ঘরে ঋণ হয়, কারুর দুটি চোখের একচোখ খোলা ও অপরটি বন্ধ অবস্থায় দেখলে বাইরের কারুর সাথে ঝগড়া হয়। এ ক্ষেত্রে দুচোখ বোজার অনুরোধ জানিয়ে দুটি বন্ধ চোখ দেখে নিতে হয়।

বাংলা মাস ধরেও কিছু কিছু সংস্কার চালু আছে এই অঞ্চলে। যেমন ধরুন, জ্যৈষ্ঠ মাসে জ্যেষ্ঠপুত্রের বিয়ে দিতে নেই, আষাঢ়ে নতুন কুটুম বাড়ীতে (সাধারণত মেয়ের শ্বশুর বাড়িতে) আষাঢ়ি তত্ত্ব পাঠাতে হয়। ভাদ্রের রৌদ্রে মাথায় ঘুরলে পিত্তি পড়ে। কার্তিকে জামাই বাঁদনায় বাড়ির জামাইদের ডেকে এনে তত্ত্ব করতে হয়, মাঘের বউ নাকি বাঘ হয়। অতএব মাঘে ছেলের বিয়ে দেয়া ঠিক নয়, ইত্যাদি। এ ছাড়া ভাদ্র পৌষ ও চৈত্র - এই তিনটি ভাঙা মাসে গৃহস্থকে অনেক নিয়মকানুনই মেনে নিতে হয়। এই তিন মাসে প্রবাস যাত্রা নিষেধ। গৃহস্থ তার আশ্রিত অতিথিকেও এই মাসগুলিতে যেতে দেন না। বিশেষ করে পৌষ মাসের মাসে যদি প্রবাস থেকে স্বগৃহে আগমন ঘটে—তাও দোষের। এ ক্ষেত্রে সংক্রান্তি পোয়াতে বাইরে কাটিয়ে আসার নিয়ম। কেউ কেউ এরূপ ক্ষেত্রে সংক্রান্তির ভোরে বের হলে সূর্যোদয় হলে ঘরে ফিরেন।

মাথার ডাকুর (মাকড়শা) পেচ্ছাব করলে মাথা জুড়ে ঘা হয়। এই ঘা সারানোর দাওয়াই হল কচড়া খোলের ভাপ লাগান। বড় বড় ঘুঁটের আকারে কচড়া খৈল হাটে বাজারে কিনতে মেলে। এই খৈল গনগনে আঁচে গরম করে একটি বাটিতে রক্ষিত জলে ফেলামাত্র যে বাষ্প উদিত হয়—তার মধ্যে ঘা-যুক্ত মস্তক পেতে দেওয়ার নামই কচড়া খৈলের ভাপের সেঁক।

'টিকটিকি - বাঘের আঁচড় - খড়ম পা' বুঝলেন কিছু? ছোট ছেলে মেয়েদের মধ্যে ও সংস্কারটির চল। কেউ মলমূত্র আবর্জনা মাড়ালে সে অশুচি হল তো? সঙ্গীসাথীরা তখন ওই তিনটি আসন করে নেবে অশুচি বন্ধুটির ছোঁয়া বাঁচাতে। আঙুলের মধ্যমাকে তর্জনীতে জড়িয়ে হয় টিকটিকি, দুপায়ে আঁচড় কেটে হয় 'বাঘের আঁচড়' আর দু-পায়ের বুড়ো আঙুল দুটি বেঁকিয়ে হয় 'খড়ম পা'।

ছেলেমেয়েদের জন্মবারে অনেক পিতামাতাই ক্ষৌরকর্ম করান না, পোড়া কিছু খান না, ক্ষার বসান না বা প্রবাস যাত্রা করেন না। ভয়, পাছে তাঁদের সন্তানের অমঙ্গল হয়।

লক্ষ্মীচরিত্রের কোথাও বুঝি লেখা আছে,

গুরুবারে যেইজনা খায় মৎস্য পোড়া
সাতজন্ম গরু হয় পর জন্ম ঘোড়া।

অতএব মাছ তো মাছ এখানকার অনেক গৃহস্থ লক্ষ্মীবারে কোন দগ্ধ বস্তুই খান না, এমনকী রুটিও। এরকম গোঁড়া সংস্কারবাদীর পাশাপাশি আবার চার্বাক ঋষির মন্ত্রশিষ্যদেরও অভাব নেই—এই সংস্কারপূর্ণ কঙ্করময় রুক্ষভূমে। সংস্কার-টংস্কার কিছুই মানেন না এঁরা, বরং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নাচিয়ে বলেন 'মাকড় মাইরলে ধকড় হয়'।

মৃত্যুসংস্কারে যেসব বৈচিত্র্য চোখে পড়ে তারমধ্যে মৃতদেহের পাশে মেঝেতে একটি লোহার পেরেক পুঁতে ফেলার নিয়ম আছে এখানে। এটি প্রেতাত্মার উপদ্রব বিষয়ক সংস্কার। তারপরেও যদি তিনি দর্শন দিতে থাকেন তবে কুলোর মধ্যে ছাই নিয়ে তা উলটোভাবে ধরে ছাই পাছড়ে প্রেতাত্মাকে অন্ধ করে ফেললেই ল্যাঠা চুকে যায়।

উত্তরাধিকার সূত্রে যেসব সংস্কার মানুষের মনে স্থায়ী হয়ে গেছে তার কতকগুলি রীতিমতো অর্থযুক্ত ও যুক্তিপূর্ণ, আর কতকগুলি তাদের মানসিক দুর্বলতার সুযোগে বাসাবাঁধা। আলোচ্য প্রবন্ধে এই সংস্কারের ব্যাখ্যা থেকে বিরত হয়ে শুধু সংস্কারের প্রচলিত নিয়মকানুনগুলি পাঠকের সামনে তুলে ধরেছি। সংস্কারগুলির সবই যে মানভূমের মাটিতে জন্ম, সে দাবি প্রবন্ধ লেখকের নেই, তবে উল্লিখিত সংস্কারগুলি সবই মানভূমের কোথাও না কোথাও প্রচলিত—এ দাবি সহজেই করা চলে। এরই মধ্যে কতকগুলি যে একান্তভাবে এখানকার মাটিতেই জন্ম—সংস্কারটির রীতিবৈচিত্র্যই তার প্রমাণ।

গ্রন্থসহায়ক :

ছত্রাক ৭ বর্ষ, ৩য়, ৪র্থ সংখ্যা,
ছত্রাক ৮ বর্ষ, ১ম, ২য় সংখ্যা,

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : সংগঠন : স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব

পুরুলিয়া জিলা স্কুল-সার্ধ শতবর্ষের আলোকে

বারিদ বরণ মিশ্র

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমতম সীমান্তে,শাল, পলাশ আর মহুয়ায় ঘেরা মালভূমির ইতিহাসে, এই অঞ্চলের সর্বস্তরের মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক. অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চিন্তা-চেতনার দিশা নির্ধারণে যে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের প্রায় শতাব্দীকাল পূর্ব থেকেই অসীম প্রভাব বিস্তার করে এসেছে, সেই ঐতিহ্যশালী পুরুলিয়া জিলা স্কুল, স্বকীয় দীপ্তিতে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা মানচিত্রে যা চিরভাস্বর, অপরিহার্যভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৮৩৩ সাল। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ প্রশাসনের যৌবনকাল। চতুর্দিকে বিক্ষোভ, অসন্তোষ, বিদ্রোহের প্রকট, প্রচ্ছন্ন দাবানল। গঠিত হল নতুন জেলা মানভূম। ১৮৩৮ সাল। মানভূমের জেলা প্রশাসনিক কেন্দ্র মানবাজার থেকে স্থানান্তরিত হল পুরুলিয়া'য়। সদ্যগঠিত জেলার প্রশাসনিক কাজকর্ম, বিশেষ করে রাজস্ব বিভাগ দেখাশোনার জন্য চাই শিক্ষিত ও দক্ষ কর্মী। সম্ভবত তখনই ১৮৫৩ সালে রাজস্ব কর্মীবাহিনী গড়ে তোলার উদ্দেশ্যেই ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষার জন্য গঠন করা হয় পুরুলিয়া হাইস্কুল যা পরবর্তীকালে রূপান্তরিত হয় পুরুলিয়া জিলা স্কুল নামে।

প্রাচীন, ঐতিহ্যমণ্ডিত পুরুলিয়া জিলা স্কুলের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে দ্বিতীয় একটি মতও প্রচলিত। সেই সময়কার গভর্নর জেনারেল মেটেলিভ-এর (Metealev) প্রাইভেট সেক্রেটারি মেজর সাদারল্যাণ্ড-এর (Major Sutherland) বক্তব্য অনুসারে, ওই সময় এলাকার বিদ্রোহী জনগণকে সেনাবাহিনী দ্বারা নিয়ন্ত্রণের ফলে সাধারণ মানুষের মনে অসন্তোষ দানা বাঁধে। সেই অসন্তোষ প্রশমনের উদ্দেশ্যে, সরকারি পরিষেবামূলক কাজের দৃষ্টান্ত স্থাপনের কারণেই নাকি স্কুল স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়ে যত মতবিরোধ থাক, একথা অনস্বীকার্য, মানভূম জেলার ইতিহাসের সঙ্গে একান্ত ওতপ্রোতভাবে জড়িত পুরুলিয়া জিলা স্কুল। ১৮৫৩ সালে স্কুল স্থাপনের সময় মানভূম জেলার আয়তন ছিল ৭০০০ বর্গ মাইলেরও বেশি। এখন খণ্ডিত হতে হতে পুরুলিয়া জেলার আয়তন দাঁড়িয়েছে ২৩০০ বর্গ মাইল-এ। এই পরিসংখ্যান-ই প্রমাণ করে গত দেড়শ বছরে মানভূম ডিভিসনকে কীভাবে নজিরবিহীন ব্যবচ্ছেদ করা হয়েছে। পুরুলিয়া জিলা স্কুল যেন সেই বিবর্তনের সাক্ষ্য বুকে নিয়ে আজ ইতিহাসের নীরব সাক্ষী।

পরাধীন ভারতবর্ষের ইংরেজ শাসকদের হাতে স্থাপিত হলেও, পুরুলিয়া জিলা স্কুল প্রথম থেকেই জেলার সর্বস্তরের মানুষের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে বহুমুখী প্রভাব ফেলেছে। বিবর্তনের গতিকে ইতিবাচক ও সদর্থক করেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শোষণ

ও শাসনের বিরুদ্ধে পরাধীন ভারতে যে জাতীয় আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, সেই আন্দোলনকে বাস্তবে রূপ দেওয়া এবং আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করার জন্য পুরুলিয়া জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ঋষি নিবারণ চন্দ্র দাশগুপ্তের পদত্যাগ বিদ্যালয় পরিমন্ডলীতে শুধু নয়, জেলার সর্বস্তরের মানুষের কাছে ছিল এক দৃষ্টান্তমূলক, জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধকারী ঐতিহাসিক ঘটনা। এজন্য তাঁকে বছরের পর বছর কারাবাস করতে হয়েছে। পুরুলিয়া শহরের কেন্দ্রস্থলে তাঁর চিরঅম্লান মর্মর মূর্তি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের প্রতীক রূপে যুগ যুগ ধরে জেলাবাসীকে অন্যায়, কু-শাসন এবং সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সংগ্রাম-আন্দোলনের প্রেরণা যুগিয়ে আসছে।

বিগত দেড়শ বছরের শিক্ষা-সংস্কৃতির আন্দোলনের ক্ষেত্রে পুরুলিয়া জিলা স্কুলের শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও ছাত্রেরা শুধু রাজনৈতিক আন্দোলনেই তাঁদের বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন-এ মন্তব্য সত্যের অপলাপ। স্কুলের ছাত্রদের একাংশ দেশে, বিদেশে, কি জাতীয় কি আন্তর্জাতিক বিষয়ের ক্ষেত্রে যে ভূমিকা পালন করছেন—তার ফলশ্রুতি ১৯১২ সালে বাংলা ভাষা আন্দোলন কিংবা ১৯৫৬ সালে ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের আন্দোলন। শিক্ষক-ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন যেমন বিভিন্ন দাবি আদায়ে সফল হয়েছে তেমনি মানভূম ডিভিশনের একাংশ, যা ১৯১২ সালে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল তাকে ১৯৫৬ সালে পুনরায় ফিরিয়ে এনে পশ্চিমবাংলার শিক্ষা সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে শক্তিশালী গণ-আন্দোলন সৃষ্টিতে পথিকৃৎ এর ভূমিকা পালন করেছে। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে কর্ণওয়ালিশ পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট যখন বিভিন্ন অঞ্চলের সামন্ত প্রভুদের ব্রিটিশ সরকারের সাহায্যকারী শক্তি হিসাবে গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছে। সেই যুগে সেইসব সামন্ত পরিবার থেকে যে সমস্ত ছাত্র এই পুরুলিয়া জিলা স্কুলের শিক্ষার্থী ছিলেন তাঁদের অনেকেই আত্মত্যাগ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের শীর্ষে অগ্রগামী স্তম্ভ হিসাবে কাজ করেছেন। এই সংগ্রামের ধারা ১৯৫৬ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় পর্যন্ত অব্যাহত গতিতে চলেছে।

পুরুলিয়া জিলা স্কুল-এ সেইযুগে ব্রিটিশ শাসনের প্রয়োজনে যেমন—কেরানীকুল, উকিল, আমিন, ডাক্তার তৈরি হয়েছে, পাশাপাশি তৈরি হয়েছে, কলিয়াবী ও কলকারখানার অসংখ্য ইঞ্জিনিয়ার যাদের কর্মকুশলতার ফল স্বরূপ বোকারো ইস্পাত কারখানা, টাটা ইস্পাত কারখানা সহ বিদ্যুৎ ও অন্যান্য শিল্পে এই অঞ্চল ভারতবর্ষের শিল্প মানচিত্রে উজ্জ্বল।

এছাড়া, বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, বিশেষত পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই স্কুলের বহু ছাত্র ধারাবাহিক ভাবে সফল প্রশাসক ও অধ্যাপক হিসাবে কাজ করে আসছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগে আজও পুরুলিয়া জিলা স্কুলের ছাত্রদেরই আধিপত্য।

অতীতের মতো বর্তমানেও জেলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে পুরুলিয়া জিলা স্কুল। উন্নয়নের বিশেষত প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বহুমুখী নতুন নতুন আবিষ্কারকে তুলে ধরার জন্য এবং সেগুলি আয়ত্ত করার লক্ষ্যে মেধাশক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি, ভাষা সংস্কৃতি ও মানব সভ্যতার অবশ্য প্রয়োজনীয় মানবিক গুণগুলিকে আরও উন্নতস্তরে নিয়ে গিয়ে সংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদী মনস্কতা গড়ে তুলতে যোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে।

এই বিদ্যালয় ১৮৫৩ সালের ১ মে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রাজ্যগত অবস্থানের পরিবর্তন এবং সমান্তরাল ভাবে নীতি নির্ধারক সংস্থার বারংবার হাত বদলের প্রতিকূলতা বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী, ছাত্র, অভিভাবক ও শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিকতা ও আবেগ এর মাধ্যমে প্রতিক্ষেত্রেই কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে। প্রথমে এই প্রতিষ্ঠানের ভাগ্যবিধাতা ছিল অবিভক্ত বঙ্গ, পরে বিহার

এবং পরবর্তীতে স্থানীয়ভাবে পশ্চিমবঙ্গ। স্বাভাবিক নিয়মেই শিক্ষাবিষয়ক নীতি নির্ধারণের অভিভাবকত্ব পালন করছে যথাক্রমে—কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয় (১৮৫৭-১৯১৬), পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯১৭-১৯৫০), বিহার বোর্ড (১৯৫১-১৯৫৬) পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার (১৯৫৬) এবং বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ যৌথভাবে। তবুও কালের ভ্রুকুটি কুটিল রক্তচক্ষু অগ্রাহ্য করে প্রাকৃতিক রাজনৈতিক বহু বাধা-বিপত্তিপূর্ণ বহু সর্পিল যাত্রাপথ অতিক্রম করে পুরুলিয়া জিলা স্কুলের বর্ণময় শোভাযাত্রা অবিরাম গতিতে অগ্রসর হয়ে সার্ধশত বর্ষ অতিক্রম করেছে।

স্বাভাবিকভাবেই এই বিদ্যালয়ের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র, শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী, অভিভাবক তথা সমগ্র পুরুলিয়াবাসী বিদ্যালয়ের সার্ধশতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান বিদ্যালয়ের ঐতিহ্যের সাথে সাযুজ্য বজায় রেখে সংগঠিত করার আন্তরিক ইচ্ছা সহ সামিল হয়েছিলেন। এই অনুষ্ঠান পরিচালনার প্রয়োজনে বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রথিতযশা ব্যক্তি, জেলার প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ, বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষক-ছাত্র-অভিভাবক সমন্বয়ে একটি সার্ধশতবর্ষ উদযাপন কমিটি গঠিত হয়েছিল। এই কমিটির উপদেষ্টা মণ্ডলীতে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মন্ত্রী সংসদ, বিধায়ক যেমন ছিলেন, তেমনই ছিলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক, কবি, গায়ক, ক্রীড়াবিদ ও শিক্ষাবিদ। কার্যকরী সমিতির সভাপতি ছিলেন পদাধিকার বলে বিদ্যালয়ের সভাপতি শ্রী দেবপ্রসাদ জানা, আই. এ. এস. জেলাশাসক পুরুলিয়া। কার্যকরী সভাপতি ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রী বারিদ বরণ মিশ্র এবং সম্পাদক ছিলেন বিদ্যালয়ের সহ প্রধান শিক্ষক শ্রী রঞ্জিৎ কুমার মুখার্জী। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস ১লা মে, ১৮৫৩ হওয়ায় ২০০২ সালের ১লা মে থেকে ২০০৩ সালের ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত চারটি পর্বে বর্ষব্যাপী বিভিন্ন স্বাদের অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। প্রথম পর্বে শহরের বিভিন্ন প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের আমন্ত্রণ জানানো হয় যাতে তারা জেলার ঐতিহ্যপূর্ণ বিদ্যালয়ের মঞ্চে তিনদিন ধরে তাদের সেরা দলগত অনুষ্ঠান পরিবেশনের মাধ্যমে পরস্পরের সাথে আরো ভালোভাবে পরিচিত হয় এবং শহরের সমস্ত ছাত্রের মধ্যেই যেন পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বন্ধন গড়ে ওঠে। এই প্রচেষ্টার অভিনবত্ব ও উপযোগিতা পুরুলিয়াবাসী কর্তৃক অত্যন্ত সমাদৃত হয়। এছাড়াও বিভিন্ন বিদ্যালয়ে আন্তর্বিদ্যালয় প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নির্বাচিত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আন্তঃস্কুল সংগীত, চিত্রাঙ্কণ, আবৃত্তি ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। চতুর্থ দিনে ও পঞ্চম দিনে কলকাতার সুবিখ্যাত নাট্যদলের দুটি নাটক মঞ্চস্থ হয়। অনুষ্ঠানের প্রথম দিনে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস উন্নত মানের প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ও তথ্য সমৃদ্ধ সুদৃশ্য স্যুভেনিয়র প্রকাশ করেন। ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসকে কেন্দ্র করে দ্বিতীয় পর্বে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য বিষয় শহরের বিভিন্ন বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের প্রধানদের এবং জেলার রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান এবং আন্তঃবিদ্যালয় শিক্ষকদের ফুটবল প্রতিযোগিতা। বিদ্যালয়ের বর্ষিক পারিতোষিক বিতরণ এবং বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে ডিসেম্বর '০২ এর শেষ সপ্তাহে অনুষ্ঠিত তৃতীয় পর্বের অনুষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি ছিল সারা বাংলা "১০ কি.মি. পথ দৌড় প্রতিযোগিতা", পৌর এলাকার বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রছাত্রীদের আন্তঃস্কুল "রবীন্দ্রসংগীত প্রতিযোগিতা", কলকাতার বিশিষ্ট শিল্পী সমন্বয়ে "সংগীতসন্ধ্যা", বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ পরিবেশিত নাটক মনোজমিত্রের "সাহিত্যভূতের গল্পো" এবং শিক্ষক, শিক্ষিকা ও অভিভাবক অভিনীত নাটক মনোজ মিত্রের "নৈশভোজ"। এছাড়া বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মনোজ্ঞ বিচিত্রানুষ্ঠান। প্রতিটি অনুষ্ঠানই দর্শক ও শ্রোতৃবৃন্দ কর্তৃক অত্যন্ত প্রশংসিত হয়।

চতুর্থ তথা অন্তিম পর্বে ৩০ এপ্রিল ও ১ মে, ২০০৩ তারিখে রক্তদান শিবির, জেলা সদর হাসপাতালে রোগীদের ফল-মিষ্টি-বিস্কুট বিতরণ সহ ছাত্রদের বিজ্ঞানমূলক নাট্যানুষ্ঠান, চিত্র প্রদর্শণী, বিজ্ঞান প্রদর্শণী এবং শিক্ষক শিক্ষিকা ও অভিভাবকবৃন্দ অভিনীত পূর্ণাঙ্গ নাটক মনোজ মিত্রের "সাজানো বাগান" মঞ্চস্থ হয়। এই অনুষ্ঠানগুলিও পুরুলিয়াবাসীর মনে যথেষ্ট সাড়া ফেলে ও প্রশংসিত হয়।

বর্ষব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠান জেলার জনমানসের শুধু তাৎক্ষণিক আনন্দানুভূতি প্রদান করেনি— জেলার ভাঁটার টানে ঝিমিয়ে পড়া সংস্কৃতিক প্রবাহে জোয়ার আনে। বিভিন্ন সংস্থাকে ও বিদ্যালয় গুলিকে নব-উদ্যমে অগ্রসরের প্রেরণা জোগায়।

বিদ্যালয়ের জন্মলগ্ন থেকে সার্ধশতবর্ষের সুদীর্ঘ বন্ধুর পথ অনায়াস দক্ষতার উত্তোরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি র লক্ষ্যে মনন ও চেতনার উন্মেষ ঘটিয়ে বিদ্যালয়কে যাঁরা সাফল্যের শিখরে উন্নীত করার গুরুদায়িত্ব বহন করে এসেছেন সেই সব স্মরণীয় নমস্য—

প্রধান শিক্ষককূলের সকলের নাম কাঢদন্ত নাথ থেকে সব ডদ্ধারকরা না গেলেও যাদের জানা গেছে তাঁরা হলেন:

১.	কেদার নাথ দাশগুপ্ত	১৫.০৬.১৯১৬ পর্যন্ত
২.	বাবু হীরালাল ভট্টাচার্য	১৩.০৭.১৯১৬ "
৩.	বাবু নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত	২১.০২.১৯২১ "
৪.	বাবু আশুতোষ দত্ত	০৮.০১.১৯২৩ "
৫.	বাবু রামচরণ সেন	১৫.১০.১৯২৬ "
৬.	বাবু দেবেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী (হেড পন্ডিত)	০৬.০২.১৯২৭ "
৭.	বাবু যতীন্দ্রনাথ মিত্র (সহ-প্রধান শিক্ষিকা)	১২.০২.১৯২৭ "
৮.	বাবু জ্ঞানেন্দ্র চরণ মজুমদার (সহ-প্রধান শিক্ষক)	২৩.১২.১৯৩১ "
৯.	বাবু যতীন্দ্রনাথ মিত্র (সহ-প্রধান শিক্ষক)	০৮.০৭.১৯৩২ "
১০.	বাবু রামচরণ উপাধ্যায়	০২.০৬.১৯৩৪ "
১১.	বাবু বৈদ্যনাথ দে	১০.০৮.১৯৩৭ "
১২.	সত্যেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	১৫.০৫.১৯৪০ "
১৩.	বাবু নিত্যরঞ্জন রায় (সহ-প্রধান শিক্ষক)	০৮.০৩.১৯৪১ "
১৪.	রায়সাহেব বিমল চন্দ্র চ্যাটার্জী	২৩.০৪.১৯৪৬ "
১৫.	বাবু হরিপদ গুপ্ত	১৯.০৪.১৯৪৮ "
১৬.	সঈদ ফজলুর রহমান (ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক)	০৭.০৭.১৯৪৯ "
১৭.	সূর্যনারায়ণ সিং	১৫.০৯.১৯৫৩ "
১৮.	সন্তোষ কুমার ব্যানার্জী	৩১.০৮.১৯৫৬ "
১৯.	ধনপতি চ্যাটার্জী	৩১.১০.১৯৫৬ "
২০.	জয়গোবিন্দ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত সহ-প্রঃ শিক্ষক)	২২ ০৮.১৯৫৭ "
২১.	নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত	৩১.১০.১৯৬৭ "
২২.	সুধীর ঘোষ (ভারপ্রাপ্ত সহ-প্রঃ শিক্ষক)	২৮.১২.১৯৬৯ "
২৩.	প্রমথনাথ ব্যানার্জী (ভারপ্রাপ্ত সহশিক্ষক)	০৬.০৮.১৯৭০ "
২৪.	প্রফুল্ল কুমার সরকার—	২০.১১.১৯৭৪ "

২৫. প্রমথনাথ ব্যানার্জী (ভারপ্রাপ্ত সহ প্রধান শিক্ষক) ১১.০৪.১৯৭৬ ”
২৬. অনিল উপাধ্যায় (ভারপ্রাপ্ত সহ-প্রঃ শিক্ষক) ০২.০৫.১৯৭৭ ”
২৭. শঙ্কর দেব চক্রবর্তী ২৩.০৪.১৯৮৪ ”
২৮. নির্মল চন্দ্র ভৌমিক ১২.০২.১৯৮৭ ”
২৯. দুর্গাপদ বর্মণ ২৫.০৮.১৯৮৯ ”
৩০. কমলা প্রসাদ দাসগুপ্ত ১৬.০৭.১৯৯৪ ”
৩১. দীপঙ্কর সরকার [সহ-প্রঃ শিক্ষক (ভাঃ প্রাঃ)] ৩১.১২.১৯৯৬ ”
৩২. বটকৃষ্ণ সরকার (ভাঃ প্রাঃ সঃ শিক্ষক) ১৬.০৫.১৯৯৭ ”
৩৩. তারাদাস চ্যাটার্জী— ৩১.১০.১৯৯৭ ”
৩৪. বিরোচন মাহাতো (ভাঃ প্রাঃ সহ-প্রঃ শিক্ষক) ০৭.০৯.১৯৯৯ ”
৩৫. বিরোচন মাহাতো (প্রঃ শিক্ষক) ৩১.১০.১৯৯৯ ”
৩৬. মদন গোপাল দাস (ভাঃ প্রাঃ সহ-প্রঃ শিক্ষক) ১২.০৫.২০০০ ”
৩৭. শিব প্রসন্ন গুপ্ত (ভারপ্রাপ্ত সহ-প্রঃ শিক্ষক) ৩০.১১.২০০০ ”
৩৮. রঞ্জিৎকুমার মুখার্জ্জী (ভারপ্রাপ্ত সহ-শিক্ষক) ১৯.০৩.২০০১ ”
৩৯. বারিদ বরণ মিশ্র— ২০.০৩.২০০১ ”

জেলা সরকারি বিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী জেলার সর্বোচ্চ প্রশাসক তৎকালীন ডি. সি. এবং বর্তমানে ডি. এম. পদাধিকার বলে বিদ্যালয়ের সভাপতি হন। কীটদষ্ট পুরাতত্ত্ব থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে যে সমস্ত ডেপুটি কমিশনারের নাম (যাঁরা বিভিন্ন সময়ে পুরুলিয়া জিলা স্কুলের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন) তাঁদের নাম দেওয়া হল:

১৯১১ সাল — এল. স্টিভেনসন (L. Stevension)
১৯১৩ সাল — এস. কে. ইনগিউ (L. Ingiece)
১৯১৫ সাল — জে. লুবি (J. Luby)
১৯১৬ সাল — ডব্লিউ. ম্যাকাউফ্রেড (W. Mcaufred)
১৯১৯ সাল — রায় ব্রজেন্দ্র নাথ রায়বাহাদুর
১৯২০ সাল — সি. এল. ফিলিপ (C. L. Phillip)
১৯২৩ সাল — এম. ফকাস (M. Faukas)
১৯২৮ সাল — বি. কে. গোখেল।
১৯২৯ সাল — রায় বাহাদুর সি. সি. মুখার্জী
১৯৩৩ সাল — এস. এন. মজুমদার
১৯৩৬ সাল — এন. সেনাপতি

ডেপুটি কমিশনার

১৯৫৬ সাল — শ্রী জে. সি. সেনগুপ্ত
১৯৫৭ ” — ” বি. সি. গাঙ্গুলী
১৯৫৭ ” — ” এস. সি. বসু

১৯৫৯ ” — ” এস. এন. রায়
১৯৬০ ” — ” বি. সি. গাঙ্গুলী
১৯৬২ ” — ” এ. চৌধুরী
১৯৬২ ” — ” টি. বি. সিং
১৯৬৪ ” — ” এস. চৌধুরী
১৯৬৭ ” — ” সি. আর. গুহমজুমদার
১৯৬৮ ” — ” এ. কে. ব্যানার্জী
১৯৬৯ ” — ” পি. এন. চৌধুরী
১৯৭০ ” — ” কে. এম. লাল
১৯৭২ ” — ” এস. এন রায়
১৯৭২ ” — ” এল. বি. পারিয়ার
১৯৭২ ” - ” কে . এম লাল
১৯৭৩ ” — ” এন. আর. হালদার
১৯৭৪ ” — ” আর. জাসুমা
১৯৭৭ ” — ” কে. কে. নস্কর
১৯৭৯ ” — ” আর. কে. ত্রিপাঠি
১৯৮১ ” — ” এ. এম. চক্রবর্তী
১৯৮৩ ” — ” এ. মিশ্র
১৯৮৫ ” — ” এ. মিশ্র
১৯৮৬ ” — ” এ. বি. চক্রবর্তী
১৯৮৯ ” — ” পি. এস. কাথিরিসায়া
১৯৯৩ ” — ” এম. কে. দে
১৯৯৫ ” — ” কে. এন. বেহেরা
১৯৯৬ ” — ” এ. কে. বল
১৯৯৭ ” — ” ডি. বসু
১৯৯৯ ” — ” এ. ভট্টাচার্য
২০০০ ” -- ” এ. কে. দাস
২০০১ ” — ” ডি. পি. জানা

সুদক্ষ প্রশাসকদের তত্তাবধানে জন্মলগ্ন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এই বিদ্যালয়ে উন্নত মানের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বাতাবরণ ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে শিক্ষক মণ্ডলীর আন্তরিক প্রয়াস ও বিদ্যালয়ের ঐতিহ্য অম্লান রাখার সতর্ক মানসিকতার কারণে। ইউনিভার্সিটি ক্যালেন্ডার থেকে প্রাপ্ত সূত্রানুসারে এবং বিদ্যালয়ের নথি থেকে, যে সমস্ত কৃতী ছাত্র ভালো ফলাফল কবেছে, তাদের কিছু নাম উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

১৮৫৯ সাল — হংসেশ্বর মুখার্জী — ১ম বিভাগ
১৮৯৬ সাল — ভুবন চন্দ্র দাস — ১ম বিভাগ
১৯০৩ সাল — যতীন্দ্রমোহন দত্ত — ১ম বিভাগ

১৯০৩ সাল — ক্ষিতীশ চন্দ্র ঘোষ — ১ম বিভাগ
১৯০৩ সাল — শচীন্দ্র মোহন ঘোষ — ১ম বিভাগ
১৯০৩ সাল — শ্রীশ চন্দ্র সরকার — ১ম বিভাগ
১৯২২ সাল — আশুতোষ দুবে — ১ম বিভাগ

১৯৩১ সালে ১ম বিভাগে পাশ করেছিলেন—তারকনাথ ঘোষ, শ্যামাপদ মল্লিক, মহঃ আব্দুর রেজাক, তারাপদ মুখার্জী, সুধীর কুমার পাঠক এবং সুধীর কুমার রায়।

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদে অন্তর্ভুক্তির পর কৃতিত্ব প্রদর্শনকারী ছাত্ররা হল: ত্রিদিব কুমার রায় (১৯৫৭, মাসিক সরকারি বৃত্তিপ্রাপ্ত, ১ম বিভাগ), পরমেশ্বর চ্যাটার্জী (১৯৫৮, মাসিক সরকারী বৃত্তিপ্রাপ্ত, ১ম বিভাগ), প্রভুশঙ্কর কোটারী (১৯৬২, ১ম বিভাগ,জেলার প্রথম স্থানাধিকারী), গোপাল কৃষ্ণ ব্যানার্জী (১৯৬৩, জাতীয় মেধাবৃত্তি পাপক), প্রফুল্ল কুমার মাহাতো (১৯৬৪, ১ম বিভাগ, জেলার প্রথম স্থান অধিকারী), বারিদ বরণ দরিপা (১৯৬৪, ১ম বিভাগ, জেলার দ্বিতীয় স্থানাধিকারী)।

পরবর্তী বছরগুলিতে কৃতী ছাত্রদের তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হওয়ায় স্থানাভাবে দেওয়া গেল না।

শিক্ষা সংস্কৃতি ও ক্রীড়াক্ষেত্রে দেশে বিদেশে ছড়িয়ে থাকা কৃতী ছাত্রেরাই বিদ্যালয়ের ঐতিহ্যের নিশান সুউচ্চে তুলে ধরে আছে, আগামী দিনে উত্তরোত্তর শ্রী বৃদ্ধির মাধ্যমে এই বিদ্যালয়কে তারা শীর্ষে স্থাপন করবে।

পুরুলিয়া জেলার শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রেই পুরুলিয়া জিলা স্কুল-এর প্রভাব অপরিসীম। বারংবার ভাগ্যনিয়ন্তা পরিবর্তনের ফলে বিদ্যালয়ের গৌরবময় অতীত ইতিহাসের অনেকটাই অলিখিত থেকে গেল। ভবিষ্যতে পুরুলিয়া জিলা স্কুলের শুভানুধ্যায়ী কোনো গবেষক যদি এই শূন্যস্থান পূরণ করতে পারেন তবে জিলা স্কুলের ঐতিহ্যপূর্ণ ইতিহাস পূর্ণতা লাভ করবে।

মানভূম ভিক্টোরিয়া ইন্স্টিটিউশন

অনিল কুমার চৌধুরী

বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভের পর বহু বছর কেটে গেলেও ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষের এই পূর্বাঞ্চলের অংশটিকে কিছুতেই পদানত করে ফেলতে পারছিল না প্রাণপণ আয়াসেও। তাই, বৃহত্তর বঙ্গদেশকে দমিত করে রাখার জন্য প্রথমেই তার অরণ্য অঞ্চল 'জঙ্গল মহল'কে পৃথক ভাবে শাসনের জন্য ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের ১৩ নং রেগুলেশন দ্বারা বেঁধে ফেলা হল এবং নানা ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়ে যেমন এই বিশাল 'জঙ্গলমহল'কে খণ্ড খণ্ড করে দেওয়া হল তেমনি অপর দিকে বহুবিধ ব্যবচ্ছেদের দ্বারা সৃষ্টি করা হল এই মানভূম জেলার, যার সদর দপ্তর হল 'মানবাজার'। আবার, ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে জিলার কেন্দ্রাঞ্চলে সেই দপ্তরটিকে তুলে আনা হল অরণ্য পরিবেষ্টিত গ্রাম—'পুরুলিয়ায়', নিতান্ত প্রশাসনিক কারণেই। সেই সঙ্গে মানভূমের মুখ্য শাসক, 'প্রিন্সিপ্যাল এ্যাসিসট্যান্ট'কে মানভূমের ডেপুটি কমিশনার রূপে অভিহিত করা হতে থাকলো। খুব সম্ভবত কর্ণেল এস. আর. টিকেল্ আই. সি. এস-ই মানভূমের প্রথম ডেপুটি কমিশনার ছিলেন।

অতঃপর পুরুলিয়াকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক ও জনজীবনের উন্নতির এক জোয়ার এসে গেল। এক দিকে যেমন সরকারি অফিস-আদালত, থানা, জেল, চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় প্রভৃতি গড়ে উঠতে লাগলো, সরকারি উদ্যোগে, পরবর্তী বিশ বছরের মধ্যেই তেমনি কর্মব্যপদেশে এ অঞ্চলে এসে বসতি করা বিদগ্ধ মানুষ-জনও সামাজিক উন্নয়নের প্রয়াসে পাঠশালা, বিদ্যালয়, ক্রীড়া-সংস্থা, ক্লাব-সমিতি, রঙ্গালয় প্রভৃতির সূচনা ও স্থাপনা করে চললেন বেশ দ্রুত গতিতেই। যদিও, এই অঞ্চল তখনও বেশ জঙ্গলাকীর্ণ ছিল তথাপি প্রদেশের মানুষের শিক্ষার আগ্রহের কিছুমাত্র অভাব ছিল না। বস্তুত, সেই সময় এই এলাকায় নয়টি চতুষ্পাঠী ও বেশকয়েকটি মক্তব-মাদ্রাসা সচল ছিল। উন্নয়নশীল শহরেরবিশিষ্ট মানুষজন, সরকারি পদাধিকারী, আইন ব্যবসায়ী, চিকিৎসা ব্যবসায়ী ও স্থানীয় বণিক সম্প্রদায়ের আন্তরিক চেষ্টা ও যত্নে মানভূম পুরুলিয়ায় ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে লাগলো নানা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান—আরও অন্যতম বহুতর সংগঠন, সংস্থার পাশাপাশি।

মানভূমের পথে-প্রান্তরে পর্যটনকালে দেখেছি—, বিশেষত পুরুলিয়া শহরকে কেন্দ্র করে ২৫/৩০ মাইলের মধ্যেই প্রাপ্ত বহুতর প্রাচীন পুঁথির পাণ্ডুলিপিগুলি থেকে সহজেই অনুমান হয় যে এখানে ব্রিটিশ আধিপত্যের পূর্বকালেও বহু বর্ধিষ্ণু ব্রাহ্মণ প্রধান গ্রামের নানা স্থানে পাঠশালা, টোল, চতুষ্পাঠী প্রভৃতির অস্তিত্ব ছিল। যেখানে কাব্য, ব্যাকরণ, দর্শন, বেদ, উপনিষদ প্রভৃতির পঠন ও পাঠন প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণেরা পূজাপাঠের জন্যও নানা পুঁথির সাহায্য নিতেন।

আপাতদৃষ্টিতে সেসব শিক্ষা-ব্যবস্থা ব্যক্তিকেন্দ্রিক হলেও এইরূপ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানই ভারতবর্ষের আদর্শ স্থানীয় এবং রীতিগত। বিস্মৃত অতীতকাল থেকে অদ্যাবধি যার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় এ দেশের বহু স্থানেই। প্রসঙ্গত বলা ভাল যে ইসলামী সমাজেও ঊনবিংশ শতাব্দীর সুরু থেকেই মক্তব-মাদ্রাসার মতো প্রতিষ্ঠানও স্থাপিত ছিল। যা পরিপূর্ণ ইসলামী পদ্ধতি অনুযায়ী পরিচালিত হত।

জঙ্গল মহলের কেন্দ্রভূমি পুরুলিয়া নামে সদর কার্য্যালয় স্থাপিত হবার ১৫ বৎসর পর ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে পুরুলিয়ায় একটি 'ইংলিশ স্কুল' স্থাপন করা হয় বটে কিন্তু ছাত্র সংখ্যা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল না, দৈনিক হাজিরাও নিতান্ত নিরুৎসাহ-ব্যঞ্জক ছিল। সে সময়কার বিদ্যোৎসাহী সাহেবগণের লিখিত পত্রাবলী থেকে জানা যায় যে সে কালে শিক্ষা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই প্রকাণ্ডভাবেই সীমাবদ্ধ ছিল। বিত্তবান, জমিদার, রাজা-মহারাজাসনের বিদ্যা শিক্ষার যেমন কোনো আগ্রহ ও প্রয়োজন বোধ ছিল না, তেমনি নিম্নবিত্ত তথা বিত্তহীন বর্ণের মধ্যে এই শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ ও সুবিধা ছিল তাদের অর্থনৈতিক সামর্থ্যের বহির্ভূত। সে কারণ দীর্ঘকাল যাবৎ শিক্ষা আর প্রসার লাভ করতে পারেনি। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে ইংলন্ডের বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতি স্যার চার্লস উড্ এ অঞ্চলে উচ্চ শিক্ষার জন্য যে সুপারিশ করেন তা ব্রিটিশ ভারতে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি রচনা করে। সেই সূত্রে ১৮৭০-৭১ খ্রিস্টাব্দে সরকারি প্রচেষ্টায় ২৩টি ও স্যার জর্জ ক্যাম্পবেলের গ্রান্টস্-ইন্-এইডের সাহায্যে আরও ৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় গঠন করা হয়। ঠিক তার পরের বৎসর থেকেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি হতে হতে ৫·২৭১ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে ১৮৩টি বিদ্যালয় এ জেলায় জন্ম লাভ করে। এরই পাশাপাশি কিছু বিদ্যোৎসাহী সমাজ কর্মীগণের আন্তরিক প্রচেষ্টায় জেলার মধ্যে গড়ে উঠেছিল ৭২টি বেসরকারি বিদ্যালয়—যার ছাত্রসংখ্যা ছিল ১·২৩৮ জন। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাস পর্যন্ত দেখাগেল ৬·৯৩৮ জন ছাত্রছাত্রী গিয়ে ২৪৪টি সরকারি বিদ্যালয় চলছে। জেলার আয়তন ও তৎকালীন জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতি ২০·১৩ বর্গ মাইলে ১টি বিদ্যালয় এবং প্রতি ১৪৩ জনের মধ্যে ১জন মাত্র শিক্ষার্থী ছিল। পরবর্তী ১৫ বৎসরে সরকারি শিক্ষা বিভাগ যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছিলেন শিক্ষা বিস্তারের কাজে। ১৮৯২-৯৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ দেখা গেল ৬৬২টি বিদ্যালয়ে ১৫·৫৭৮ জন ছাত্রছাত্রী পাঠ নিচ্ছে। পরবর্তী দশ বৎসরে অর্থাৎ ১৯০১-০২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ৭২৭টি বিদ্যালয় ও ১৯·৭২৮ জন ছাত্রছাত্রী ছিল। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের জন গণনায় ৪৭·২৩৯ জন মধ্যে শিক্ষণ-পঠনক্ষমের সংখ্যা ছিল পুরুষ শতকরা ৮·০ এবং স্ত্রী শতকরা ০·৩।

এই ভাবে ধীরে ধীরে জেলার শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি হতে হতে দেখাগেল স্থাপিত বিদ্যালয়গুলির মধ্যে ২৫টি মাধ্যমিক, ৬টি উচ্চ-ইংরেজি বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। সরকারি সাহায্যে প্রথম উচ্চ-ইংরাজি বিদ্যালয় 'মডেল স্কুল' অথবা 'পুরুলিয়া হাইস্কুল' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দের ১লা মে মাসে। সেটি পরবর্তী কালে 'পুরুলিয়া জেলা স্কুল' নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে অর্থাৎ ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের নিকটবর্তী কোনো এক সময় থেকে পুরুলিয়ায় আরও একটি বিদ্যালয় চলে আসছিল—যার নাম ছিল 'ভার্নাকুলার স্কুল'। সরকার, পুরসভা ও বিদ্যোৎসাহী জনসাধারণের অনুদানে পুষ্ট এই বিদ্যালয়টি ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর শুভক্ষণে, সদ্যপ্রয়াত তদানীন্তন ভারত-সম্রাজ্ঞী এ্যালেকজান্দ্রিনা ভিক্টোরিয়ার স্মৃতি রক্ষার্থে রূপান্তরিত হল 'মানভূম ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশন' নামে।

শহরবাসীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে 'ভার্ণাকুলার স্কুল' মানভূম ভিক্টোরিয়া

ইন্সটিটিউশন নাম নিয়ে শহরের বুকে তার নিজস্ব গৃহ প্রতিষ্ঠিত হল। পঞ্চকোট রাজ পরিবারেব কাছ থেকে দানরূপে পাওয়া জমিতেও জনসাধারণের অর্থানুকুল্যে এই বিদ্যালয় গৃহ শহরের কেন্দ্র স্থলে নির্মিত হয়। স্থানটি রাঁচী রোড, বরাকর রোড, বাঁকুড়া রোড ও চাইবাসা রোডের সঙ্গমের দক্ষিণ ভাগে। জমিটি দানরূপে প্রাপ্ত হওয়ার পর শহরের বিত্তবান ও রাজখেতাবধারী কয়েকজন উদারচেতা, বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির অর্থানুকুল্যে এবং আন্তরিক উৎসাহে ও উদ্যোগে বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠা হল। প্রতিষ্ঠাতাগণের মধ্যে প্রথম সারিতে ছিলেন আইনজীবী শ্রী অনঙ্গমোহন ভট্টাচার্য্য, আইনজীবী শ্রী নন্দলাল ঘোষ, আইনজীবী রায়বাহাদুর শ্রী কৃষ্ণকিশোর অধিকারী, আইনজীবী শ্রী রামচরণ সিংহ, কুমার রামনারায়ণ সিংহ (সাঁজিলাল), ডঃ প্রসন্ন কুমার দে প্রভৃতি শহরের মুখ্য ব্যক্তিগণ। বিদ্যালয়টি ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ কবে। তথাপি কোনো অর্থ বরাদ্দ তার ভাগ্যে জোটেনি। স্থানীয় জনসাধারণ ও মানভূমের রাজন্যবর্গের অনুদানেই মূলত বিদ্যালয়ের ব্যয় সঙ্কুলান হত। কিন্তু অচিরেই ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে মানভূম জেলা বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিহার-উড়িষ্যা রাজ্যেব অন্তর্বর্তী হয় এবং বিদ্যালয়গুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। ছাত্র সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হওয়ায় এবং বিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থানটি ক্রমশ পঠন-পাঠনের অনুপযুক্ত বিবেচিত হওয়ায বিদ্যালয়ের কার্যকরী সমিতির সদস্যগণ বিদ্যালযটিকে অন্যত্র অপসারণের কথা চিন্তা করতে থাকলেন। অপসারণ পরিকল্পনাব মূল কারণ এই যে, বিদ্যালয়টির অবস্থান উন্নয়নশীল সদর শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত হওয়ায় এবং সেখানে ক্রমশ ব্যবসাকেন্দ্র ও বসতির ঘনত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় স্থানটি উত্তরোত্তর বিদ্যালয়ের পক্ষে অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছিল। তাই, স্থানান্তরে অপসারণের কথা চিন্তা করতে থাকলেন কতৃপক্ষ। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ স্থানীয় 'জারমান ইভাঞ্জেলিকেল লুথারেন' (G.E.L.) চার্চের কাছ থেকে ২৫ বিঘার মিশনগ্রাউন্ড কিনে নেন বিদ্যালয়ের কার্যকরী সমিতি। অতঃপর অর্থ সংগ্রহ করতে কেটে যায় দুই-তিন বৎসর। চলতি বিদ্যালয়ের বাড়িটি শোনা যায়, মাত্র ১০ হাজার টাকায় করিমুদ্দিন সাহেব (প্রাক্তন ডি. আই. অব স্কুলস্) কিনে নেন, মতান্তরে ১০০ বছরের ইজারাতে হস্তান্তর করা হয়। বাকী অর্থ সংগ্রহ হয় জন সাধারণ ও পঞ্চকোট রাজ-এর এককালীন ৫০০০ টাকা অনুদানে। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যালযের নূতন একতলা পাকা গৃহপ্রবেশের অনুষ্ঠান হয়। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতল গৃহের কাজ সম্পূর্ণ করা হয়। ছাত্রাবাসের গুরুতর প্রয়োজন থাকলেও সে সময়ে বিশেষ কিছু করা যায়নি। বাড়িভাড়া করে সে অভাব সাময়িকভাবে পূর্ণ করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে ঝালিদার জনৈক বিত্তশালী মারোয়াড়ী ভদ্রলোকের দানে তার সদ্যপ্রয়াত সন্তানের নামে বিদ্যালয় সীমানার মধ্যে বিশ্বনাথ হোস্টেল গৃহ নির্মিত হল। এখানে উল্লেখ্য সেই বিশ্বনাথ এই বিদ্যালয়েরই ছাত্র ছিলেন। খুব সম্ভবত সেটা ১৯৩০/৩১ খ্রিস্টাব্দ হবে। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে এই বিদ্যালয়টি সরকারি অনুদান প্রাপকের যোগ্যতা অর্জন করে বটে, কিন্তু বিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ (তখন ছাত্র ইউনিয়ন ছিল না) ভাষা আন্দোলনের সমর্থক প্রতিপন্ন হওযায় অনুদান বন্ধ থাকে। স্বাধীনতার পর থেকেই বিহার সরকার বঙ্গভাষা মানভূমের বঙ্গীয় স্বত্তা লোপ করার মানসে মানভূমের অধিবাসীগণের ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। বিদ্যালয়ে, অফিসে জনজীবনে হিন্দি ভাষাব বাধ্যতামূলক আরোপ মানযকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে লাগলো। স্থানীয় কংগ্রেস থেকে সরে আসা লোকসেবক দল এরই প্রতিবাদে ভাষা আন্দোলন গড়ে তোলেন। ভিক্টোরিয়ার ছাত্র সমাজ এরই কট্টব সমর্থকরূপে প্রতিভাত হওয়ায় বহু ছাত্রের দুর্গতির সীমা ছিল না। আন্দোলনের ফল স্বরূপ সীমানা কমিশনের রায়ে মানভূম জেলা ভেঙে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১লা নভেম্বব পুরুলিয়া জেলার জন্ম হল এবং এই জেলার মধ্যে যত

বিদ্যালয় ছিল সেগুলি সবই আবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ হল। তারপর বিদ্যালয়ের হলঘর, ব্যায়ামাগার প্রভৃতিও গড়ে ওঠে ধীরে ধীরে। মাঝে বন্ধ হয়ে যাওয়া ছাত্রাবাস পুনরায় প্রবর্তিত হল। অতঃপর একটু প্রাসঙ্গিক আলোচনা করে নিই—

পুরুলিয়া বালিকা বিদ্যালয় নামে মেয়েদেরও একটি আদর্শ বিদ্যালয় (প্রাথমিক) চলতো সমসাময়িক কালেই। আনুমানিক ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে মূলত শহরবাসীর দান ও পুরসভার অর্থ-সাহায্যে। পরে, সেটি প্রাথমিক থেকে উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত হলে নাম হয় 'পুরুলিয়া বালিকা বিদ্যালয়'। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে মধ্য ইংরাজি স্কুলে উন্নীত হয় এবং ১৯৫৩ খিস্টাব্দে উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের মর্যাদা লাভ করে। বর্তমানে এই বিদ্যালয়টি একটি বহুমুখী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মানে গৌরবান্বিত। এরই বর্তমান নাম শান্তময়ী বালিকা বিদ্যালয়।

[illegible]রেই গড়ে ওঠে মহকুমাশহর রঘুনাথপুরে একটি বিদ্যালয়—উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম বংশকে—যেটি ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে [illegible] জি. [illegible] ল্যাং ইন্‌স্টিটিউশন [illegible] আত্মপ্রকাশ করে। শহর রঘুনাথপুরে ১৮৬৮ খিস্টাব্দ থেকে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় জনসাধারণের দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছিল। পরে, স্থানীয় ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ ভকত মহাশয়ের বদান্যতায় ও তদানীন্তন ডেপুটি কমিশনার মিঃ জে. ল্যাং, আই. সি. এস. সাহেবের উৎসাহ ও সহায়তায় এই মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। রামনারায়ণ বাবুর পিতা স্বর্গত গোবিন্দ দাস (জি. ডি.) মহাশয়ের ও জে. ল্যাং সাহেবের স্মৃতি পূত এই বিদ্যালয়টি অতঃপর জি.ডি. ল্যাং ইন্সটিটিউশন নামে পরিচিত হয়।

অনুরূপভাবে মানভূম পুরুলিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে বরাহবাজারেও ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে একটি মাইনর বিদ্যালয় পরিচালিত হয়ে আসছিল। অবশেষে ১৯৪৩ খিস্টাব্দে সেটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের মর্যাদা পায়। বর্তমানে প্রাথমিক স্তর থেকে মহা বিদ্যালয় পর্যন্ত জেলায় ৩·২৫৮ টি শিক্ষায়তন গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে ১৪টি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ও ১টি মহিলা কলেজ। এখানে আরও উল্লেখ্য এই যে, ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের লোকগণনায় জানা গেছে যে, জেলায় (পুরুলিয়া) বর্তমান শিক্ষিতের হার ৭৪.১৮ শতাংশ পুরুষ ও ৩৭.১৫ শতাংশ স্ত্রী। গড় হার ৫৬.১৪ শতাংশ।

একদা স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী স্বাধীনচেতা মানুষের সমাজ-চেতনার ফলস্বরূপ তৎকালীন সমাজের বুকে অতি ক্ষুদ্র আকারে মাতৃভাষায় পঠন-পাঠনক্ষম ভার্নাকুলার স্কুলটির জন্ম হয়েছিল পুরুলিয়ায়। বলা বাহুল্য তদানীন্তন সামাজিক, রাজনৈতিক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে তার যাত্রাপথ নিতান্ত কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না তথাপি সর্বসাধারণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও ভবিষ্যৎ নাগরিকের কল্যাণের কথা স্মরণ করেই মন্থর পদে একদা এসে পৌঁছে গেল ১৯০১ খিস্টাব্দে মানভূম ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশনের পরিচিতি নিয়ে। সবকার সহায়তা এবং [illegible] আগ্রহ ও প্রয়োজনবোধের সোনার ফসল ফলতে দেরী হল না। অথচ, পরবর্তীকালে আমরা এই ভিক্টোরিয়া স্কুল (চলতিকথায়) কে জাতীয় জীবনে এক অনন্যসাধারণ ভূমিকায় পেয়ে গেলাম। পেলাম এক দুর্নিবার রাজনৈতিক সমাজ সচেতন, [illegible] বিশাল ছাত্রগোষ্ঠী এবং অপর দিকে রাজানুগ্রহ প্রতিপালিত, রাজসম্মানে ভূষিত কতিপয় উচ্চকোটির কর্মকর্তা সম্প্রদায় [illegible] বিদ্যালয়ের জীবনে ছাত্র-শিক্ষকের আদর্শগত চিন্তাধারায় মহাসাগরীয় অনৈক্যের এক সীমাহীন ব্যবধান রচিত হয়েছিল, মনে হয় এই বিদ্যালয়ের প্রথম জীবনের শুরু থেকেই। তাই আমরা দেখতে পাই, বিদ্যালয়ের শৈশব থেকেই তার ছাত্র সমাজকে স্বীয় দাবি ও অধিকারবোধে স্পর্শকাতর, সচেতন হয়ে উঠতে, অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠতে, স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে উঠতে।

ছাত্রগণের এবম্বিধ মানসিকতার ফলস্বরূপ কত ছাত্র যে বিদ্যালয় থেকে অপসৃত, বহিষ্কৃত হয়েছিলেন তার কোনো সংখ্যা লিখে রাখা হয়নি বিদ্যালয়ের নথিপত্রে। কত ছাত্রকে বিদ্যালয়-জীবন থেকে কেবলমাত্র রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত থাকার অপরাধে বিদ্যালয়জীবন থেকে নিঃশব্দে সরে যেতে হয়েছে তারও কোনো তালিকা রাখা হয়নি বিদ্যালয়ের নথিপত্রে। এখানে তারই কিঞ্চিৎ ধারাবিবরণী উপস্থিত করতে চাই।

সকল ইতিহাসেরই কিছু না কিছু বিপরীত দিক থেকেই যায়। তবে, মানভূম, ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশনের জন্ম শতবর্ষের এই উজ্জ্বল গৌরবময় লগ্নে আর সেই ঘনতমসার মলিন মন্দ ভাগ্যের কাহিনি উপস্থাপিত করবো না। কী পাইনি তার হিসাবও নয়, বরঞ্চ আজ এই বিদ্যালয়ের জীবনের সিদ্ধি কতটুকু এসেছে তারই সন্ধান করা যাক। জাতীয় জীবনে বিদ্যালয়ের অবদান কতখানি, স্বাধীনতার সংগ্রামে সারা ভারতের ছাত্রসমাজের সঙ্গে পশ্চিমবাংলার এই কনিষ্ঠতম জেলার ছাত্রগোষ্ঠীর সাযুজ্য কীরূপ ছিল অর্থাৎ, পরাধীন ভারতের মুক্তি যোদ্ধাগণের সমবায়ে জেলার স্বদেশীয়ানায় কতখানি সমন্বয় গড়ে তুলতে পেরেছিল—কেবল, সেইসব কথাই আজ এইখানে যতটা মনে আছে বিবৃত করব।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ থেকে এই শহরে দুইটি বড় উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় বেশ চলছিল। আর একটি সরকার পরিচালিত পুরুলিয়া জেলা স্কুল এবং অপরটি নাগরিকগণের পরিচালিত ভার্নাকুলার স্কুল। পরে সেটি মানভূম ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশন নামে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এই বিদ্যালয়টি যেমন একাধারে পঠন-পাঠন, খেলাধুলায় অগ্রজ জেলা স্কুলের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল তেমনি ছাত্র আন্দোলনেও অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে দেশবাসীর প্রশংসনীয় হয়ে উঠেছিল। পড়াশুনার ক্ষেত্রে যেমন বহু ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হয়ে ছাত্রবৃত্তি লাভ করেছে, বিভাগীয় বৃত্তি পেয়েছে, পেয়েছে জেলাভিত্তিক ছাত্রবৃত্তি, যা দিয়ে তাঁরা উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করে পরবর্তী জীবনে সার্থক হয়েছিলেন, তেমনি আবার ক্রীড়াক্ষেত্রে অগ্রজ জেলাস্কুলের সঙ্গে দ্বিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বীতায় অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব ও অর্জন করেছিলেন। ক্রীড়াক্ষেত্রের আজন্ম প্রতিদ্বন্দ্বী জেলা স্কুলকে ১৯৩৩ সালের স্কাউট-জাম্বুরীতে অতিক্রম করে যেতে পেরেছিলেন অতি অল্প আয়াসেই। তৎকালীন বিখ্যাত 'ব্ল্যাক ওয়াচ্' ফুটবল দলের সঙ্গে 'মিশন গ্রাউন্ডে' (বর্তমান বিদ্যালয় মাঠের তৎকালীন নাম)। এই স্কুলের ছাত্রগণ খেলায় সমতা (ড্রন) রক্ষা করেছিলেন। সে সময়ে স্কুলের জার্সি ছিল—হাঁটুর উপর ধুতি মালসাট মারা, গায়ে সাদা ফতুয়া ও নগ্নপদ। অপর পক্ষে কালো জার্সি সহ বুট-পট্টি পরা ফুটবল জগতের তৎকালীন নামী টিম 'ব্ল্যাক ওয়াচ্' দল। আজকের প্রজন্মের কাছে যা একান্ত অভাবিত।

ছাত্র আন্দোলনের রাজনীতির সঙ্গে এই বিদ্যালয়টি ওতপ্রোত ভাবেই জড়িয়ে পড়েছিল সেই শুরু থেকেই। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ৭ই আগস্টের বিদেশী বর্জন থেকে আরম্ভ করে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন পর্যন্ত নিরন্তর রাজনৈতিক ঘটনাবলীর স্রোতে বহমান ছিল এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের সংগ্রাম। স্বদেশীয়ানায় ভরা জোয়ারে ভাসমান এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ স্বদেশপ্রীতি ও জাতীয়তাবোধের যে পরিচয় রেখেছেন তা অনন্যসাধারণ। দুঃখ, কষ্ট, বঞ্চনাকে মাথার মুকুট করে কত ছাত্র শিক্ষাজগত থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেন, তাঁদের সন্ধান করে কেউ কোনোদিন স্মরণ-মননও করবে না একথা জেনেই তাঁরা দেশের কাজে—অভিভাবকগণের ইচ্ছার, বাধার বিরুদ্ধে তাঁরা নিজেদের বিলিয়ে দিয়ে গেছেন। মানভূম ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশনের শতবর্ষের এই সাড়ম্বর অনুষ্ঠানে আজ সর্বজনের দৃষ্টির অন্তরাল থেকে সেই সব বঞ্চিত নিপীড়িত ছাত্রগণের

প্রতি আমার অন্তরের প্রণতি জানিয়ে যাই, যারা দেশ-জননীর চরণ কমলে বলি প্রদত্ত হয়েছেন, নিঃস্বার্থ দেশ সেবার আদর্শ বুকে নিয়ে নিজেদের অন্ধকার ভবিষ্যতের গহ্বরে নিক্ষেপ করেছেন, অবশেষে, স্বাধীনতার মহান আহবে একদা কোথায় হারিয়ে গেছেন। আজ কেউ তাঁদের জানে না—চেনেও না।

যেসব রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে এই বিদ্যালয়টি স্বতঃই জড়িত হয়ে পড়েছিল তার সবগুলির সংবাদ আমার কাছে নেই, তবে, কিঞ্চিৎ শোনা, কিছু পত্র-পত্রিকা মারফৎ এবং বাকি আমার জীবনে প্রত্যক্ষ করা ঘটনাগুলির তালিকা নিম্নে পরিবেশন করলাম।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ৭ই আগস্ট এই বিদ্যালয়ের ছাত্র দল সম্ভবত প্রথম জাতীয়তার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়। বিদেশী বর্জন, স্বদেশী প্রচার ও সেই সঙ্গে রাখী বন্ধন অনুষ্ঠানের প্রবল তরঙ্গে ভিক্টোরিয়া স্কুলের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রগণ তাড়িত হয়েছিলেন। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে ছাত্র-শহীদ ক্ষুদিরামের ফাঁসির ঘটনায় ১১ই আগস্ট তারিখে স্কুলের বিক্ষুব্ধ ছাত্রগণ ক্লাস বয়কট করেন। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে মানভূমকে বাংলা থেকে বিহারের সঙ্গে যুক্ত করার প্রতিবাদে স্থানীয় নেতৃত্বের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ বিক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল রাউলাট আইনের প্রতিবাদ সভায় জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদ জানিয়ে বিদ্যালয় বন্ধ করতে কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করেন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের কার্লাইল সার্কুলারের প্রবল বিরোধীতায় অশান্ত ছাত্রগণ সোচ্চার হয়ে পথে নেমেছিলেন, ফলে কয়েকজন ছাত্র নেতার ছাত্র-জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। এই কার্লাইল সার্কুলারে ছাত্রগণের রাজনীতি করার, অধিকার হরণ করা হয়েছিল। ওই বৎসরেরই ২৯শে নভেম্বর লর্ড সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহের অকস্মাৎ পদত্যাগে সারা বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় যে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল—তার কেউ পুরুলিয়ার ছাত্রসমাজকেও অশান্ত করে তুলেছিল। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে তারকেশ্বর সত্যাগ্রহে যারা যোগদান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বহু যুবক এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির দ্বাদশ রাজনৈতিক সম্মেলনে পুরুলিয়ার ছাত্রসমাজ ব্যাপকভাবে স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকা পালন করেছিলেন। এই সম্মেলনে শ্রীযুক্ত মোহনদাস গান্ধীসহ বিহারের তৎকালীন প্রথম সারির সকল নেতাগণ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত বৎসরেই হিন্দু মিশনের লালা মুন্শীরাম (স্বামী শ্রদ্ধানন্দ)-এর হত্যার প্রতিবাদে ছাত্রগণের বিশাল মৌনমিছিল শহর পরিক্রমা করে। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারী সাইমন কমিশনের প্রতিবাদে বিদ্যালয় বয়কট করেন ছাত্রগণ।' ভারত শাসন আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনকল্পে যে কমিশন গঠন করা হয়েছিল তাতে কোনো ভারতীয়কে স্থান দেওয়া হয়নি—, তারই প্রতিবাদে সমগ্র দেশব্যাপী এই বয়কটের আহ্বান ঘোষিত হয়েছিল। তারপর, ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের অসহযোগ আন্দোলন ও মদিরাগৃহে পিকেটিং-এ বহু ছাত্রের অংশগ্রহণ ও কারাবরণ শহরে চাঞ্চল্যের সঞ্চার করেছিল। মোহনদাস গান্ধীর লবণ সত্যাগ্রহেও তৎকালীন বহুছাত্র যোগ দিয়েছিলেন বলেই জানা যায়। ১৯৩১ সালের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরোধিতায় ক্লাস বয়কট করেন ছাত্রগণ। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী 'স্বাধীনতা দিবসে'র অনুষ্ঠানে ১৪৪ জারি হয়। সে আইন ভঙ্গ করার অপরাধে বহু ছাত্র বন্দী হন। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে 'রামগড় কংগ্রেস'-এ দলে দলে ছাত্রগণ সাইকেলে সেখানে উপস্থিত হন। দৈব দুর্যোগে কংগ্রেসের অধিবেশন বিনষ্ট হলেও সুভাষচন্দ্রের পৃথক মঞ্চ থেকে নেতাজীর স্বাধীনতার ডাকে উদ্বুদ্ধ হয়ে পুরুলিয়ার ক্ষাত্রশক্তি শপথ নিয়ে ফিরে আসে। অবশেষে আসে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের আগুনঝরা দিনগুলি। দাহ, ধ্বংস, গুলি, হত্যা প্রভৃতির মধ্যদিয়ে। ছাত্রসমাজের ঐক্যকে সমূলে ছারখার করে দিতে পেরেছিলেন তৎকালীন

ইংরেজ সরকার—রাজখেতাবধারী কতিপয় বঙ্গসন্তানের সহায়তায়। আভ্যন্তরীণ চাপ ও বাহিরের শাসনদণ্ড ছাত্রগণের জন্য এনে দিল পুঞ্জীভূত তিরস্কার আর ভাগ্যবান রাজভক্তগণের জন্য বংশ পরম্পরাগতভাবে মহার্ঘ্য পুরস্কারের শিরোপা।

এইসবের পাশাপাশি শিক্ষককূলের কথাও কিঞ্চিৎ অবহিত করতে হয় পাঠকদের। ছাত্রগণের পরম প্রিয়জন রূপে ছিলেন সর্বশ্রী শ্রদ্ধেয় যজ্ঞেশ্বর দে, বিশ্বেশ্বর মিত্র, গোপেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, সন্তোষ কুমার ঘোষ, বসন্ত কুমার সরকার, ক্ষুদিরাম পণ্ডিত, মৌলবী সাহেব (পার্শিয়ান টিচার) প্রভৃতি হৃদয়বান, সদাশয়, মহানুভবগণ। মধ্যপন্থী ছিলেন দুই ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নরসিংহ মোহন মিশ্র, পূর্ণেন্দু সমাদ্দার, চন্দ্রবাবু, জ্যোতির্ময় অধিকারী, তিনকড়িবাবু প্রভৃতি শিক্ষকবৃন্দ। স্কুল-কর্তৃপক্ষের অনুগত রূপেও বেশ কয়েকজন ছিলেন যাঁরা নিরুত্তাপ মস্তিষ্কে কর্তৃপক্ষের নির্মম আদেশে ছাত্রগণকে দণ্ড-প্রহার করতে পারতেন। অনায়াসেই পারতেন সন্তানবৎ ছাত্রগণকে নিষ্ঠুরভাবে উৎপীড়িত করতে। ছাত্রগণের সমব্যথী আরও দুজন ছিলেন বিদ্যালয়ে যাঁরা সর্বদা ছাত্রগণের সুখে সুখী, দুঃখে দুখী হতেন। বিপদের অগ্রিম সংকেত তাঁরা সর্বদা ছাত্রদের গোপনে জানিয়ে দিতেন। অফিসের ভেতরের সংবাদ সতত আগাম জানিয়ে দিতেন ছাত্রদের। এঁদের ছাত্রপ্রেমের তুলনা নেই। এঁরা চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী বাহাদুর, মোতি এবং মোতির ভাই (নাম ভুলে গেছি)। ১৯৪২ সালের পর দীর্ঘকাল বশীভূত থেকেছে এই বিদ্যালয়টি। এমনকি স্বাধীনতার পর বহু সময় লেগেছে স্কুলটির আপন স্বকীয় মানসিকতায় ফিরে আসতে।

শতবর্ষের উপল-সঙ্কুল বন্ধুর পথে মানভূম ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউসনের সুদীর্ঘ পদযাত্রায় ছাত্রগণ নির্ভীক চিত্তে, উন্নত শিরে, জ্ঞানাহরণের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের প্রতি স্বীয় কর্তব্য পালন করে গেছেন একান্ত আন্তরিকতার সঙ্গে। দেশ ও জাতির প্রতি যথা কর্তব্য করতে কখনও পশ্চাদপদ হননি এই বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থী সমাজ। যারা এক মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হননি যে, জ্ঞানার্জন ব্যতীতও দেশমাতৃকার জন্য আরও কী কর্তব্য তাঁদের সামনে রয়েছে। আজ আমরা ভেবে অবাক হই যে, সে যুবক পরাধীনতার গ্লানি বিজ্ঞ, বিদগ্ধ মানুষের পাশাপাশি এই ছাত্রসমাজকেও কী অত্যুগ্রভাবে প্রভাবিত করেছিল, যার ফলে ফাঁসির মঞ্চে, কারার বেত্রে, জীবন-মৃত্যুর খেলা খেলে গেছেন তাঁরা নিতান্ত অবহেলায়। পুরুলিয়ার মতো এই ক্ষুদ্র অবহেলিত, প্রবঞ্চিত প্রত্যন্ত শহরে এতবড় গৌরবের আধারটিকে ধরে রাখার স্থান অদ্যাপি নির্মিত হয়নি। আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, পুরুলিয়ার এই ছাত্র-বিদ্রোহ কোনো নির্দিষ্ট নেতা ছিলেন না। ক্ষেত্রবিশেষে নেতৃত্বের জন্ম হত। নেতৃত্ব কায়েমী পর্যায়ে কখনও আসেনি, কখনও তা প্রভুত্বের ক্ষেত্রে উন্নীত হয়নি। তাঁরা সকলেই ছিলেন স্বতঃস্ফূর্ত কোনো আন্দোলনের তাৎক্ষণিক পরিচালক মাত্র। এঁরা বরেণ্য।

আজ শতবর্ষের আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে অতীতের পানে দৃষ্টি ফেরালে চিত্রমালার মতো সেইসব দিনের ঘটনাবলী চোখের সামনে ভেসে উঠে আমায় বিহ্বল করছে। সেই বিগত দিনের আদর্শবান মহান অগ্রজগণকে তাই শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করি আজকের দিনে। তাঁদের দেশভক্তি ও গৌরবময় চরিত্রের পদতলে এই জরাগ্রস্ত অকিঞ্চনের শেষ প্রণতি জানিয়ে যাই।

পুরুলিয়া সৈনিক স্কুল

অনন্ত ইয়াগনিক

কোন দেশ বা জাতিকে সুদৃঢ় করতে হলে চাই শক্ত বুনিয়াদ আর তার জন্যে চাই চরিত্রবান নাগরিক। আজকের চরিত্রবান ছাত্রই আগামীকালের দৃঢ়চেতা নাগরিক। আদর্শ বিদ্যালয়ই ছাত্রের চরিত্র গঠন করার কারখানা। এই কথা মনে রেখেই ১৯৬১ সালে কেন্দ্রীয় সামরিক বিভাগ সৈনিক স্কুল সোসাইটি গঠন করে (Societies Registration Act XXI of 1860) বিভিন্ন রাজ্যে একটি করে সৈনিক স্কুল স্থাপনের কথা চিন্তা করেছিলেন। ১৯৬১ সালের ২৩ জুন মহারাষ্ট্রে সাতারা সৈনিক স্কুল স্থাপনের মধ্যে দিয়ে এই চিন্তা ফলপ্রসূ হবার পথ খুঁজে পেয়েছিল। ধীরে ধীরে বিভিন্ন প্রদেশে একের পর এক সৈনিক স্কুল গড়ে উঠল। আজ ভারতের ১৮টি প্রদেশে ১৮টি সৈনিক স্কুল প্রকৃত চরিত্রবান নাগরিক প্রস্তুত করার দায়িত্ব বহন করে চলেছে। মহারাষ্ট্রে সাতরা ছাড়া হরিয়ানায় কুঞ্জপুরা সৈনিক স্কুল (১৯৬১), পঞ্জাবে কপুরতলা (১৯৬১), গুজরাতে বালাচারী (১৯৬১), রাজস্থানে চিতোরগড় (১৯৬১), অন্ধ্রপ্রদেশে কোড়কুন্ডা, কেরালায় কাঝাকুটাম, পশ্চিমবঙ্গে পুরুলিয়া, উড়িষ্যায় ভুবনেশ্বর, তামিলনাড়ুতে অমবাবতীনগর, মধ্যপ্রদেশে রেওয়া (সবকটি ১৯৬২), বিহারে তিলাইয়া, কর্ণাটকে বিজাপুর (১৯৬৩), আসামে গোয়ালপাড়া (১৯৬৪), উত্তরপ্রদেশে ঘোরাখাল (১৯৬৬), জম্মু ও কাশ্মীরে নাগরোটা (১৯৭০), মণিপুরে ইম্ফল (১৯৭১) ও হিমাচল প্রদেশে সুজানপুর টিরা সৈনিক স্কুল (১৯৭৮) প্রতিষ্ঠিত হয়।

সৈনিক স্কুল স্থাপনার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষায়, শারীরিক তথা মানসিক দিক দিয়ে জাতীয় সামরিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশের জন্য ছাত্রদের প্রস্তুত করা। অন্য উদ্দেশ্য হল, সামরিক বিভাগে অফিসার শ্রেণীর মধ্যে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করা; শারীরিক, মানসিক ও চারিত্রিক গুণের উন্নয়ন করে আজকের ছাত্রদের আগামীকালের সুনাগরিক তৈরি করা; পাব্লিক স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থাকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌছে দেওয়া।

সোসাইটি অ্যাক্ট অনুসারে সৈনিক স্কুল সোসাইটি গঠিত ও এর পরিচালনার ভার কয়েকজন দায়িত্বশীল সভ্যের ওপর ন্যস্ত। এই পরিচালক সমিতি (বোর্ড অব গভর্নরস) সৈনিক স্কুলগুলির জন্য নীতি নির্ধারণ, স্কুলগুলির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের অনুমোদন, স্থানীয় পরিচালন-সমিতির সুপারিশের বিচার ও অনুমোদন ছাড়া স্কুলের উন্নতি-কারক কার্যাবলি নির্দেশ করেন। কেন্দ্রীয় পরিচালন সমিতির সভাপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন কেন্দ্রীয় রক্ষা মন্ত্রী (সামরিক), সম্পাদকের সাম্মানিক পদ গ্রহণ করেন সামরিক বিভাগের একজন ডেপুটি সেক্রেটারি। যে যে রাজ্যে সৈনিক স্কুল আছে সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীগণ পরিচালন সমিতির সভ্য। সম্পাদককে সাহায্য করার জন্য সামরিক

বিভাগের কর্নেল/ব্রিগেডিয়ার পদস্থ দুইজন পরিদর্শক (Inspecting Officer) থাকেন। কেন্দ্রীয় পরিচালন সমিতি ছাড়াও প্রতি রাজ্যে যেখানে সৈনিক স্কুল আছে সেখানে একটি স্থানীয় পরিচালক-সমিতি থাকে (Local Board of Administration)। রাজ্যের সামরিক বিভাগের প্রধান বা জি ও সি ইন.সি. এর সভাপতি, রাজ্য সরকারের দুই জন কর্মাধ্যক্ষ, যে জেলায় স্কুল অবস্থিত সেই জেলার জেলাশাসক, রাজ্যের দুজন শিক্ষাবিদ, লোকসভার স্থানীয় প্রতিনিধি, অভিভাবকের মধ্যে থেকে নির্বাচিত একজন ও স্কুলের অধ্যক্ষ যিনি সম্পাদকের কাজ করেন—এই নিয়েই স্থানীয় পরিচালন সমিতি। এই সমিতি বার্ষিক আয়ব্যয়ের সুপারিশ, শিক্ষক নিয়োগ, অ-সামরিক হিসাব পরীক্ষকের অনুমোদন, আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা ও আপৎকালীন নীতি নির্ধারণের জন্য বা পরিবর্তনের জন্য সমিতির নিকট সুপারিশ ইত্যাদি আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন, কোনও শিক্ষকের বরখাস্তকরণের অনুমোদন, অত্যাবশ্যক অবস্থায় রিজার্ভ ফান্ড ব্যবহারের জন্য কেন্দ্রীয় সমিতির কাছে সুপারিশ ইত্যাদি।

এতক্ষণ সৈনিক স্কুলের বহির্বিভাগীয় দিক থেকে স্কুলের পরিচালন ও নিয়ন্ত্রিতকরণের কথা বলা হল। এবার আভ্যন্তরীণ পরিচালনার কথা বলা যেতে পারে। সৈনিক স্কুল 10 + 2 প্যাটার্ণের আবাসিক স্কুল। বিদ্যালয়ের প্রতিদিনের তথা আভ্যন্তরীণ পরিচালনার ভার থাকে এক অধ্যক্ষের ওপর যিনি সামরিক বিভাগের একজন কর্নেল / কমান্ডার / গ্রুপ ক্যাপ্টেন পদস্থ। তাঁর অধীনে দুজন সামরিক বিভাগের কর্মাধক্ষ্য থাকেন, একজন হেড-মাস্টার, যিনি একজন মেজর বা সমতুল পদের ও অপরজন রেজিষ্ট্রার যিনি সামরিক বিভাগের একজন ক্যাপটেন বা নেভি বা এয়ারফোর্সের সমতুল পদস্থ। এরপর আছেন শিক্ষক, অফিস-কর্মচারী (Office Staff) ও সাধারণ কর্মচারী (Gr IV)। বিদ্যালয়ের করণিক কার্যাবলি তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে, সাধারণ বিভাগ (General Section) যার প্রধান হলেন অফিস সুপারিনটেন্ডেন্ট, এ্যাকাউন্টস্ বিভাগ যার প্রধান একজন এ্যাকাউন্টেন্ট ও মেনটেন্যান্স বিভাগ যার প্রধান কোয়ার্টার মাস্টার। শিক্ষক ছাড়াও এন.সি.সি ও খেলাধুলা দেখাশোনা ও পরিচালনার জন্য সামরিক বিভাগ প্রেরিত চারজন কর্মী থাকেন যাঁরা J.C.O, N.C.O ও APTC NCO পদস্থ। ছাত্রদের জন্যে 'হাউসে' হোস্টেল সুপার থাকেন যাঁরা ছাত্রদের থাকা, শোওয়া, পরিধান ও অন্যান্য সুবিধের দিকে লক্ষ রাখেন। ছাত্রদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তার চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল (M.I.Room) আছে যেখানে পাশ করা অভিজ্ঞ ফারমাসিস্ট ও একজন অ্যাসিস্টেন্ট আছেন। শহর থেকে নামকরা অভিজ্ঞ ডাক্তার এসে অসুস্থ ছাত্র ও কর্মীদের চিকিৎসা করেন। ছাত্রদের ভোজনের জন্য আছে বিশাল 'মেস', যেখানে ৫৫০ জন ছাত্র যোগ্যতাসম্পন্ন দুই 'মেস ম্যানেজারের' তত্ত্বাবধানে ভোজন করে। এছাড়া ছাত্র ও কর্মীদের প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহের জন্যে আছে C.S.D.Canteen । ও টুকটাক মুখরোচক খাবার জন্যে আছে Cafetaria বা Wet Couteen. ছাত্ররা যাতে বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারে তার জন্যে আছে টেলিফোন বুথ ও পোস্ট অফিস এবং টাকা-পয়সা জমা দেওয়া ও তোলার জন্য আছে স্টেট ব্যাঙ্কের অফিস।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে অবস্থিত ১৮টি সৈনিক স্কুলের মধ্যে পুরুলিয়া সৈনিক স্কুলও একটি আবাসিক পাব্লিক স্কুল (বালকদের জন্য)। সারাদিনের ঠাসা শিক্ষাগত কার্যক্রম ও সহপাঠক্রমিক কার্যাবলি লক্ষ করলেই বোঝা যায় এই স্কুলের শিক্ষার মান কোথায়। সকাল ৫টায় শিক্ষার সংকেত ধ্বনিতে ঘুম ভাঙে। ৫-৪৫ মিঃ মধ্যেই পি.টি.শিক্ষার জন্য মাঠে উপস্থিত হতে হয়। শারীরশিক্ষা চলে ৬-৩০ মিঃ পর্যন্ত। এই সময় ছাত্ররা বিভিন্ন ধরনের শারীরিক অনুশীলন ও বায়াম শিক্ষা

করে। মাস পিটি, ক্রশ কানট্রি, যোগ, জিমন্যাসটিকস, কারাটে, টাইকোনডুর অনুশীলন এই সময়েই হয়। পিটির পরে ক্লাশে যাবার জন্যে স্কুল ড্রেস পরে তৈরি হতে হয়। এই সময় তাদের বাদাম বা ছোলা সেদ্ধ দেওয়া হয়। স্কুল আরম্ভ হয় ৭-২০ মিঃ জিরো পিরিয়ডের সঙ্গে সঙ্গে। ৭-৩৫ মিঃ প্রথম পিরিয়ড। জিরো পিরিয়ডে ছাত্রগণ কোনো বিষয়ের ওপর পালা করে ভাষণ দেয়। এর ফলে স্বাধীনভাবে কিছু বলার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাস গড়ে ওঠে। পরপর দুটি পিরিয়ডের পর প্রাতরাশ (Breakfast) মেসে প্রাতরাশ সেরে ৯-২৫ মিঃ প্রভাতী সভার (Assembly) জন্য প্রস্তুত হয়। এই সভায় প্রথমে প্রার্থনা, পরে আবৃত্তি, গল্পবলা, সংবাদ পাঠ, সাময়িক ঘটনার ওপর কোনও ভাষণ ও প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠিত হয়। সভা পরিচালনা করে সপ্তাহ ভিত্তিতে পালা করে কোনও বিশেষ সদনের ছাত্রগণ সভা শেষে অধ্যক্ষ অনুপ্রেরণা মূলক বক্তব্য রাখেন ও নতুন কোনও সংবাদ থাকলে তা ছাত্রদের কাছে পৌঁছে দেন। এই সভায় অধ্যক্ষ, প্রধান শিক্ষক, কর্মাধিকারী উপস্থিত থাকেন। ছাত্র, শিক্ষক ও সদন-অধিকারী সকলেই এই সভায় উপস্থিত থাকেন। ছাত্র শিক্ষক ও সদন-অধিকারী সকলেই এই সভায় উপস্থিত থাকেন। জাতীয় সংগীতের মধ্যে দিয়ে এই সভা শেষ হয়। এরপর অডিটোরিয়ম্ থেকে ক্লাশরুম। পরপর দুটি পিরিয়ড্। তারপর ২০ মিঃ জন্যে অবসর। এইসময় ছাত্রদের চা ও বিস্কুট দেওয়া হয়। ১১-২৫ মিঃ থেকে ১-২৫ মিঃ পর্যন্ত পঠন-পাঠনের কাজ চলে। এইভাবে সাতটি পিরিয়ড করার পর ছাত্ররা মধ্যাহ্নভোজের জন্য মেসে যায়। এখানে শিক্ষকগণ খাদ্য-গ্রহণরীতি ও শিষ্টাচার সম্বন্ধে ছাত্রদের শিক্ষা দেন। ২-০৫ মিঃ হলে স্কুল ক্যাপটেন ভোজন সমাপ্তি ঘোষণা করে। সেই সময় থেকে ৩-৪৫ মিঃ পর্যন্ত ছাত্ররা নিজ নিজ ঘরে বিশ্রাম করে। ৩-৪৫ মিঃ গেম্স প্যারেড। খেলাধুলার অনুশীলন শিক্ষার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সেইজন্য স্কুল ফুটবল, হকি, ক্রিকেট, ভলি, লনটেনিস, ব্যাডমিন্টন, স্কোয়াশ, টেবিল টেনিস প্রভৃতি খেলার আয়োজন করে। সুশিক্ষিত ইনসট্রাক্টর ও শিক্ষকদের উপস্থিতি ও উপদেশের মধ্যে দিয়ে ছাত্রগণ শরীরচর্চা করে যা সামরিক বিভাগের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। এই সময় দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্ররা অষ্টম পিড়িয়ডে U.P.S.C লিখিত পরীক্ষার জন্য শিক্ষকের কাছ থেকে ক্লাশরুমে পাঠগ্রহণ করে।

শৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে জ্ঞানের সঞ্চার হয়। সৈনিক স্কুল এই বাণীতে বিশ্বাসী। একাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সকলেরই এন.সি.সি বাধ্যতামূলক. এই সময় পৃথক পৃথক শ্রেণিকে কুচকাওয়াজ, বন্দুকের নিশানা ও সমর শিক্ষা দেওয়া হয়। আবার প্রতি বুধবার এই সময় বিভিন্ন (Club) সমিতির কার্যাবলি এক এক শিক্ষকের দায়িত্বে অনুষ্ঠিত হয়। নিজ নিজ শখ্ ও ইচ্ছা অনুযায়ী ছাত্ররা কোনও সমিতির সভ্য হয়। যেমন সাহিত্য সভা (Library Club), সংগীত সমিতি (Music Club) ইত্যাদি। এই সমিতিগুলি ছাত্রদের মধ্যে সৃজনীশক্তি ও সামর্থ্যের উন্নয়নে সাহায্য করে, ছাত্রদের ক্লান্ত মনে বিনোদনের ব্যবস্থা করে।

প্রতি শুক্রবার এই সময় সহ-পাঠক্রমিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। একে আন্তর্সদন প্রতিযোগিতা বলে। প্রতিটি হাউস বা সদনকে দুভাগে ভাগ করা হয়। দশম থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত সিনিয়র ডিভিশন এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত জুনিয়র ডিভিশন। ছাত্রগণ নিজ নিজ আবাসের পক্ষ থেকে বক্তৃতা, বিতর্কলোচনা, গ্রুপ ডিশকাশন্ প্রভৃতি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে নিজের হাউসকে জয়ী করার চেষ্টা করে। সকলেরই লক্ষ্য ও প্রচেষ্টা থাকে লেখাপড়া থেকে সহ-পাঠক্রমিক ও খেলাধুলার প্রতিটি ক্ষেত্রে সকলকে জয়ী করে Cock House হবার খ্যাতি লাভ করার (Champion House)।

সন্ধ্যা ছটার সময় সান্ধ্যকালীন 'রোল কল প্যারেডে'র পর স্কুল বিল্ডিং-এ দু ঘণ্টা বাধ্যতামূলক পড়াশুনা। পালা করে কয়েকজন শিক্ষকের উপস্থিতিতে ছাত্ররা নিজ নিজ পাঠ বুঝে নেয়। ৮-৩০ মিঃ 'মেসে' ছাত্র ও শিক্ষকদের নৈশভোজন। ভোজনের পর নিজ নিজ ঘরে বিশ্রাম করে বা পড়ে। ১০-৩০ মিঃ সংকেতধ্বনির সাথে সাথে ঘরের আলো নিভিয়ে দেয় ও বিছানা গ্রহণ করে। উচ্চশ্রেণির ছাত্ররা ক্লাশরুমে বা সদনের পাঠভবনে অধিক রাত্রি পর্যন্ত পড়াশোনা করে। এইভাবেই দিনের কাজ শেষ হয়ে যায়, আসে আর একটা দিন। পরের ক্লাশে ওঠা বা Promotion কেবল্ বাৎসরিক পরীক্ষার নম্বরেই (Marks) নির্ধারিত হয় না। বছরে দুটি Monthly tests, দুটি terminal ও বাৎসরিক পরীক্ষা হয়। প্রতিটি পরীক্ষার শতকরা হার নিয়ে তাদের সংখ্যা ১০০ করা হয়। এর মধ্যে একটি বিষয়ে শতকরা ৪০ পাশের জন্য ও সব বিষয় মিলিয়ে সর্বসাকুল্যে শতকরা ৫০ পেলে তবে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। আর বৃত্তি বা স্কলারশিপ্ রাখতে হলে কোনও বিষয়ে শতকরা ৪৫ পেতেই হবে। তবে সর্বসাকুল্যে শতকরা ৫৫ থাকলে তবেই স্কলারশিপ্ বাঁচানো সম্ভব। যে কোনও সৈনিক স্কুল ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠের ব্যবস্থা করে এবং এই পাঠ ও শিক্ষাদান ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় মধ্যশিক্ষা পর্ষত (C.B.S.E) দিল্লী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ছাত্রগণ দশম শ্রেণিতে বোর্ডের মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয় (A.I.S.S) এবং দ্বাদশ শ্রেণীতে সর্বভারতীয় উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয় (A.I.S.S.C)। আবার দ্বাদশ শ্রেণিতে পাঠকালীন সেপ্টেম্বর মাসে N.D.A এর জন্য U.P.S.C এর লিখিত পরীক্ষা। আর একটি দেয় দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা দেবার পর এপ্রিল মাসে। বছরে দু-বার এই পরীক্ষা হয়। বেশির ভাগ ছাত্র এই দুবার পরীক্ষা দিতে পারে। বয়স ১৯ হলে আর পারে না। লিখিত পরীক্ষায় যথাযথ ফল করলে সামরিক বিভাগীয় বোর্ডের (S.S.B) সম্মুখীন হতে হয়। এরপর মেধা তালিকা (Merit list) এবং তৎসঙ্গে স্বাস্থ্য পরীক্ষায় ত্রুটি না থাকলে তবেই পুনেতে খরগভসলায় (N.D.A) প্রবেশের অধিকার বা অনুমতি পাওয়া যায়। এভাবে যারা N.D.A পেল তারা নিজেদের Career হাতের মধ্যেই নিয়ে নিল আর যারা পারল না তারা ইঞ্জিয়ারিং, মেডিক্যাল, ম্যানেজমেন্ট, সেক্রেটারিশিপ, জার্নালিজম ইত্যাদি টেকনিক্যাল লাইনে এগিয়ে চলল। বলা যেতে পারে সৈনিক স্কুলের ছাত্র সামরিক বিভাগে বিগ্রেডিয়ার বা সমতুল পদ লাভ করে আছে তার সংখ্যা শতশত। অসামরিক বিভাগে উচ্চপদস্থ সৈনিক স্কুলের ছাত্রদের সংখ্যা অগুন্তি।

এরকম এক বিদ্যালয়ে সন্তান ও প্রিয়জনকে ভর্তি করে পড়াশোনা করানোর মধ্যে অবশ্যই মানসিক শান্তি আছে। যারা করেন না তাদের চিন্তা হয়ত অন্যরকম বা তাঁরা জানেন না তাদেরই রাজ্যে এরকম একটা স্কুল আছে যে স্কুল ছাত্রদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রায় সম্পুর্ণ দায়িত্ব পালন করে চলেছে। সৈনিক স্কুলে ভর্তি হতে গেলে অর্থাৎ যদি ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হয় তবে যে বছরে ভর্ত্তি হবে সেই বছরের ১ জুলাই পর্যন্ত ছাত্রের বয়স ১০ থেকে ১১-এর মধ্যে হতে হবে, আর যদি নবম শ্রেণী হয় তবে সেই বছরের ১লা জুলাই পর্যন্ত বয়স ১৩ থেকে ১৪-এর মধ্যে হতে হবে। এ বিষয়ে বিশেষ অবগতির জন্যে সারা বছরই কাজের দিনে বেলা ১টার মধ্যে স্কুলের অফিস বা রাঁচি রোডের ধারে স্কুল-গেটের পাশে ফোন বুথ থেকে ভর্তির ফর্মসহ বিজ্ঞপ্তি পুস্তিকা ৩০০ টাকার বিনিময়ে পাওয়া যায়। ডাকযোগে হলে প্রিন্সিপাল, সৈনিক স্কুল, পুরুলিয়া এই নামে ও ঠিকানায় ৩৪০ টাকার Bank Draft পাঠালেই হবে। তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য হাতেহাতে ২০০ টাকা ও ডাকযোগে ২৪০ টাকা। ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণি ছাড়া অন্য কোনও শ্রেণিতে

ভর্তি করা হয় না। নবম শ্রেণিতে ভর্তি হতে হলে অন্ততপক্ষে কোনও অনুমোদিত স্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে পাঠরত হতে হবে।

১৯৬২ সালের ২৯ জানুয়ারি সৈনিক স্কুল পুরুলিয়া শুরু হয়, কিন্তু আজ যেখানে, সেখানে নয়। পুরুলিয়া শহরের উত্তর দিকে বিবেকানন্দ নগর (বোঙ্গাবাড়ি); সেখানে জুনিয়র বেসিক ট্রেনিং কলেজের পুরানো বিল্ডিং ও তৎসংলগ্ন দুই-একটি ছোট বিল্ডিং নিয়ে এই স্কুল তৈরি হয়েছিল। তখনকার এক প্রথিতযশা শিক্ষক শ্রীযুক্ত সুশোভন সরকার এই স্কুলে প্রথম যোগদান করার সময় বলেছিলেন, "The School, then located in a few scattered buildings at 'Boungabari', certenly did not look very encouraging for a young man......" সেই অবস্থা থেকে অধ্যক্ষ-প্রতিষ্ঠাতা কর্ণেল সুপ্রভাত মজুমদার বর্তমানের এই অবস্থায় দাঁড় করিয়েছিলেন। অবশ্য এই বিষয়ে শহরের কয়েকজন গণ্যমান্য লোক ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহায়তা ছিল। এই স্থায়ী আবাসনের জন্য পুরুলিয়া শহরের ৪ কি.মি. পশ্চিমে রাঁচি রোডের ওপর মাঙ্গুরিয়ায় ২৮০ একরের মত জমি ভূমিগ্রহণ আইনে দখল নেওয়া হয়েছিল। অবশেষে ১৯৬৬ সালের ৬ ডিসেম্বর বর্তমানের স্কুল তার কার্যাবলি শুরু করেছিল। সেদিনের সেই প্রভাত বেলা থেকে আজ এই প্রখর মধ্যাহ্ন সূর্যের দীপ্তি প্রকাশে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন তাঁরা হলেন (কর্নেল মজুমদার ছাড়া, ঁতারাপদ দাস, ঁদিলীপকুমার সিন্‌হা, শ্রী আর.এন.মুখার্জ্জী, শ্রী মঞ্জরী ভূষণ ভট্টাচার্য, শ্রী মিহির ব্যানার্জী, শ্রী ফাল্গুনী দাসগুপ্ত, শ্রী ডি.কে.ব্যানার্জী, শ্রী সি.এস.মুখার্জী, শ্রী শ্যামদয়াল ঝা ও আরো অনেকে। এদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে বিখ্যাত বিখ্যাত স্কুলের প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষের মতো সম্মানীয় পদ পেয়েছিলেন। তার সাক্ষ্য দেবে ক্যালকাটা বয়েস স্কুল, ত্রিবেণী টিস্যু বিদ্যাপিঠ, স্টুয়ার্ট স্কুল, লা মার্টিনিয়ার ও সাউথ পয়েন্ট কোলকাতা। আজ ও শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মীগণ এই স্কুলকে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের সেরা স্কুলে পরিণত করার চ্যালেঞ্জ সামনে রেখে ত্যাগের আদর্শে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। আগামী দিনে এই বিদ্যালয়ের ছাত্র পাঁচজনের মধ্যে গর্ব করে বলবে। "আমি সৈনিক স্কুল পুরুলিয়ার ছাত্র। বলবে, দূরদর্শনের ডিরেক্টর সৈনিক স্কুল পুরুলিয়ার ছাত্র, রিলায়েন্সের চীফ ম্যানেজার সৈনিক স্কুল পুরুলিয়ার ছাত্র, ওয়াইপ্রোর আর ইমফোসিসের চিফ এক্সিকিউটিভ্, ভাবা এ্যাটোমিক রিসার্চ সায়েন্টিস্ট, ইউ.এন.ও এর ফিনান্স সেক্রেটারি, চিফ্ সেক্রেটারি পুরুলিয়া সৈনিক স্কুলের ছাত্র! আর্মি, নেভি, এয়ার ফোর্সের প্রধান, সেনাবাহিনীর জেনারেল সৈনিক স্কুল পুরুলিয়ার ছাত্র। আশ্চর্য হবার কিছুই নেই।

জেলা বিজ্ঞান কেন্দ্র, পুরুলিয়া

তুষার সেনগুপ্ত

১৯৬৮ সালে মানভূম ভিক্টোরিয়া ইন্‌স্টিটিউশনের দেওয়া ১০০০ বর্গফুটের একটি ঘরে স্থাপিত হয় বিদ্যালয়ভিত্তিক একটি বিজ্ঞানকেন্দ্র—যা বর্তমান পুরুলিয়া জিলা বিজ্ঞান কেন্দ্রের পূর্ব-পদক্ষেপ। এই বিজ্ঞান কেন্দ্রটি ১৯৮২ সালের ১৫ ডিসেম্বর পূর্ণাঙ্গ রূপ পেয়ে শহরের অন্যতম আকর্ষণ সাহেব বাঁধের উত্তর পাড়ে ২৫৪ একর জায়গা জুড়ে সুরম্য একটি ঘরে আত্মপ্রকাশ করে। এই কেন্দ্রের বিশেষত্ব হল এটি পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের প্রথম জিলা বিজ্ঞান কেন্দ্র। পদাধিকারবলে এই কেন্দ্রের সভাপতি জেলাশাসক এই বিজ্ঞান কেন্দ্রের দ্বারোদ্ঘাটন করেন তদানীন্তন রাজ্যপাল মাননীয় শ্রী বি.ডি.পান্ডে। জন্মলগ্ন থেকে আজও "পুরুলিয়ার সম্পদ" গ্যালারি আর "বিজ্ঞান উদ্যান" জেলাবাসীর কাছে অন্যতম আকর্ষণ। পুরুলিয়া জেলার সৃষ্টিকথা থেকে শুরু করে সংস্কৃতি, শিল্প, কৃষি, খনিজ সবকিছুরই পরিচয় পাওয়া যাবে কেন্দ্রের এই "পুরুলিয়া সম্পদ" গ্যালারিতে।

১৯৮৭ সালে স্বাধীনতার ৪০তম বর্ষপূর্তি-হিসাবে এখানে সংযুক্ত হয় "জনপ্রিয় বিজ্ঞান" গ্যালারিটি। এই বৎসরই পুরুলিয়া জেলায় প্রথম কম্পিউটার শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে এই কেন্দ্রে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি শুরু হয়। ১৯৯৫ সালে সংযুক্ত হয় "কম্পন" গ্যালারিটি এবং ১৯৯৮ সালে কেবলমাত্র শিশুদের জন্য "শিশুদের খেলাঘর" গ্যালারী। সাথে সাথে নবরূপে আত্মপ্রকাশ করে বিজ্ঞান উদ্যানও। সংযোজিত হয় "সৌর উদ্যান" অংশটি। ২০০২ সালে "কম্পন" গ্যালারির পরিবর্তে আসে "মজার বিজ্ঞান" গ্যালারীটি।

এই কেন্দ্রের "বিজ্ঞান উদ্যান'টি দর্শকদের কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয়। এতে আছে নানা দুর্লভ প্রজাতির গাছ যা কলেজ ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহারিক ক্লাশ করতে টেনে আনে। নানান মরসুমি ফুল দৃষ্টিনন্দন। ছোট ছোট বাচ্চাদের কাছে প্রধান আকর্ষণ পাখি. খরগোশ, ময়াল সাপ, হরিণ, বাঁদর প্রভৃতি। খেলার ছলে হাতেনাতে বিজ্ঞান শেখা ও শেখানোর অপূর্ব সুযোগ দেওয়ার জন্য আছে বেশ কিছু মডেল—যেমন দোলনা, প্রতিধ্বনি নল, লিভার প্রভৃতি। তবে সবচেয়ে মজার দড়ির ওপর চালানো "আজব সাইকেল", "তোমার বলের গতি', "তুমি কত জোরে দৌড়ও" প্রভৃতি মডেলগুলি। হাতে নাতে নিজের দক্ষতা বিচারের সুযোগ মেলে এগুলিতে। সৌর উদ্যানের স্বল্প পরিসরেও যে মডেলগুলি আছে তা থেকে অপ্রচলিত-তথা সৌর শক্তির ব্যবহারিক দিকগুলো

আমাদের অবহিত করে। এই উদ্যানটি সবচেয়ে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে শীতকালে। সুদূর সাইবেরিয়া, গাড়োয়াল হিমালয় থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে দুর্লভ প্রজাতির পরিযায়ী পাখিরা আসে সাহেব বাঁধে। এইউদ্যানে আছে সুন্দর একটি "পক্ষী নিরীক্ষণ কেন্দ্র"। এখানে বসে বাইনোকুলার দিয়ে পাখি দেখার এমন সুযোগ আর কোথাও নেই।

সারা বছরের প্রতিটি সময়ই ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে নানান প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয় এই বিজ্ঞান কেন্দ্রে। এর মধ্যে "বিজ্ঞান আলোচনা চক্র", "বিজ্ঞান মেলা", "কম্পিউটার মেলা","বিজ্ঞান নাটক", "বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা" প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে বেশ কিছু প্রতিযোগিতা পঃ বঙ্গ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সক্রিয় সহযোগিতায় তাদের সাথে যৌথভাবে আয়োজিত হয়। এছাড়াও বিভিন্ন স্মরণীয় দিনে যেমন "বিজ্ঞান দিবস", "বিশ্ব পরিবেশ দিবস" প্রভৃতিতে আরও নানান প্রতিযোগিতা তো লেগেই আছে। নিত্যনতুন বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সাথে ছাত্রছাত্রীদের পরিচয় করে দেবার জন্য সদাসচেষ্ট এই বিজ্ঞান কেন্দ্র। সময়ে সময়ে বাইরের এবং স্থানীয় বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে আয়োজিত হয় বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনাচক্র। ছাত্রছাত্রীদের হাতে-কলমে বিজ্ঞান শেখানোর জন্য রয়েছে বিভিন্ন শ্রেণির পাঠ্যসূচির উপযোগী "প্রদর্শনমূলক বিজ্ঞান বক্তৃতা"। প্রতি গ্রীষ্ম, শীত ও পূজার ছুটিতে আয়োজন করা হয় "হাতে-কলমে বিজ্ঞান" প্রশিক্ষণ শিবিরের। এই শিবিরগুলিতে যেমন তারা হাতে-কলমে কাজ করার সুযোগ পায় তেমনি তাদের সৃজনাত্মক প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের সুযোগও মেলে যা এককথায় অভিনব। এছাড়াও বিশেষ উৎসাহী ছাত্রছাত্রীদের জন্য সারা বৎসর ধরে চলে CAC (Creative Ability Centre)-এর কাজকর্ম।

সুদূর গ্রামাঞ্চলে বিজ্ঞান চেতনাকে ছড়িয়ে দেবার জন্য এই কেন্দ্রে রয়েছে ২৪টি মডেল যুক্ত এক ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী গাড়ি। সাথে প্রশিক্ষণের সামগ্রী, বিজ্ঞানের চলচ্চিত্র নিয়ে সারা বছর গাড়ি ঘোরে সুদূর গ্রামের স্কুলগুলিতে যাতে প্রত্যন্ত গ্রামের ছাত্রছাত্রীরা যারা হয়তো এই কেন্দ্রে আসার সুযোগ তেমন পায় না তারা এই কেন্দ্রের কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত হয়ে নিজেকে বিজ্ঞানমনস্ক করে তুলতে পারে।

প্রতি বছর আয়োজিত হয় "শিক্ষক শিক্ষণ" শিবিরও। এই শিবিরে জেলার শিক্ষক-শিক্ষিকারা হাতে-নাতে বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ বানানোর কৌশল রপ্ত করেন।

গ্রাম তথা শহরের বেকার যুবক-যুবতীদের স্বনির্ভর হয়ে ওঠার কথা মাথায় রেখে এই কেন্দ্রে সারা বছর বহু প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন হয়। তার মধ্যে "শালপাতা থেকে থালাবাটি" এবং "বীজতলা বানানো ও ফুলচাষ" প্রশিক্ষণ উল্লেখযোগ্য। উপরোক্ত প্রশিক্ষণগুলি বিনা পয়সায় করা হয়ে থাকে। এছাড়াও এই একই লক্ষ্যে রয়েছে আরো কিছু প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। যেমন, "কম্পিউটার সফ্‌টওয়্যার", "কম্পিউটার হার্ডওয়্যার", "সিল্ক স্ক্রিন ছাপাই", "বাড়ির বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম সারানো" প্রভৃতি। উদ্দেশ্য একটাই বেকার যুবক-যুবতীদের স্বনিযুক্তি প্রকল্পের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে তোলা।

খুবই সহজে আকাশকে চেনার জন্য এই কেন্দ্রে রয়েছে "তারামণ্ডল"। ছাত্রছাত্রী তথা সাধারণ মানুষ প্রতিদিন এই অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ পান। এছাড়াও টেলিস্কোপের সাহায্যে আকাশ নিরীক্ষণের সুযোগও আছে এই কেন্দ্রে।

পুরুলিয়ার এই বিজ্ঞান কেন্দ্রে না এলে আপনি অবশ্যই হারাবেন বিজ্ঞানের নানা কর্মকাণ্ডে ভরা অপূর্ব এই কেন্দ্র ঘোরার অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ।

ভারত সরকারের অধীনস্ত "রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান সংগ্রহালয়ের" পরিচালনায় এই কেন্দ্র মাননীয় জেলাশাসকের নেতৃত্বে এলাকার গুণীজন সমৃদ্ধ "স্থানীয় উপদেষ্টা মণ্ডলীর" সক্রিয় সহায়তা ও অভিভাবকত্বে এবং জেলাবাসীর ভালোবাসায় জনগণ বিশেষত ছাত্রছাত্রীদের আনন্দদানের মাধ্যমে কুসংস্কারমুক্ত ও বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলার কাজে নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

সময় সূচি

খোলা : সপ্তাহের সাতদিনই (বন্ধ কেবলমাত্র দোল ও কালীপূজার দিন)
সময় : সকাল ১০.৩০ মিঃ—সন্ধ্যা ৬.০০ (অগস্ট থেকে মার্চ)
সকাল ১১.৩০ মিঃ—সন্ধ্যা ৭.০০ (এপ্রিল থেকে জুলাই)
প্রবেশমূল্য : সাধারণের জন্য জনপ্রতি ৩ টাকা।
বিদ্যালয় থেকে আসা দলবদ্ধ ছাত্রছাত্রীদের জন্য মাথাপিছু ১ টাকা।
বিশেষ শো : তারামণ্ডল, বিজ্ঞান-ম্যাজিক এবং অপ্রত্যাশিত বিজ্ঞান (প্রতিটির আলাদা টিকিট)
ফোন : (০৩২৫২) ২২২৬৮৮, ই মেল : dsepris@sancharnet.in

পুরুলিয়ার হরিপদ সাহিত্য মন্দির

নিলয় মুখার্জী

যেখানে কোনো ঘটনা থাকে না অথবা খুবই কম উল্লেখযোগ্য ঘটনা থাকে সেখানে ইতিহাস লেখার বিষয়টা হয় অত্যন্ত সহজ। কিন্তু যেখানে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধারার ঘটনাবলী সংঘটিত হয় সেখানে ইতিহাস বিধৃত করার বিষয়টি কিছুটা হলেও দুরূহ হয়ে পড়ে। ইতিহাস সংরক্ষণের বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কর্মকর্তার মধ্যে একটা অনীহা থাকায় যথাযথভাবে তা সংরক্ষিত হয়নি। ফলে কোনো দিনই সাহিত্য মন্দিরের পূর্ণাঙ্গ ইতিবৃত্ত প্রকাশিত হবেনা।

৮২ বছরের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় সাহিত্য মন্দির নামে বটবৃক্ষের শাখা-প্রশাখা-পত্রালি এতটাই বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ যে অসম্পূর্ণ ইতিহাসের কালানুক্রমিক ইতিবৃত্ত বর্ণনা করতে হলে "সাহিত্য মন্দির" নামে আলাদা একটি গ্রন্থ প্রকাশ করতে হবে। ফলে উল্লেখযোগ্য কিছুটা ঘটনাই এই লেখার মাধ্যমে তুলে ধরবো। বর্তমান শতকের প্রথম মহাযুদ্ধের সমসাময়িক কালে মানভূম জেলার সদর দপ্তর পুরুলিয়াতে শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে নূতন সংস্কৃতি চেতনা ও সামাজিক ভাবধারায় গ্রন্থাগার স্থাপনের চিন্তা ভাবনার উন্মেষ শুরু হয় এবং সংগঠিত প্রয়াসেরও সূচনা দেখা দেয়। সেই সময় গ্রন্থাগারের প্রতীক অস্তিত্ব-উচ্চ বিদ্যালয়ে, স্থানীয় বার লাইব্রেরীর আইন ঘটিত পুস্তক এবং বিশিষ্ট আইনজীবিদের নিজস্ব আইন-সংক্রান্ত পুস্তক, জার্নাল প্রভৃতি সংগ্রহের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। আর সেই সময়ে শহরের বুকে কোর্ট-কাছারি-আদালতের চৌহদ্দির মধ্যে নিজস্ব কৌলিন্য ও আভিজাত্য নিয়ে ইয়োরোপীয়ান ক্লাব বিরাজ করছিল। বর্তমানে যেখানে এম. এম. হাই স্কুল ও চিত্তরঞ্জন হাই স্কুল অবস্থিত সেই স্থানটিতেই ছিল অধুনা লুপ্ত ইয়োরোপীয়ান ক্লাব। এই ক্লাবের সদস্য পদ ও প্রবেশাধিকার ইয়োরোপীয়ান রাজকর্মচারী, মিশনারী প্রভৃতি শ্বেতকায়দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই ক্লাবেও খেলাধুলার সঙ্গে নিছক মনোরঞ্জনের জন্য ইংরাজি পত্র-পত্রিকা ও পুস্তকাদি রাখা হত।

সেই সময়ে সরকারি উদ্যোগে কোনও গ্রন্থাগার স্থাপনের যেমন কোনও প্রশ্নই ছিলনা তেমনি সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য কোনও সাধারণের গ্রন্থাগারের কোনও অস্তিত্বও ছিলনা। এইরূপ সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপনের শুভ সূচনা করেন শহরের কয়েকজন শিক্ষিত যুবক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রিপ্রাপ্ত তরুণ যুবক কালীপদ দত্ত এই গ্রন্থাগার স্থাপনে বিশেষ উৎসাহী ও উদ্যোগী হন এবং মুনসেফডাঙার তাঁর কতিপয় অন্তরঙ্গ বন্ধু সাধুচরণ সাও, হরিপদ সেন, সত্যকিঙ্কর সেনগুপ্ত, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় রাম রতন চৌধুরী প্রমুখেরাও আগ্রহের সঙ্গে সাড়া দেন।

এই গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রথম সংগঠিত উদ্যোগ হল মুনসেফডাঙার হরিসভার প্রাথমিক বৈঠকে। ১৩২৭ সনের ২০শে অগ্রহায়ণ তারিখের এই সভার শ্রীশ চন্দ্র তেওয়ারী মহাশয় সভাপতিত্ব করেন এবং গ্রন্থাগার স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

দীর্ঘ তিন মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর ও যখন প্রস্তাবিত গ্রন্থাগারটিকে রূপদান করা সম্ভব হল না— সেই পরিস্থিতিতে তরুণ উদ্যোক্তারা নিরাশ না হয়ে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে সাধারণ পাঠাগার কোনও ধর্মসভার সাথে সংশ্লিষ্ট না থাকাই বাঞ্ছনীয়। কারণ এতে নানা বাধ্য বাধকতা ও বিধি নিষেধের প্রশ্ন দেখা দিতে পারে, যেগুলি সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপন ও তার বিকাশের পথে অন্তরায় স্বরূপ হবে। সেই অনুযায়ী ১৩২৭ সানের ২৬শে চৈত্র (ইং ১৯২১ সালের মার্চ মাস) স্বতন্ত্র ভাবে গ্রন্থাগার স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পুরুলিয়া শহরের অন্যান্য পাড়াতেও বিক্ষিপ্ত ভাবে গ্রন্থাগার স্থাপনের উদ্দেশ্যে যে সব আলোচনা কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল সেগুলি যতদূর সম্ভব সুসংহত করে মূল প্রচেষ্টার মধ্যে কেন্দ্রীভূত করা হয়। এই প্রচেষ্টা আত্মপ্রকাশ করে গ্রন্থাগারের জন্য প্রায় পনেরোটি পুরাতন পুস্তক ও একটি কেরাসিন কাঠের পুরাতন আলমারি সংগ্রহের মাধ্যমে যা নকুল চন্দ্র সেন মহাশয় দান করেছিলেন (আলমারিটি এখনো সাহিত্য মন্দিরে বর্তমান)। এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে "সাহিত্য মন্দির" নামে গ্রন্থাগার আত্মপ্রকাশ করল। এই সাহিত্য মন্দিরের প্রথম সভাপতি হলেন কালিপদ দত্ত। আরও যে সকল যুবক এই কাজে অগ্রণীর ভূমিকা নেন তাঁদের মধ্যে অন্নদা কুমার ব্যানার্জী, অনন্ত কুমার সেন, গোপাল চন্দ্র চৌধুরী, বসন্ত কুমার দাঁ, সহদেব সেন, নকুলচন্দ্র সেন, রাজকিশোর মাহাত, মৃগাঙ্ক শেখর বসু প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এইভাবে সাহিত্য মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হল।

১৩২৭ সন (ইং ১৯২১ সাল) আমাদের কাছে এক স্মরণীয় বৎসর। এটি স্মরণীয় দুটি কারণে। প্রথমত সাহিত্য মন্দির গ্রন্থাগার হিসেবে রূপ গ্রহণ করল। দ্বিতীয়ত ১৩২৭ সালের ৭ই পৌষ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতনের বীজ বপন করেন।

১৩২৮ সাল এই সদ্যজাত শিশু প্রতিষ্ঠানটি তখনও নিঃসম্বল ও নিরাশ্রয়। বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করে পুস্তকের সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি পেলেও গ্রন্থাগারের তখনও মাথা গোঁজার কোনও ঠাঁই হয়নি! কখনো শ্রীকণ্ঠ সেনের বৈঠকখানায়, কখনো মুনসেফ ডাঙা প্রাইমারি স্কুলে, কখনো প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়-এর বৈঠকখানায়, আবার কখনো সাধুচরণ সাও এর স্টাডি রুমে গুটি কয়েক বই রেখে ততোধিক সীমাবদ্ধ সংখ্যক গ্রাহকদের মধ্যে পুস্তক লেনদেনের কাজ। অর্থাৎ গ্রন্থাগার পরিচালনার কাজ চালানো হত।

এই নবজাত শিশু প্রতিষ্ঠানটিকে বাঁচিয়ে রাখার গভীর আগ্রহে উদ্যোক্তারা ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরতে আরম্ভ করলেন। সাধ্যমত সকলেই কিছু কিছু সাহায্য করেন। সেই সময়ে অর্থ ও পুস্তক দিয়ে সাহিত্য মন্দিরকে যাঁরা বিশেষভাবে সাহায্য করেন তাঁদের মধ্যে লালিত কিশোর মিত্র, শচীন্দ্রমোহন ঘোষ, রায় বাহাদুর সতীশ চন্দ্র সিংহ, শশধর গাঙ্গুলী, যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, বড়রার ঠাকুর সাহেব, নোওয়াগড়ের নীলকণ্ঠ সিং দেও প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে আরও একজন সহৃদয় ব্যক্তির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য তিনি হলেন রাম কিষেণ সাও যিনি নিজের বৈঠকেখানাতে স্থান দিয়ে এই আশ্রয়হীন প্রতিষ্ঠান সাহিত্য মন্দিরকে আশ্রয় দান করেন।

প্রথমে ৪১টি পুস্তক ও ১৭জন গ্রাহককে নিয়ে সাহিত্য মন্দির শুরু হয় এবং প্রতিষ্ঠানের

গঠনতন্ত্র অনুসারে ডোনার ও সাধারণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যাঁরা এককালিন ১০ টাকা অর্থ সাহায্য দেন তাঁরা ডোনার শ্রেণীভুক্ত হন এবং মাসিক চার আনা চাঁদা দিয়ে যাঁরা পুস্তক লেনদেন করেন তাঁরা সাধারণ শ্রেণীভুক্ত হন।

সাহিত্য মন্দিরের প্রথম কার্যকরী সমিতির কর্মকর্তারূপে কালিপদ দও সভাপতি এবং সুবোধ কুমার সেন সম্পাদক হন। কার্যকারী সমিতির সদস্যরূপে ছিলেন সাধুচরণ সাও, হরিপদ সেন, সুকুমার বিশ্বাস, রঘুপতি চ্যাটার্জী মৃগাঙ্ক বিশ্বাস, রামরতন চৌধুরী, শৈলেন্দ্র মিত্র ও শিশির দাশগুপ্ত। সাহিত্য মন্দির পরিচালনার এই প্রথম পর্বে নানা বিরোধ ও বাধা নিষেধের বেড়া অতিক্রম করতে হয়, তখন দেশ ব্যাপী বিদেশি বর্জন ও অসহযোগীতা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম বিরোধ দেখা দেয় ইংরাজী সাহিত্য সম্পর্কে। সিদ্ধান্ত হয় যে ইংরাজি পুস্তক রাখা চলবে না। তারপর নাটক, উপন্যাস প্রভৃতি গ্রন্থ মানুষের চরিত্র নষ্ট করে সুতরাং এই রূপ গ্রন্থের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে কেবল ধর্মগ্রন্থ রাখার বিধান দেওয়া হয়।

দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া উত্তপ্ত হতে থাকায় প্রবীণের দল বিশেষ আতঙ্কিত হয়ে উঠেন এবং সাহিত্য মন্দিরকে রাজনৈতিক আবহাওয়া থেকে মুক্ত রাখার জন্য রাজনৈতিক পুস্তকের উপরও নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করতে চান। কিন্তু নবীনের দল এতে প্রায় বিদ্রোহী হয়ে উঠেন। নবীনেরা এই পর্যন্ত্য রাজী হলেন যে সরকার ও পুলিশের নজর থেকে দূরে রাখার জন্য সরকারের নিষিদ্ধ করা কোনও রাজনৈতিক পুস্তক রাখা হবে না তবে অন্যান্য রাজনৈতিক ভাবাপন্ন পুস্তক থাকবে।

১৩২৮ সালের ২৬শে চৈত্র (ইং ১৩/৪/২২) সাহিত্য মন্দিরের প্রথম বাৎসরিক অধিবেশন হয়। এই অধিবেশন সভাপতিত্ব করেন শাক্য সিংহ সেন, ১৩২৯ সালের পৌষ মাসে গ্রন্থাগারের সঙ্গে একটি অবৈতনিক পাঠ কেন্দ্রের সংযোজন করা হয়। এইভাবে পুস্তক লেনদেন ছাড়াও গ্রন্থাগারের কর্মক্ষেত্র ও পরিধি বিস্তার করা হয়। সেই সময় এই অবৈতনিক পাঠাগারের জন্য ইংরাজি দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকা ও সাপ্তাহিক বিজলী নেওয়া হত। যে সব মাসিক পত্রিকা নেওয়া হতো তার মধ্যে ইংরাজি মাসিক মডার্ন রিভিউ এবং বাংলা মাসিক পত্রপ্রবাসী, ভারতবর্ষ, বসুমতী, মানসী, প্রবর্তক বঙ্গবাণী, ভারতী, উদ্বোধন ও সন্দেশ।

এই গ্রন্থাগার পরিচালনায় নানা অসুবিধা থাকার দরুণ এবং কার্যকরী সমিতির সকল সদস্যই বিভিন্ন সরকারি বা আধাসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী হওয়ায় কাজের দিনগুলিতে সেভাবে সময় দিতে না পারার কারনে সাহিত্য মন্দির প্রতিদিন খোলা সম্ভব হত না। সেই কারণে, প্রাথমিক অবস্থায় সাহিত্য মন্দির অনেকটা সান্ডে লাইব্রেরী তথা রবিবাসরীয় গ্রন্থাগার পর্যায়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

১৩২৯ সালের ২১শে চৈত্র সাহিত্য মন্দিরের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী হরিনাথ ঘোষ মহাশয়। হরিনাথ বসু আইন ব্যবসার অবসরে ইতিহাস ও প্রাচীন সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করতেন। মামলার নথিপত্র থেকে আদিবাসী সর্দারদের বীরত্ব ও সংগ্রামের বিবরণ ও তাদের দেশ প্রেমের চিত্র সংগ্রহ করে ও গবেষণা চালিয়ে "লাল সিংহ" নামে এই জেলার ঐতিহাসিক কাহিনি সম্বলিত পুস্তক রচনা করেন। ওই অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে মানভূমের ঐতিহাসিক বিবরণসমূহ লিপিবদ্ধ কবার এবং প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সমুহ অনাদৃত অবস্থায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সে সমস্ত সংগ্রহ করার প্রয়োজনীয়তার উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

১৩৩০ সাল থেকে সাহিত্য মন্দিরকে সুচারুরূপে পরিচালনার সুসংহত প্রয়াস শুরু হয়।

ওই বৎসরের ভাদ্র মাস থেকে গ্রন্থাগারের ভ্রাম্যমান বিভাগ প্রথম চালু করা হয়। ভ্রাম্যমান বিভাগের সদস্য/সদস্যাদের জন্য মাসিক ছয় আনা চাঁদা ঠিক করা হয়।

সমগ্র মানভূম জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের অগ্রণী পথিকৃৎরূপে সাহিত্য মন্দির যেমন জনপ্রিয়তা ও জনসমর্থন লাভ করতে থাকে— সেই সঙ্গে সরকারী স্বীকৃতিও লাভ করে। মানভূমের তদানীন্তন ডেপুটি কমিশনার মিঃ ই-ওলি সাহিত্য মন্দিরের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে সরকারের Petty Works Improvement Grant তহবিল থেকে আসবাব পত্র ক্রয়ের জন্য ৭০ টাকা মঞ্জুর করেন। সেই সময় মানভূম-সিংভূমের সেসন্স জজ মিঃ এফ. এস. ম্যাকফার্সনের চেষ্টার ও তত্ত্বধানে তদানীন্তন সেটেলমেন্ট অফিসার মিঃ ডিক্সির প্রায় ৮০০ টাকা মূল্যের ইংরাজি বইগুলি মাত্র ১৫০ টাকায় সাহিত্য মন্দির পায়। ওই পুস্তকগুলির মধ্যে Encyclo Paedia Britannica র খন্ডগুলি ছিল যা সাহিত্য মন্দিরে এখনো বর্তমান। সাহিত্য মন্দির পুস্তক লেনদেন ও পঠন-পাঠন ছাড়াও খেলাধুলায় উৎসাহদানে বিশেষ আগ্রহী ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯২৪ সালে "সাহিত্য মন্দির ফুটবল কাপ" নাম দিয়ে একটি ফুটবল প্রতিযোগিতার শুরু করা দেখে। বর্তমান কার্যকরী কমিটিও গত ২০, ২১, ২২শে ডিসে: ২০০২ সাফল্যের সাথে রাজ্য যোগাসন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করে। ১৯২৬ সালে শ্রীকণ্ঠ সেন এবং সুরেশচন্দ্র সরকার পুরুলিয়া পৌরসভার কমিশনার নির্বাচিত হন এবং তাঁদের চেষ্টায় পুরুলিয়া পৌরসভা কিং এডোয়ার্ড মেমোরিয়াল ট্যাঙ্কের পাশ ৩০ বছরের জন্য লিজে বার্ষিক ১ টাকা যাজনায় গ্রন্থাগার স্থাপনের জন্য সাহিত্য মন্দিরকে এক খণ্ড জমি দেয়। কর্মকর্তারা ঠিক করলেন ওই জমিতে স্থায়ী গ্রন্থাগার গড়ে তোলার জন্য স্থানীয় জনসাধারণের কাছ থেকে দান সংগ্রহ করা হবে। প্রথম এগিয়ে আসেন হরিপদ দাঁ নামে একজন ঠিকাদার এবং অবসর প্রাপ্ত কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। হরিপদ দাঁ উক্ত জমিতে একটি কক্ষ গড়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন বিনিময়ে তিনি স্বীকৃতি হিসেবে তাঁর নাম সাহিত্য মন্দিরের সাথে সম্পৃক্ত করার প্রস্তাব দেন। সাহিত্য মন্দির কর্তৃপক্ষ তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হলে তিনি কক্ষটি তৈরি করা শুরু করেন। পরবর্তীকালে জানা যায় পৌরসভা কেবল মাত্র গ্রন্থাগার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার শর্তে সাহিত্য মন্দিরকে জমিটি হস্তান্তর করেছেন। কোন কারণে সাহিত্য মন্দির কর্তৃপক্ষ উদ্দীষ্ট লক্ষ্যপূরণে বিচ্যুত হলে তা পৌরসভা পুনরায় অধিগ্রহণ করবেন। এই শর্তের কথা জানতে পেরে দাঁ মহাশয় নির্মাণ কাজ স্থগিত রাখেন। পরবর্তীকালে (৩০শে জুলাই ১৯২৬) পৌরসভা সিদ্ধান্ত নেয় যে কোন কারণে সাহিত্য মন্দির কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পৌরসভা জমি অধিগ্রহণ করলেও নির্মিত গৃহের সাথে হরিপদ দাঁ মহাশয়ের নামটি অচ্ছেদ্যবন্ধনে জড়িত থাকবে।

সাহিত্য মন্দিরের গৃহনির্মাণের পর ২১শে বৈশাখ ১৩২৭ সালে (১৯২৬) অক্ষয় তৃতীয়ার দিন নূতন ভবনের উদ্বোধন ও গৃহপ্রবেশের অনুষ্ঠান হয়। ১৯২৬ সালে সাহিত্য মন্দিরের নাম পরিবর্তিত হয়ে নূতন নাম হল হরিপদ সাহিত্য মন্দির।

হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের কাজে খুশি হয়ে পুরুলিয়া পৌরসভা ১৯২৭ সালের জুন মাস থেকে মাসিক কুড়ি টাকা করে অনুদান দেওয়া শুরু করে। বর্তমানে যা মাসিক পাঁচশত এক টাকাতে দাঁড়িয়েছে।

১৯২৭ সালে প্রতিশ্রুতি মতো কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর স্ত্রী সুশীলা দেবীর স্মৃতিতে একটি কক্ষ গড়ে দেন। ১৯২৭ সালে সাহিত্য মন্দিরের কর্মকর্তাদের উদ্যোগে ইম্পিরিয়াল সার্কাস তাদের একদিনের বিক্রির সমস্ত অর্থ দান করেন।

১৯২৭ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে সাহিত্য মন্দিরের সদস্যরা সম্বর্ধনা জানান।

১৯২৮ সালের ২৬শে এপ্রিল দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসবে কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন। দিনটিকে স্মরণীয় রাখতে বর্তমান কার্যকরী সমিতি গত ২৬শে এপ্রিল ২০০৩ সাহিত্য মন্দির চত্বরে শরৎচন্দ্রর একটি আবক্ষ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন।

সাহিত্য মন্দিরের ৩১/৮/২৭ তারিখের সভায় এক বিচিত্র পরিস্থিতিতে এক অভূতপূর্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সুবাসিনী নামের এক বারাঙ্গনাকে গ্রন্থগারে গ্রাহক তালিকাভুক্ত হতে দেখা যায়। গ্রন্থাগার ও সাধারণের পক্ষে ঘটনাটি বিশেষ "লজ্জাজনকও আপত্তিকর" হবে ভেবে সুবাসিনীর সদস্য পদ খারিজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই সূত্রে বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয় হল সেই সময়ে এই শ্রেণীর নারীর মধ্যেও পাঠচর্চার ইচ্ছা।

১৯২৬ সালের অক্টোবরে সমসাময়িক "মুক্তি" পত্রিকা মারফত স্থানীয় যুব সমাজকে আহ্বান করে জেলার একমাত্র প্রত্নবিদ হরিনাথ ঘোষ মহাশয় মানভূমের ঐতিহাসিক উপকরণ সংগ্রহ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। হরিনাথ ঘোষ মহাশয়ের এই প্রচেষ্টাই মানভূমে প্রথম সংগ্রহশালা স্থাপনের সূচনা।

১৯৩৫ সালে রাঁচির স্বনামধন্য প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃতত্ত্ববিদ শরৎচন্দ্র রায় মহাশয় সাহিত্য মন্দিরের চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনে এই জেলার প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহশালার সম্ভাব্যতা ও সারবত্তা সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত ভাষণে জানিয়েছিলেন এই অনুর্বর মানভূমের মাটির নীচের অন্ধকার গর্ভে কি সম্পদ লুকিয়ে আছে।

১৯৫০ সালে সাহিত্য মন্দিরের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব কালে ডঃ নীহার রঞ্জন রায় এই গ্রন্থাগারে সংগ্রহশালা স্থাপনের পরিকল্পনা দিয়ে যান। পুনরায় তিনবছর পর গ্রন্থাগারের আরেক বার্ষিক অধিবেশনে বিশিষ্ট নৃত্যত্ত্বিক অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু মহাশয় সংগ্রহশালা স্থাপনের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা দেন। পরবর্তীকালে তদনীন্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ কৈলাসনাথ কাটজু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন ভাষণে প্রতি জেলায় প্রত্নতাত্ত্বিক সমিতি গঠনেব আহ্বান জানান এবং তিনি সাহিত্য মন্দিরের সংগ্রহশালা স্থাপনের প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করেন। এইভাবে গ্রন্থাগার সংশ্লিষ্ট উৎসাহী ব্যক্তিদের উদ্যোগে সংগ্রহশালা স্থাপন তথা মানভূম জেলার পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনাদি সংগ্রহের ও সংরক্ষণের কাজ ধীরে ধীরে আরম্ভ হয়।

১৯৬০ সালে গ্রন্থাগার আয়োজিত রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসব সূত্রে তদানীন্তন বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক মন্ত্রী অধ্যাপক হুমায়ুন কবির হরিপদ সাহিত্য মন্দিরে রবীন্দ্রভবনের শিলান্যাস কালে আমাদের জেলা সংগ্রহশালার উদ্বোধন করেন। যাঁদের নিরলস শ্রম ও আর্থিক সহযোগিতায় জেলা সংগ্রহশালা গড়ে উঠেছে তাঁরা হলেন ডঃ প্রভাত কুমার মল্লিক, রেখা মল্লিক, অনিল চৌধুরী এবং মহাদেব মুখার্জী। জেলা সংগ্রহশালা এঁদের মিলিত প্রচেষ্টার একটি সুন্দরতম সৃষ্টি। বর্তমান কার্যকরী কমিটির নেতৃত্বে জেলা সংগ্রহশালা আরো সুন্দর হচ্ছে। নূতন নূতন নিদর্শন সংগৃহীত হচ্ছে। পঃবঃ সরকারের উদ্যোগে কিছুদিন আগে পুরুলিয়ার গজপুরে খনন কার্যের মাধ্যমে উৎক্ষণিত প্রত্নবস্তুগুলি তৎকালিন জেলাশাসক মাননীয় দেবপ্রসাদ জানা হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের সংগ্রহশালায় দান করেন (২০/৭/০৩)। খুব তাড়াতাড়ির মধ্যেই বর্তমান কার্যকরী কমিটির নেতৃত্বে জেলা সংগ্রহশালার নূতন ভবনের কাজ সম্পূর্ণ হবে।

বিভিন্ন সময়ে হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির যে সমস্ত দিকপালরা এসেছিলেন তাঁরা হলেন—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র (২৬ /৪/১৯২৮), রামানন্দ চট্টপাধ্যায় (১৯২১) গোপাল হালদার (১৯৩৯), নীহাররঞ্জন রায় (১২/১১/১৯৪৮), নির্মল কুমার বসু (১লা বৈশাখ ১৩৫৮), প্রমথনাথ বিশী (২৫/১/৫৩), প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় (২৭/১/৫৩), মনোজ বসু (৯/৪/১৯৫৫), হুমায়ুন কবির (২৮/৮/১৯৬০) , সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর (২৭শে চৈত্র ১৩৬১), কুমুদরঞ্জন মল্লিক (৭/১/১৯৬৫), হরপ্রসাদ মিত্র (১৫/১২/১৯৬১) এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে এসেছেন নারায়ণ সান্যাল, নিমাই মাল, সরলদেব, কান্তি বিশ্বাস প্রমুখেরা।

সাহিত্য মন্দিরের গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণের পরবর্তী পর্যায়ে রিক্সাভ্যানে করে সদস্যদের বাড়িতে গিয়ে বই পৌঁছে দেওয়া, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সভা সমিতি করার জন্য হল ঘর নির্মাণের ভাবনা শুরু হয়। তৎকালীন সরকারের কাছ থেকে কিছু অনুদান পেয়ে হলের কাজ শুরু করে শেষ করা হয় সদস্যদের আর্থিক সহযোগিতায়। সেই সময় (১৯৫৪) জগদীশ মুখোপাধ্যায় হল ঘর সমাপ্ত করার জন্য পাঁচ হাজার টাকা দান করেন। কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পঞ্চকোট রাজ কল্যাণি প্রসাদ সিংদেও বাকি অর্থ প্রদান করেন। বিষয়টিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য হলটির নাম দেওয়া হয় 'জগদীশ হল' এবং হলের মঞ্চে র ভেতরের অংশের নাম হয় যথাক্রমে উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও কল্যাণী প্রসাদ সিং দেওয়ের নামে।

২/২/১৯৫৬ তারিখে শিশু বিভাগ চালু করা হয়। ৬/১২/১৯৫৯ তারিখে সংস্থার মেমোরেণ্ডাম তৈরি করে ৭/১/১৯৬০ তারিখে রাজ্য সরকারের সংস্থা নিবন্দিকরণ দপ্তরে নিবন্ধিত হয়।

১৯২১ সালে সাহিত্য মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতারা যে স্বপ্ন দেখেছিলেন—তাঁদের সেই স্বপ্নকে বিভিন্ন নূতন নূতন পরিকল্পনা ও কর্মসূচির মাধ্যমে বাস্তবায়িত করছেন বর্তমান কার্যকরী সমিতির সদস্যরা। বিগত কয়েক বছরে যেমন নূতন নূতন বিভিন্ন কর্মসূচি সংগঠিত হয়েছে-পাশাপাশি বর্তমান রাজ্য সরকারের গ্রন্থাগার দপ্তর, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তর, পৌরসভা ও সাংসদ উন্নয়ন তহবিলের অর্থের মাধ্যমে বেশ কয়েকটি নূতন ভবন নির্মাণ এবং অন্যান্য প্রচুর উন্নয়ন হয়েছে।

বিভিন্ন ঘটনা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে সেদিনের কচি কিশলয় আজ বিশাল মহীরূহে পরিণত হয়েছে। পাঠাগার, জেলা সংগ্রহশালা, ভ্রাম্যমান পাঠাগার, উচ্চ শিক্ষায়ব্রতী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ফ্রী স্টাডি সেন্টার, সংস্কৃতি চর্চার জন্য হল ও সুরতীর্থ, চাকুরি প্রার্থীদের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরিক্ষার পাঠকেন্দ্র, শিশুদের মানসিক বিকাশ ও শিক্ষার জন্য নবোদয়, শিশুদের জন্য শিশু পাঠাগার ইত্যাদি বিভিন্ন শাখা নিয়ে বর্তমানে হরিপদ সাহিত্য মন্দির পরিচালিত হচ্ছে।

সংস্থার বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৮৪৭। পাঠাগারে মোট পুস্তকের সংখ্যা ২১,০২৯।

হরিপদ সাহিত্য মন্দির বর্তমানে আমাদের জেলার শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র।

হরিপদ সাহিত্য মন্দিরে বিভিন্ন সময়ে যারা সভাপতি ও সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

সভাপতি	—	কার্যকাল
কালিপদ দত্ত	—	১৯২১-১৯২৮
অম্বুজা সরকার	—	১৯২৮
উপেন্দ্রনাথ মুখার্জী	—	১৯৩৯

জিমূত বাহন সেন —
ললিত কিশোর মিত্র —
শশধর গাঙ্গুলী —
ধীরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য —
জগদীশ চন্দ্র মুখার্জী — ৯/৮/৫০-২/৩/৫৯
বঙ্কিমচন্দ্র বসু — ২/৩/৫৯-৩০/৩/৬৩
দ্বারিকা নাথ ব্যানার্জী — ৩০/৩/৬৩-১২/৫/৬৭
অশোক চৌধুরী — ২০/৫/৬৯-১৬/৮/৮৪
ইন্দুভুষণ ব্যানার্জী — ১৬/৮/৮৪-৮/৮/৮৬
অলক চৌধুরী — ৮/৮/৮৬-২৫/৫/৮৮
সুভাষচন্দ্র রায় — ২৫/৫/৮৮-১৯/৯/৯৪
সুশান্ত হাজরা — ১৫/৫/৯৪-৪/৪/৯৯
হারাধন ব্যানার্জী — ৪/৪/৯৯-এখনো

"সম্পাদক" — কার্যকাল

সুবোধ কুমার সেন — ১৯২১-১৯২২
সাধুচরণ সাও — ১৯২২-১৯২৭
সুবোধ কুমার সেন — ১৯২৭-১৯২৮
কালিপদ দত্ত — ১৯২৮
সুবোধ কুমার সেন — ১৯৩১
বসন্ত কুমার দাঁ — ১৯৩৩
পৃথ্বীশ নারায়ণ সরকার — ১৯৩৯
ধীরেন ভট্টাচার্য — ১৯৪৫
অশোক চৌধুরী — ৫/৪/৫২-২০/৫/৬৯
জয়ন্ত কুমার দাঁ — ২০/৫/৬৯-৩০/৫/৭১
ইন্দুভূষণ ব্যানার্জ্জি — ৩০/৫/৭১-৮/২/৮০
গণেশ চন্দ্র মিত্র — ৮/২/৮০-৩/৫/৮৪
অজিত মিত্র — ৩/৫/৮৪-৬/৯/৮৫
গৌর কিশোর দত্ত — ৬/৯/৮৫-৮/৮/৮৬
দিলীপ সেন — ৬/১০/৮৬-২৫/৫/৮৮
অসীম কর — ২৫/৫/৮৮-১৯/৮/৯০
অশোক আগরওয়াল — ১৯/৮/৯০-১৫/৯/৯৪
অসীম কর — ১৫/৪/৯৪-২৪/৪/৯৭
নিলয় মুখার্জি — ১৬/৪/৯৭-এখনো

সূত্র- সাহিত্য মন্দিরের বিভিন্ন সময়ের রেজোলিউশান।
সাহিত্য মন্দিরের সম্পাদকীয় প্রতিবেদন।
সাহিত্য মন্দির পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

পুরুলিয়ার মানুষ অসীমানন্দ

ড. ব্রজদুলাল চক্রবর্তী

প্রখ্যাত কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা দিয়েই শুরু করা যাক—"অসীমানন্দ সরস্বতী একটি পুণ্যময় নাম, একটি মাধুর্য্যস্মৃতিমণ্ডিত নাম, দিব্য জীবন তৃষ্ণার্ত একটি তপস্যার নাম, একটি আনন্দময় নাম। নামটি স্মরণ করলেই মন আপ্লুত হয় প্রীতিতে, মাধুর্য্যে, আপ্লুত হয় বিস্ময়ে।"

অখণ্ড মানভূম জেলার রামচন্দ্রপুর গ্রাম, সেই মাটির কোলে স্বামী-অসীমানন্দ সরস্বতী (ওরফে অন্নদাপ্রসাদ চক্রবর্তী) জন্মগ্রহণ করেছিলেন-১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দ (৩রা ফাল্গুন, ১৩১০ বঙ্গাব্দ)। পুবের আকাশ তখনও রক্তিম হয়ে ওঠেনি—পাখির কূজনে প্রভাতী সমীরণ তখন সবেমাত্র শিহরিত হচ্ছে—, আর সেই মুহূর্তেই শিহরণ জাগানো এক মহা আবির্ভাব—,অজানা কালের অসীম প্রত্যাশার প্রতিশ্রুতি—অন্নদাপ্রসাদ। অচিরেই টের পাওয়া গেল—এ কোনো সাধারণ শিশু নয়, এ এক অসাধারণ সত্তার বাহক, এক বিস্ময়বালক। যথারীতি পাঠশালা যাওয়া শুরু করলেন অন্নদাপ্রসাদ। সবে চতুর্থ মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন। এল ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর, সম্রাট পঞ্চম জর্জের দরবার উৎসব। দেশ জুড়ে শুরু হয়েছে বর্ণাঢ্য উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজন। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পুরস্কার দেওয়া হবে—স্কুলঘর সাজানো হচ্ছে—গ্রামের পথ পরিষ্কার করে তার উপর তোরণ তৈরি হয়েছে, রঙ-বেরঙের কাগজ আর আম্রপল্লবের বনমালা দিয়ে পল্লির পথঘাট হয়েছে সাজানো। শোভাযাত্রার গান তৈরি হয়েছে—"জয়তী জয়তী পঞ্চম জর্জ / জয় হে ভারত ভূপতি" ইত্যাদি। ছেলেদের সেই গান শেখানো হচ্ছে---, মহা উৎসাহে পণ্ডিতমশাইরা অনুষ্ঠানটিকে সফল করে তুলতে তৎপর হয়ে উঠেছেন। কিন্তু অজানা বিস্ময়ের ঘেরাটোপ তখনও উন্মোচিত হয়নি। আট বছরের বালক অন্নদাপ্রসাদ ওই গান গাইতে অস্বীকার করলেন। সাড়া জাগানো ঘটনা! এইটুকু দুধের ছাওয়াল বলে কি-না ভারত সম্রাটের জয়গান গাইবে না! প্রহৃত হলেন অন্নদাপ্রসাদ কিন্তু প্রত্যাহৃত হল না তাঁর অটুট প্রতিজ্ঞা। ক্ষোভে-দুঃখে-উত্তেজনায়, তিনি ওই অল্প বয়সেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে তাঁর জীবনের প্রথম কবিতা লিখলেন—শ্লেষ আর উষ্মার আগুনে উষ্ণ হয়ে উঠল তাঁর ভাষা, হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে তার বেদনার্ত ঝংকার—সেদিন বহু মানুষকেই ভাবিয়ে তুলল। কবিতার শিরোনাম 'দরবার দিনে'। বালক কবি লিখলেন—

"যারা তাঁতির কাটল আঙুল তাদের দেব জয়।
জীবন থাকতে নয়।।
কিসের তোদের গানের আসর রাস্তা সাজা,

কিসের তোদের সাজগোজ আর বাজনা বাজা,
কিসের তোদের হৈ চৈ সারা গেরামময়,
পঞ্চম জর্জ রাজা? সে তায় মোদের দেশের কী?
আমার দেশে ইংরাজ রাজা? বলিস্ না ছি ছি।
আমার দেশের রাজা হবে আমার দেশের লোক.
আজকে আমোদ স্ফূর্তি সে নয়, আজকে করব শোক।
মা বলেছে আমার দেশের বন্ধু ওরা নয়
প্রাণ থাকতেও গাইবনাকো আমি তাদের জয়।

পরের দেশের রাজা ও সে আমার দেশের নয়
তাদের দেওয়া রুপার পদক পরতে লজ্জা হয়।
আমার দেশে বুক ফুলিয়ে করবে শাসন মোরে
আমার দেশে অপমানে থাকব মোরা মরে
তোদের সাথে যোগ দিতে আজ মরি যে লজ্জায়
দেশের রাজা হলে তবেই আমোদ শোভা পায়
স্বাধীন যবে এদেশ হবে করব যে উৎসব
তোদের সাথে আজ যাব না করতে কলরব
মা বলেছে স্বাধীন যেদিন হবে আমার দেশ
পরব সেদিন জামা-কাপড় করব ভালো বেশ।

(রামচন্দ্রপুর উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়—১৩১৮ সাল, ২৫ অগ্রহায়ণ)

যে বয়সের শিশু পৌগণ্ড চাপল্যে চটুল চঞ্চল হয়ে ওঠে, সেই বয়সেই শাণিত চৈতন্যের প্রদীপ্তস্ফুরণ বহমান ইতিহাসের পাতায় এক অবিস্মরণীয় সংযোজন! বিস্ময় দানা বেঁধে হল জমাট এবং বিরাট। শিশু কবির যাত্রা হল শুরু, ব্যক্তিজীবনের, সমাজজীবনের তথা রাষ্ট্রজীবনের অবাধ অপশাসনের বিরুদ্ধে অন্নদাপ্রসাদের আপসহীন সংগ্রাম পরবর্তী জীবনেতিহাসে স্বাক্ষরিত প্রামাণ্য দলিল। নয় বৎসর বয়সে তিনি উচ্চ প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার জন্য মনোনীত হলেন। অসুস্থ শরীর নিয়ে রঘুনাথপুর হাইস্কুলের বারান্দায় বিছানায় বসে পরীক্ষা দিলেন। পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেও তাঁকে বৃত্তি দেওয়া হল না। কারণ অজানা নয়—ব্রিটিশ সরকারের রুদ্ররোষের এও এক নগ্ন বহিঃপ্রকাশ! দামাল অন্নদাপ্রসাদ ঝড়ের গতিতে এগিয়ে চললেন। দেশমাতৃকা তখনও শৃঙ্খলিত—কোটি কোটি ভারতবাসী বেনিয়া ইংরেজের অপশাসনের অসহায় শিকার হয়ে চলেছে, কারার লৌহকপাটের অন্তরালে শতশত বিপ্লবীর মাতৃমুক্তির পণ ঝঙ্কার তুলেছে দেশের আকাশে-বাতাসে, গ্রামে-নগরে, পথে-প্রান্তরে। চঞ্চল হয়ে ওঠেন অন্নদাপ্রসাদ।

সেই অল্প বয়সেই দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের পবিত্র কর্মে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন অন্নদাপ্রসাদ। তাঁর বিকচোন্মুখ বিপ্লবী জীবনটিকে গতিঋদ্ধ করেছিলেন তাঁরই শিক্ষক পশুপতি মণ্ডল। বালক অন্নদাপ্রসাদ তাঁরই পাদস্পর্শ করে সেদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন,—"ভারতবর্ষ স্বাধীন না দেখে আমি কখনো মরব না। আজ থেকে ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদের জন্য আমার জীবনের কাজ শুরু হল।" এরপর জীবনের ধাপে ধাপে এগিয়ে চলল উত্তাল-উদ্বেল প্রাণচাঞ্চল্য—সামনে একটাই লক্ষ্য—দেশের স্বাধীনতা—নইলে মৃত্যু—"করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে।" বিপন্ন দেশ আর ক্ষয়িষ্ণু

সমাজের শত শত মানুষের হাহাকারে তিনি পীড়িত হয়েছেন। পথ অন্বেষণ করেছেন কঠিন সংগ্রামে জয়ী হবার। তাঁকে তাঁর পিতামহ নীলকণ্ঠ চক্রবর্তী, পিতৃদেব যুগলকিশোর চক্রবর্তী ও মাতৃদেবী রজনীবালা দেবী প্রতি পদক্ষেপে উৎসাহ ও উদ্দীপনা জুগিয়েছিলেন। প্রতিকূল পরিবেশ এবং পরিস্থিতি অন্নদাপ্রসাদকে ঘরছাড়া করল—তখন তাঁর বয়স মাত্র এগারো বছর। পাড়ি দিলেন বর্ধমানের পথে। সম্বল মাত্র এক টাকা চার আনা। তাঁর কৈশোরের কয়েকটা বছর কেটেছিল মানভূমের বাইরে বর্ধমানে। নির্মম জীবনসংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই লক্ষ্যচ্যুত হননি। কঠোর নিয়ম আর একাগ্র নিষ্ঠায় তাঁর ছাত্রজীবনের মজবুত বুনিয়াদ তৈরি হয়েছিল। একদিকে একাগ্র চিত্তে অধ্যয়ন—অন্যদিকে দিনভর পরিশ্রম করে মোটা ভাত-কাপড়ের সংস্থান করা। এর জন্য রাস্তায় ঝাড়ু দিয়েছেন, চাকরের কাজ করেছেন, ঠাকুরবাড়িতে পরিচারকের কাজ করেছেন, ঠোঙা তৈরি করেছেন। কোনো কাজকেই কোনো দিন ছোট মনে করেননি। নিজের পড়াশোনা, থাকা-খাওয়ার খরচা চালিয়েও তিনি নানা উপায়ে অর্থ উপার্জন করে গ্রামে পাঠাতেন, পিতৃদেবের খরচ খরচা নির্বাহের জন্য। তাঁর কথায়—"রাজপুতনা স্টোর থেকে কিছু পেতাম। তা ছাড়া পোষ্টকার্ডে ছবি আঁকতাম তা এক আনা করে বিক্রী হোত। চক কেটে মূর্ত্তি তৈরী করতাম, মাটির খেলনা প্রস্তুত করতাম—এগুলি বিক্রী হত। এছাড়া আমার আর এক কাজ জুটেছিল বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী অফিসে। সেখানে প্রুফ দেখতাম—কিছু কিছু লেখার কাজও করতাম। প্রবোধবাবু এজন্য মাসে দশ টাকা করে আমার হাত খরচ দিতেন। আমার খরচ খরচা বাদে আমি প্রতিমাসে বাবাকে এ থেকে প্রায় ৫০ টাকা পাঠাতে পারতাম।" এমন নিটোল কর্তব্যবোধ আমাদের চিত্তস্তম্ভনকারী!

পাঠ্যাবস্থায় অন্নদাপ্রসাদ গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূত সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। শান্তিনিকেতন থেকে বিদায় নেবার সময় রবীন্দ্রনাথ সস্নেহে বলেছিলেন "তোমার যখন ইচ্ছা এসো। এখানে তোমার জন্য স্থান থাকবে।" অন্নদাপ্রসাদ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "আমি গুরুদেবের চরণে লুটিয়ে পড়লাম। তিনি বুকে জড়িয়ে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন। আমার জীবন ধন্য হয়ে গেল। আজও সেই স্মৃতি আমার চোখে ভাসে। আমি নিজেকে ধন্য-পুণ্য ও কৃতার্থ বোধ করি, যখন ভাবি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ আমাকে বুকে জড়িয়ে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন। সেই সময় পূজ্যপাদ পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের স্নেহলাভে আমি ধন্য হয়েছিলাম।"

শ্রীযুক্ত অনিলবরণ, ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ প্রমুখ নেতাদের সঙ্গে বর্ধমানে থাকাকালীন অন্নদাপ্রসাদের ঘনিষ্ঠতা হয়। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে তিনি নিবিড় বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন এবং বর্ধমান ও রানিগঞ্জে বহুদিন একসঙ্গে অতিবাহিত করেন। ডাঃ সুরেন লাহিড়ী একদিন তাঁকে নিয়ে গেলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের কাছে—, অন্নদাপ্রসাদের পরিচয় দিয়ে বললেন—"একটি ঝাড়ুদার ছেলেকে এনেছি। এ বর্দ্ধমানের রাস্তায় ঝাড়ু দিয়েছে, চাকরের কাজ করেছে, রাঁধুনীর চাকরী করেছে আর পড়েছে। ঠোঙ্গা তৈরী করে ম্যাট্রিকুলেশনের ফি দিয়ছে।" আচার্যদেবকে প্রণাম করতেই তিনি অন্নদাপ্রসাদকে বুকে জড়িয়ে বললেন, "কোন কাজকেই কোনদিন যাতে ছোট বলে মনে না হয়—এই আমার আশীর্ব্বাদ।"

পালাবদলের ডাক আসে—সেই ডাকে সাড়াও দিতে হয়। অন্নদাপ্রসাদের কর্মক্ষেত্র এবার মানভূমকে কেন্দ্র করে প্রসারিত হতে লাগল। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ আবশ্যক মনে হয়। পুরুলিয়া থেকে ঋষি নিবারণচন্দ্র যাচ্ছেন মধুপুর। আসানসোল স্টেশনে অন্নদাপ্রসাদের সঙ্গে দেখা হতেই তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন, বললেন "আপনি অন্নদাবাবু! মুরাডি স্টেশনে উঠতে দেখলাম। দেখেই মনে হল আপনিই হবেন। মানভূমে ত যথেষ্ট কাজ রয়েছে—আপনি মানভূমে চলে আসুন।"

অভিভূত অন্নদাপ্রসাদ বললেন—, "আপনি বলছেন? নিশ্চয় আসবো। আমার বাবা আজ যদি বেঁচে থাকতেন এবং বলতেন, আমি যেমন ভক্তির সঙ্গে তাঁর আদেশ মেনে নিতাম—, আপনার আদেশও তেমনি মেনে নিলাম।" এই পরিচয়ই নিবিড় আত্মীয়তায় পর্যবসিত হয়েছিল। অন্নদাপ্রসাদের কথায়,—"ট্রেনের অনেক দেরী ছিল। তিনি বললেন—শুনেছি আপনি ইচ্ছা করলেই কবিতা লিখতে পারেন। একটা কবিতা লিখুন। কবিতাটির শীর্ষক হবে 'আর কতকাল বাকী'।" উনত্রিশ ছত্রের কবিতাটি অন্নদাপ্রসাদ আসানসোলের প্ল্যাটফর্মে বসেই অবলীলায় লিখে ফেললেন।

বর্ধমান ও কলকাতার অধ্যায় শেষ করে অন্নদাপ্রসাদ ফিরলেন রামচন্দ্রপুরে। আশ্রমে চারটি তাঁত চালাবার ব্যবস্থা করা হল—গ্রামে গ্রামে তাঁতিদের মধ্যে সুতা বিলির কাজও অব্যাহত থাকল। নূতন করে একটি পাঠাগার স্থাপিত হল—যেখানে বইয়ের সংখ্যা পনের শোর অধিক ছিল।

গ্রামে এসেই শ্রমজীবীদের এবং তাদের ছেলেদের জন্য একটা নৈশ বিদ্যালয় খুলে দিলেন অন্নদাপ্রসাদ। গ্রাম সংগঠনের কাজ পুরোমাত্রায় চলতে লাগল। ওই সময় মানভূমের সব থানায় কংগ্রেস কমিটি ছিল না। তাই রঘুনাথপুর, সাঁতুড়ী, নিতুরিয়া ও কাশীপুর অঞ্চলে থানা কংগ্রেস কমিটি গঠনের উদ্যোগ নিতে হয় অন্নদাপ্রসাদকে। সহযোগিতা করেন পূজ্যপাদ নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়। ১৯২৭ সালে মানভূমের কর্মক্ষেত্রে যে উন্মাদনা সঞ্চারিত হয়েছিল সে সম্বন্ধে অন্নদাপ্রসাদ বলেছেন—"১৯২৭ সালের ১২ই জানুয়ারী মহাত্মাজী ধানবাদে এলেন। তাঁর আগমনে মানভূমে গঠনমূলক কার্য্যের উন্মাদনার সৃষ্টি হল। পুরুলিয়া শিল্পাশ্রমকে কেন্দ্র করে ঋষি নিবারণচন্দ্রকে ঘিরে শত শত ত্যাগী কর্মীর হল সমাবেশ। সে সময় মানভূমের যে কোন কাজে ঋষি নিবারণচন্দ্রের নেতৃত্ব অপরিহার্য্য হয়ে উঠেছিল। রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে মানভূমে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের আন্দোলনও উল্লেখযোগ্য। ... এই উপলক্ষে পুরুলিয়া ভিক্টোরিয়া স্কুলে যে বিরাট জনসভা হয় এরূপ সভা মানভূমের ইতিহাসে প্রথম। এই বৎসর পুরুলিয়ায় মানভূমের অধিবাসীদের কল্যাণকল্পে "মানভূম সমিতির" প্রতিষ্ঠা হয়। পুরুলিয়ার প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা হরিপদ দাঁ হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের গৃহ নির্মাণ করিয়েছেন এবং দেশ বিখ্যাত কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ অপর একটি প্রকোষ্ঠ প্রস্তুত করিয়ে দিয়েছিলেন। এই বৎসর বরিশালের বিখ্যাত চারণকবি মুকুন্দদাস জেলার সর্ব্বত্র তাঁর গানে সকলকে মাতিয়ে তোলেন।

এই সময় অন্নদাপ্রসাদ বাউরি জাতির সমাজ সংস্কার নিয়ে ভাবনা-চিন্তা শুরু করেন। ১ নভেম্বর (১৯২৭) রামচন্দ্রপুর আশ্রমে বাউরিদের এক বিরাট সভা হয় এবং ওই সভায় সংস্কারমূলক কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সভায় বিভিন্ন স্থানে নৈশবিদ্যালয় খোলার প্রস্তাব নেওয়া হয়। ফলস্বরূপ প্রায় চল্লিশটিরও বেশি নৈশবিদ্যালয় পত্তন করা হয়েছিল। বিদ্যালয়ে শিশু এবং বয়স্ক সকলেই পড়তে আসত। তাদের বই, শ্লেট ও জামা বিনামূল্যে দেওয়া হত। প্রতি রবিবারে তাদের পেটভরে ভোজন করানো হত। এমনভাবেই পিছিয়ে পড়া অবহেলিত মানুষদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের কাজ শুরু করেছিলেন অন্নদাপ্রসাদ, সঙ্গে ছিলেন তাঁর নিষ্ঠাবান সহকর্মীবৃন্দ। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইংরেজ সরকারের ভয়াল রোষে অচিরেই সেই মহতী প্রচেষ্টার অপমৃত্যু ঘটে। পুলিশের ভয়ে আর কেউ স্কুলে আসতে চাইল না।

বহুমুখী কর্মের বোঝা ঘাড়ে অন্নদাপ্রসাদ তখন মানভূমের কোনায় কোনায় ঝড়ের বেগে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এবার একটি নূতন পরিকল্পনা রূপায়িত করতে অগ্রণী হলেন। আদিবাসী প্রধান মানভূম জেলায় সাঁওতালদের সঙ্ঘবদ্ধ করবার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। তাঁকে পাশে থেকে সহায়তা করলেন শ্রী মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, গুনান মাঝি ও সুরাই মাঝি। সাঁওতাল সংগঠনের পাশে পাশে

অনগ্রসর অবহেলিত বাউরিদের মধ্যে যেমন সংগঠনের কাজ শুরু করলেন—, অগণিত কুড়মি ও সরাকজাতির সার্বিক উন্নতির জন্য সচেষ্ট হলেন। এই সময় বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভ্য নির্বাচিত হন ও মাদ্রাজ কংগ্রেসেরও প্রতিনিধি নির্বাচিত হন।

এরপরই এল মানভূম জেলা রাজনৈতিক সম্মেলনের প্রস্তুতিপর্ব। সে সময়ের কর্মব্যস্ততার কথা—, নূতন বোধে জীবনকে অভিষেক করার কথা—জানতে পারা যায় তাঁর আত্মজীবনী থেকে। তিনি লিখেছেন—, "১৯২৮ সালে আমরা পূর্ণোদ্যমে মানভূম জেলা রাজনৈতিক সম্মেলনকে সফল করে তুলবার জন্য উঠে পড়ে লাগলাম। এ সময় পূজ্যপাদ ঋষি নিবারণচন্দ্রের সঙ্গে বহু গ্রামে ঘুরবার সুযোগ হয়েছিল। দারুণ শীতে নিবারণচন্দ্র গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন। গায়ে একটি খদ্দরের ছোট পাঞ্জাবী আর একটি খদ্দরের চাদর। পায়ে রাবারের চটি। মাইলের পর মাইল হেঁটে চলেছি, সন্ধ্যার সময় কোন গ্রামে পৌঁচেছি, ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন ঋষি। আমি তাঁর পদপ্রান্তে বসে তেল গরম করে পায়ের তলায় মালিশ করে দিয়েছি। আমার মনে হয়েছে, আমি যেন আমার পরলোকগত পিতৃদেবের সেবা করছি। সেই মহাপ্রাণ ঋষিব সঙ্গে দিনের পর দিন পল্লীর পথে পথে ভ্রমণ করে আমি যে শিক্ষা লাভ করেছি এবং তাঁর কাছ থেকে যে উপদেশ লাভ করেছি, তা আমার জীবনে পরম সম্পদ হয়ে রয়েছে। পথ চলতে চলতে তিনি কত উপদেশ দিয়েছেন, তাঁর জীবনের কত কাহিনী বলেছেন, রাজনৈতিক জীবনের কত অভিজ্ঞতার কথা বলে সতর্ক করেছেন— তা আজও আমার জীবনে পথ প্রদর্শক হয়ে রয়েছে।"

ক্রমেই রামচন্দ্রপুরে মানভূম জেলা প্রথম রাজনৈতিক সম্মেলনের দিনটি এগিয়ে আসতে লাগল। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ওই সভার সভাপতির আসনটি অলঙ্কৃত করতে সম্মত হলেন এবং সম্মেলনের দিন ঠিক হল শুভ দোলপূর্ণিমা (১৯২৮)। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হলেন অন্নদাপ্রসাদ। এই সম্মেলনে প্রায় বিশ সহস্রাধিক লোকের সমাবেশ হয়েছিল। ঋষি নিবারণ দাশগুপ্ত, অতুলচন্দ্র ঘোষ, লাবণ্যপ্রভা ঘোষ—উপস্থিত থেকে সমস্ত ব্যবস্থা করেছিলেন। এছাড়াও জীমূতবাহন সেন, নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী, বিমলেন্দু দাশগুপ্ত, কুমারেন্দ্রনাথ ঘোষ, ব্রহ্মচারী ব্রজেন্দ্রনাথ প্রমুখ মানভূমের বিশিষ্ট কর্মীবৃন্দ এই সম্মেলনকে সফল করে তুলতে সবিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

ইংরেজি ১৯১৮ সালে অন্নদাপ্রসাদের পরিচালনায় রামচন্দ্রপুরে বিপ্লবীদের এক গোপন সংস্থা স্থাপিত হয়—যার নাম ছিল "আর্য্য আশ্রম।" পরে নেতাজির পরামর্শে ওই "আর্য্য আশ্রম"ই ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে হয় "মানভূমি কর্মীসংসদ"। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস ওই সংসদের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করায় এই অঞ্চলের সংগ্রামী কর্মীরা অসীম অনুপ্রেরণায় উৎসাহিত হয়েছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে জনৈক লেখকের মন্তব্য উল্লেখ্য বলে মনে করি, তাঁর কথায় "অসহযোগ আন্দোলনে তখন মানভূমে ঋষি নিবারণচন্দ্র ব্যতীত তাঁহার (অন্নদাপ্রসাদের) সর্ব্বসাধারণের উপর এত প্রভাব আর কাহারও ছিল না। প্রায় পাঁচ হাজার সাঁওতাল বাহিনী একান্ত অনুগত। এই সমস্ত কারণে তিনি ক্রমশ সরকারের সমধিক বিরাগভাজন হইয়া উঠেন। ১৯৩১ সালে সরকার তাঁহার যথাসর্বস্ব এমন কি পুস্তক, তৈজসপত্র ও গ্রন্থাগার সমস্তই বাজেয়াপ্ত করেন।"

সেদিন পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে অন্নদাপ্রসাদকে আসতে হবে পুরুলিয়া থেকে রামচন্দ্রপুর,— গোপন বৈঠকে সামিল হতে হবে নির্জন আস্তানায়। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অবসন্ন শরীর, ক্লান্তিতে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতি শ্লথ-মন্থর। তবুও চলতে হবে—চলার শেষ হবে সেদিন— যেদিন স্বাধীন ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে তেরঙ্গা জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে অসীম নীল আকাশের বুকে উড্ডীন

স্বাধীন বিহঙ্গের অবাধ বিচরণ দেখে খলখল করে হাসবেন, হাতে হাতে তালি দিয়ে আনন্দে উচ্ছল-উদ্বেল হয়ে উঠবেন অন্নদাপ্রসাদ।

পুরুলিয়া রেলস্টেশন, গাড়িতে চাপতে হবে। কোনমতে সে ব্যবস্থাও হল, অন্ধকার তৃতীয় শ্রেণির কামরার এক কোনায় চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন অন্নদাপ্রসাদ—,জ্বর বোধ হচ্ছে। পুলিশ এল, টর্চ জ্বেলে এদিক-ওদিক একটু দেখে নিয়েই তাদের মহান কর্তব্য শেষ করল। জ্বরাক্রান্ত অন্নদাপ্রসাদ আশ্বস্ত হলেন। আদ্রা স্টেশনে গাড়ি পালটাতে হবে— সে পর্বও সুচতুর কৌশলে সাধন করলেন অন্নদাপ্রসাদ। ট্রেন এগিয়ে চলল—মুরাড়ি স্টেশনের দিকে, অন্নদাপ্রসাদের গন্তব্যস্থল। মুরাড়ি স্টেশনে গাড়ি থামতেই টের পেলেন অন্নদাপ্রসাদ স্থানীয় পুলিশ কর্তারা সতর্ক প্রহরায় রেলস্টেশনটি ঘিরে রেখেছে—তাঁদের কাছে খবর আছে—ওই ট্রেনেই অন্নদাপ্রসাদ মুরাড়ি স্টেশনে নামতে পারেন। সে সময় মুরাড়ি রেলস্টেশনটি খুবই নিচু মানের ছিল। ছোট একফালি টিকিটঘর সমেত স্টেশন মাস্টারের অফিস—অল্পদূরে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট স্বল্পপরিসর আবাসস্থল। রেললাইনের পাশ দিয়ে সমতলভূমির একাংশ প্ল্যাটফর্মরূপে চিহ্নিত—তারই মাঝে একটা ল্যাম্পপোস্ট, গাড়ি আসার আগে কেরোসিনের বাতি জ্বেলে দেওয়া হত। সংলগ্ন বিশাল প্রান্তর জুড়ে শেয়াল-কুকুরের অকারণ অবিরাম ডেকে চলা নিদ্রাতুর ঘন অন্ধকারকে আরও যেন রহস্যময় করে তুলত। অন্নদাপ্রসাদ স্টেশনের উল্টোদিকে নামলেন। ঘন পলাশ জঙ্গলের মধ্যে অতি সন্তর্পণে কিছুটা সময় কাটাতে হল। এখানেই প্রাচীন পঞ্চমুণ্ডীর আসনে শক্তিরূপিণী শ্যামার আরাধনা করতেন অন্নদাপ্রসাদ। পরবর্তীকালে ওখানেই অন্নদাপ্রসাদকে ইংরেজ সরকার দীর্ঘকাল অন্তরীণ করে রেখেছিল। এখন সেখানে সুন্দর একটি কালী মন্দির তৈরি হয়েছে।

অন্নদাপ্রসাদের গায়ে জ্বর—তীব্র পিপাসা। সকলের অলক্ষে তিনি অসমতল ধূসর রুক্ষ মাঠের উপর দিয়ে হেঁটে চললেন মুরাড়ি গ্রামের দিকে। গ্রামের উপান্তে সে সময় সরকার পরিচালিত একটি ছোট 'ঔষধ' বিতরণ কেন্দ্র ছিল—, একজন সরকারি ডাক্তার ও একজন কম্পাউন্ডার ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পাশেই ডাক্তার বাবুর সরকারি আবাস, ডাকলেন—ডাক্তারবাবু! দরজাটা একটু খুলবেন? কিছুক্ষণ পর দরজা খুলে জড়ানো চোখে এসে দাঁড়ালেন ডাক্তারবাবু। সামনে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের মূর্তিমান আতঙ্ক অন্নদাপ্রসাদকে দেখেই আঁতকে উঠলেন—যেন ভূত দেখছেন! শঙ্কিত ডাক্তারবাবুর কম্পিত গলা থেকে স্বর ভেসে এল—" কে অন্নদাবাবু?" অসহায়ভাবে ডাক্তারবাবু বললেন, "অন্নদাবাবু, আমি সরকারের চাকর—, ছা-পোষা মানুষ—, ছেলেপুলে নিয়ে ঘর সংসার করি। যদি কেউ দেখে ফেলে আপনি আমার কাছে এসেছেন—আর কথাটা কোনক্রমে পুলিশের কাছে পৌঁছায়, তবে আমার চাকরীটাতো যাবেই—, কোন অজুহাতে জেলে পুরে ঘানি টানিয়ে ছাড়বে। স্খলিত পদে অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে অন্নদাপ্রসাদ যখন তিলুড়ী গ্রামে পৌঁছালেন, তখন যামিনীর কয়েক প্রহর অতিক্রান্ত হয়েছে! অসঙ্কোচেই অন্নদাপ্রসাদ রায় পরিবারের দ্বারস্থ হলেন—বিশ্রামের জন্য একটা নিশ্চিন্ত আশ্রয় বড় প্রয়োজন। পরম সমাদরে অন্নদাপ্রসাদকে গ্রহণ করলেন বাড়ির আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই। অচিরেই তাঁর সেবাশুশ্রূষা ও বিশ্রামের ব্যবস্থা হল। কিন্তু অন্নদাপ্রসাদের চোখে ঘুম নেই। তাঁর চিন্তা—পুলিশ যদি হদিশ পেয়ে এখানে ছুটে আসে। তাঁকে গ্রেপ্তার করবে সে চিন্তায় তিনি কাতর নন। কিন্তু তাঁর ভয় এই পরিবারের পরম শুভানুধ্যায়ী মানুষগুলিকে যদি তাঁর জন্য উৎপীড়িত হতে হয়, এই সহজ-সরল-প্রাণবন্ত মানুষগুলিকে যদি অহরহ সরকারের রুদ্ররোষে দগ্ধ হতে হয়! অন্নদাপ্রসাদের মানবিক চেতনা

বিদ্রোহী হয়ে উঠল। ভাবলেন আমি মরে গেলেও আমাকে এই আশ্রয় ত্যাগ করতে হবে। সুখ-শান্তি-স্বাচ্ছন্দ্য—এসবকে তো দুপায়ে দলিত করেই এই দুঃখকে হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছি। অন্নদাপ্রসাদের হিসেবে ভুল হয় না। যা ভেবেছিলেন—তাই ঘটতে চলেছে। বুঝতে ভুল হল না—পুলিশ বাড়ির চারধার ঘিরে ফেলেছে।

সে সময় অন্নদাপ্রসাদের দিবারাত্রির একটাই স্বপ্ন, দেশের মানুষকে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করে ইংরেজরাজের বিরুদ্ধে সমস্বরে জেহাদ ঘোষণা করা। আর সেইজন্যই দেখতে পাই তিনি কবি-সাহিত্যিক-ঔপন্যাসিক সকলের কাছেই তাঁর সেই আবেদন জানাতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। নজরুলের সেই চিরস্মরণীয় কবিতার ছত্রটি তিনি যেন প্রতিজ্ঞা মন্ত্ররূপেই গ্রহণ করেছিলেন— "কেড়ে খায় যারা তেত্রিশ কোটীর মুখের গ্রাস/ আমার রক্তে লেখা হয় যেন তাদের সর্ব্বনাশ।" বিদেশি রাজশক্তির বিরুদ্ধে মসীকে অসিরূপে ব্যবহার করতে হবে। সেই আর্জি নিয়েই তিনি একদিন উপস্থিত হলেন বার্নপুরের এক সাহিত্যসভায়—সভাপতি ছিলেন খ্যাতনামা কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরই কথায়—"বার্ণপুরের 'আগমনী' সংঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত একটি সাহিত্য সভায় আমারই সমবয়সী একদল যুবকের কণ্ঠস্বরে এবং কথা সাহিত্যের প্রতি অভিযোগে চকিত হয়ে উঠলাম। সভায় সভাপতি ছিলাম আমি। বক্তা আমাকেই যেন অভিযুক্ত করলেন। কই? বিংশ শতাব্দীর ১৯০৫ সাল থেকে মাণিকতলা বাগানে বিদ্রোহ এবং বিপ্লবায়োজন থেকে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন পর্যন্ত বাঙালি তরুণ দলের নাচিকেত তপস্যার প্রতিবিম্ব কোথায়, তার প্রতিধ্বনি কোথায়? কতকগুলি কথা আজও স্মরণ করতে পারি। রামায়ণের সীতা হরণকালে সীতার ক্রন্দন আমাদের চোখ সজল করে সঙ্গে সঙ্গে রাবণের ও রাক্ষসীয় নিয়মের উপর শক্তির উপর, পাঠক হৃদয় কঠিন হয়ে উঠে। রামচন্দ্র যখন সমুদ্র শাসন করেন তখন মানুষের সংকল্প এবং শক্তির পরিচয়ে শক্তিমান বলে নিজেকে চিনতে পারি। মহাভারতে দ্যূত সভায় রাজশক্তির অন্যায়ে কুটীলতায় স্নায়ুশিরা আমাদের টান হয়ে উঠে। ভীষ্মের চরিত্রের সমস্ত মহিমা যেন ম্লান হয়ে যায়—তার নীরবতার জন্য। এইখানেই সাহিত্য ও কাব্যের সার্থকতা। সে অভিযোগের আন্তরিকতা সারা সভাটিকে স্পর্শ করেছিল। এর সঙ্গে দেহবাদ সংক্রান্ত আসক্তি ও আস্পৃহার আতিশয্যের বিরুদ্ধে তিরস্কারও ছিল। তিরস্কারের চেয়েও বড় ছিল আত্মীয়তার আন্তরিকতা। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সেই 'অন্ন চাই প্রাণ চাই, চাই মুক্ত বায়ু'—র মতো একটি চাওয়া, আমি মুগ্ধ হয়ে তাঁকে দেখছিলাম। মনে হচ্ছিল এক দীপ্ত প্রাণবহ্নি ঘৃত নৈবেদ্যের কামনায় যেন লেলিহান হয়ে উঠেছে।" দেশাত্মবোধের উষ্ণ প্রস্রবণ তখন টগবগ করছে অন্নদাপ্রসাদের দেহ-মনের গহন-গভীরে।

অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো সংগ্রামী চেতনার বহ্নিপ্রবাহ বহুজনের বহু মনকে করল আপ্লুত—অন্নদাপ্রসাদ সদাব্যাপৃত হয়ে থাকলেন বিপ্লবীদের সংগঠনের কাজে। বিদ্রোহের লেলিহান শিখা গ্রাস করতে চাইল বিদেশি সাম্রাজ্যবাদকে. সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল সরকারি শাসনযন্ত্র। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট টেলর ও পুলিশ সুপার চার্চাদের নেতৃত্বে সশস্ত্র পাঠানবাহিনী যাত্রা করল রামচন্দ্রপুরের পথে।

অন্নদাপ্রসাদ তখন তাঁর আশ্রমে দেশমাতৃকার আরাধনায় মগ্ন—, তাঁর নিত্যকার মন্ত্রোচ্চারণে অনুরণিত হচ্ছিল উন্মুক্ত প্রান্তরের বিশাল বুক জুড়ে—"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী।"

তেজোদীপ্ত অন্নদাপ্রসাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন ম্যাজিস্ট্রেট টেলর ও পুলিশ সুপার চার্চর। তাঁদের সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে শুভাগমনের কারণ বুঝতে দেরি হল না। অন্নদাপ্রসাদের দৃপ্তকণ্ঠে ধ্বনিত

হল—'কি চাই?'— পাল্টা প্রশ্ন এল 'অন্নদা তোমার নাম?' সম্মতিসূচক ইঙ্গিত করলেন অন্নদাপ্রসাদ।

এরপরেই শুরু হয়ে গেল একটানা জিজ্ঞাসাবাদ। অনমনীয় অচঞ্চল অন্নদাপ্রসাদ বিন্দুমাত্র ভীত হলেন না। বুঝতে পারলেন ঝড়ের পূর্বাভাস, সাহেবদের শেষ কথা, রাজনীতি ছাড়তে হবে। ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করা চলবে না। লিখিত স্বীকৃতি জানাতে হবে অন্নদাপ্রসাদকে। বিধাতা অলক্ষে হাসলেন। অন্নদাপ্রসাদ প্রাণ দিতে পারে, কিন্তু অটল প্রতিজ্ঞা থেকে বিচ্যুত হতে পারে না।

"বন্দে মাতরম্"—ধ্বনিত হল অন্নদাপ্রসাদের কণ্ঠে। চকিতে বেসামাল হয়ে উঠল পাঠানবাহিনী।

শুরু হল অকথ্য নির্যাতন, দেশের মাটি হয়ে উঠল রক্তে রাঙা। আদেশ করলেন ম্যাজিস্ট্রেট— " ঘোড়ার ল্যাজে বেঁধে দাও অন্নদাপ্রসাদের ক্ষত-বিক্ষত দেহটাকে। ছুটিয়ে দাও ঘোড়া"—তাই হল। আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন—অন্নদাপ্রসাদ, মাঝে মাঝে সম্বিত ফিরে আসে, মাতৃমন্ত্র ধ্বনিত হয় তাঁর কণ্ঠে—'বন্দেমাতরম্!' সঙ্গে সঙ্গে রক্তাপ্লুত দেহের উপর পড়ে বেতের আঘাত। এরপরেও কোনো মানুষ বেঁচে থাকতে পারে! নিশ্চিন্ত হয়েই অন্নদাপ্রসাদের জ্ঞানহীন দেহটাকে একটা পুকুরের পাশে ফেলে দিয়ে বীরবিক্রমে ফিরে গেল আত্মতুষ্ট পাঠানবাহিনী।

অন্নদাপ্রসাদ মরেননি, তাঁর নতুন জীবনে প্রত্যাবর্তনের দীর্ঘ কাহিনী ইতিহাসের পাতায় সমুজ্জ্বল—, অনুসন্ধিৎসু গবেষকদের চিত্তহরণকারী।

অন্নদাপ্রসাদ বারবার কারারুদ্ধ হয়েছেন, জেল থেকে বেরিয়ে এসেই তরুণদের ডাক দিয়ে জাগিয়ে তুলেছেন—"মৃত্যু সে তো ক্রীড়নক মৃত্যুঞ্জয়ী বীরের সদনে / সে মৃত্যু নাচিছে আজ ক্রীড়নকের সূত্র আকর্ষণে / তরুণের তাজা রক্তে স্নাত হয়ে জেগেছে তরুণ / ভয়হীন বাধাহীন চঞ্চল প্রদীপ্ত অরুণ।"

আবার তাঁকে অন্তরীণ করে রাখা হল মুরাডি রেলস্টেশনের অশ্বত্থ গাছের তলায়। ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় কাতর হয়েছেন অন্নদাপ্রসাদ—কিন্তু শক্তির সাধনা থেকে ক্ষণিকের জন্যও বিচ্যুত হননি। মহাশক্তি মহাকালীর অশেষ কৃপা বর্ষিত হয়েছে তাঁর উপর—তাই নিষ্কাম কর্মযোগী অন্তিমে সেই মহাশক্তির চরণে ঠাঁই পাবার অভীপ্সাই ব্যক্ত করেছেন তাঁর স্বরচিত গানের একটি ছত্রে। সেই অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় একটি সুন্দর মন্দির স্থাপিত হয়েছে—, সেখানে আজও হয় দেবীশক্তির নিত্য আরাধনা।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র দেশ ছাড়লেন। তাঁর নির্দেশমতো কাজ করে যেতে লাগলেন অন্নদাপ্রসাদ। শ্রান্তিহীন-ক্লান্তিহীন।

তাঁর অন্তরের গভীরে অহর্নিশ ঝংকৃত হতে লাগল নেতাজির উপদেশ—, "একটা কথা মনে রেখো, কখনও সত্য থেকে বিচ্যুত হবে না। অন্যায়ের সমর্থন করো না, যে অন্যায় করে, সে যেই হোক—, তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে কখনও পশ্চাৎপদ হবে না।" প্রসঙ্গক্রমে—, নেতাজির ঋজু আদর্শপুষ্ট অন্নদাপ্রসাদের নেতাজি সম্পর্কিত স্মৃতি রোমন্থন—উল্লেখ্য বলে মনে করি, কারণ তাঁর কর্মজীবনের প্রেরণাই ছিল নেতাজির অনুকরণীয় ভাবাদর্শ।

১৯৩৯ সালের ত্রিপুরী কংগ্রেস ভারতের ইতিহাসে চিরপ্রোজ্জ্বল হয়ে থাকবে। ত্রিপুরী কংগ্রেস থেকে ফেরবার পথে সুভাষচন্দ্র বিশ্রাম নেবার জন্য এলেন জিয়ালগড়িয়া কোলিয়ারিতে তাঁর দাদার বাসায়। কলকাতায় যাবার দিন অন্নদাপ্রসাদকে লিখলেন,—"আমি আজ কলকাতায় রওনা হচ্ছি। জরুরী দরকার, চিঠি পেয়েই কলকাতা রওনা হবে।"

অন্নদাপ্রসাদ সুভাষচন্দ্রের নির্দেশমতো কলকাতা রওনা হলেন। যেদিন কলকাতায় পৌঁছালেন—

সেইদিনই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল 'ফরওয়ার্ড ব্লক' গঠনের। ছোটনাগপুর অঞ্চলে 'ফরওয়ার্ড ব্লকে'র সংগঠনকে সুদৃঢ় করে তোলার দায়িত্ব দেওয়া হল অন্নদাপ্রসাদকে।

রামগড়ের সম্মেলন উপলক্ষে অন্নদাপ্রসাদ সম্পাদিত 'সংগঠন' পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। ওই সংখ্যাটি পড়ে নেতাজি অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন।

এ সম্বন্ধে অধ্যাপক প্রশান্তকুমার সরকার মহাশয় একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন—, "এইবার বর্দ্ধমান থাকাকালীন তাঁহার সাংবাদিকতার ও সাহিত্যিক জীবনের কথা। তাঁহার ৮/৯ বৎসর বয়স হইতেই কবিত্ব শক্তির স্ফুরণ হয় ....। মুরাড়ি মধ্য বাংলা বিদ্যালয়ে পড়িবার সময়ই তিনি 'ধীরা ও মিলন' নামে একাঙ্ক নাটক লিখেছিলেন। উহা পরে বর্দ্ধমানেই ছাপা হয়। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি গীতা ও চণ্ডীর অনুবাদ করেন। ১৩২৪ (ইং ১৯১৮) সালে তাঁহার চণ্ডীর অনুবাদ শেষ হয়। ১৩২৬ সালে ঈশ ও কেনোপনিষদের পদ্যানুবাদ করেন। চণ্ডীর অনুবাদের স্বত্ব বিক্রয় করিয়া ৫০ টাকা লাভ করেন। ১৩২৫ সালে গীতার অনুবাদ শেষ করেন। এত অল্প বয়সে কিরূপে তিনি ঐ সকল গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিস্ময়াবিষ্ট হই। ছাত্রাবস্থাতেই 'বেদনা' নামক পত্রিকার সম্পাদনা করেন। যখন তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র তখন মাসিক 'ভক্তি' পত্রিকা ও সাপ্তাহিক 'দেশদর্পণ' পত্রিকায় লিখিয়া মাসে মাসে ২০ টাকা পাইতেন। ঐ সময় তিনি তাঁহার গ্রামাঞ্চলে প্রচারের জন্য 'সমাজ সখা'-র সম্পাদনা করিতে থাকেন। পত্রিকাটি মাত্র এক বৎসর চলিয়াছিল। ইহা ছাড়া 'আর্য্যাবর্ত্ত' 'আত্মশক্তি' 'ভারতী' প্রভৃতি পত্রিকাতেও তিনি লিখিয়াছিলেন। বর্ধমান হইতে প্রকাশিত 'শক্তি'-র সম্পাদনাও কিছুকাল করিয়াছিলেন। পুরুলিয়া হইতে প্রকাশিত ঋষি নিবারণ চন্দ্রের 'মুক্তি' এবং বাঁকুড়া হইতে প্রকাশিত 'যুগদীপ' পত্রিকাতেও তিনি লিখিতেন। বাংলাদেশে এত অল্প বয়সে অন্য কোন সাংবাদিকের জীবন আরম্ভ হইয়াছে কিনা সন্দেহ। বর্দ্ধমানের ছাত্রাবস্থাতেই তাঁহার প্রথম কবিতা পুস্তক 'স্মৃতিপূজা' ছাপানো হয়। 'ধীরা ও মিলন' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই দুইখানি গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ অর্থ তিনি হিতৈষিণী সভার তহবিলে দান করেন।

অন্নদাপ্রসাদ তাঁর বিপ্লবী জীবনে 'তরুণশক্তি' ছাড়াও 'মানভূম সমিতি' এবং 'সংগঠন' পত্রিকা সম্পাদনা ও পরিচালনা করে গেছেন। ইংরেজ প্রশাসনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল 'সংগঠন' পত্রিকা। অতীতের মানভূম জেলার সদর দপ্তর পুরুলিয়া থেকে প্রকাশিত হত 'সংগঠন'। সমাজ জীবনের হতাশা, নিরাশা, অভাব-অভিযোগ তথা নিপীড়িত মানুষের ব্যথা-বেদনার কথা অসঙ্কোচে এবং নির্ভীকভাবে উৎসারিত হত পত্রিকার ছত্রে ছত্রে। বিভিন্ন শিরোনাম বা Column কে ভিত্তি করে দেশি-বিদেশি সংবাদ ছাড়াও গঠনমূলক সমালোচনা এবং মন্তব্য প্রকাশ পেত। যেমন—'ছিটে ফোঁটা', 'ভৃগুরাম শর্মার চিঠি', 'নানা কথা', 'চিত্রগুপ্ত', 'অভিযোগ', 'প্রাপ্তপত্র' প্রভৃতি। 'ভৃগুরাম শর্মা' এবং 'চিত্রগুপ্ত' ছদ্মনামে অন্নদাপ্রসাদের সরস অথচ গভীর অর্থদ্যোতক লেখাগুলি পাঠককে যেমন তৃপ্ত করত তেমনি যাঁদের উদ্দেশ্যে লেখা হত তাঁরা ও তাঁদের স্খলন-পতন-ত্রুটিগুলির সংশোধনে প্রয়াসী হতেন।

অন্নদাপ্রসাদ সম্পাদিত 'সংগঠন' পত্রিকার বহুল প্রচার সবিশেষ উল্লেখ্য ব্যাপার। কয়েকশো মানুষ সারিবদ্ধ হয়ে সংগঠন কার্যালয়ের সামনে অধীর আগ্রহে একখানি 'সংগঠন' করায়ত্ত করার জন্য দাঁড়িয়ে থাকতেন। অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণই 'সংগঠন'কে শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্রের শিরোনামায় ভূষিত করেছিল। স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী পাটনা থেকে লেখা তাঁর ৩০.১০.৫৬ তারিখের চিঠিতে এবিষয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন—"তোমরা দেখিয়াছ যে সংগঠনের কোনও কোনও সংখ্যা আমরা ৫০০০

পর্যন্ত ছাপিয়েছিলাম। মিঃ আমিন আমাদের সঙ্গে ঝগড়ার সময় (চক বাজারের হরিনাম সংকীর্ত্তন লইয়া) আমরা সংগঠনের দৈনিক সংস্করণ প্রতিদিন ১০,০০০ পর্যন্ত ছাপিয়াছি।"

দেশ স্বাধীন হল। বিপ্লবী অন্নদাপ্রসাদ দেশ গড়ার কাজে, জাতির নৈতিক বুনিয়াদকে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে এবং সর্বোপরি ভারতীয় অধ্যাত্ম চেতনার নব মূল্যায়নের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। স্বাধীন ভারত পেল বিপ্লবী অন্নদাপ্রসাদকে কর্মযোগী অসীমানন্দরূপে। সে সময় মহাযোগী স্বামী কিরণচাঁদ দরবেশ 'মন্দির' পত্রিকা প্রকাশ করেছেন— সম্পাদনার ভার তখন তিনিই বহন করে চলেছেন। তিনি 'মন্দির' পত্রিকা পরিচালনার জন্য উপযুক্ত লোক খুঁজছিলেন। অভিজ্ঞ জহুরির রত্ন চিনতে সময় লাগে না। তাই তাঁরই সুযোগ্য শিষ্য অন্নদাপ্রসাদকে 'মন্দির' পত্রিকার প্রকাশ এবং সম্পাদনার ভার দিয়ে তিনি পরম স্বস্তি বোধ করেছিলেন। ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতিমূলক 'মন্দির' পত্রিকা আজও পুরুলিয়া জেলার রামচন্দ্রপুর গ্রাম থেকে প্রকাশিত হচ্ছে।

স্বাধীন ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচন। অসীমানন্দের উপর প্রত্যাদেশ হল— জনগণের সেবার জন্যই তাঁকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। দল ও মতের উর্ধ্বে থেকে পক্ষপাতহীন অনাসক্ত সেবকের ভূমিকায় তাঁর বিস্ময়কর অবদান ইতিহাসের পাতায় স্বাক্ষরিত। তাই, নির্দল প্রার্থীরূপেই তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেন এবং বিপুল ভোটে বিহার বিধান সভায় নির্বাচিত হলেন। তাঁকে দুটি সমস্যা একইভাবে পীড়িত ও বিচলিত করেছিল, একটি অন্ধত্ব নিবারণের সমস্যা, অপরটি কুষ্ঠদের সমস্যা। এ সম্বন্ধে তিনি প্রথম নিখিল ভারত অন্ধকল্যাণ সপ্তাহের উদ্বোধনী ভাষণে তাঁর একান্ত উপলব্ধির কথা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। প্রথমেই তিনি অন্ধদের অসহায় অবস্থার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। সে সময় তাঁরই সহকর্মী ভোলা পাশোয়ান বিহার সরকারের মন্ত্রীসভার সদস্য ছিলেন। স্বামীজির প্রতি তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধার কথা সুবিদিত। অসীমানন্দজি তাঁর রামচন্দ্রপুর শ্রী শ্রী বিজয়কৃষ্ণ আশ্রমে অন্ধদের চিকিৎসার জন্য অস্থায়ী শিবির করে সমস্যার আশু সমাধানের কথা ভাবলেন। পরামর্শ করলেন মন্ত্রী ভোলা পাশোয়ানের সঙ্গে। আর্থিক অনটনের কথা চিন্তা করেই তাঁকে প্রয়োজনমতো সাহায্যের জন্য অনুরোধ জানালেন। সে সময় তাঁর মন্ত্রক থেকে বড় অঙ্কের অনুদান দেওয়া সম্ভব ছিল না, যেটুকু দেওয়া সম্ভব তা দিয়ে প্রস্তাবিত চক্ষু চিকিৎসা শিবির পরিচালনা সাধ্যাতীত ব্যাপার। দুজনেই ছুটলেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহ-এর কাছে। তিনি স্বামীজির ভূয়সী প্রশংসা করলেন এবং চক্ষু চিকিৎসার জন্য ডাক্তার, নার্স, ঔষধ প্রভৃতি পাটনা Medical College থেকে পাঠাবার নির্দেশ দিলেন। মন্ত্রী ভোলা পাশোয়ান তাঁর মন্ত্রক থেকে যে অর্থ দিলেন তা দিয়ে রোগীদের পথ্যের ব্যবস্থা করা হল। এইভাবে কয়েক বৎসর অস্থায়ী চক্ষু শিবির চালানো হল। কিন্তু এতে আশানুরূপ ফল দেওয়া গেল না। অনেক ক্ষেত্রে নানা কারণে রোগীদের চোখে Infection দেখা দিতে লাগল। স্বামীজি ব্যথিত হলেন। ভাবলেন এভাবে চক্ষু চিকিৎসার নামে চক্ষু নষ্ট করার অধিকার তাঁর নেই। স্থায়ী চক্ষু হাসপাতাল স্থাপনের পরিকল্পনা তাঁর চিন্তারাজ্যে অহরহ ঘুরপাক খেতে লাগল। প্রচেষ্টার বুকে যবনিকা পড়ল না। স্বামীজি দশটি শয্যাবিশিষ্ট স্থায়ী চক্ষু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করলেন, বিহার সরকার সাধ্যমতো সহায়তা করতে কোনদিনই দ্বিধান্বিত হননি। দশটি শয্যাবিশিষ্ট চক্ষু হাসপাতালের স্বল্প অবয়ব পরবর্তীকালে বিপুলকায় নেতাজি চক্ষু ও সাধারণ হাসপাতালে রূপান্তরিত হয়েছে, এই বিবর্তনের সোপানগুলিতে স্বামীজির অক্লান্ত পরিশ্রমের স্বেদবিন্দু আজও হয়তো মুক্তার মতো জ্বলজ্বল করছে।

১৯৪৭ সাল। দেশ স্বাধীন হল।

শ্রীশ্রী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করলেন অন্নদাপ্রসাদ। গুরুজি স্বামী কিরণচাঁদ দরবেশ তাঁকে সন্ন্যাসী অভিধায় চিহ্নিত করলেন — আমরা পেলাম স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতীকে এক নূতন পরিচিতির বাহকরূপে।

তাঁর কর্মক্ষেত্র আরও প্রসারিত হল। একদিকে অন্নহীন, বস্ত্রহীন, স্বাস্থ্যহীন অন্ধ আতুর পীড়িত জনের সেবার কাজ, অন্যদিকে মুমুক্ষু মানুষের বুকে বহ্নিমান অশান্তির থেকে মুক্তির পথ নির্দেশের কাজ। আজীবন কর্মযোগী গীতার কর্মযোগের মূর্তিমান প্রকাশ।

তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন শ্রী শ্রী বিজয়কৃষ্ণ আশ্রম। শ্রী শ্রী বিজয়কৃষ্ণ আশ্রম রিলিফ সোসাইটি, নেতাজি চক্ষু হাসপাতাল, নিখিল ভারত অন্ধ কল্যাণ সপ্তাহ, শ্রী শ্রী বিজয়কৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ। দরবেশ বিদ্যার্থী ভবন, দাতব্য হোমিও চিকিৎসালয়। এছাড়াও তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মসূচি ছিল অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা, মাতৃসদন, কুষ্ঠরোগ মুক্ত মানুষের সুষ্ঠু পুনর্বাসন, বৃদ্ধাশ্রম প্রভৃতি।

আজকের বিপুলায়তন নেতাজি চক্ষু হাসপাতালের পত্তন মূলের ইতিহাস জানতে হলে প্রথম নিখিল ভারত অন্ধকল্যাণ সপ্তাহের উদ্বোধনী সভায় স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতীর প্রদত্ত ভাষণের মর্মবাণীটি অনুধাবন করতে হবে। যার মধ্যে তাঁর উদগ্র মানবপ্রীতি অবলীলায় উৎসারিত হয়েছে! অসীমানন্দের কথায় — "এই হাসপাতালের প্রথম প্রেরণা আমি পাই নেতাজীর কাছ থেকে। আপনারা বোধহয় শুনেছেন এর আগের বক্তা বলেছেন যে, নেতাজী যখন পুরুলিয়া এলেন সে সময় একদিনে ত্রিশটি সভার আয়োজন করা হয়েছিল এবং তাঁর ১০৪ ডিগ্রি জ্বর নিয়ে তিনি পুরুলিয়া পৌঁছেন। আমি যখন তাঁকে বললাম, 'এই ১০৪ ডিগ্রি জ্বরে আমি আপনাকে নিয়ে পুরুলিয়া শহর-জেলা ঘুরব না। আপনার life risk করে। আমি এ চাই না। আমি সব বন্ধ করে দেব' উনি আমাকে ধমকে উঠলেন — বললেন, 'বল কি? কাজ যদি করতে হয় তবে life risk করেই করতে হবে।' ওঁর এই বাণীই আমার জীবনে অক্ষয় হয়ে থাকল যে, কাজ যখন করতে হবে তখন যে কোন risk নিয়েই করতে হবে। তারপর সেদিন আরেক ঘটনা ঘটল। পুরুলিয়া থেকে আদ্রায় ট্রেন ধরবার জন্য আসতে আসতে হঠাৎ দেখলেন, একটি লোক পড়ে গেল আনাড়ার কাছে। গাড়ী থামিয়ে নেতাজী নেমে পড়লেন। নেতাজী লোকটিকে তুলে ধরলেন, দেখলেন লোকটি অন্ধ। নেতাজী কেঁদে ফেললেন, বললেন—'অন্নদা! এদের জন্য কি কিছুই করা যায় না? কিন্তু কথাটা এখানেই শেষ হয়ে গেল। তারপর নেতাজী চলে গেলেন। এই অঞ্চলে এত কুষ্ঠরোগী তা আপনারা সকলেই শুনেছেন। ১৯২১ সালে কুষ্ঠরোগীদের চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা এই অঞ্চলে ছিল না। হাতুড়েরা ওষুধ দিত। চালমুগরার তেল ইত্যাদি তৈরি করে। তারপরে আমি প্রথমে এখানে কুষ্ঠরোগীদের একটি সেন্টার করি— তখন পুরুলিয়া জেলায় কুষ্ঠদের চিকিৎসার ব্যবস্থা হয় নি।

১৯৩৫ সালে 'মানভূম সমিতি'র কর্মধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকার সময়ই শিক্ষা ব্যবস্থার গতি-প্রকৃতি নিয়ে তিনি গভীরভাবে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছিলেন এবং সেই সময়েই মানভূম থেকে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের জন্য তিনজন ছাত্রকে বিশ্বভারতীতে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু শিক্ষার উদ্দেশ্য, পরিবেশ এবং পরিকাঠামো সম্বন্ধে তাঁর মৌলিক ধ্যান-ধারণাকে রূপায়িত করবার তাগিদেই তিনি তাঁর আশ্রমে 'শ্রীশ্রী বিজয়কৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ' ও 'দরবেশ বিদ্যার্থীভবন' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যায়তনে প্রকৃত মানুষ গড়তে চেয়েছিলেন — যেখানে মানবিক মূল্যবোধ সযত্নে পরিপোষিত হবে -- দেশ ও জাতি তার আগামীর সম্পদ আহরণ

করবে তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁর এটাই কথা ছিল — 'যদি একজনও প্রকৃত মানুষ আমার বিদ্যালয়ে তৈরি হয় ভাববো আমার স্বপ্ন সার্থক হয়েছে।'

১৯৬৮ সাল—১৩ আগস্ট অক্লান্ত কর্মযোগী মহাসমাধিতে লীন হলেন। দেশবাসী হারাল একজন নিষ্ঠাবান সমাজসেবক। পুরুলিয়ার মানুষ হারাল তাদের অতি আপনজনকে। যে মানুষটি যাবার আগে পর্যন্ত প্রার্থনা জানিয়ে গেছেন—

"দাও ভিক্ষা সকলের ব্যথিত হিয়ার
ব্যথা বেদনার ভাগ ওগো বিশ্ববাসী।
সেবকের যোগ্য নহি, তবু দাও সেবা অধিকার
কাতর প্রার্থনা আজ জীবনের শেষ প্রান্তে আসি।।

আমরা ইতিহাসবিস্মৃত — তাই আমরা দিক্‌ভ্রান্ত। ইতিহাস ভারাক্রান্ত নয় — তাই ইতিহাস স্বপ্রকাশ। কালের বাহক জীর্ণ কীটদষ্ট ছেঁড়া পাতার পরাকাষ্ঠা নয়। যুগযুগান্তের কলকোলাহলের কাহিনি তার হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দনধ্বনি।

পুরুলিয়ার ভারত সেবাশ্রম সঙঘ

স্বামী শাশ্বতানন্দ

মানুষের সমষ্টি সমাজ-জাতি-রাষ্ট্র। মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশ ভারতের চিরন্তন আদর্শ। স্বভাবগতভাবে ব্যক্তিজীবন দুর্বল হলে সমাজ সেখানে দুর্বল হবেই। তাই স্বভাবত ব্যক্তি-জীবন-গঠন প্রাধান্য লাভ করে।

সমাজের সেবা, সমাজ-সংস্কার ও শক্তিশালী জাতিগঠনে চাই একটি সহানুভূতি সম্পন্ন আদর্শ জীবন, অনন্যসাধারণ অলৌকিক ব্যক্তিত্ব। তিনিই যথার্থ সমাজের সেবক হতে পারেন। সেই সূত্রে স্মরণীয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে আবির্ভূত প্রাতঃস্মরণীয় একটি মহাজীবন—আচার্য স্বামী প্রণবানন্দ।

ভারতের চিরন্তন আদর্শের ভিত্তিতে ব্যক্তিজীবনের উন্মেষ, সমাজের সেবা, বিচ্ছিন্ন-বিস্মৃত জাতির সুগঠন লক্ষ্য রেখে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে আচার্য স্বামী প্রণবানন্দ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেন। তখন তিনি ব্রহ্মচারী বিনোদ নামেই পরিচিত ছিলেন। ১৯২৪-এ প্রয়াগে অর্ধকুম্ভ মেলায় সন্ন্যাস গ্রহণান্তে নাম হয় আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ।

আচার্য প্রণবানন্দের সুমহান ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি হল অখণ্ড ব্রহ্মচর্য, কঠোর তপস্যা, অপ্রতিহত সাধনা, সর্বশ্রেণির জনকল্যাণকর অবিরাম কর্ম-প্রবাহ, সুতীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টি এবং সর্বসামঞ্জস্য ও সমাধানমূলক নীতিনৈপুণ্য, অনমনীয় মর্যাদাবোধ ও অসাধারণ সংগঠন প্রতিভা।

বয়সের অনুপাতে শরীরের বৃদ্ধি খুবই হয়েছিল, সেখানে শ্রী, লাবণ্য ও শক্তি ছিল চরম আকর্ষণীয় ও চমকপ্রদ। তাঁর স্বভাবের মৃদুতা, চরিত্রের পবিত্রতা, আচার-ব্যবহারের মধুরতা, বাক্যালাপের শালীনতা, বুদ্ধির নির্মলতা, মানসিক স্থিরতা ও অবিচল গম্ভীরতা স্বভাবতই তাঁকে দেশের নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও জাতীয় উত্থানের যোগ্যতম মহান্ আচার্য হিসাবে চিহ্নিত করেছিল।

জন্ম হতে সিদ্ধিপ্রাপ্তের সময় পর্যন্ত নিজ পিতৃগৃহেই ছিলেন। গ্রামের বালকদের সাথে স্কুলে গেছেন, নিয়মিত ব্যায়াম করেছেন, বাল্য হতে গ্রাম-মঙ্গলকর জনকল্যাণ কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন, বালক-যুবকদের জীবনগঠন বিষয়ে উপদেশ ও সঙ্গ দিতেন, কখনও গ্রাম্যবিবাদ-দলাদলি-সমস্যা মেটাতে এগিয়ে আসতেন, কখনও দুষ্ট-দুর্বৃত্তের দমন করতেন, এরপরও তাঁর কঠোর ব্রহ্মচর্যের অপ্রতিহত সাধনা—মিতভাষী, মিতাহারী, সদা আত্মসমাহিত, জিতনিদ্র, শান্ত সৌম্য ; ও জাতিগঠনকল্পে অবিচল সংকল্প দর্শনে অতিশয় প্রবীণ বুদ্ধিজীবীদেরও অবাক হতে হত।

কুড়ি বছর। আচার্যের জীবনের প্রথমার্ধ কঠোর তপঃ সাধনার জীবন। অতঃপর সিদ্ধিলাভ,

সঙ্ঘগঠন, পরবর্তী চব্বিশ বছর জাতিগঠন-কল্পে বিভিন্ন কর্মযোজনা। মাত্র চুয়াল্লিশ বছরের সামান্য কিছু বেশিতে স্থূল দেহের অবসান।

তদ্‌কর্তৃক আয়োজিত ব্যক্তি ও সমাজজীবন গঠনের বিভিন্ন আয়োজনকে তিনি আন্দোলন নামে ভূষিত করেছেন। আর যখন যে আন্দোলনের যোজনা তিনি করেছেন, তখন তখনই সমাজে ভীষণ আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। আমরা বর্তমানে বেশ ভালো করে অনুভব করি সেই আন্দোলনগুলির ব্যাপক প্রয়োজনীয়তা।

প্রথমে তাঁর ব্রহ্মচর্য তথা জীবনগঠনের আন্দোলন। ব্যক্তিজীবনের বিকাশ না হলে ; ব্যক্তিজীবনে ব্রহ্মচর্য, সংযম, সরলতা, দেশপ্রেম, শক্তিসাধনা প্রতিষ্ঠিত না হলে অপুষ্ট দুর্বল চরিত্রের জীবন দিয়ে কী হবে! শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তর পর্যন্ত সকল জীবনে বিদ্যালাভের সাথে সাথে চাই মুনষ্যত্বের উন্মেষ। মনুষ্যত্বের উন্মেষে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র উন্নত হবে। তিনি এবং তাঁর সঙ্ঘ সমগ্র শক্তি নিয়ে এই আন্দোলনে আসমুদ্র হিমাচল ত্রস্তব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এরপর তিনি গার্হ্যস্থ আন্দোলন, ক্রমে তীর্থসংস্কার, শিক্ষাবিস্তার, ধর্মপ্রচার, জনসেবা, সমাজে শ্রদ্ধা-বিশ্বাসের উন্মেষ, সমগ্র দেশের গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে সার্বজনীন মিলন ভাতৃত্ব-সৌহার্দ্রের কেন্দ্রস্বরূপ আশ্রম-মঠ ও মিলন মন্দির স্থাপন ; হীন-অন্ত্যজ-পতিত-দলিতের উন্নয়নে সমাজ-সমন্বয় আন্দোলনের প্রবর্তন, সমাজের উপর অন্যায়-অত্যাচার-অবমাননা-অমর্যাদারোধে এবং জাতীয় স্বার্থ, অধিকার রক্ষার রক্ষীদল গঠন প্রভৃতি বিবিধ কর্মযোজনার প্রবর্তন করেন।

আজ বিদেশেও সঙ্ঘের অনেকগুলি শাখাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সিদ্ধিলাভের প্রাক্কালে এযুগের আকাঙ্ক্ষিত যা সেটিকে তাঁর প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সেই অবিস্মরণীয় বাণীটি হল,—'এ যুগ মহাজাগরণের যুগ, এ যুগ মহামিলনের যুগ, এ যুগ মহাসমন্বয়ের যুগ, এ যুগ মহামুক্তির যুগ।'

যুগের মহাজাগরণ ও মহামুক্তিকে তিনি দর্শন করেছিলেন। জাতির মহাজাগরণ ও মহা মুক্তি ভেদাভেদ, দলাদলি ও সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে কখনও সম্ভব হতে পারে না। মহামিলন ও মহাসমন্বয়ের মধ্য দিয়েই আসবে জাতির মহাজাগরণ ও মহামুক্তি। আর মিলন-সমন্বয় সম্ভব হবে পরস্পর সহানুভূতি, সহযোগিতা ও সেবার মাধ্যমে।

তিনি বলতেন—'আমরা সংগঠন ও সংস্কার চাই। কিন্তু আমরা এমন কিছু করব না যাতে সমাজে ভেদ ও বিপ্লবের সৃষ্টি হয়। আমরা এমন সেবা করব যাতে জাতি ও সমাজ সবল-সুস্থ-সুসংগঠিত ও বলিষ্ঠ হয়ে আপন ধারায় চলতে পারে।'

তাঁর আদর্শে দীক্ষিত সমাজসেবায় আত্মনিয়োজিতপ্রাণ সন্ন্যাসীদের অদম্য উৎসাহে উৎসাহিত করে বলতেন,—'তোমরা অমৃতের সন্তান। তোমরা স্বরূপতঃ পবিত্র, স্বতঃ বিশুদ্ধ। তোমাদের কোন ভয় নেই। তোমরা অবিনাশী, কোন কিছু তোমাদের নষ্ট করতে পারে না। তোমরা আত্মবিশ্বাসী হও। আত্মশক্তি বিকাশের জন্য সতত চেষ্টা করে চল। আত্মবিশ্বাসের অমোঘ শক্তিতে শক্তিমান হয়ে আত্মশক্তির উপর নির্ভর করতঃ সহস্র সহস্র সন্তপ্ত প্রাণকে সুশীতল করবার জন্য তোমাদের এই সঙ্ঘকে উপযুক্ত করে তোল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিগুলিকে সম্মিলিত সংগঠিত করে বিরাট সঙ্ঘশক্তির নির্মাণ কর। ভুলে যাও পাপ-তাপ-আধি-ব্যাধি-রিপু-ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা ; ধর বিবেক ও বৈরাগ্যের অসি, এরূপে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ ও মুক্ত স্বভাব হয়ে উদ্ধার কর পতিতের,

রক্ষা কর বিপন্নজনের, সন্তপ্তকে শান্তি সুখ প্রদান কর, আশ্রয় দাও নিরাশ্রিতকে।'

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বললেন, 'আমি সঙ্ঘ-শক্তি সৃষ্টি করতে চাই। ভারতীয় জাতীয়তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা এই সঙ্ঘের লক্ষ্য হবে। আশ্রম ধর্ম্মের পবিত্রতা ও বিকাশের প্রতি শ্রদ্ধা চাই। আর জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সেবাই সঙ্ঘের ব্রত।'

বন্যা, মহামারী, প্লাবনে, ভূমিকম্পে, ঝড়ে-ঝঞ্ঝায় লক্ষ লক্ষ বিপন্ন মানুষের পাশে সঙ্ঘ সততই ধাবমান। স্মরণ হয়, তীর্থে তীর্থে হাজার হাজার যাত্রীর সর্বপ্রকার সেবা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করে তীর্থের সংস্কার, মনুষ্যত্বের বিকাশশীল শিক্ষার বিস্তারকল্পে দেশে-বিদেশে স্কুল-কলেজ ও বিদ্যার্থী ভবনের স্থাপনা, ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে আত্মপরিচয়হীন জাতির কানে কানে সনাতন ধর্ম-শিক্ষা-সংস্কৃতির মহিমার অমৃতকথা শ্রুতিগোচর করে স্বধর্মনিষ্ঠার জাগরণ এনে দেওয়া,—সকল জনকল্যাণকর্মে সকল প্রকার সহযোগিতার সুযোগ করে দেবার জন্য আচার্য্য প্রণবানন্দ কর্তৃক চারণদলের রচনা—যার সংগৃহীত অর্থানুকুল্যে সঙ্ঘের সকল কর্মের সুচারু নির্বাহ। বহু দাতব্য চিকিৎসালয়, হসপিটাল, ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা ব্যবস্থার দ্বারা সঙ্ঘ হাজার হাজার পীড়িত মানুষের সেবা করে চলেছে। এছাড়া মুম্বাই-এ ক্যান্সার রোগীর চিকিৎসা, চেন্নাই-তে থেকে বহুবিধ চিকিৎসার সুযোগ, কলকাতায় বহির্বিভাগ ও পাঁচশত শয্যাবিশিষ্ট হসপিটালের স্থাপনা, জামশেদপুরে বিস্তারিত কুষ্ঠ হসপিটালসহ বহুবিধ সেবা প্রকল্পের যোজনা এ সবই সঙ্ঘের সেবাকার্যের বহু প্রসারিত দিঙ্‌মালা।

আচার্য স্বামী প্রণবানন্দের দর্শন হল—সকল মানুষের সকল প্রকার বিরোধ মেটাবার দর্শন। নিরাশা-হতাশাগ্রস্ত মানুষ পাবে অদম্য প্রেরণা। বুদ্ধিহীন মানুষ পাবে সদবুদ্ধি। দিশাহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট মানুষ খুঁজে পাবে মানুষের লক্ষ্য সাধনের পথ।

আজ ধর্ম নিয়ে দেশে-বিদেশে যে হানাহানি, তার চিরন্তন নিরসন করেছে আচার্য স্বামী প্রণবানন্দের ধর্মীয় দর্শন। তিনি বলছেন—'ধর্ম্ম হল ত্যাগ, সংযম, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য। এই চারটির আচরণ ও অনুশীলনের উপরই মানবিকতার চরম বিকাশ নির্ভর করছে, —জগতের কোন মানুষই এই চারটিকে অস্বীকার করতে পারবে না। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রগতি ও কল্যাণ—এই চারটির যথার্থ মর্য্যাদা রক্ষায় নির্ভরশীল। এই চারটির উপেক্ষা ও অনাদরে ব্যক্তি-মানুষ অসম্পূর্ণ। অজ্ঞতা, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, কুসংস্কার, দারিদ্রতা, জাতীয় অবরোধ, সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থপরতা, আত্মাবচেতনা, জড়তা, চরম ইন্দ্রিয় ভোগাসক্তি, অমানসিকতা ইত্যাদি হতে মুক্তি জীবনের লক্ষ্য।' বললেন 'লক্ষ্য হল-মহামুক্তি ও আত্মতত্ত্বোপলব্ধি।'

আলস্য-জড়তাকে, লোভ-মোহাদিকে মহাশত্রু বলেছেন। আত্মবিশ্বাস, আত্মনির্ভরতা, আত্মমর্যাদা হল মহাসম্বল ; ধৈর্য, স্থৈর্য, সহিষ্ণুতাই মানুষের মহাশক্তি। আর উদ্যম, উৎসাহ, অধ্যবসায় হল পরম মিত্র। মানবপ্রেমী আচার্য স্বামী প্রণবানন্দের দর্শন কালজয়ী, জগতের প্রত্যেক মানুষের শান্তি-শক্তি-প্রগতি ও সমাধানের উৎসস্বরূপ।

উদারতা, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, অহিংসা ভারতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির চিরন্তন আদর্শ। কিন্তু এটা ভুললে চলবে না যে, হেথা ক্ষত্রিয়গরিমা ও ব্রাহ্মণ্য মহিমা সম-মর্যাদা পায়। হাজার বছরের পরাধীনতার পর ভারতকে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, অহিংসার সাথে চাই তেজ ও শক্তিসাধনার ব্যাপক অনুশীলন। আচার্য স্বামী প্রণবানন্দের জীবন ও বাণীতে তা দৃপ্ত হয়ে উঠেছে। অন্যায়,

অত্যাচারী, দুষ্কৃতকারী অসুরের বিনাশ চাই। তবেই ন্যায়-নীতি ও ধর্মের প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

দেশ, সমাজ ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োজিত পরম মানবপ্রেমী সেবাধর্মের সার্থক প্রতিষ্ঠাতা ও প্রচারক আচার্য স্বামী প্রণবানন্দ ও তাঁর সঙ্ঘের অতি-সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে রাখলাম।

আচার্য স্বামী প্রণবানন্দ তাঁর ছাত্র-যুব জীবনগঠন ও গার্হ্যস্থ্য আন্দোলনের সময় সমগ্র দেশব্যাপী যে প্রচার-পরিক্রমা করেছিলেন, সেই সময় (১৯২৮) দু'দিনের সফরে পুরুলিয়া শহরে এসেছিলেন। আবার, তাঁর মহাজীবনের শেষপাদে রঘুনাথপুরের পার্শ্ববর্তী গ্রাম সেনেড়ায় (১৯৪০) দু'দিনের উপজাতি সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছিলেন। সেই প্রেরণাকে সম্বল করে তার অনেক পরে ১৯৭৮ সালে পুরুলিয়ায় আশ্রম নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১৯৮০ সালে আচার্যদেবের লীলাপার্ষদ সঙ্ঘের সম্পাদক স্বামী প্রজ্ঞানন্দজি সন্ন্যাসীমণ্ডলীসহ এসে নবনির্মিত আশ্রমের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী শাশ্বতানন্দের অক্লান্ত পরিশ্রম-অধ্যবসায় ও তত্ত্বাবধানে ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন জনকল্যাণকর কর্মের বিস্তার হতে থাকে। অবিরাম জনসংযোগবশত শহরের প্রায় সকল মানুষ নানাভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় ; সশ্রদ্ধভাবে এগিয়ে আসেন বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ। আশ্রমের গৌরবে ও সৌরভে ছুটে আসে অধ্যাত্মপিপাসু ত্যাগী সন্তানগণ। স্পৃশ্যাস্পৃশ্যের ঊর্ধ্বে সকল মানুষের আত্মিক মিলনের ক্ষেত্র রচনা করেন নির্মিত হয় বিশাল প্রার্থনা গৃহ। আঞ্চলিক গরিব মেধাবী ছাত্রদের সুযোগ করে দিতে নির্মিত হল বিদ্যার্থীভবন। পীড়িত মানুষের চিকিৎসার জন্য হোমিও ও এ্যালোপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় হাজার হাজার মানুষের ভরসার স্থলরূপে চিহ্নিত হয়েছে, এছাড়া আছে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসার ব্যবস্থা। মানসিক শান্তির জন্য আছে মেডিটেশন সেন্টার। বৌদ্ধিক প্রেরণার জন্য নিয়মিত ক্লাসের ব্যবস্থা আছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার জন্য আছে পুস্তকভাণ্ডার ও পাঠাগার। জাতীয় সংহতি ও মহত্ত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক চেতনার সঞ্চারকল্পে আছে সাংস্কৃতিক প্রচার বিভাগ। এই জেলায় সঙ্ঘের জনসেবার দায়িত্বের উপর সজাগ দৃষ্টি রেখে আশ্রম বন্যা, দুর্ভিক্ষে, খরায় বিশেষ দায়িত্ব পালন করেছে। প্রতি বছর দরিদ্রদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। মেধাসম্পন্নদের উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতায় পাঠানো হয়, তাদের জন্য নানা বৃত্তিমূলক ব্যবস্থা আছে। নির্মিত হয়েছে একটি অতিথিশালা। পুণ্যার্থী ও ভ্রমণপিপাসুদের নিরাপদ বাসস্থান ও ভ্রমণের পরামর্শ দেওয়া হয়। ছাত্র-যুবকদের সুস্বাস্থ্য ও নৈতিক চারিত্রিক উন্মেষের জন্য আছে ব্যায়ামগার ও বৌদ্ধিক ক্লাসের ব্যবস্থা। হাজার হাজার মানুষের সাগ্রহ সমাবেশে আশ্রমের বার্ষিক মহোৎসব-সম্মেলনটি বড়ই আকর্ষণীয়।

আশ্রমের সেবকার্যের প্রসারবশত ক্রমে স্থাপিত হয়েছে রঘুনাথপুর, সেনেড়াগ্রাম ও অযোধ্যা পাহাড় সেবাকেন্দ্র। তিনটি স্থলেই শিশুশিক্ষার প্রসার লক্ষ্য রেখে স্থাপিত হয়েছে বিদ্যালয়-বিদ্যার্থীভবন। রঘুনাথপুর আশ্রমের শিক্ষাকেন্দ্রের নাম 'প্রণবানন্দ শিশুতীর্থ।' সেনেড়াগ্রামেরটি 'প্রণবানন্দ শিশুশিক্ষা নিকেতন' ও অযোধ্যা পাহাড়েরটি 'প্রণবানন্দ শিশুশিক্ষা উদ্যান' নামে পরিচিত। এর মধ্যে রঘুনাথপুরেরটির বয়স একটু বেশি। বর্তমানে ৫৫০ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে এই শিশুশিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি। আশ্রমিক মনোরম পরিবেশে ভব্যতা, সভ্যতা, নিয়মানুবর্তিতা, সংযম ও প্রার্থনার সঙ্গে মেধাবৃত্তির বিকাশশীল শিক্ষানীতি নিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমবেত প্রার্থনাগৃহ, বিদ্যার্থীভবন, ব্যায়ামগার, অতিথিশালা, দাতব্য চিকিৎসালয়, গ্রন্থাগারসহ রঘুনাথপুর আশ্রমটি এখন পরিপূর্ণতা লাভ করছে।

অযোধ্যা পাহাড় আশ্রমটিতে পর্যটকদের চাহিদানুসারে নির্মিত হয়েছে যাত্রীনিবাস—বর্তমানে

এটির সম্প্রসারণ হচ্ছে; নির্মিত হচ্ছে বিদ্যালয় ভবনটি। রঘুনাথপুরের নিকটে বেরো রেলওয়ে স্টেশনের পার্শ্বে সেনেড়া কল্যাণ-কেন্দ্রটি মন্দির, বিদ্যালয়, সাধুনিবাস, সংহতি ভবন প্রভৃতিসহ একটি গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে বিবিধ সেবা ও কল্যাণকার্য চালিয়ে যাচ্ছে। ক্রমে গ্রামে গ্রামে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসার সম্প্রসারণের চিন্তা করা হচ্ছে। শীঘ্রই পুরুলিয়া সেবাশ্রম কেন্দ্রে বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার হবে। বর্তমান কর্মযোজনা ও সকল সম্প্রসারণ পরিকল্পনা সহৃদয় দাতাগণের দানের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। আশ্রম নির্মাণে ও পরিকল্পনায় সরকার ও পৌরসভার সহযোগিতা প্রতিষ্ঠান কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করে।

বিঃ দ্রঃ সঙ্ঘের শাখাকেন্দ্রসমূহ :-

গয়া, বারাণসী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, নিউদিল্লি, কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, কেদারনাথ, গৌরীকুণ্ড, বদ্রীনাথ, উখীমঠ, যোশীমঠ, হায়দ্রাবাদ, পুরী, আমেদাবাদ, সুরাট, দ্বারকা, মুম্বাই, চেন্নাই, রামেশ্বরম্, কন্যাকুমারী, জামশেদপুর, রাঁচি, বিলাসপুর, জববলপুর, শিলিগুড়ি, বেলডাঙ্গা, গৌহাটি, লামডিং, রায়গঞ্জ, মালদা, তিওর, বালুরঘাট,অরঙ্গাবাদ, সিউড়ি, তারাপীঠ, দুর্গাপুর, বাঁকুড়া, কলকাতা (H.O.), গড়িয়া, নবদ্বীপ,গঙ্গাসাগর, হোড়খালি, মহিষাদল, পুকুরিয়া, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, খড়্গাপুর, রানিবাঁধ, খাতড়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, ডায়মন্ডহারবার, বৈদ্যনাথধাম।

লণ্ডন, গায়না, ত্রিনিদাদ, কানাডা, নিউ-ইয়র্ক, চিকাগো, উত্তর আমেরিকা, কাঠমাণ্ডু, বাংলাদেশে—বাজিতপুর, মাদারিপুর, খুলনা, আশাশুনী, নওগাঁ, ঢাকা।

এছাড়া সারা ভারতবর্ষে পাঁচ শতাধিক ধর্মীয় ও সমাজসেবামূলক কেন্দ্র রয়েছে।

পুরুলিয়া জেলার উন্নয়ন ও বিকাশে 'কল্যাণ'-এর ভূমিকা

অজিত কুমার পতি

পশ্চিমবঙ্গের আঠেরোটি জেলার অন্যতম হল পুরুলিয়া। পুরুলিয়া শুধু এই রাজ্যের মধ্যে নয়, সারা দেশের মধ্যেই অন্যতম পশ্চাৎপদ জেলা হিসাবে চিহ্নিত। জনঘনত্বের দিক দিয়ে এই জেলা যথেষ্ট সুবিধাজনক অবস্থায় থাকলেও আর্থিক, সামাজিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে তার অবস্থান উৎসাহব্যঞ্জক স্তরে নেই। জামসেদপুর, বোকারো, রাঁচী, ধানবাদ, দুর্গাপুর রানিগঞ্জ, আসানসোল ইত্যাদি শিল্পাঞ্চল দিয়ে ঘেরা এই জেলা প্রকৃতই 'প্রদীপের নীচে অন্ধকার' প্রবাদকে স্বার্থকনামা করেছে। ১৯৫৬ সালে তৎকালীন বিহার রাজ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর জীবন-জীবিকার প্রায় সর্বক্ষেত্রেই কিছু লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন হয়েছে সত্য, কিন্তু কখনোই তা প্রয়োজনের সঙ্গে তাল রাখতে পারেনি।

বর্তমানের পরিবর্তিত পটভূমিতে সরকারি উদ্যোগের সঙ্গে পৌরসভা এবং পঞ্চায়েতি-রাজ প্রতিষ্ঠানগুলি ছাড়া বহু বেসরকারি সংস্থাও যুক্ত হয়েছে। কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর ইত্যাদি জেলায় তাই বহু বেসরকারি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তুলনায় পুরুলিয়া জেলায় এ জাতীয় সংস্থার সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। যে কয়েকটি বেসরকারি সংস্থা এই জেলার মানুষের কল্যাণে নিযুক্ত রয়েছে 'কল্যাণ' তার অন্যতম।

জন্মলগ্ন থেকেই পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের সঙ্গে কল্যাণের সম্পর্ক তৈরি হয়। এর কিছুদিন পরই ১৯৮১ সালে রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ নরেন্দ্রপুরের অনুমোদন লাভ করায় পরিষদের সাহায্যেই ৬০টি বিধিমুক্ত শিক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে কল্যাণ গ্রামে গ্রামে গঠনমূলক কাজে যুক্ত হয়ে পড়ে। তারপর ১৯৮১ থেকে ২০০৩ সালের মধ্যে একে একে গবেষণাগার থেকে কৃষিক্ষেত্র কর্মসূচি, গ্রাম বিকাশ প্রকল্প, পরিবার বিকাশ প্রকল্প, যুবকর্মী প্রশিক্ষণ প্রকল্প, বন্যাত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রকল্প, সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ প্রকল্প, অব্যবহৃত জমির উন্নয়ন প্রকল্প, পরিবার সহায়তা প্রকল্প. কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র, নিবিড় স্বাস্থ্যবিধান প্রকল্প, জাহাজপুর সুসংবদ্ধ উন্নয়ন প্রকল্প এবং জনশিক্ষণ সংস্থান ইত্যাদির প্রকল্প যুক্ত হয়। এই প্রকল্পগুলি পরিচালনার জন্য আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন ভারত সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কেন্দ্রীয় সমাজকল্যানপর্ষদ, ভারতীয় কৃষি গবেষণা পর্ষদ, ভারত পেট্রোলিয়াম, জার্মান অ্যাগ্রো অ্যাক্সন, কোনার্ড অ্যাডেন্যুর ফাউন্ডেশন, খ্রিস্টান চিলড্রেন ফান্ড, জাতীয় সাক্ষরতা মিশন ইত্যাদি সংস্থা।

'কল্যাণ'-এর অন্যতম মূল লক্ষ্যগুলি হল :

—সাক্ষরতা ও সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষকে আরও সক্ষম করে তোলা।

—বৃত্তিধর্মী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সর্বশ্রেণির মানুষকে, বিশেষত যুব সম্প্রদাযকে আয়সৃষ্টি বা আয়বৃদ্ধিতে সাহায্য করা।

—মহিলাদের অবস্থানগত পরিবর্তনে সহায়কের ভূমিকা নেওয়া।

—স্বাস্থ্য, পরিবেশ, পুষ্টি ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন।

—কৃষি, পশুপালন, হাঁস-মুরগি পালন এবং মৎসচাষের উন্নত প্রণালীকে গ্রামে গ্রামে জনপ্রিয় করে তুলতে অর্থনৈতিক মানোন্নয়নে সাহায্য করা।

—বিকল্প আয়ের সন্ধান দেওয়া এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গঠনে সাহায্য করা।

—শিশুদের শিক্ষায় আগ্রহী করে তোলা।

—সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলি রক্ষা করা এবং এসব ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে নিয়োজিত থাকা।

—সাধারণ মানুষকে উন্নয়ন ভাবনায় ভাবিত করা।

—নিঃস্বার্থ সেবার জন্য গ্রামীণ যুব সমাজের মধ্যে আধ্যাত্মিক প্রেরণা সঞ্চার করা।

—উন্নয়ন কাজে জড়িত বিভিন্ন কুশীলবদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার মাধ্যমে জেলার সার্বিক উন্নয়নে কার্যকরী শরীক হওয়া।

উপরিউক্ত উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যগুলি সামনে রেখে কল্যাণ তার কাজের এলাকা ক্রমাগত বিস্তৃত করেছে। বর্তমানে পুরুলিয়া জেলার প্রায় সব কয়টি ব্লক এলাকাতেই কল্যাণের কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে, যদিও পুরুলিয়া ১ও ২ নম্বর, হুড়া, আড়ষা, জয়পুর ও পাড়া ইত্যাদি ব্লকের অধীন গ্রামগুলিতে এই কর্মপ্রবাহ তুলনায় বেশি। পুরুলিয়া জেলার বাইরে বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটি এবং ছাতনা ব্লকের অধীন বেশকিছু গ্রামে এবং উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকেও কল্যাণ তার কর্মসূচিকে ব্যাপ্ত করেছে।

যদিও 'কল্যাণ' জেলার সমস্ত শ্রেণীর মানুষের কল্যাণের লক্ষ্য নিয়েই কাজ করেছে তবু বিশেষভাবে তার লক্ষ্য হল :

—উন্নয়নের স্বাদ যাদের কাছে তেমন করে পৌঁছোয়নি সেই উপজাতি, অনুসূচিত জাতি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষেরা।

—যে সমস্ত গ্রাম, শহর থেকে দূরবর্তী এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে সেইসব গ্রামের মানুষেরা।

—যুব সম্প্রদায়, মহিলা এবং আর্থিক দিক থেকে অনুন্নত পরিবারের শিশুরা।

—প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষিরা।

—শহরের বস্তি অঞ্চলে বসবাসকারী পরিবারগুলির সদস্যেরা।

সাধারণ মানুষ নিয়ে কাজ করতে গেলে কাজের একটি নির্দিষ্ট ধারা বা কৌশল থাকতে হয়। কল্যাণের কাজের ধারা বা কৌশল হল :

—শিক্ষাবিস্তার, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, চেতনা বৃদ্ধি, সক্ষমতা বৃদ্ধি, ক্ষমতায়নের ভিতর দিয়ে মানুষকে নিজের উন্নয়নে পারঙ্গম এবং আগ্রহী করে তোলা।

—প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মপটুতার বৃদ্ধি ঘটিয়ে মানুষকে উপযুক্তভাবে কর্মক্ষম ও উপার্জনক্ষম করে তোলা।

—স্থানীয় সমস্যা, প্রাপ্তিযোগ্য সম্পদ, মানুষের ঝোঁক এবং এলাকায় সম্ভাবনার দিকগুলি বিবেচনায় রেখে সংশ্লিষ্ট মানুষকে নিয়ে কর্মসূচি গ্রহণ।

—পারস্পরিক সহযোগিতা, মহিলাদের ক্ষমতায়ন, স্বল্পসঞ্চয় এবং গোষ্ঠীগঠনের প্রয়োজনের বিষয়টি মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্যভাবে তুলে ধরা।

—কর্মসূচি গ্রহণ ও রূপায়ণে সমষ্টি মানুষের সহযোগী হওয়া নিশ্চিত করা।

উপরিউক্ত কৌশল বা ধারা অনুসারে কাজ করতে হলে কিছু সুনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করা দরকার। তদনুসারে 'কল্যাণ' তার কর্মপদ্ধতি স্থির করেছে। 'কল্যাণ'-এর এই কর্মপদ্ধতি কিছু ব্যতিক্রমের দাবি রাখে। জড়তা ও হতাশা ঝেড়ে ফেলে মানুষ সংগঠিত হয়ে নিজেদের সমস্যাগুলি নিয়ে ভাববে, সমাধানের পথ খুঁজবে এবং সংঘবদ্ধভাবে সেই পথ ধরে এগোবে—এককথায় এই হল 'কল্যাণ'-এর কর্মপদ্ধতি। এই পদ্ধতি মেনে কাজ করার জন্য কল্যাণ যে পন্থা-প্রকরণ অবলম্বন করেছে তা হল :

—গ্রামে গ্রামে যুব সংগঠন গড়ে তোলা।

—সংগঠন কর্মীদের আধুনিক উন্নয়ন ভাবনার সঙ্গে পরিচয় ঘটানো।

—সংগঠনগুলির মধ্যে সমন্বয়ের লক্ষ্যে গুচ্ছসমিতি (Cluster Organisation) গঠন করা।

—সংগঠন কর্মীদের নিয়মিত ব্যবধানে ভাবনার আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করা।

—এলাকার পরিস্থিতি বিবেচনার ভিত্তিতে কর্মসূচি গ্রহণ ও রূপায়ণে সংগঠনের স্বেচ্ছাকর্মীদের উদ্বুদ্ধ করা।

—সংস্থা গঠন ও পরিচালনার ব্যাপারে এবং নেতৃত্ব বিকাশের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।

—সংগঠন নেতৃবর্গকে নিয়ে চারদিন মেয়াদি বাৎসরিক সচিব সম্মেলনের আয়োজনের মাধ্যমে পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি।

—মাঝে মাঝে নির্বাচিত কিছু কর্মী ও চাষিদের জেলা বা রাজ্যের বাইরে কিছু কিছু সফল উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন করানো।

—জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় পঞ্চায়েতের সঙ্গে গঠনমূলক সম্পর্ক তৈরি করে পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে কাজ করা।

—উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সমস্ত স্তরে মহিলা সমেত জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণের পরিবেশ তৈরি করা।

'কল্যাণ' তার নাতিদীর্ঘ জীবনে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে, মহিলা গোষ্ঠী ও যুব সংগঠনের সক্রিয় সহযোগিতায় এবং সংশ্লিষ্ট মানুষের অংশগ্রহণের ভিতর দিয়ে পুরুলিয়া জেলার গ্রামাঞ্চলে কিছু লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে কল্যাণের অস্তিত্ব যে আরও অর্থবহ হয়ে উঠবে, সঙ্গত কারণেই তেমন একটা সম্ভাবনার ছবি অবশ্যই দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে।

পরিশেষে 'কল্যাণ' পুরুলিয়া জেলার হতদরিদ্র মানুষের জীবনমান পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসাবে সৃষ্টি করেছে এই গণমুখী অরাজনৈতিক আন্দোলনকে। এই আন্দোলনের মূল শক্তি হল নিঃস্বার্থ সেবার আধ্যাত্মিক প্রেরণা। ভারতসরকারের যোজনা কমিশনের "রাষ্ট্রীয় সম বিকাশ যোজনায়"

পঁচিশটি অনুন্নত জেলার মধ্যে পুরুলিয়া অন্তর্ভুক্ত হয় (২০০২-২০০৫) তিন বছরের জন্য। বিশিষ্ট স্বেচ্ছাসেবী তথা অসরকারী সংস্থা রূপে "কল্যান"-কে যোজনা-সহযোগী হিসেবে রাজ্য ও জেলা প্রশাসন নির্বাচন করেছেন।

'কল্যাণ'-এর সারদা মেলা তথা বার্ষিক উৎসবের প্রদর্শনী, কৃষক সম্মেলন, নরনারায়ণ সেবা, যুব সমাবেশ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি ক্ষেত্রে গ্রামবাংলার দরিদ্র পরিবারের হাজার হাজার মানুষ, বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে ছুটে আসেন এই নিঃস্বার্থ সেবার আধ্যাত্মিক প্রেরণা নিয়েই। সমগ্র জেলাবাসীর কাছে এটাই হল বিশেষ আত্মিক আকর্ষণ। শ্রীশ্রীঠাকুর, মা-সারদা ও স্বামী বিবেকানন্দের এই অধ্যাত্মবাদ গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা দৃশ্যতই প্রতীয়মান হয়ে উঠছে। কল্যাণের অস্তিত্ব ও কর্মকাণ্ডের সার্বিক সার্থকতা এখানেই।

তথ্য : পরিসংখ্যান

তথ্য ও পরিসংখ্যানে পুরুলিয়া

শ্যামাশিস রায়

আয়তন	ঃ	৬২৫৯ বর্গকিমি
জনসংখ্যা	ঃ	২৫,৩৫,২৩৩
পুরুষ	ঃ	১২,৯৮,০৭৯
মহিলা	ঃ	১২,৩৭,১৫৪
তপশিলি জাতি	ঃ	৪,৮৯,৭৮১
তপশিলি উপজাতি	ঃ	৪,৮২.২৪৩
০-৬ জনসংখ্যা	ঃ	৩,৯৮,৭৯৩
পূর্বতন নাম	ঃ	মানভূম (বিহার রাজ্য)

পশ্চিমবঙ্গে এই জেলাব অন্তর্ভুক্তি ১ নভেম্বর ১৯৫৬

জেলাসদর	ঃ	পুরুলিয়া
পৌরসভা	ঃ	৩
মহকুমা	ঃ	৩
ব্লক/পঞ্চায়েত সমিতি	ঃ	২০
থানা	ঃ	২০
মৌজা	ঃ	২৬৮৫
গ্রাম পঞ্চায়েত	ঃ	১৭০
গ্রাম সংসদ	ঃ	১৯১১ (৬ষ্ঠ পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুযায়ী)
পোস্ট-অফিস	ঃ	৩৬৮
ব্যাঙ্ক	ঃ	১১৭
প্রাথমিক বিদ্যালয়	ঃ	২৯৭১
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ঃ	১৫২
উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ঃ	৮৯
মহাবিদ্যালয় (প্রশিক্ষণসহ)	ঃ	১৫
শিশুশিক্ষা কেন্দ্র	ঃ	১৯১
হাসপাতাল/স্বাস্থ্যকেন্দ্র	ঃ	৪৭০

বিদ্যুতায়িত মৌজা ঃ ১৬৯১
মোট বনাঞ্চল ঃ ১,৪৩২৯১ হেক্টর
নিবন্ধীকৃত ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগ ঃ ১২৯৫
প্রধান জনগোষ্ঠী ঃ কুরমি ও সাঁওতাল
লোকসভার আসন ঃ ২টি (একটি বাঁকুড়ার সঙ্গে যুক্ত)।
বিধানসভার আসন ঃ ১১
মোট ভোটারের সংখ্যা ঃ ১৫,১৪,৯৩১
সাক্ষরতার হার ঃ ৫৬.১৪%
পুরুষ সাক্ষরতা হার ঃ ৭৪.১৮%
মহিলা সাক্ষরতা হার ঃ ৩৭.১৫%
পুরুষ ও মহিলাব অনুপাত ঃ ৯৫৩ (প্রতি ১০০০ পুরুষ জনসংখ্যায়)
জনসংখ্যার ঘনত্ব ঃ ৪০৫ বর্গ কিমি
বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত ঃ ১৩০০ মি.মি
কৃষিশ্রমিক ঃ ৪,০৬,৯১৮
কৃষক ঃ ৩,৫২,০৭৬

ভূমি ও ভূমি সংস্কার

সরকারে ন্যস্ত জমির পরিমাণ ঃ কৃষি ৯২,৭২৫.৯৯ একর
অকৃষি ৬০,৫৭০.১৫ একর
বণ্টনযোগ্য কৃষিজমির পরিমাণ ঃ ৬৬,৫৮৬.২৪ একর
বণ্টনযোগ্য অকৃষিজমির পরিমাণ ঃ ৩০৩৮.৪১ একর
অবণ্টিত কৃষিজমির পরিমাণ ঃ ১৫৩৭.৫৪ একর
অবণ্টিত অকৃষিজমির পরিমাণ ঃ ১৪৪৯.২২ একর
বণ্টিত জমির পরিমাণ ঃ ৬০০৯১.৮০ একর
তপশিলি জাতিভুক্ত পাট্টাদারের সংখ্যা ঃ ২৮৬৭৯
তপশিলি উপজাতিভুক্ত পাট্টাদারের সংখ্যা ঃ ৩৩১৮৫
মহিলা পাট্টাদারেরর সংখ্যা ঃ ৩৫০৪

কৃষি

মোট কৃষিযোগ্য জমি ঃ ৩১১৬৯০.০০ হেক্টর
চাষযোগ্য জমির শতকরা হার ঃ ৫০.০১
বনভূমি শতকরা হার ঃ ১৪.০৬
পতিত জমির শতকরা হার ঃ ১৮.১৭
ধান—মোট জমির পরিমাণ ঃ ১২৬৪৪৫২ হেঃ
উৎপাদনের পরিমাণ ঃ ২২৭২১১৫.৪০ মেঃ টন
গম—মোট জমির পরিমাণ ঃ ১৯৭৬৮ হেঃ
উৎপাদনের পরিমাণ ঃ ৪৪৩৭৬.৮০ মেঃ টন
ডাল—মোট জমির পরিমাণ ঃ ৯০৩৪৬ হেঃ

উৎপাদনের পরিমাণ : ৩৫২৫২.৮০ মেঃ টন
তৈলবীজ—মোট জমির পরিমাণ : ২১৪৫২ হেঃ
উৎপাদনের পরিমাণ : ১০৭৮৯.৫০ মেঃ টন
আলু—মোট জমির পরিমাণ : ৮৫৮৫ হেঃ
উৎপাদনের পরিমাণ : ১২৩৩০১.৪০ মেঃ টন
মিনিকিট বিতরণ : ৬,০৭৩১৮ লক্ষ
মূল্য : ৬১২.৪৯ লক্ষ টাকা

সেচ ও ক্ষুদ্র সেচ

বিভিন্ন উৎস হতে সেচ ব্যবস্থা (হাজার হেক্টরে)

সরকারি ক্যানেল : ২৭.৩৩
পুকুর : ২৭.৮১
কূপ : ১.০২
অন্যান্য উৎস : ১৪.১০
নদী-উত্তোলক সেচ ব্যবস্থা : ১৩৫
সেচ কূপের সংখ্যা : ৪২১৮
বৃহৎ সেচ প্রকল্প : ৩২
ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প : ৫৯

মৎস্য

ব্যক্তিগত মালিকানায় চাষযোগ্য জলাশয় : ৩৭৭৫৩.২৬ হেঃ
খাস জলাশয় : ৯২২৩.২৪ হেঃ
বাঁধ ও অন্যান্য জলাশয় : ৩০৩৯.১০ হেঃ
সামাজিক মৎস্য চাষ : ১২৫৯ হেঃ
মৎস্য চাষ প্রদর্শন ক্ষেত্র ও প্রশিক্ষণ : ৪.৮ হেঃ
সুসংহত মাছ ও হাঁস চাষ : ১৯৮.২৩ হেঃ
মৎসজীবী মহিলাদের হাঁস পালন
জাল ও হাঁড়ি বিতরণ : ৬৮২
মৎস্যজীবীদের জন্য আদর্শ গ্রাম : ১১৬

মৎস্যজীবীদের জন্য পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ও NDC, FDA-এর মাধ্যমে মাছ ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম বিতরণ—৭৫ কিমি রাস্তা ১০টি মিলনগৃহ নির্মাণ, ১১১৩ হেঃ জলা।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ

জেলাসদর হাসপাতাল : ১টি
মহকুমা হাসপাতাল : ১টি (রঘুনাথপুর)
ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র : ১৫টি

উপকেন্দ্র	ঃ	৩৮৫টি
প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র	ঃ	৫৩টি
গ্রামীণ হাসপাতাল	ঃ	৫টি
জন্মহার (প্রতি হাজারে)	ঃ	২৪.১০
মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে)	ঃ	৮.২১
শিশুমৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে)	ঃ	৫১.৫০
মাতৃ-মৃত্যুর হার (শতকরা)	ঃ	৩.২৩

শিল্প

কেমিক্যাল প্রোডাক্ট	ঃ	১৪ ইউনিট
ফুড প্রোডাক্টস	ঃ	২০ ইউনিট
ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প	ঃ	৪ ইউনিট
টোবাকো প্রোডাক্টস	ঃ	১ ইউনিট
নন-মেটালিক মিনারেল প্রোডাক্টস	ঃ	৬ ইউনিট
গ্লাস অ্যান্ড সেরামিক	ঃ	৬ ইউনিট
পর্যটন ও অন্যান্য শিল্প	ঃ	১০ ইউনিট
হলদিয়া অনুসারী (ডাউন স্টিম)	ঃ	১২ ইউনিট
স্পঞ্জ আয়রন শিল্প	ঃ	১৫ ইউনিট

পর্যটন

অযোধ্যা পাহাড়	ঃ	আযোধ্য, বাঘমুণ্ডি
প্রাণী সংরক্ষণ কেন্দ্র	ঃ	অযোধ্যা, বাঘমুণ্ডি
পরিবেশ পর্যটন কেন্দ্র	ঃ	মাঠা, বাঘমুণ্ডি
জল সংরক্ষণ প্রকল্প	ঃ	অযোধ্যা, বাঘমুণ্ডি
দোলাডাঙা পরিবেশ পর্যটন কেন্দ্র	ঃ	মানবাজার-১
কুইলাপাললপ বিশ্রামঘর	ঃ	বান্দোয়ান
সুরুলিয়া হরিণ উদ্যান প্রকল্প	ঃ	পুরুলিয়া-২
গড়-পঞ্চকোট পর্যটন কেন্দ্র	ঃ	নিতুড়িয়া
আনাই জামবাইদ	ঃ	পুরুলিয়া-২
বিরিঞ্চিনাথ	ঃ	নেতুড়িয়া
বুধপুর	ঃ	মানবাজার-১
চড়িদা	ঃ	বাঘমুণ্ডি
দেউলঘাটা	ঃ	জয়পুর
দুয়ারসিনি	ঃ	বান্দোয়ান

জয়চণ্ডী পাহাড়	ঃ	রঘুনাথপুর-১
কাশিপুর রাজবাড়ি	ঃ	কাশিপুর
খয়রাবেড়া	ঃ	বাঘমুণ্ডি
কুইলাপাল/নান্না ফরেষ্ট	ঃ	বান্দোয়ান
মুরগুমা ড্যাম	ঃ	ঝালদা-২
পাকবিড়রা	ঃ	পুঞ্চা
পাঞ্চেত পাহাড়	ঃ	নেতুড়িয়া
রাকাব ফরেস্ট	ঃ	হুড়া
ফুটিয়ারি ড্যাম	ঃ	হুড়া
রামচন্দ্রপুর বিজয়কৃষ্ণ আশ্রম	ঃ	সাঁতুড়ি
সুইসা	ঃ	বাঘমুণ্ডি

রাস্তাঘাট নির্মাণ

জাতীয় সড়ক দপ্তর	ঃ	৬৩.৫০ কিমি
পূর্ত দপ্তর	ঃ	২০২ কিঃমিঃ
পূর্ত সড়ক বিভাগ	ঃ	৫৭২.৯৪ কি. মি
ত্রিস্তর পঞ্চায়েত	ঃ	৫১৬ কিঃ মিঃ
		৬১০০ কিঃ মিঃ
		৮২০ কিঃ মিঃ

তপশিলি জাতি ও উপজাতি কল্যাণ

অনুন্নত সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগেব উদ্যোগে বিগত পাঁচ বছরে নিম্নলিখিত কর্মসূচিগুলি রূপায়িত হয়েছে।

	উপকৃত ব্যক্তি ও ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যা	
	তপশিলি জাতি/	তপশিলি উপজাতি
১. পুস্তিকা ক্রয় বৃত্তি	৮৫,৮০৬	১,০৩,১৫০
২ ছাত্রাবাস বৃত্তি	১২,০০০	২৭,৫০০
৩. আবশ্যিক বৃত্তি	—	৪৬,৩২০
৪. ভরণপোষণ বৃত্তি	১২,০০০	১৮,২৭০
৫. মেধাবৃত্তি (বালিকা পঞ্চম হইতে দশম)	২৬৪	৫২৮
৬. মেধাবৃত্তি (নবম হইতে দ্বাদশ শ্রেণি)	১১০	২৪৭
৭. অপরিচ্ছন্ন পেশায় নিযুক্ত পরিবারের ছেলে-মেয়েদের বৃত্তি	৫৭৬	—
৮. মাধ্যমিকোত্তর বৃত্তি	৭,৪৩৮	৭,১২৮

৯. আশ্রম ছাত্রাবাস ১৫০০ ৩,০৯০

১০.	পাত-কুয়া নির্মাণ	১৭৪টি	১৫.	রাস্তা নির্মাণ	৮টি
১১.	রাস্তা নির্মাণ	৮টি	১৬.	গৃহ নির্মাণ	১১৪টি
১২.	বাঁধ খনন	৩১টি	১৭.	কমিউনিটি হল	৭টি
১৩.	গৃহসংস্কার	১৫টি	১৮.	বিদ্যালয়গৃহ	৩টি
১৪.	পাম্পসেট বিতরণ	৫টি			

সমাজকল্যাণ বিভাগ

১. বার্ধক্যভাতা প্রাপক	১২০৬
২. বিধবাভাতা প্রাপক	৪৬৯
৩. প্রতিবন্ধী ভাতাপ্রাপক	২৪২
৪. প্রতিবন্ধী ছাত্রবৃত্তিপ্রাপক	১৬২
৫. অর্থনৈতিক পুর্নবাসন অনুদান	৬৩
৬. প্রতিবন্ধীদের কৃত্রিম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিতরণ (গত তিন বছরে)	৩৫০

সুসংহত শিশুবিকাশ প্রকল্প

১. মোট শিশুবিকাশ প্রকল্পের সংখ্যা	২০
২. মোট অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সংখ্যা	২,৪০০
৩. মোট গর্ভবতী মায়ের সংখ্যা (যারা রান্না করা খাবার পাচ্ছেন)	১৫,৮২৩
৪. প্রসূতি মায়ের সংখ্যা (যারা রান্না করা খাবার পাচ্ছেন)	১৮,৬২২
৫. ৬ বৎসর পর্যন্ত শিশুদের সংখ্যা যারা খাবার পাচ্ছে	১,০৩,৯৪৬
৬. প্রাক্-বিদ্যালয়ে শিক্ষার সুযোগ প্রাপক	
(ক) ৩ থেকে ৬ বৎসর বয়স্ক বালকের সংখ্যা	৫২,৯৬৯
(খ) ৩ থেকে ৬ বৎসর বয়স্ক বালিকার সংখ্যা	৫১,৪৭৩
৭. স্বয়ংসিদ্ধা প্রকল্পের অধীন ব্লকের সংখ্যা	৭
(ক) মোট গ্রুপের সংখ্যা	৫৭৫
(খ) মোট গ্রুপের সদস্য সংখ্যা	৭৩৫৪
(গ) মোট সংগৃহীত অর্থ	১১,২০,৩৮৩
৮. বালিকা সমৃদ্ধি যোজনা	৬২৯৭ বালিকা শিশু উপকৃত

পুরুলিয়া জেলা বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জী

মৃণালকান্তি মণ্ডল

পুরুলিয়া জেলা সম্বন্ধে পুরুলিয়া তথা পশ্চিমবঙ্গের ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থ ছাড়া ও ইংরাজি, কুম্মালী, সাঁওতালি গ্রন্থ এই পঞ্জীতে অর্ন্তভুক্ত হয়েছে। এমন কিছু গ্রন্থ ও এখানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যেগুলোর সঙ্গে চাক্ষুষ যোগাযোগ সম্ভব হয়ে ওঠেনি, কেবলমাত্র তথ্যসূত্রের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। এই পঞ্জীতে উল্লেখিত গ্রন্থ ছাড়াও রচিত হয়েছে গল্প, উপন্যাস, কবিতা—যার ভিতরে খুঁজে পাওয়া যাবে পুরুলিয়া জেলার সমাজচিত্র, অর্থনীতি ইত্যাদি। পঞ্জীর দীর্ঘতা হ্রাস করার জন্য এই ধরনের গ্রন্থের তালিকা গুলো প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি।

গ্রন্থপঞ্জীটি লেখকের নাম অনুসারে বর্ণানুক্রমিক ভাবে সাজানো হয়েছে। কিছু কিছু গ্রন্থ গ্রন্থের নামানুসারে বর্ণানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত হয়েছে। প্রথমে লেখকের নাম, তারপর প্রকাশ স্থান, প্রকাশক, তারপর সাল, তারপর পৃষ্ঠা, তারপর দাম এই ভাবে সাজানো হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে পারিনি। তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

এই গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়ন করতে গিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন শ্রদ্ধেয় শ্রী সুবোধ বসুরায় মহাশয়। বিভিন্ন তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন শ্রী অমিয় কুমার সেনগুপ্ত, ড: সুধন্বা ধরিপা, শ্রী অজিত মিত্র, প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক শ্রী দোল গোবিন্দ কুইরী, জেলা গ্রন্থাগারের শ্রী প্রণবেশ গাঙ্গুলী ও শ্রী সুনীল মাহাতো। পুরুলিয়া জেলা গ্রন্থাগার ও হরিপদ সাহিত্য মন্দির এই দুটি প্রতিষ্ঠানের কাছে আমি বিশেষ সহযোগিতা পেয়েছি। হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের সম্পাদক শ্রী নিলয় মুখার্জী মহাশয়ের উৎসাহেই এই গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। এঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

1. অজিত মিত্র, সম্পাদিত।
পুরুলিয়া জেলার গ্রাম্য-ভাষা-তত্ত্ব।
ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। পুরুলিয়া,
১৩৮৪, ৯০ পৃষ্ঠা, ১০ টাকা।

2. অতুল চন্দ্র ঘোষ।
নিবারণ চন্দ্রের জীবন কথা।
পুরুলিয়া, ১৯৩৯।

3. অতুল সুর।
বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়।
৩য় সংস্করণ, কলকাতা, জিজ্ঞাসা,
১৯৮৬, ৫৯ পৃষ্ঠা, ২৫ টাকা।

4. অতুল সুর।
বাংলার সামাজিক ইতিহাস।
জিজ্ঞাসা সংস্করণ, কলকাতা, জিজ্ঞাসা,
১৯৯৮, ১৫৪ পৃষ্ঠা, ৫০ টাকা।

5. অতীন্দ্র মজুমদার
ভাষাতত্ত্ব। পরিবর্ধিত ও সংশোধিত ২য় সংস্করণ, কলিকাতা, নয়া প্রকাশ, ১৯৮৭, ২৭১ পৃষ্ঠা, ৫৫ টাকা।

6. অনুপম মিশ্র।
আজও পুকুর আমাদের। অনুবাদক-নিরুপমা অধিকারী। পুরুলিয়া, আশাববী, ২০০২, ৭৯ পৃষ্ঠা, ৬০ টাকা।

7. অপূর্ব কুণ্ডু, সম্পাদিত।
বাংলা ও বাঙালির দিনপঞ্জী (১৪৮৬-১৯৯৮)। বারাকপুর, প্রভা প্রকাশনী, ১৯৯৮, ৪২৪ পৃষ্ঠা, ১৫০ টাকা।

8. অভয় কুমার পাল।
অগ্নি শিখা টুসু সঙ্গীত।
পুরুলিয়া (গড়ুরবাসা), ১০ পৃষ্ঠা, ৪ টাকা।

9. অভয় কুমার পাল।
আঞ্চলিক টুসু সঙ্গীত। পুরুলিয়া (গড়ুরবাসা) ,১০ পৃষ্ঠা, ২·৫০ টাকা।

10. অভয় কুমাব পাল।
ফুল কুমারী টুসু সঙ্গীত। পুরুলিয়া (গড়ুরবাসা), ১০ পৃষ্ঠা, ৪ টাকা।

11. অভয় কুমার পাল।
মনমোহিনী ঝুমুর সঙ্গীত। পুরুলিয়া (গড়ুববাসা), ১৪০৮, ১৪ পৃষ্ঠা, ৩ টাকা।

12. অভয় কুমার পাল।
রামায়ণ টুসু সঙ্গীত। পুরুলিয়া (গড়ুববাসা), ১২ পৃষ্ঠা, ৪ টাকা।

13. অভয় কুমার পাল।
সরলতা টুসু সঙ্গীত। পুরুলিয়া (গড়ুরবাসা), ১১ পৃষ্ঠা, ৩ টাকা।

14. অমল কুমার দাস ও রমেন্দ্রনাথ সাহা।
পশ্চিমবঙ্গের তপশিলী জাতি ও আদিবাসী নির্দেশিকা। কলিকাতা, কালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ১৯৮৯, ২৫৬ পৃষ্ঠা, ৪৫ টাকা।

15. অমলেন্দু মিত্র।
রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর। কলকাতা, ফার্মা কে. এল. এম., ১৯৭২।

16. অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
পশ্চিমবাংলার গ্রামের নাম। কলকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স, ১৯৮০, ২৯৫ পৃষ্ঠা ৩০ টাকা।

17. অমিয় কুমার সেনগুপ্ত।
অন্য নামেই যাদের পরিচয়। বাঁকুড়া, লুব্ধক, ২০০১, ৪০ পৃষ্ঠা, ২০ টাকা।

18. অমিয় কুমার সেনগুপ্ত।
আমাদের পুরুলিয়া। বাঁকুড়া, লুব্ধক, ১৯৯৯, ২৫২ পৃষ্ঠা, ৭০ টাকা।

19. অমিয় কুমার সেনগুপ্ত।
পাষাণময় যে দেশ। বাঁকুড়া, লুব্ধক, ১৯৯৮, ২১২ পৃষ্ঠা, ৭০ টাকা।

20. অমিয় কুমার সেনগুপ্ত, সম্পাদিত।
পুরুলিয়ার কঠিন মাটি। বাঁকুড়া, লুব্ধক, ১৯৯৯, ১৯২ পৃষ্ঠা, ৮০ টাকা।

21. অমিয় কুমার সেনগুপ্ত।
পুরুলিয়ার লেখকদের ছদ্মনাম ও নামান্তব। বাঁকুড়া, লুব্ধক, ১৪০৬, ৪২ পৃষ্ঠা, ১৫ টাকা।

22. অমিয় কুমার সেনগুপ্ত।
প্রশ্নোত্তবে পুরুলিয়া। ২য় সংস্করণ, পুরুলিয়া, করমদীপ, ২০০৩, ১১৭ পৃষ্ঠা, ৫০ টাকা।

23. অমিয় কুমার সেনগুপ্ত, সম্পাদিত।
বিংশ শতাব্দীর মানভূমি কবিতা। বাঁকুড়া, লুব্ধক, ২০০১, ২৮০ পৃষ্ঠা, ৬০ টাকা।

24. অমিয় কুমার সেনগুপ্ত।
হাতিব মতন পবব। বাঁকুড়া, লুব্ধক, ১৯৯৬, ১৬ পৃষ্ঠা, ৫ টাকা।

25. অমিয় কুমার সেনগুপ্ত।
হে পুরুল্যে, নাথবতী। বাঁকুড়া, লুব্ধক, ২০০২, ২০ পৃষ্ঠা, ১৫ টাকা।

26. অমূল্য রতন গরাঁই।
টুসু সঙ্গীত। বোকারো, ৭ পৃষ্ঠা, ২·৫০ টাকা।

27. অরূপ কুমার দাস, সম্পাদিত।
গণযুগের দিনপঞ্জি (১৯৬০-১৯৭৯)। কলকাতা, প্রসেসিভ পাবলিশার্স, ২০০২, ১২৬ পৃষ্ঠা, ১৫০ টাকা, চিত্র।

28. অরুণ কুমার রায়।
লোকায়ন চর্চার ভূমিকা। কলকাতা,
লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র,
১৯৯৫, ১৩২ পৃষ্ঠা।

29. অরুণ চন্দ্র ঘোষ।
টুসুর গানে মানভূম। পুরুলিয়া,
লোকসাহিত্য ভবন, ১৬ পৃষ্ঠা, ১ আনা।

30. অশোক কুমার কুণ্ডু।
পত্রিকাপঞ্জী। ১ম খণ্ড, কলকাতা,
বাংলাভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি গবেষণা
সংস্থা, ১৩৮৯, ১৭৩ পৃষ্ঠা, ৫০ টাকা।

31. অশোক কুমার বসু।
পশ্চিমবঙ্গের নদনদী। কলকাতা,
মিত্র ও ঘোষ, ২০০২, ৯০ পৃষ্ঠা, ৬০ টাকা।

32. অশোক নাথ চৌধুরী।
মানভূমের পরিচয়।

33. অশোক মিত্র, সম্পাদিত।
পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা।
দিল্লী, ১৯৮২।

34. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
আঞ্চলিক বাংলা ভাষাব অভিধান। প্রথম
খণ্ড, কলকাতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
১৯৯১, ১৫৯ পৃষ্ঠা, ১০০ টাকা, মানচিত্র।

35. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত। প্রথম ও দ্বিতীয়
খণ্ড, প্রথম পর্ব, কলকাতা, মর্ডান বুক
এজেন্সি, ১৯৯৯।

36. অম্বিত কুমার মাজী।
পরবটাড়ের পাঁচালী। পুরুলিয়া (ঝাপড়া),
বীক্ষণ, ২০০২, ৭৯ পৃষ্ঠা, ১৫ টাকা।

37. অসিত কুমার মাজী।
সমকালীন সরাক সম্প্রদায়। বম্বে,
মুনিমোহন ফাউন্ডেশান, ১৪০০, ২৫ টাকা।

38. অসিত বরণ চৌধুরী।
সাঁওতাল সমাজ ডাইনি ও বর্তমান সংকট।
কলকাতা, এ. মুখার্জী, ১৯৮৫, ২১৭ পৃষ্ঠা,
২৮ টাকা।

39. অসিত বসু।
পুরুলিয়া পরিচয়। ১ম ভাগ, পুরুলিয়া,
রাইটার্স পাবলিশার্স এন্ড প্রিন্টার্স কোঃ
অপারেটিভ সোসাইটি, ১৯৯০, ৭৫ পৃষ্ঠা,
১২ টাকা।

40. আলোক নাথ চক্রবর্তী।
ভাদুর কথা। কলিকাতা, প্রকাশক- রাণা
চক্রবর্তী। ১৯৫৮, ৪৮ পৃষ্ঠা, চিত্র।

41. আবুল হোসেন বঙ্গবাসী।
বাঙালী স্বাধীনতা সংগ্রামী চরিতাভিধান।
কলিকাতা, লোকনাথ সাহিত্য মন্দিব,
১৯৯৭, ৩০০ পৃষ্ঠা, ৬৫ টাকা।

42. আশুতোষ ভট্টাচার্য।
পুরুলিয়া থেকে প্যারিস। কলকাতা,
লোক সংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ,
১৯৭৫, ২৩৯ পৃষ্ঠা, ১৫ টাকা।

43. আশুতোষ ভট্টাচার্য।
বাংলার লোকনৃত্য। ১ম খণ্ড-ছৌ।
কলকাতা, এ. মুখার্জী এ্যান্ড কোম্পানী,
১৯৭৬, ১০৪ পৃষ্ঠা, ১৫ টাকা।

44. আশুতোষ ভট্টাচার্য।
বাংলার লোকসাহিত্য। ২য় সংস্করণ,
কলিকাতা, ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৫৭।

45. আশুতোষ ভট্টাচার্য।
বাংলার লোকসংস্কৃতি। নিউদিল্লী,
ন্যাশন্যাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৮৬, ১৬৫ পৃষ্ঠা,
১৫ টাকা।

46. আশুতোষ ভট্টাচার্য।
বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর।
১ম খণ্ড, কলকাতা,পশ্চিমবঙ্গ লোকসংস্কৃতি
গবেষণা পরিষদ, ১৯৬৬।

47. আশুতোষ ভট্টাচার্য।
বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর। ২য় খণ্ড,
কলকাতা, এ. মুখার্জী এ্যান্ড কোম্পানী,
১৯৬৬, ১০৪০ পৃষ্ঠা, ৩০ টাকা।

48. অশুতোষ ভট্টাচার্য।
মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস।

49. ইন্দ্রাণী দত্ত শতপথী।
ছৌ। কলিকাতা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ১৯৯৯, ১০৯ পৃষ্ঠা, ৪০ টাকা।

50. এ. কে. দাস ও এস. মুখোপাধ্যায়।
পশ্চিমবঙ্গে আদিবাসী আন্দোলন।

51. কপিলা বাৎসায়ন।
ভারতের নাট্য ঐতিহ্য : বিচিত্র প্রবাহ। অনুবাদ-নারায়ণ চৌধুরী। নয়াদিল্লী, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ২৩৯ পৃষ্ঠা, ৮২ টাকা।

52. কমলা দাশগুপ্ত।
স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাব নাবী। কলকাতা, বসুধারা প্রকাশনী, ১৯৬৩, ৩০০ পৃষ্ঠা, ১০ টাকা।

53. কল্যাণ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়।
বাংলার ভাস্কর্য। কলকাতা, সুবর্ণবেখা, ১৯৮৬, ২৩৮ পৃষ্ঠা, ৫০ টাকা।

54. কামিনী কুমার বায়।
বাংলার লোকদেবতা ও লোকাচাব। কলকাতা,বাসন্তী লাইব্রেরী, ১৯৮০, ২১৬ পৃষ্ঠা, ২০ টাকা।

55. কিরীটি মাহাত, সংকলক।
ঝাড়খণ্ডী ব্লু বুক (The Eternal Massage of Jharkhand)। পুরুলিয়া, হড় প্রকাশনী, ১৯৯৫, ৩৯ পৃষ্ঠা, ৫ টাকা।

56. কিরীটি মাহাত।
ঝুমুর সংগীত ও সাহিত্য।

57. কীর্তানন্দ অবধূত।
রক্ত মৃত্তিকা রাঢ়। ১-৬ খণ্ড, ১৯৯১।

58. কৃত্তিবাস কর্ম্মকাব।
পুরুলিয়া লোকসংস্কৃতির গুনীজন গ্রন্থমালা : চিরদিনের পরিচয়। পুরুলিয়া, পুরুলিয়া ছৌনৃত্য একাদেমী, ১৪০৯, ২০০ পৃষ্ঠা, ৬০ টাকা।

59. কৃত্তিবাস কর্ম্মকার।
যুগে যুগে টুসু গান। পুরুলিয়া (গোবিন্দপুর), ১০ পৃষ্ঠা, ২ টাকা।

60. কৃত্তিবাস কর্মকার।
বিরহ টুসু সঙ্গীত। পুরুলিয়া (গোবিন্দপুর), ১৪০৬, ১০ পৃষ্ঠা, ৪ টাকা।

61. কৃত্তিবাস মাহাত।
আধুনিক টুসু সঙ্গীত ও বাগডিগিব খাইদ ভাসা ঝুমুর। ফুলবহড়া, ১২ পৃষ্ঠা, ৩·৫০ টাকা।

62. কৃত্তিবাস মাহাত।
কলির মহাভারত : আধুনিক টুসু সঙ্গীত। পুরুলিয়া, ১২ পৃষ্ঠা, ৪ টাকা।

63. কৃষ্ণানন্দ মাঝি।
আনন্দ লহরী টুসু সঙ্গীত। পুরুলিয়া (কড়াডি), ৯ পৃষ্ঠা, ২ টাকা।

64. কৃষ্ণানন্দ মাঝি।
পুরুল্যার ঝুমুর সঙ্গীত। পুরুলিয়া (কড়াডি), ১২ পৃষ্ঠা ২ টাকা।

65. কৃষ্ণানন্দ মাঝি।
পুরুল্যাযার টুসু সঙ্গীত। পুরুলিয়া (কড়াডি), ১০ পৃষ্ঠা, ২ টাকা।

66. খগেন্দ্র নাথ ভৌমিক।
নাম ও পদবীতে হিন্দু মুসলমান। কলকাতা, সঞ্চয়ন প্রকাশনী, ১৯৯৯, ২০৮ পৃষ্ঠা, ১২০ টাকা।

67. ক্ষুদিরাম মাহাত।
কুর্ম্মালী ভাষাতত্ত্ব। পুরুলিয়া, ১৩৮০, ৪৮ পৃষ্ঠা, ২·৫০ টাকা।

68. ক্ষুদিরাম মাহাত।
কুর্ম্মালী শব্দ কোষ (Kurmali Dictionary)। পুরুলিয়া, ৯৯ পৃষ্ঠা, ৮ টাকা।

69. গদাধর মিত্র।
লক্ষণপুরের ইতিহাস।

70. গিরিশ চন্দ্র মাহাত।
নব ভারত ও মানভূমের সংগ্রাম।

71. গীতা দত্ত ও মৃণাল দত্ত।
ভ্রমণসঙ্গী (১৯৯৬-৯৭)। অষ্টাদশ সংস্করণ, কলকাতা, এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী, ১৯৯৭, ৮৫৬ পৃষ্ঠা, ২২৫ টাকা।

73. গোপাল বসাক।
পর্যটকের দৃষ্টিতে এই বাংলা। কলকাতা, ডি. এম. লাইব্রেরী, ১৯৮৩, ১৬০ পৃষ্ঠা, ১২ টাকা।

73. গোবিন্দ মাহাত।
ফৈছ্যফুটা টুসুগীত। পুরুলিয়া (চিরুগড়া), ৯ পৃষ্ঠা, ৩ টাকা।

74. গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু।
বাংলার লৌকিক দেবতা। কলিকাতা, দে'জ, ১৯৬৬, ২২৬ পৃষ্ঠা, ১২ টাকা।

75. গোপেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
সাঁওতালী সমাজ ও সংস্কৃতির দিগদর্শন।

76. গোলাম মুর্শিদ।
আশার ছলনে ভুলি।

77. গৌরী ভট্টাচার্য।
পশ্চিম সীমান্ত বাংলার আর্থ সামাজিক পরিচয়। কলকাতা, বেস্ট বুকস প্রকাশন বিভাগ, ১৯৯৯, ১৩৬ পৃষ্ঠা, ৫০ টাকা।

78. চিত্তরঞ্জন দেব।
বাংলার পল্লীগীতি। কলকাতা, ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সি, ১৯৯৮, ৫৮৪ পৃষ্ঠা, ১৩০ টাকা।

79. চিত্তরঞ্জন লাহা।
ধলভূমেব লোকগীতি: বাঁদনা ও টুসু।

80. চিন্তাহরণ চক্রবর্তী।
বাংলার পালপার্বণ। বিশ্বভারতী, ১৩৫৯।

81. চৌতন্য দাস মণ্ডল।
বৃহৎ মনসামঙ্গল। ১-৪ খণ্ড, পুরুলিয়া, প্রকাশক: খগেন্দ্রনাথ দত্ত। ১৪০৭, ২১১ পৃষ্ঠা, ৫০ টাকা।

82. জগন্নাথ বাউরী।
সু-মধুর টুসু সঙ্গীত। পুরুলিয়া (ডুমুরশোল), ১৪০৮, ২২ পৃষ্ঠা, ৩ টাকা।

83. জগবন্ধু ভট্টাচার্য।
বীর বিভূতি (মুক্তিযোদ্ধা)। ধানবাদ, ১৯৭৮, ৪১ পৃষ্ঠা, ৩ টাকা।

84 জলধব কর্মকার।
নাচে নাচনী যৌবন। পুরুলিয়া, চোদ্দশ সাল সাহিত্য সংসদ, ২০০১, ৬১ পৃষ্ঠা, ৪০ টাকা।

85. জলধব কর্মকার।
হামরা মানভুঁইয়া বটি। পুরুলিয়া, চোদ্দশ সাল সাহিত্য সংসদ।

86. জলধর কর্মকার ও রবি ব্যানার্জী।
মাণিকে ভরা মানভূম। ১ম খণ্ড, পুরুলিয়া, চোদ্দশ সাল সাহিত্য সংসদ, ১৪০০, ৬৫ পৃষ্ঠা, ৪০ টাকা।

87. জয়শ্রী ভট্টাচার্য।
বাংলার প্রবাদে নারীমন। কলকাতা, প্রকাশক-প্রীতিকণা ঘোষ। ১০৬ পৃষ্ঠা, ২৫ টাকা।

88. জি. এম. আবুবকর।
কালো মানুষ সোনালী সংস্কৃতি। কলকাতা, এম. সি. সরকার, ১৩৯৩, ১২২ পৃষ্ঠা, ১৫ টাকা।

89. জীবেন্দু রায়।
বাংলা ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত। কলকাতা, সাহিত্যশ্রী, ১৩৯৭, ১৪২ পৃষ্ঠা, ৩০ টাকা।

90. জীবেন্দ্র চন্দ্র নায়ক।
বাংলার সীমান্তের লোককথা।

91. জ্ঞানেন্দ্র নাথ কুমার।
বংশ পরিচয়। অষ্টাদশ খণ্ড, কলিকাতা, প্রকাশক-জ্ঞানেন্দ্র কুমার। ১৩৪৪, ২৭২ (ক) পৃষ্ঠা, ৫ টাকা।

92. ডবলিউ ডবলিউ. হান্টার।
গ্রামবাংলার ইতিকথা। অনুবাদ-অসীম চট্টোপাধ্যায়। কলকাতা, সুবর্ণবেখা, ১৯৮৪, ৩২৮ পৃষ্ঠা, ৪৫ টাকা।

93. তপন কর।
অসামান্য মানভূম। কলকাতা, আনন্দ, ১৯৯৪, ১২০ পৃষ্ঠা, ৩০ টাকা।

94. তরুণদেব ভট্টাচার্য।
পুরুলিয়া। কলকাতা, ফার্মা কে. এল. এম., ১৯৮৬, ৪৩০ পৃষ্ঠা, ৫০ টাকা।

95. তরুণদেব ভট্টাচার্য।
বাঁকুড়া। কলকাতা, ফার্মা কে. লে. এম., ১৯৮২, ৪৩৭ পৃষ্ঠা, ৫০ টাকা।

96. তরুণদেব ভট্টাচার্য।
মেদিনীপুর। কলিকাতা,
ফার্মা কে. এল. এম., ১৯৭৯।

97. তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
পশ্চিমবাংলার ভূমি ব্যবস্থা ও ভূমি রাজস্ব।
কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ,
১৯৮৩, ১৮৮ পৃষ্ঠা, ১০ টাকা।

98. তারাপদ সাঁতরা।
ছড়া প্রবাদে গ্রামবাংলার সমাজ।
কলকাতা, পিপল্‌স বুক পাবলিশিং,
১৩৮৮, ৫৯ পৃষ্ঠা, ৬ টাকা।

99. তারাপদ সাঁতরা।
পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প ও শিল্পসমাজ।
কলকাতা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী কেন্দ্র,
২০০০, ১৯৭ পৃষ্ঠা, ১৩০ টাকা।

100. তুষার কান্তি পান্ডে, সম্পাদিত।
ভ্রমণে ভারত ও বিশ্বভ্রমণ। তৃত্তীয় সংস্কবণ,
কলকাতা, গ্রন্থনা, ২০০১, ৮২৪ পৃষ্ঠা, ২০০
টাকা।

101. তুষার কান্তি পান্ডে, সম্পাদিত।
হলিডে হোমের সুলুক সন্ধানে (ভারত ও
বিশ্ব)। কলকাতা, গ্রন্থনা, ১৯৯৯, ৩৪৮ পৃষ্ঠা,
১০০ টাকা।

102. তৃপ্তি বিশ্বাস।
সিন্ধুবালা ঝুমুর ও নাচনী। কলকাতা,
কবিতা পাক্ষিক, ২০০৩, ২৩২ পৃষ্ঠা, ৭৫
টাকা।

103. ত্রিপুরা বসু।
লোকসংস্কৃতির নানা দিগন্ত। দুর্গাপুর,
প্রকাশক-মালতী বসু। ১৯৮৯,
বিবিধ পৃষ্ঠা, ১৬ টাকা।

104. দয়াময় রায়।
পদ্মশ্রী গম্ভীর সিং মুড়ার জীবন ও শিল্প।
১ম খণ্ড, পুরুলিয়া, ২০০৩, ৬৩ পৃষ্ঠা, ৪০
টাকা।

105. দিলীপ কুমার গোস্বামী, সম্পাদিত।
পঞ্চকোট ইতিহাস। রাজপুরোহিত রাখাল
চন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত। পুরুলিয়া, বজ্রভূমি
প্রকাশনী, ২০০৩, ১১৪ পৃষ্ঠা, ৮০ টাকা।

106. দিলীপ কুমার গোস্বামী।
পুরুলিয়ার মন্দির। পুরুলিয়া, চৌদ্দশ সাল
সাহিত্য সংসদ, ৫৫ পৃষ্ঠা, ৫০ টাকা।

107. দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।
ভারতের নদনদী। কলিকাতা,
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৩৪,
১৮৩ পৃষ্ঠা, ১৩ টাকা।

108. দিলীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
ভারতের নদী। কলকাতা, ভারতী, ২০০২,
২২০ পৃষ্ঠা, ১০০ টাকা।

109. দিব্যজ্যোতি মজুমদার, সম্পাদিত।
টুসু: ইতিহাসে ও সঙ্গীতে। কলকাতা,
পুস্তক বিপণী, ১৯৮২, ১৫৪ পৃষ্ঠা, ১৫
টাকা।
দীনেন্দ্র কুমার সবকার, সম্পাদিত। বিবাহেব
লোকাচার। কলকাতা, পুস্তক বিপণি।
১৯৮২, ২৯৮ পৃষ্ঠা, ৩০ টাকা।

110. দীনেশ চন্দ্র সেন।
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। ১-২ খণ্ড,
অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা সম্পাদিত।
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তকপর্ষদ,
২০০২, ৮৮৪ পৃষ্ঠা, ২৪০ টাকা।

111. দীনেশচন্দ্র সেন।
বৃহৎ বঙ্গ, (১-২১)। কলিকাতা,
দে'জ, ১৯৯৩, ৫০০ টাকা।

112. দুলাল চৌধুরী।
বাংলার লোকউৎসব।

113. দুঃশাসন মাহাত।
পুরুল্যার টুসু গীত। পুরুলিয়া (সোনাইজুড়ি)।
প্রকাশক— চৈতুরাম ও কিষ্টপদ মাহাত।

114. দুঃশাসন মাহাত ও সুফল চন্দ্র মাহাত এবং
হাজারী রাজুয়াড়।
মানভূম টুসু গীত। পুরুলিয়া (সোনাইজুড়ি), ১২
পৃষ্ঠা, ৩ টাকা।

115. দুঃশাসন, বরুণ ও কিশোর।
পার্বতী টুসু সঙ্গীত। পুরুলিয়া।
১০ পৃষ্ঠা, ৪ টাকা।

116. দেবপ্রসাদ জানা, সম্পাদিত।
অহল্যাভূমি পুরুলিয়া, প্রথম পর্ব।
কলকাতা, দীপ প্রকাশন, ২০০৩
৩১৮ পৃষ্ঠা, ৩০০ টাকা।

117. দেবপ্রসাদ জানা, সম্পাদিত।
অহল্যাভূমি পুরুলিয়া, দ্বিতীয় পর্ব।
কলকাতা, দীপ প্রকাশন, ২০০৩।

118. নৃপতি দাস।
সাঁওতাল সমাজ সমীক্ষা।
কলকাতা, সমতট, ১৯৮৩,
৯৯ পৃষ্ঠা, ১২ টাকা।

119. ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে।
আদিবাসী সমাজ ও পালপার্বণ।
কলকাতা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী
সংস্কৃতি কেন্দ্র, ২০০১, ১১২ পৃষ্ঠা, ৪৫ টাকা।

120. ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে।
কুদুম ঃ সাঁওতালী হেঁয়ালী। কলকাতা,
প্রকাশক—অনিতা বাস্কে। ১৯৯৮,
৭৪ পৃষ্ঠা, ২৫ টাকা।

121. ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে।
পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ।
তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৯৯
২৪৭ পৃষ্ঠা, ১২৫ টাকা।

122. ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে।
বঙ্গ সংস্কৃতিতে প্রাক-বৈদিক প্রভাব।
কলকাতা, প্রকাশক—অনীতা বাস্কে।
১৯৯২, ১২০ পৃষ্ঠা, ৩০ টাকা।

123. ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে।
সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস।
তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, পাল পাবলিশার্স,
১৯৮২, ১৪৩ পৃষ্ঠা, ১৬ টাকা।

124. ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে।
সাঁওতালী ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস।
১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯৯, ২০২ পৃষ্ঠা, ১০০
টাকা।

125. ধীরেন্দ্রনাথ সাহা।
ঝাড়খন্ডী লোকভাষার গান।

126. ধীরেন্দ্রনাথ সাহা।
ঝাড়খন্ডী বাংলা উপভাষা। রাঁচী,
রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩, ৩০৮ পৃষ্ঠা, ৪০
টাকা।

127. ননীগোপাল দেবদাস।
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ঃ কালানুক্রমিক
ঘটনাপঞ্জী। কলকাতা, প্রতিশব্দ প্রকাশনী,
১৯৯৯, ২৭২ পৃষ্ঠা, ১১০ টাকা।

128. নন্দদুলাল আচার্য, সম্পাদিত।
আসানসোলের ইতিবৃত্ত। কলকাতা,
রক্তকরবী, ১৯৯৮, ১৩৩ পৃষ্ঠা, ১০০ টাকা।

129. নন্দদুলাল ভট্টাচার্য, সম্পাদিত।
বাংলার ছৌ নাচ ও গম্ভীর সিং।
কলকাতা, দীপায়ন, ২০০৩,
১৬৭ পৃষ্ঠা, ১০০ টাকা।

130. নমিতা মন্ডল।
বাঁকুড়া কেন্দ্রিক মল্লভূমের উপভাষা।
বাঁকুড়া, বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি অকাদেমী,
১৯৮৯, ২৪৮ পৃষ্ঠা, ৫০ টাকা।

131. নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।
ঝুমুর। কলকাতা, লোকসংস্কৃতি
ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ১৯৯৯,
১৭৪ পৃষ্ঠা, ৭০ টাকা।

132. নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।
নামের মালায় মানভূম। পুরুলিয়া,
ছত্রাক, ১৯৮৬, ১১৯ পৃষ্ঠা, ১৬ টাকা।

133. নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।
মানভূম বাংলা উপভাষা তত্ত্বের ভূমিকা।
কলকাতা, মুক্ত প্রকাশ, ১৪০৩, ১৪৬ পৃষ্ঠা,
৪০ টাকা।

134. নায়েক শ্রী মঙ্গলচন্দ্র তুরকু লুমাম সরেন।
সাঁওতালী ধর্ম ও সংস্কৃতি।

135. নিখিল নাথ রায়।
ইতিকথা। ১৯৩৯।

136. নিখিল রঞ্জন রায়।
দেব দেউলের দেশে। কলকাতা,
পুঁথি, ১৯৮৬, ১২৬ পৃষ্ঠা, ২০ টাকা।

137. নিখিলেশ পুরকাইত।
বাংলা অসমীয়া ও ওড়িয়ার উপভাষার ভৌগোলিক জরিপ। কলকাতা, সুবর্ণরেখা, ১৯৮৯, ৩৮৪ পৃষ্ঠা, ৫০ টাকা।

138. নির্মাল্য সিংহ ও অন্যান্য, সম্পাদিত।
বাংলায় ভ্রমণ। ১ম ও ২য় খণ্ড, তৃতীয় সংযোজিত সংস্করণ, শৈবা সংস্করণ, কলকাতা, শৈবা প্রকাশনী, ১৯৯৭, ৪৪০ পৃষ্ঠা, ৩০০ টাকা।

139. নিরঞ্জন হালদাব।
পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমস্যা। কলকাতা, সিটিজেন ফর ডেমোক্রেটিক রাইটস, ১৯৮০, ৪৮ পৃষ্ঠা, ১.৫০ টাকা।

140. নিশীথ চক্রবর্তী।
নাচনি।

141. নিশীথ রঞ্জন রায়।
বাঙলার কথা। কলকাতা, এ-মুখার্জী এ্যান্ড কোম্পানী, ১৩৭৬, ২৭০ পৃষ্ঠা, ৭.৫০ টাকা।

142. নীহাব রঞ্জন রায়।
বাঙ্গালীর ইতিহাস। কলকাতা। দে'জ, ১৯৯৩, ৭৮৮ পৃষ্ঠা, ২৬০ টাকা।
পদ্মলোচন মাহাতো।
কুরমালি (কুড়মালি)/সাদানি ভাষাব (ভাখিক) ব্যাকরণ (বেউরা)। পুরুলিয়া। প্রকাশক—শশাঙ্ক শেখব মাহাত। ২০০৩। ৪৯ পৃষ্ঠা।

143. পবিত্র সরকার।
ভাষা দেশ কাল। কলকাতা, জি. এ. ই পাবলিশার্স, ১৩৯২, ২৬১ পৃষ্ঠা, ৩৫ টাকা।

144. পবিত্র সরকার।
লোকভাষা লোকসংস্কৃতি। কলকাতা, চিরাযত প্রকাশন, ১৯৯১, ১৫৮ পৃষ্ঠা, ৩৫ টাকা।

145. পরেশ চন্দ্র দাশগুপ্ত।
প্রাগৈতিহাসিক বাংলা। কলকাতা, অনিমা প্রকাশনী, ১৩৮৮, ১৩০ পৃষ্ঠা, ১২ টাকা।

146. পরেশ চন্দ্র দাশগুপ্ত।
প্রাগৈতিহাসিক শুশুনিয়া। কলকাতা, প্রত্নতত্ত্ব অধিকার (পঃ বঃ), ১৯৬৮, ৩৯ পৃষ্ঠা।

147. পরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য।
ভাষা বিদ্যা পরিচয়। ৪র্থ পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৯৬, ৪৬৯ পৃষ্ঠা, ৯০ টাকা।

148. পরিমল চন্দ্র মিত্র।
সাঁওতাল ভাষা : ভিত্তি ও সম্ভবনা। ৪০ টাকা।

149. পল্লব সেনগুপ্ত।
পূজা পার্বনের উৎস কথা। দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, পুস্তক বিপণী, ১৯৯০, ২০৮ পৃষ্ঠা, ৪০ টাকা।

150. পল্লব সেনগুপ্ত।
লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ। কলকাতা, পুস্তক বিপণী, ১৯৯৫, ২৮০ পৃষ্ঠা, ৮০ টাকা।

151. পশুপতি প্রসাদ মাহাত।
আদিবাসী অর্থনীতি ও ভূমি ব্যবস্থা। ১ম খণ্ড, কলকাতা, বনমালী বিশ্বনাথ প্রকাশন, ১৯৮৩, ৮৮ পৃষ্ঠা, ৮ টাকা।

152. পশুপতি প্রসাদ মাহাত।
ঝাড়খন্ডের বিদ্রোহ জীবন। কলকাতা, সুজন পাবলিকেশন, ১৯৮২, ১১৫ পৃষ্ঠা, ১২ টাকা।

153. পুরুলিয়া। কলকাতা, জনশিক্ষা প্রচার কেন্দ্র, ৭০ পৃষ্ঠা. ১.৫০ টাকা।

154. পুরুষোত্তম প্রসাদ দাশ, সম্পাদিত।
বাংলায় অতিথি শব্দের অভিধান। কলকাতা, প্রকাশক—বিজয় কৃষ্ণ দাস। ১৩৯৫, ১৮৩ পৃষ্ঠা, ৩০ টাকা।

155. পুলকেন্দু সিংহ।
ফিরে চল মাটির গানে। কলকাতা, প্রভা প্রকাশনী, ১৯৯৮, ৩১৮ পৃষ্ঠা, ১০০ টাকা।

156. পূর্ণেন্দুনাথ নাথ।
পরাজিত বাঙালী। কলকাতা,
পুস্তক বিপণী, ২০০২, ২৭ পৃষ্ঠা, ২০ টাকা।

157. প্রনব রায়।
বাংলার মন্দির ঃ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য।
কলকাতা, সাহিত্যলোক, ১৯৯৮,
৬০ পৃষ্ঠা, ১২ টাকা।

158. প্রনবেশ চক্রবর্তী।
এই বাংলায়। কলকাতা, দেব
সাহিত্য কুটির, ১৯৯২, ১৬০ পৃষ্ঠা, ৩৫
টাকা।

159. প্রভাত রঞ্জন সরকার।
নৃত্য-বাদ্য-গীত তিনে সংগীত। কলকাতা,
১৯৮৭, ৮৮ পৃষ্ঠা, ১০ টাকা।

160. প্রভাস মাহাতো।
মায়ের বীণা টুসু সংগীত।
পুরুলিয়া (তেঁতুলদাগ), ৭ পৃষ্ঠা, ২.৫০ টাকা।

161. বঙ্কিম মাহাত।
ঝাড়খন্ডের লোক ভাবনা।

162. বঙ্কিম মাহাত।
ঝাড়খন্ডের লোকসাহিত্য। বাণী
শিল্প শোভন সংস্করণ, কলকাতা,
বাণী শিল্প, ২০০০, ৩১৬ পৃষ্ঠা, ১৭৫ টাকা।

163. বরুণ কুমার চক্রবর্তী।
লোক উৎসব ও লোকদেবতা প্রসঙ্গ।
কলকাতা, পুস্তক বিপণী, ১৯৮৪,
১০৯ পৃষ্ঠা, ১২ টাকা।

164. বরুণ কুমার চক্রবর্তী।
লোক বিশ্বাস ও লোক সংস্কার। দ্বিতীয় পুস্তক
বিপণী সংস্করণ, কলকাতা, পুস্তক বিপণী,
১৩৯০, ১৪৪ পৃষ্ঠা, ১৫ টাকা।

165. বরুণ কুমার চক্রবর্তী।
লোকসংস্কৃতি ঃ নানা প্রসঙ্গ।
কলকাতা, বুক ট্রাস্ট, ১৩৮৭,
১৪০ পৃষ্ঠা, ১৫ টাকা।

166. বরুণ কুমার চক্রবর্তী।
বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ।
কলকাতা, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স,
১৯৯৫, ৫৬০ পৃষ্ঠা, ২৫০ টাকা।

167. বরুণ কুমার চক্রবর্তী।
বাংলা প্রবাদে স্থান কাল পাত্র।
২য় সংস্করণ, কলকাতা, পুস্তক বিপণী,
১৯৮৪, ২৩২ পৃষ্ঠা, ২৫ টাকা।

168. বাউরী বন্ধু মাহাত।
সঙ্গীত সৃষ্টি এবং ঝুমুর উৎপত্তি।
পশ্চিম সিংভূম (বিহার), ১৯৯৭,
২০ পৃষ্ঠা, ৭ টাকা।

169. বারিদবরণ ঘোষ।
ভারত ভ্রমণ। তৃতীয় পরিমার্জিত।
সংস্করণ, কলকাতা, গ্রান্থিক, ১৯৯৮,
৬৫৪ পৃষ্ঠা, ১৩০ টাকা।

170. বাহাত্তরের ভেটি। কলকাতা,
অনির্বান প্রকাশনী, ১৩৭৯, ২৫৩ পৃষ্ঠা, ১০
টাকা।

171. বিকাশ চক্রবর্তী।
বাউল জীবনের সমাজতত্ত্ব। কলকাতা,
প্রগেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৩, ২০৮ পৃষ্ঠা,
২৫০ টাকা।

172. বিজয় পান্ডা।
মানভূম সংস্কৃতির বিবিধ প্রসঙ্গ।
১ম খন্ড, কলকাতা, ক্রিয়েটিভ
এ্যাসোসিয়েটস, ২০০৩, ৪৬ পৃষ্ঠা, ৫০ টাকা।

173. বিনয় ঘোষ।
পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি। ১ম খন্ড,
দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, প্রকাশ ভবন,
১৩৮৩, ৪৫৭ পৃষ্ঠা, ৮০ টাকা।

174. বিনয় ঘোষ।
বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব।
কলকাতা, অরুণা প্রকাশনী, ১৯৭৯,
১৭৫ পৃষ্ঠা, ১৪ টাকা।

175. বিনয় মাহাত।
লোকায়ত ঝাড়খন্ড। কলকাতা,
নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮৪, ৩৬৮ পৃষ্ঠা, ৩০
টাকা।

176. বিপ্লব কবিরাজ ও মৃণাল কান্তি মন্ডল,
সম্পাদিত।
পুরুলিয়া জেলার পত্র-পত্রিকা পঞ্জী।
পুরুলিয়া, প্রকাশক—সাধনা মন্ডল ও সুতপা
কবিরাজ। ২০০৩, ৫৯ পৃষ্ঠা, ৩০ টাকা।

177. বিপিন বিহারী মাহাত।
মালাবতী টুসু সঙ্গীত।
পুরুলিয়া, ২০০১-২০০২, ১০ পৃষ্ঠা, ৪ টাকা।

178. বিপিন বিহারী মুখী।
ঝুমুর সঙ্গীত। কলকাতা, সজল পুস্তকালয়, ৪০ পৃষ্ঠা, ৬ টাকা।

179. বিভূতি ভূষণ গোস্বামী।
চিরকায় গৌরীনাথ আবির্ভাব কথন তৎসহ মাহাত্ম বর্ণন। প্রকাশক—উত্তম কুমার গোস্বামী ও অনাদী গোস্বামী।

180. বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত।
সেই মহাবরষাব রাঙা জল।
কলকাতা, প্রকাশক— কাজল সেন।
১৯৭৪, ৩৪ পৃষ্ঠা, ২০ টাকা।

181. বিমলা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায।
মানভূমের ভূগোল ও ইতিবৃত্ত।

182. বিশ্বনাথ চক্রবর্তী।
পাহাড়ের কোলে বান্দোয়ান। কলকাতা, প্রকাশক— সুকুমার চক্রবর্তী। ২০০১, ৮৮ পৃষ্ঠা, ৩৫ টাকা।

183. বিশ্বনাথ মুর্ম্ম।
সাঁওতালী শব্দাবলী ও ভাষা শিক্ষা। কলকাতা, ফার্মা কে, এল. এম. ১১১ পৃষ্ঠা ৬০ টাকা।

184. বীরেশ্বব বন্দ্যোপাধ্যায়।
পশ্চিমবঙ্গের লৌকিক দেবদেবী ও লোকবিশ্বাস। কলকাতা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী কেন্দ্র, ২০০১, ১২১ পৃষ্ঠা, ৭০ টাকা।

185. বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, সজল বসু ও পবিত্র কুমার গুপ্ত. সম্পাদিত।
বাংলায় আগস্ট বিপ্লব। কলকাতা, সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন সমিতি, ১৭০ পৃষ্ঠা, ১২০ টাকা।

186. বুদ্ধদেব রায়।
বাংলার লোককথা। কলকাতা, জ্ঞান প্রকাশন, ১৫ টাকা।

187. বুদ্ধদেব রায়।
লোক সাঙ্গীতিকী। পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ফার্মা কে. এল. এম, ১৯৯৮, ১৩৫ পৃষ্ঠা, ৭৫ টাকা।

188. ব্রজদুলাল চক্রবর্তী।
প্রসঙ্গ অসীমানন্দ। পুরুলিয়া, অসীমানন্দ সাহিত্য একাডেমি, ১৯৯২, ৯৬ পৃষ্ঠা, ২৫ টাকা।

189. ভজহরি মাহাত ও পদক মাহাত।
স্বাধীনতা আন্দোলনে রক্তে রাঙা মানভূম। পুরুলিয়া, প্রকাশক— পদক চন্দ্র মাহাত। ১৯৯৫, ২৪৯ পৃষ্ঠা, ৪০ টাকা।

190. ভবপ্রীতানন্দ ওঝা।
বৃহৎ-ঝুমর-রসমঞ্জরী। তৃতীয় সংস্করণ, পুরুলিয়া, প্রকাশক-শিরোমনী হাজরা, (বেড়াম) ও অন্যান্য। ১৩৩১, ১/০ টাকা।

191. ভব রায়।
রাঢ়ের লোকভাষা ও শব্দকোষ। কলকাতা, দীপায়ন, ২০০১, ১৩৬ পৃষ্ঠা, ৬০ টাকা।

192. ভূনাথ মাহাত।
প্রেম ও ভালবাসা টুসু সঙ্গীত। পুরুলিয়া (ঘাগরজুড়ি), ৯ পৃষ্ঠা, ৪ টাকা।

193. ভূপতি রঞ্জন দাস।
পশ্চিমবঙ্গ ভ্রমণ ও দর্শন। কলিকাতা, শরৎ পাবলিশিং হাউস, ১৯৭৯, ২২ টাকা।

194. মধুসূদন গ্রন্থাবলী (কাব্য)। কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৮৬০, বিবিধ পৃষ্ঠা।

195. মনোরঞ্জন পাণ্ডে।
মনোরঞ্জন টুসুর গীত। পুরুলিয়া (ঘাঘরজুড়ি), ৭ পৃষ্ঠা, ২ টাকা।

196. মনোরমা ইয়ারবুক ২০০৩। কলকাতা, মালয়ালা মনোরমা, ২০০৩, ৭৩২ পৃষ্ঠা, ৮০ টাকা।

197. মহাশ্বেতা দেবী ও অন্যান্য।
অরণ্য সন্তান শবর খেড়িয়া। কলকাতা, ক্যাম্প, ১৯৯৮, ৮৫ পৃষ্ঠা, ৫০ টাকা।

198. মহাশ্বেতা দেবী।
বীরসা মুন্ডা।

199. মহাশ্বেতা দেবী, সম্পাদিত।
ভেরিয়ার এল্যুইন নির্বাচিত বচনা। কলকাতা, সাহিত্য আকাদেমী, ২০০১, ৩৯০ পৃষ্ঠা, ১৫০ টাকা।

200. মানিক লাল সিংহ।
পশ্চিম রাঢ় তথা বাকুড়া সংস্কৃতি। বাঁকুড়া, প্রকাশক—চিত্তবঞ্জন দাশগুপ্ত। ১৩৮৪, ২৩৪ পৃষ্ঠা, ১২ টাকা।

201. মানিক লাল সিংহ।
রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি। ১ম খন্ড, বাঁকুড়া, প্রকাশক—দিলীপ কুমার সিংহ। ১৯৮২, ২৩৯ পৃষ্ঠা, ৩০ টাকা।

202. মানিক লাল সিংহ।
রাঢ়েব জাতি ও কৃষ্টি। ২য় খন্ড। বাঁকুড়া। প্রকাশক—প্রণব কুমার সিংহ। ১৯৮২, ২৬৬ পৃষ্ঠা, ৩০ টাকা।

203. মানিক লাল সিংহ
রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি। তৃতীয খন্ড, বাঁকুড়া, প্রকাশক—সুকান্ত সিংহ। ১৯৮৩, ১৬৪ পৃষ্ঠা, ১৬ টাকা।

204. মানিক লাল সিংহ।
রাঢের মন্ত্রযান। কলকাতা, ঠাকুরদাস লাইব্রেবী, ১৩৫৭।

205. মালিনী ভট্টাচার্য, সম্পাদিত।
সুধী প্রধান স্মারক গ্রন্থ। কলকাতা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, ১৯৯৯, ৩৭৮ পৃষ্ঠা, ২০০ টাকা।

206. মিহির চৌধুরী কামিল্যা।
আঞ্চলিক দেবতা ঃ লোক সংস্কৃতি। ২য় সংস্করণ, বর্ধমান, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০00, ৩০৪ পৃষ্ঠা, ১০০ টাকা।

207. মিহির চৌধুরী কামিল্যা।
বাংলার নারী সংস্কৃতি ঃ লোকায়ত প্রেক্ষাপট। কলকাতা, পুনশ্চ, ২০০৩, ১৯২ পৃষ্ঠা, ৭০ টাকা।

208. মিহির চৌধুরী কামিল্যা।
ভাষাতত্ত্বঃ বাংলা ভাষার ইতিহাস। তৃতীয় সংস্কবণ, কলকাতা, প্রকাশক—অনিল কুমার ঘোষ। ২০০২, ১৫০ পৃষ্ঠা, ৫২ টাকা।

209. মিহির চৌধুরী কামিল্যা।
রাঢ়ের পূর্বপুরুষ পূজাঃ গ্রাম্য দেবদেবী, লোকধর্ম, লোক সংস্কৃতি। কলকাতা, ভোলানাথ প্রকাশনী, ১৯৯১, ৮২ পৃষ্ঠা, ২০ টাকা।

210. মৃদুল কান্তি চক্রবর্তী।
লোকসংগীত। ঢাকা, প্যাপিরাস, ১৯৯৯, ১১৫ পৃষ্ঠা, ৯৫ টাকা।
মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।
মাড ভাতের লড়াই। মেদিনীপুব, অমৃতলোক, সাহিত্যপরিষদের পক্ষে সমীরণ মজুমদাব, ১৩৯৩, ৮০ পৃষ্ঠা, ১৫ টাকা (শোভিন সংস্কবণ) ১০ টাকা (সাধাবণ সংস্করণ)।

211. যদুগোপাল মুখোপাধ্যায।
বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি। দ্বিতীয সংস্কবণ, কলকাতা, অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স, ১৯৮২, ৫৯১ পৃষ্ঠা, ৪০ টাকা।

212. যুধিষ্ঠির মাজী।
ভাদুগীতির ইতিকথা। ১ম খন্ড, কলকাতা, প্রকাশক—সত্যচরণ ঘোষ। ১৯৮৫, ১০৮ পৃষ্ঠা, ১৫ টাকা।

213. যোগেশ চন্দ্র বাগল।
জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনাবী। কলকাতা, বিশ্বভাবতী গ্রন্থালয়, ১৯৫৪।

214. রঞ্জন বাচস্পতি।
পশ্চিমবাংলার ইতিহাস। রাজনৈতিক পর্ব, (১৯৪৭-১৯৭২)। কলকাতা, ইণ্টারন্যাশন্যাল বুকস, ১৯৮৬, ২৩২ পৃষ্ঠা, ৩০ টাকা।

215. রভিকান্ত দে।
পরিচয়ে আভাস। পুরুলিয়া, প্রকাশক—নিমাইলাল দত্ত, ১৩৫৯, বিবিধ পৃষ্ঠা।

216. রহিন চন্দ্র মাহাত।
মনমতো টুসু সঙ্গীত। পুরুলিয়া (প্রতাপপুর)।
১০ পৃষ্ঠা, ২ টাকা।

217. রবীন্দ্রনাথ সামন্ত।
তুষব্রত ও গীতি সমীক্ষা। কলকাতা,
পুস্তক বিপণী, ১৩৮৫, ১৫৮ পৃষ্ঠা, ১২.৫০
টাকা।

218. রমেশ চন্দ্র মজুমদার।
বাংলাদেশের ইতিহাস। প্রথম খণ্ড।

219. রাখাল চন্দ্র চক্রবর্তী।
জগদ্দেও। পুরীধাম, প্রকাশক— শ্যামাপ্রকাশ
ব্রহ্মচাবী ও গোবর্দ্ধন মঠ। ১৩৩৯, ৩৪ পৃষ্ঠা,
৫০ পযসা।

220. বাখাল চন্দ্র চক্রবর্তী।
পঞ্চকোট ইতিহাস। ১৯৩৩, ১৩৯ পৃষ্ঠা।

221. রাখাল চন্দ্র চক্রবর্তী।
পঞ্চকোট প্রতিষ্ঠা। বেনারস,
প্রকাশক— শ্যামাপ্রকাশ ব্রহ্মচারী,
পঞ্চকোটরাজ শিবালয়, ১৩৩৯, ১৬৯ পৃষ্ঠা,
১ টাকা।

222. রাখাল চন্দ্র চক্রবর্তী।
রাখালেব গান। বেনারস, প্রকাশক—
শ্যামাপ্রকাশ ব্রহ্মচারী। পঞ্চকোটরাজ হাউস
শিবালয়, ১৩৩৪, ২২৯ পৃষ্ঠা, ১/০ টাকা।

223. বাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
বাংলার ইতিহাস। কলকাতা,
মনোমোহন প্রকাশনী, ১৯৮৫।

224. রাজকুমার ভট্টাচার্য।
পার্বত্য কাহিনী।

225. রাজকুমার বেদতীর্থ।
ভাষা দর্পন
(Bhasa-Darpan or A Mirror of the Bengali language)। প্রকাশক— রাজকুমার
বেদতীর্থ, ১৯১২, ১০৮ পৃষ্ঠা, ১২ আনা।

226. রাখহরি মাহাত।
একবিংশ টুসু বাম্পাব। মেদিনীপুর,
১৯৯৯, ১৩ পৃষ্ঠা, ৩ টাকা।

227. রাধাগোবিন্দ মাহাত।
ঝাড়খন্ডের কুড়মি। কলিকাতা,
ইন্ডিয়ান পাবলিকেশান, ১৯৮৫,
১৩১ পৃষ্ঠা, ১৮ টাকা।

228. রাধাগোবিন্দ মাহাত।
ঝাড়খন্ডের লোকসংস্কৃতি।

229. রাধাগোবিন্দ মাহাত।
ঝাড়খন্ডের লোকসমস্যা। পুরুলিয়া,
প্রকাশক— রাধাগোবিন্দ মাহাত। ১৩৮৩,
১০০ পৃষ্ঠা, ১০ টাকা।

230. রামশঙ্কর চৌধুরী।
ভাদু ও টুসু। কলকাতা, কথাশিল্প,
১৯৮১, ৮৭ পৃষ্ঠা, ১০ টাকা।

231. রামেশ্বর শ।
সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলাভাষা।
২য় সংস্কবণ, কলকাতা, পুস্তক বিপণী,
১৩৯৯, ৭২৪ পৃষ্ঠা, ১২৫ টাকা।

232. রিফুজী মাহাত।
রস রঙ্গ টুসু সঙ্গীত। পুরুলিয়া,
(ভাঙ্গাড়া), ৯ পৃষ্ঠা, ৪ টাকা।

233. রীণা দত্ত।
বাঙলার কীর্তণ ও লোকসঙ্গীত। কলকাতা,
মডেল পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৬, ১৮৪ পৃষ্ঠা,
৫০ টাকা।

234. রেখা সিংহ।
মানভূমের লোকসাহিত্য ও শব্দকোষ।
কলিকাতা, সংস্কৃত বুক ডিপো, ১৯৮৪,
১৮৫ পৃষ্ঠা, ৪০ টাকা।

235. রেবতী মোহন সরকার।
নৃবিজ্ঞান প্রবেশিকা। ২য় খন্ড, কলকাতা,
এম রায, ২০০০, ৪৬২ পৃষ্ঠা, ১০৮ টাকা।

236. লক্ষীন্দ্র কুমার সরকার।
পুরুলিয়ার ডাইনী বিরোধী আন্দোলন।
কলকাতা, আর. বি. সরকার প্রকাশনী,
১৯৯১, ২৮০ পৃষ্ঠা, ৬০ টাকা।

237. লীলাময় মুখোপাধ্যায়।
জেলার নাম পুরুলিয়া। বাঁকুড়া,
বাঁকুড়া হিতৈষী প্রকাশনী, ১৯৮৪, ৬৪ পৃষ্ঠা,
৫ টাকা।

238. লীলাময় মুখোপাধ্যায়।
রাজ্যের নাম পশ্চিমবঙ্গ। দ্বিতীয় সংস্করণ, বাঁকুড়া, বাঁকুড়া হিতৈষী প্রকাশনী, ১৯৮৪, ৬৫ পৃষ্ঠা, ৫ টাকা।

239. শক্তি সেনগুপ্ত।
দামুন্দা কপিশা শিলাবতী। দ্বিতীয় সংস্কবণ, কলকাতা, অন্তরাল, ২০০২, ১৩০ পৃষ্ঠা, ৭০ টাকা।

240. শক্তি সেনগুপ্ত ও শ্রমিক সেন, সম্পাদিত।
লোকয়ত মানভূম। প্রথম খণ্ড, কলকাতা, অন্তরাল, ১৪০৭, ২৬১ পৃষ্ঠা, ১৫০ টাকা।

241. শক্তি সেনগুপ্ত, সম্পাদিত।
লোকায়ত মানভূম। দ্বিতীয় খন্ড, কলকাতা, অন্তরাল, ১৪০৯, ২১১ পৃষ্ঠা, ১২৫ টাকা।

242. শচীন্দ্রলাল ঘোষ।
পশ্চিমবঙ্গ। নয়াদিল্লী, ন্যাশন্যাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৮৫, ১১৯ পৃষ্ঠা, ১১·২৫ টাকা।

243. শরৎ চন্দ্র মাঝি।
পুরুলিয়ার লোকসঙ্গীত টুসু। পুরুলিয়া। (আড়াল কোচা), ৯ পৃষ্ঠা, ২·৫০ টাকা।

244. শরৎ চন্দ্র মাঝি।
সুপার হিট টুসু সঙ্গীত। পুরুলিয়া (আড়ালকোচা), ৮ পৃষ্ঠা, ৩ টাকা।

245. শান্তি সিংহ।
টুসু। কলকাতা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, ৪০৪ পৃষ্ঠা, ১৫০ টাকা।

246. শান্তি সিংহ।
নিরন্তর আলোকিত আশা। কলকাতা, অরুণা প্রকাশনী, ১৯৮৮, ১০১ পৃষ্ঠা, ১০ টাকা।

247. শান্তি সিংহ।
মাটিতে পা রেখে। কলকাতা, প্রমা প্রকাশনী, ১৯৮২, ৪৮ পৃষ্ঠা, ৭ টাকা।

248. শান্তি সিংহ।
রূপ-রস-ছন্দে বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার লোকায়ত জীবন, কলকাতা, সৃষ্টি প্রকাশন, ১৩৬ পৃষ্ঠা, ৮০ টাকা।

249. শান্তি সিংহ।
লাল মাটি নীল অরণ্য। কলকাতা, গঙ্গোত্রী প্রকাশনী, ১৯৭৩, ৪৮ পৃষ্ঠা, ৩ টাকা।

250. শান্তি সিংহ।
লোক সঙ্গীত সংগ্রহ : ঝুমুর। কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমী. ১৯৯৭, ৪২১ পৃষ্ঠা, ১৫০ টাকা।

251. শীলা বসাক।
বাংলা ধাঁধাব বিষয় বৈচিত্র ও সামাজিক পবিচয়। ২য় সংস্কবণ, কলকাতা, পুস্তক বিপণী, ১৯৯৮, ৪০০ পৃষ্ঠা, ১৫০ টাকা।

252. শৈলেন দাস ও ধনপতি সামন্ত।
লোকসংস্কৃতি ও আমরা। কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যদ, ১৯৭৬।

253. শ্যামল মুখোপাধ্যায় ও ধ্রুব চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদিত।
পর্যটন সাথী ২০০০-২০০১। চতুর্থ সংস্কবণ, কলকাতা, বর্ষা পাবলিকেশন, ২০০০, ৩৩৫ পৃষ্ঠা, ৭০ টাকা।

254. শ্যামা প্রসাদ বসু।
সংগ্রামী জাতীয়তাবাদ: মেদিনীপুব ও মানভূম (১৯০০-১৯৪৭)। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৩, ১০৪ পৃষ্ঠা, ৪৫ টাকা।

255. শ্রাবণী চক্রবর্তী।
লোকজীবন ও লোকসংগীত। কলকাতা, সেন্টার ফর কমুনিকেসান এ্যান্ড কালচাবাল এ্যাকসান, ২০০০, ১১২ পৃষ্ঠা, ৮০ টাকা।

256. শ্রমিক সেন।
এক নজবে পুরুলিয়া। তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, অন্তরাল, ২০০১, ১০১ পৃষ্ঠা ৪০ টাকা।

257. সচ্চিদানন্দ দত্ত রায়।
পশ্চিমবঙ্গবাসী। কলকাতা, কে. পি. বাগচী এ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৯৪, ৩৫২ পৃষ্ঠা, ১৫০ টাকা।

258. সঞ্জীব নাথ।
বাংলার লোকনাট্য স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য। কলকাতা,অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ২০০৩, ২০০ পৃষ্ঠা, ১০০ টাকা।

259. সনৎ কুমার মিত্র, সম্পাদিত।
ঝুমুর আলোচনা ও সংগ্রহ। কলকাতা, লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, ১৯৯৮, ১৭৬ পৃষ্ঠা, ৬০ টাকা।

260. সনৎ কুমার মিত্র।
পশ্চিমবঙ্গের লোকবাদ্য। কলকাতা, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৮৫, ৮০ পৃষ্ঠা, ২০ টাকা।

261. সন্দীপ সেন, পার্থসারথী দাশগুপ্ত ও অভীক হালদার।
সংক্ষিপ্ত বঙ্গকোষ (প্রকৃত খণ্ড)। কলকাতা, দূর্বা, ১৯৭৮, ২৪০ পৃষ্ঠা, ২৫ টাকা।

262. সমীরণ দত্তগুপ্ত।
ফিরে ফিরে দেখা চোয়াড় বিদ্রোহ। কলকাতা, এন. ই. পাবলিশার্স, ১৯৯৯, ১১২ পৃষ্ঠা, ৫০ টাকা।

263. সমীরণ দত্তগুপ্ত।
শতাব্দীর আলোয় মুন্ডা বিদ্রোহ। কলকাতা, সুবর্ণ প্রকাশনী, ২০০০, ১০৮ পৃষ্ঠা, ৫০ টাকা।

264. সরোজ রঞ্জন চৌধুরী।
মানভূমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। পুরুলিয়া, ১৯৩৮, ১১৯ পৃষ্ঠা, ৮ আনা।

265. সিরাজুল হক।
পুরুলিয়ার মেলা। পুরুলিয়া, অনুজু প্রকাশনী, ২০০২, ৩৪ পৃষ্ঠা, ২৫ টাকা।

266. সুকান্ত পাল, প্রবীর দে ও শ্রাবণী ঘোষ।
উপজাতি ভাবনা। কলকাতা, বাঙলাদেশ পাবলিকেশন, ২০০১, ৮০ পৃষ্ঠা, ৪০ টাকা।

267. সুকুমার সিং।
ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকার নিশানা। কলকাতা, মাস এডুকেশন, ১৯৮৯, ৫ টাকা।

268. সুকুমার সেন।
বাংলা লোকসাহিত্যের ইতিহাস। ১ম খণ্ড।

269. সুকুমার সেন।
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা, আনন্দ, ১৯৯৪।

270. সুকুমার সেন।
বাংলা স্থান নাম। দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, আনন্দ, ১৩৮৯, ১৪৭ পৃষ্ঠা, ১২ টাকা।

271. সুকুমার সেন।
ভাষার ইতিবৃত্ত। পঞ্চদশ সংস্করণ, কলকাতা, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, ১৯৮৭, ৪২১ পৃষ্ঠা, ৫০ টাকা।

272. সুধীর করণ।
বিশ্বলোক কথার রূপরেখা। কলকাতা, পুনশ্চ, ১৯৯৬, ২৫৫ পৃষ্ঠা, ৮০ টাকা।

273. সুধীর করণ।
সীমান্ত বাংলার লোকযান। কলকাতা, এ. মুখার্জী এ্যান্ড কোম্পানী, ১৩৭১, ৩৫৮ পৃষ্ঠা, ১২ টাকা।

274. সুধীর কুমার করণ।
সীমান্ত রাঢ়ী ও ঝাড়খন্ডী বাংলার গ্রামীণ শব্দকোষ। কলকাতা, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০২, ৬৪৪ পৃষ্ঠা, ৯০০ টাকা।

275. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়।
বাঙ্গলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা। নবম সংস্করণ, কলকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬, ১৪৯ পৃষ্ঠা, ৮০ টাকা।

276. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়।
বাঙ্গলা ভাষা প্রসঙ্গে। কলকাতা, জিজ্ঞাসা, ১৯৮৯, ৩৮৮ পৃষ্ঠা, ৬০ টাকা।

277. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়।
বাঙ্গালীর সংস্কৃতি। কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯০, ৬৮ পৃষ্ঠা, ১৫ টাকা, চিত্র।

278. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়।
ভারত সংস্কৃতি।

279. সুনীল মাহাত।
ঝাড়খন্ডের মসীহা।

280. সুপ্রকাশ রায়।
ভারতে কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম। দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, ডি. এন. বি এ. ব্রাদার্স, ১৯৭২, ৪৩২ পৃষ্ঠা, ২৫ টাকা।

281. সুফল মণ্ডল।
পুরুলিয়া পরিচিতি। পুরুলিয়া,
ছত্রাক, ১৯৮১, ১২০ পৃষ্ঠা, ১০ টাকা।

282. সুবোধ চক্রবর্তী, সম্পাদিত।
সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান।
কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৬।

283. সুবোধ চন্দ্র ঘোষ।
পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক পরিচয়। নয়াদিল্লী,
ন্যাশন্যাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৮৬, ১৯৬ পৃষ্ঠা,
১৫ টাকা।

284. সুবোধ ঘোষ।
ভারতের আদিবাসী। কলকাতা,
ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সি, ২০০০, ২৪৬ পৃষ্ঠা,
৭০ টাকা।

285. সুবোধ বসুরায়।
অযোধ্যা। পুরুলিয়া, ছত্রাক প্রকাশনী,
১৯৮৩, ১১৮ পৃষ্ঠা, ১৫ টাকা।

286. সুবোধ বসুরায়।
বনে যদি যেতেই হয়। পুরুলিয়া,
ছত্রাক প্রকাশনী, ১৯৯৪, ৯৫ পৃষ্ঠা, ২৫
টাকা।

287. সুবোধ বসুরায়, সম্পাদিত।
মানভূমি কবিতা। ২য় সংস্করণ, পুরুলিয়া,
ছত্রাক, ১৯৮৭, ৩৪ পৃষ্ঠা, ১০ টাকা।

288. সুবোধ বসুরায় ও নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।
মানভূমি শব্দকোষ: আঞ্চলিক বাংলা
উপভাষার লৌকিক অভিধান। পুরুলিয়া,
ছত্রাক প্রকাশনী, ১৯৯০, ১৯০ পৃষ্ঠা, ৩০
টাকা।

289. সুব্রত চক্রবর্তী।
ভাদু। কলকাতা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী
সংস্কৃতি কেন্দ্র, ২০০১, ১৮০ পৃষ্ঠা, ৬০
টাকা।

290. সুব্রত মুখোপাধ্যায়।
সীমান্ত বাংলার লোকক্রীড়া। কলকাতা,
লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী কেন্দ্র, ২০০১,
৬২ পৃষ্ঠা, ৩০ টাকা।

291. সুভাষ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
পশ্চিম সীমান্তবঙ্গের লোকগীতি। কলকাতা,
সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৬৯।

292. সুভাষ চন্দ্র ভৌমিক।
আমাদের পুরুলিয়া। মেদিনীপুর, প্রকাশক-
ত্রিনা ভৌমিক। ১৯৯৯-২০০০, ৩৮ পৃষ্ঠা,
১২ টাকা।

293. সুভাষ চন্দ্র ভৌমিক।
সেকাল-একাল পুরুলিয়া। মেদিনীপুর,
প্রকাশক-টি. ভৌমিক। ১৯৯৯, ৯২ পৃষ্ঠা,
৬০ টাকা।

294. সুভাষ রায়, সম্পাদিত।
ঝুমুর ও তার নানা দিক। ১ম খণ্ড, পুরুলিয়া,
অনুজ প্রকাশনী, ২০০৩, ১২৮ পৃষ্ঠা, ৬০
টাকা।

295. সুভাষ রায়, সম্পাদিত।
ঝুমুর শিল্পী ভবপ্রীতানন্দ ওঝার জীবন ও
সাহিত্য। কলকাতা, ক্রিয়েটিভ
এ্যাসোসিয়েটস, ২০০২, ১৯১ পৃষ্ঠা, ১০০
টাকা।

296. সুভাষ রায়, সম্পাদিত।
মানভূমের লোকনৃত্য। পুরুলিয়া,
অনুজ প্রকাশনী, ২০০৩, ১২৮ পৃষ্ঠা, ৬০
টাকা।

297. সুমিত্রা মিত্র।
সদর মানভূমের স্বাধীনতা আন্দোলন,
১৯৮৯।

298. সুরজিৎ সিংহ।
বরাভূম।

299. সুরেশ চন্দ্র মৈত্র।
মাইকেল মধুসূদন দত্ত জীবন ও সাহিত্য।
তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, পুঁথিপত্র,
১৯৯৭, ২৪০ পৃষ্ঠা, ৭৫ টাকা।

300. সুশীল কুমার দে, সম্পাদিত।
বাংলা প্রবাদ। ২য় সংস্করণ, কলকাতা,
১৩৫৯, ৯৮৭ পৃষ্ঠা, ২০ টাকা।

301. সুহৃদ কুমার ভৌমিক।
আদিবাসীদের ভাষা ও বাঙলা। মেদিনীপুর, মারাংবরু প্রেস, ১৯৯১, ৬৮ পৃষ্ঠা ৩৫ টাকা।

302. সুহৃদ কুমার ভৌমিক।
আরণ্যক দর্শন ও সাঁওতালি ঈশোপনিষদ। মেদিনীপুর, মারাংবরু প্রেস, ১৯৯১, ৭৪ পৃষ্ঠা।

303. সুহৃদ কুমার ভৌমিক, সম্পাদিত।
শায় সেরমা রেনা· অনড়হে (শতবর্ষের সাঁওতালি কবিতা)। কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন সমবায় নিগম, ১৯৯৩, ২৭৪ পৃষ্ঠা, ৬০ টাকা।

304. সৃষ্টিধর বঁশরিআর।
মানভূমের লোককথা। কলকাতা, ক্রিয়েটিভ এ্যাসোসিয়েটস, ১৪০৬, ১১৬ পৃষ্ঠা, ৫০ টাকা।

305. স্বামী অসীমানন্দ।
আমার জীবন। ১-৬ খণ্ড, পুরুলিয়া, সদগ্রন্থ প্রকাশনী, শ্রী শ্রী বিজয়কৃষ্ণ আশ্রম, ১৯৯২, ৪৮১ পৃষ্ঠা, ৪৫ টাকা।

306. সৈয়দ বসিরুদ্দোজা।
বাঢ়ের শিল্প ডোকরা। বর্ধমান, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১, ৪৮ পৃষ্ঠা, ৪০ টাকা।

307. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য।
হিন্দুদের দেবদেবী : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ। তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা, ফার্মা. কে. এল. এম. ১৯৭৮।

308. হাজারী প্রসাদ রাজোয়াড় ও সুনীল কুমার মাহাত।
কাশফুল।

309. হরিনাথ ঘোষ।
লাল সিংহ বা পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসের এক অধ্যায়। ১৯১৩।

310. হরিপদ রায়।
মানভূমের কথা। কলকাতা, প্রকাশক—নারায়ণ চক্রবর্তী। ১৩৫৬, ৬৯ পৃষ্ঠা, ১ টাকা।

311. হরিসাধন দাস।
মেদিনীপুর দর্পণ। মেদিনীপুর, ১৪০১, ৮২ পৃষ্ঠা, ৯৫ টাকা।

312. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।
বাঙ্গলার কীর্তন ও কীর্তনীয়া। কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৯৭১।

1. A. Campbell.
A Santali English Dictionary . Vol I-II. Pokhuria. 1933.

2. A. C. Mukherjee.
Folk Art of Bengal. Calcutta. 1939.

3. Ahmed Hasan.
Pre-History and Proto History of Eastern India. Calcutta. FIRMA K.L.M. 1960.

4. Alan Dundes.
The Study of Folklare. Barkeley. 1965.

5. A. N. Mukherjee.
A Few Traditional Cottage and Small Industries of Purulia.

6. Archer Taylor
Folklore and the Student of Literature. Vol-II. 1948.

7. A. Mitra.ed.
The Tribes and Castes of West Bengal. Calcutta.

8. A. Mitra.ed.
West Bengal District Census Handbook. Calcutta 1961.

9. Annual Administrative Report 2001-2002. Purulia. office of the District Magistrate. 243 p.

10. Anthony Giddens. Sociology. Calcutta. 1993.

11. A. P. Sinha Religious life in Tribal India. New Delhi. Classical Publishing Company. 1989. 310P. photo. Rs. 250/-

12. Ashutosh Bhattacharayya. Chhau Dance of Purulia.

13. Atul Chandra Ghosh. A short life-Sketch of Rishi Nibaran Chandra.Purulia. 1940.

14. Bhibhuti Bhusan Dasgupta. Manbhum Tusu Satyagraha and our stand. 1954.

15. B. Roy. ed. West Bengal District Census Hand Book. Calcutta. 1961.

16. Brajadulal Chakrobarty. Asimananda my master. Purulia. Asimananda Sahitya Academi.

17. Buddhadev Roy. Folk Songs of Bengal. 1980. Rs. 20/-

18. Buddhadev Roy. Marriage rituals & songs of Bengal (with Staff notations). Calcutta. FIRMA K. L. M. 1984. 34P. Rs. 50/-

19. C. A. Hans. Teach yourself Mundari. Ranchi. Horo Senra Samaiti. 136P. Rs. 20/-

20. Chitta Ranjan Laha. The songs of the Rock.

21. Census of India. 1981.

22. C. M. Bompas. Folklore of the Santal Parganas. London. 1909.

23. C. Stewart. History of Bengal. 1813.

24. David Mc Cutchion Late Medieval Temples of Bengal.

25. D. D. Kosambi. An Introduction to the Indian culture and Civilisation in historical outlines. Calcutta.

26. Debala Mitra. Telkupi. 1969.

27. Dikshit Sinha. The Hill Kharia of Purulia. Calcutta. Authorpological Survey of India.1984. 104P. Rs. 80/-.

28. D. N. Majumdar and T. N. Madan. An Introductional to Social Authorpology. Calcutta. Asia Publishing House. 1956. 304p.

29. District Statistical Handbook. Purulia. Bureau of Applied Economics & Statistics. 2001. V.P.

30. D. R. Patil. The Antiquarian Remains in Bihar. Patna. Kashiprosad Jayaswal Research Institute. 1963, Rs. 16/-.

31. Edward Tuite Dalton. Descriptive Ethonology of Bengal. Calcutta. Indian Studies : past & present. 1872 [2nd Rep. 1973]. 357p.

32. Fredrich Engelh and Karl Marx The First war of Indian Independence. Calcutta.

33. G. A. Grierson. A Linguistic Survey of India. Calcutta. 1899.

34. G. D. Oversteel & M. Windmiller. Communism in India. Calcutta. 1960.

35. G. S. Ghurye. Caste and Race in India. 5th ed. Bombay. popular Prakason. 1969 [Rep, 2000]. 493p. Rs. 200/-.

36. H. Coupland. Bengal District Gazetteers Manbhum. Calcutta. 1911. 298P.

37. Henry Strachy. Notes on Burrabhum. 1800.

38. H. H. Risley. The Tribes and Castes of Bengal. Vol-I. Calcutta. FIRMA Mukhopadhyay. 1891 [Rep. 1981]. 540P. Rs. 600/-.

39. H. Ricketts. Reports on Purulia or Manbhum (etc). 1855.

40. H. H. Risley. The Tribes and castes of Bengal. Vol-2. FIRMA Mukhopadhyay. 1891 [Rep. 1981]. V.P. Rs. 600/-

41. Jagadish Jha. Kol Rebellian.

42. Jagannatha Dash. Human Ecology of Foragers. New Delhi. 483P. Rs. 1700/-

43. J. C. Price. The Chuar Rebellion. Calcutta 1874

44. J. D Beglar Report a Tour throug the Bengal Provinces Vol-VIII. 1872-73.

45. J. E. Harrison. The Ancient Art & Ritual. 1925.

46. J. H. Hutton. Caste in India. Bombay. 1969.

47. J. Hoffman. Encyclopaedia Mundarica. Vol-1-16. New Delhi. Gian Publishing House. 1st Rept. 1990. Total Set Rs. 4,500/-.

48. J. Nath. Cultural Heritage of Tribal Societies. Vol-1. New Delhi. Omsons Publications. 2000. 202p. Rs. 490/-

49. Monarama year book 2001. Calcutta . Malayala Monarama. 2001. 824p. Rs. 90/-

50. N. C. Choudhury. Munda Social Structure. Calcutta. FIRMAKLM. 1977 137P. Rs. 90/-.

51. N. K. Bose. Culture and Society of India. Calcutta. 1967.

52. Nihar Ranjan Roy. History of the Bengali people. Calcutta. Orient Longman. 1994. 613P.

53. N. Kaviraj. Santal village Community and the Santal Rebellion. of 1985. Calcutta. Subarnarekha. 2001. 222p.

54. N. K. Dutta. Origin and growth of caste in India.

55. N. K. Sinha. Economic History of Bengal. Vol—I-II. Calcutta.

56. N. K. Sinha. Mundari Phonetic Reader. Mysore. Central Institute of Indian Languages. 1974. 102 p. Rs. 5/-.

57. N. K. Sinha.
Mundari Grammar.
Mysore. Central Institute of Indian Languages. 1975. 163 p. Rs. 10/-.

58. N. Kumar. ed.
Ranchi District Gazetter.
Patna. Government of India. 1970. 612 P. Illus. Rs. 15/-.

59. Norman H. Zide.
Studies in the Munda Numerals.
Mysore. Central Institute of Indian Languages 1978. 77P. Rs. 10./-.

60. N. Ramaswami.
Bhumij Grammar. Mysore. Central Institute of Indian Languages. 1992 191 p. Rs. 36/-.

61. Pasupati Prasad Mahato.
Performing Arts of Jharkhand.

62. P. C. Biswas.
Santals of the Santal Parganas. Delhi. 1956.

63. P. C. Roychowdhury.
Jainism in Manbhum.

64. P. K. Mitra.
Mundari Folk Tales. Ranchi 1956.

65. P. O. Bodding.
A Santal Dictionary. Vol—I-V.
New Delhi. Gian Publishing House. 1993. Set of volumes Rs. 3,600/.

66. P. O. Bodding.
Santel Folk tales. Vol. I-III.
ASLO. 1925.

67. P. O. Bodding.
Traditions and Institutions of the Santals. OSLO. 1942.

68. Pradip Kumar Bandyopadhyay
Tribal Situation in Eastern India.
Calcutta. Subarnarekha. 1999. 271p. Rs. 300/-.

69. Rajasri Basu.
Santals of West Bengal : Ethnopsychology and Political participation Calcutta Progressive Publishers. 2000. 231P. Rs. 350/.

70. R. C. Majumdar.
History of ancient Bengal. 1974.

71. R. C. Majumdar.
History of Mediaeval Bengal.

72. R. C. Majumdar.
Struggle for Freedom.

73. R. M. Macphail.
An Introduction to Santali. Part—I-II. Calcutta. FIRMAKLM.

74. R. M. Macphail. ed.
Campbells Santali—English Dictionary. 3rd. ed. Calcutta. FIRMAKLM. Rep. 1988. 816p. Rs. 600/-.

75. R. V. Williams.
Folksong Encyclopaedia Britanica. 14th ed. 1932.

76. Sankarananda Mukhopadhyay.
The Austrics of India. Calcutta. K. P. Bagchi. 1975. 148P.

77. Sarat Chandra Roy.
The Mundas and their country.
Ranchi. City Book Society. 1912 [Rep. 1995]. 356 p. Rs. 250/-

78. S. C. Roy and Roy
The Kharias. Vol. I-II. Ranchi. 1937.

79. S. C. Roy
Oraon Religion and Customs.
New Delhi. Gyan Publishing. 1999. 418p. Rs. 600/-.

80 Shibani Roy & S. H. M. Rizvi.
Tribal Customary Laws of North East India. Delhi. B. R. Publishing Corporation. 1990. 204 p. Rs. 450/-

81. S. M. Channa.
Religion and Tribal Society : Social life and belief systems. New Delhi. Cosmo Publication. 2002. 312 p. Rs. 975/-.

82. S. R. Das.
Folk Religion of Bangal. Calcutta. 1953.

83. S. Sinha and others.
Ethnic groups, villages and Towns of pargana Burrabhum. 1964.

84. Subhas Chandra Mukhopadhyay.
Glimps of the History of Manbhum. Calcutta. 1983. 40 p. Rs. 12/-.

85. Subhas Chandra Mukhopadhyay
Jain Tamples of Purulia.

86. Subhaskanti Chakroborti
A Brief History of Press and Media. Government of India. Calcutta. Barnali. 1994, 80 p. Rs. 100/-.

87. Suchibrata Sen.
The Santals of Jungle Mahals. Calcutta. Patra Prakasan. 1984. 167 p. Rs. 65/-

88. Sudhibhuson Bhattacharya.
Studies in Comparative Munda Linguistics. Simla. Indian Institute of Advanced Study. 1975. 205p. Rs. 50/-.

89. Sukumar Sen.
History of Bengali Literature. Sahitya Academi. 1960.

90. Sunil Kofhari
Chhou Dance of India. 1968.

91. Suniti Kumar Chatterjee.
Languages and Literatures of Modern India. Calcutta. 1963.

92. Suniti Kumar Chatterjee.
The origin and Development of the Bengali Language. Calcutta. Rupa & Co. 1993. 1179 p. Rs. 295.

93. Sushil Kumar Bhattacharaya.
Folk Heritage of India. Varanasi. Bibliographical society of India. 1989. 375 p. Rs. 300/-.

94. Tarun Kumar Banerjee & Debesh Roychowdhury.
Colonial India : Ideas and movements. Calcutta. Progressive Publishers. 2001. 352 p. Rs. 400/-.

95. T. C. Das.
The Wild Kharias of Dhalbhum. Calcutta. 1931.

96. V. A. Smith.
The Early History of India. 4th ed. London. Oxford University Press. 1957.

97. West Bengal District Gazetteers.
Purulia. 1971.

98. West Bengal District Gazetters.
Purulia. 1985. 468 p.

99. W. W. Hunters.
The Annals of Rural Bengal. Calcutta. 1868 [Rep. 1965].

100. W. W. Hunter.
The Statistical Account of Bengal. London. 1877

সৃজক পরিচিতি

অজয় মোহন গাঙ্গুলী ঃ জন্ম ১৫.৭.১৯৪৫। ইতিহাস বিষয়ে স্নাতোকত্তর। ১৯৬৫ সাল থেকে শিক্ষকতার সাথে যুক্ত। বর্তমানে পুরুলিয়া শহরের এম. এম. হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির প্রাক্তন জেলা সম্পাদক।

ছন্দম দেব ঃ জন্ম কলকাতা ১৯৫৮। কলকাতার মৌলানা আজাদ, প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাক্রমে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর। বর্তমানে পুরুলিয়ার জে. কে. কলেজ ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক। ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণায় রত।

ডঃ অপূর্ব কুমার সান্যাল ঃ জন্ম ১৯৩৩ হুগলি জেলার বলাগড়ে। বিশ্বভারতী থেকে স্নাতকোত্তর, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ. ডি.। নিখিল ভারত বঙ্গ সম্মেলনের পুরুলিয়া জেলা শাখার সভাপতি ও সম্পাদকের দায়িত্ব দীর্ঘ দিন পালন করেছেন।

ইন্দ্রাণী দেব ঃ জন্ম জামসেদপুর, ১৯৬০। প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাক্রমে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর। বর্তমানে পুরুলিয়ার নিস্তারিণী কলেজে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপিকা।

দেবাশীষ সরখেল ঃ জন্ম ১৯৬০, পুরুলিয়া জেলার এক প্রত্যন্ত গ্রামে। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আধুনিক ইতিহাসে এম.এ.। পেশা—শিক্ষকতা। রচিত গ্রন্থ— থেকে পড়বার কথা নয়, রেড স্যালুট, কালি ও কয়লায় আছি, লেনিনের জীবনী।

মোহিনীমোহন গাঙ্গুলি ঃ ষাটের দশকের উজ্জ্বল কবি-ব্যক্তিত্ব মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। দীর্ঘ ৩৪ বৎসর কবিতার কাগজ'কেতকী' সম্পাদনা করে আসছেন। পুরুলিয়া জেলার কবিতা আন্দোলনের অগ্রণী ভূমিকার সফল অংশীদার কবি-সৈনিক। কবিতা, প্রবন্ধ, কাব্যনাটক, ছড়া লেখেন। দেশি-বিদেশি ভাষার বহু কবিতা বাংলায় অনুবাদ করেছেন। দু'বাংলার বহু নামি-দামি পত্রপত্রিকা ও লিটল ম্যাগাজিনের নিয়মিত লেখক। ১৮টির বেশি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৯৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি কর্তৃক সম্বর্ধিত ও সম্মানিত হয়েছেন।

অনুপ মুখোপাধ্যায় ঃ জন্ম ১৯৬২, ১৭ই আগস্ট, পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুর মহকুমার রক্ষৎপুর গ্রামে। সত্যযুগ পত্রিকাতে সাংবাদিকতার শুরু। গ্রুপ থিয়েটার পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য। বতর্মানে আলফা বাংলার সর্বক্ষণের সাংবাদিক; নাট্য সংস্থা বিদ্যার সঙ্গে যুক্ত। প্রখ্যাত চিত্রপরিচালক বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর সঙ্গে সহপরিচালক এবং অভিনয়।

রাওয়েল পুষ্প : জন্ম ১৯৫১, উত্তরপ্রদেশ। কর্মস্থল—পশ্চিমবঙ্গ। শিক্ষা—গণিতে স্নাতকোত্তর। পেশা—বীমা কোম্পানিতে চাকুরি। প্রকাশিত গ্রন্থ—মুঝে গর্ভ মে হি মার ডালো।

সুশান্ত হাজরা : জন্ম—২০.১২.১৯৩৮। শিক্ষাগত যোগ্যতা—এম. এ., লাইব্রেরি সায়েন্সে ডিপ্লোমা। ১৯৬২ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত পুরুলিয়ার জেলা গ্রন্থাগারে জেলাগ্রন্থাগারিক হিসেবে কাজ করেছেন। পরবর্তীকালে পুরুলিয়ার জেলাগ্রন্থাগার আধিকারিক হিসেবে ১৯৮৯ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত কাজ করেছেন।

জগন্নাথ দত্ত : জন্ম ২রা জুলাই ১৯৫৫। শিক্ষা—ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর। পেশা—শিক্ষকতা। প্রকাশিত গ্রন্থ—আগতের নাম, নির্বাসনে প্রতিদিন। সম্পাদিত পত্রিকা—এবং আমরা, অমিত্রাক্ষর, ঠিকানা—নিউ কলোণী, মিশন রোড, পুরুলিয়া।

সুবোধ বসুরায় : ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ১লা নভেম্বর পুরুলিয়া শহরে জন্ম। শিক্ষালাভ কলকাতার স্কটিশচার্চ, সেন্টপল্স, প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ইংরাজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন ১৯৪৮-এ। পুরুলিয়ার নবপ্রতিষ্ঠিত জে.কে. কলেজের অধ্যাপক হিসাবে কাজে যোগ দেন। কর্মজীবন কাটে প্রিয় কলেজটিতে অধ্যাপনা করে। জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ মানভূম লোকসংস্কৃতি মুখপত্র 'ছত্রাকের' সম্পাদনা। ছত্রাকের সম্পাদক সুবোধ বসুরায় নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে লোকসংস্কৃতির গভীর গবেষণায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন।

কিরীটি মাহাত : জন্ম পুরুলিয়া জেলার পাড়া থানার রামকৃষ্ণপুর গ্রামে ২৮শে জুন ১৯৫৯। পুরুলিয়ার জে. কে. কলেজ থেকে বি. এ. এবং রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কুড়মালি ভাষায় এম. এ.। প্রথম জীবন থেকেই ঝুমুর ও লোকসংস্কৃতি চর্চার সঙ্গে যুক্ত। বর্তমানে আকাশবাণী কলকাতার একজন তালিকাভুক্ত শিল্পী। প্রকাশিত গ্রন্থ—ঝুমুর : সংগীত ও সাহিত্য, কুড়মি জাতি ও কুড়মালি ভাষা।

স্বপন দাস : জন্ম ১৯৬৮ সালে পুরুলিয়ার কালুহার গ্রামে। কলা বিভাগে স্নাতক। 'অনৃজু' পত্রিকার প্রকাশক।

ডঃ শান্তি সিংহ : জন্ম ১৯৪৫ সালে, (১৩৫২ বঙ্গাব্দ, ৪ঠা আষাঢ়) বাঁকুড়া শহরের উপকণ্ঠে গন্ধেশ্বরী নদীর তীরে ভূতেশ্বর গ্রামে। বিশিষ্ট কবি ও গবেষক। বর্তমানে পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক। সর্বপ্রথম গবেষণা গ্রন্থ 'লোকসঙ্গীত সংগ্রহ: ঝুমুর'। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ এবং বিদ্যাসাগর নিয়েও অভিনব গবেষণা করেছেন। কয়েকটি গ্রন্থও আছে এ বিষয়ে। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি থেকে প্রকাশিত বসন্তরঞ্জন রায়ের জীবনী গ্রন্থের লেখক।